সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

আমপারা

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

আমপারা

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক

AL-QURAN ACADEMY LONDON

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন
(২২তম খন্ড সূরা আন নাবা থেকে সূরা আন নাস)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৩৬২ ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫
২০তম সংস্করণ
রবিউস সানি ১৪৩২ মার্চ ২০১১ ফাল্গুন ১৪১৭

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত ষাট টাকামাত্র

Bengali Translation of Tafseer
'Fi Zilalil Quran'

Author
Syed Qutb Shaheed
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
3rd Volume
(Sura A-le Imran)

Published by
Khadija Akhtar Rezayee
Director Al Quran Academy London
124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK
Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 362 Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition 1995
20th Edition
Rabius Sani 1432 March 2011
Price Tk. 260 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN-984-8490-22-1

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক—এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পুনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন।।

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো। সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না–না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ক্রটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আন নাবা

আয়াত ৪০ রুকু ২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝٢ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا

شِدَادًا ۝١٢ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٣ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝١٥ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. কোন্ বিষয় সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে? ২. (তারা কী) সেই (গুরুত্বপূর্ণ) মহাসংবাদের ব্যাপারেই (জিজ্ঞাসাবাদ করছে), ৩. যে ব্যাপারে তারা নিজেরাও বিভিন্ন মত পোষণ করে; ৪. না, (তা আদৌ ঠিক নয়, সঠিক ঘটনা) এরা তো অচিরেই জানতে পারবে, ৫. আবারও (তোমরা শুনে রাখো, কেয়ামত আসবেই এবং) অতি সত্বরই তারা (এ সম্পর্কে) জানতে পারবে। ৬. (তোমরা কি আমার সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে ভেবে দেখোনি?) আমি কি এ ভূমিকে বিছানার মতো করে তৈরী করে রাখিনি? ৭. (ভূমিকে স্থির রাখার জন্যে) আমি কি পাহাড়সমূহকে (এর গায়ে) পেরেকের মতো গেড়ে রাখিনি? ৮. (সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে) আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি, ৯. তোমাদের ঘুমকে আমি শান্তির উপকরণ বানিয়েছি, ১০. আমি রাতকে (তোমাদের জন্যে) আবরণ করে দিয়েছি, ১১. (তার পাশাপাশি) দিনগুলোকে জীবিকা অর্জনের জন্যে (আলোকোজ্জ্বল করে) রেখেছি, ১২. আমি তোমাদের ওপর সাতটি মযবুত আসমান বানিয়েছি, ১৩. (এতে) স্থাপন করেছি একটি প্রোজ্জ্বল বাতি, ১৪. মেঘমালা থেকে আমি বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা, ১৫. যেন তা দিয়ে আমি (শ্যামল ভূমিতে) উৎপাদন করতে পারি (নানা রকমের) শস্যদানা ও তরিতরকারি, ১৬. এবং সুনিবিড় বাগবাগিচা; ১৭. (সব কিছুর শেষে) এর (সিদ্ধান্তকারী একটি) দিনও সুনির্দিষ্ট

مِيقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ

فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ

مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا

بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا

يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾

فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ

وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا

وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

(করে রাখা) হয়েছে, ১৮. যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, (প্রলয়ংকরী ফুঁর সাথে সাথে) তোমরা দলে দলে আসবে, ১৯. (যখন) আসমান খুলে দেয়া হবে এবং তা অনেকগুলো খোলা দরজায় পরিণত হয়ে যাবে, ২০. পর্বতমালাকে সরিয়ে দেয়া হবে এবং তা মরীচিকার মতো হয়ে যাবে, ২১. নিশ্চয়ই জাহান্নাম (পাপীদের জন্যে) এক (গোপন) ফাঁদ, ২২. বিদ্রোহীদের জন্যে তা হবে (নিকৃষ্টতম) আবাসস্থল, ২৩. সেখানে তারা কালের পর কাল ধরে পড়ে থাকবে, ২৪. সেখানে তারা কোনো ঠান্ডা ও পানীয় (জাতের) কিছুর স্বাদ ভোগ করবে না, ২৫. (সেখানে) ফুটন্ত পানি, পুঁজ, দুর্গন্ধময় রক্ত, ক্ষত ছাড়া (ভিন্ন) কিছুই থাকবে না, ২৬. এ হচ্ছে (তাদের) যথাযথ প্রতিফল; ২৭. (কারণ) এরা হিসাব-নিকাশের (দিন থেকে কিছুই) আশা করেনি, ২৮. (বরং) তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; ২৯. আমি তো (তাদের) যাবতীয় কর্মকান্ডের রেকর্ড সংরক্ষণ করে রেখেছি, ৩০ অতএব তোমরা আযাব উপভোগ করতে থাকো, (আজ) আমি তোমাদের জন্যে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধিই করে দেবো।

রুকু ২

৩১. (অপরদিকে) পরহেযগার লোকদের জন্যে রয়েছে (পরম) সাফল্য, ৩২. (তা হচ্ছে সুসজ্জিত) বাগবাগিচা, আংগুর (ফলের সমারোহ), ৩৩. (আরো রয়েছে) পূর্ণ যৌবনা সমবয়সী সুন্দরী তরুণী, ৩৪. এবং উপচে পড়া পানপাত্র; ৩৫. এখানে তারা কোনো বাজে কথা ও মিথ্যা শুনতে পাবে না, ৩৬. তোমার মালিকের তরফ থেকে (এটা হচ্ছে) তাদের জন্যে যথাযথ পুরস্কার, ৩৭. (এ পুরস্কার তাঁর) যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার মালিক– দয়াময় আল্লাহ তায়ালা– তাঁর সাথে

بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

صَفًّا ۙۗ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ

الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ

يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

কেউই বিতর্ক করার ক্ষমতা রাখে না, ৩৮. সেদিন (পরাক্রমশালী মালিকের সামনে জিবরাঈল-) রূহ ও অন্যান্য ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যাদের অনুমতি দেবেন তারা ছাড়া (সেদিন) অন্য কেউই কথা বলতে পারবে না এবং সে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও (যখন বলবে তখন) সঠিক কথাই বলবে। ৩৯. এ দিনটি সত্য, (তাই) কেউ ইচ্ছা করলে (এখনো) নিজের মালিকের কাছে নিজের জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে। ৪০. আমি আসন্ন আযাব সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করে দিলাম, সেদিন মানুষ দেখতে পাবে তার হাত দুটি এ দিনের জন্যে কী কী জিনিস পাঠিয়েছে, (এ দিনকে) অস্বীকারকারী ব্যক্তি তখন বলে ওঠবে (ধিক্ এমনি এক জীবনের জন্যে), হায়, কতো ভালো হতো যদি মানুষ (না হয়ে) আমি (আজ) মাটি হতাম!

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরাটি এই পারার মধ্য বর্ণিত বিষয়গুলোর এক চমৎকার উদাহরণ। এ পারাতে উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়, উদাহরণ, প্রাকৃতিক বর্ণনা, ঘটনাপঞ্জী, বিভিন্ন জিনিসের প্রতিচ্ছবি, বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান বিষয়সমূহ। প্রাণীজগত ও জড়জগতের সুরঝংকার, দুনিয়া ও আখেরাতের বর্ণনা, অনুভূতি ও বিবেককে আকর্ষণকারী শব্দ ও বাচনভংগি ও এখানে রয়েছে। জগত ও জীবন সম্পর্কে বর্ণিত এসব কথা এ সূরাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সূরাটি শুরু করা হয়েছে একটি হৃদয়স্পর্শী প্রশ্ন আকারে। ওই সময়ে ওরা (কোরায়শরা) যে বিষয়ে মতভেদ করছিলো তার গুরুত্ব এতে অত্যধিক বেড়ে গেলো। অর্থাৎ প্রশ্নের বিষয়টি পাঠকের কাছে নিসন্দেহে এমনভাবে মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হলো যে, সে বিষয়ে সন্দেহ করার আর কোনো সুযোগই রইলো না। তবু কি তারা মতভেদ করছে? এ প্রসংগে তাদেরকে সতর্ক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে- যেদিন ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে সবকিছু। 'কোন্ বিষয়ে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে?'

সেই মহা খবর সম্পর্কে কি, যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত? না- যা তারা ভাবছে তা কিছুতেই হবার নয়। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। অবশ্যই তারা জানবে। তারপর প্রসঙ্গ

পরিবর্তন করে এই মহাসংবাদ সম্পর্কিত আলোচনা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে বলা হয়েছে, আমাদের সামনে ও আশেপাশে যে অবস্থা বিরাজ করছে, আমাদের অন্তরে যা আমরা অনুভব করছি এবং বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান অবস্থা সেই ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দিচ্ছে যা পরবর্তীকালে আসবে– আমি কি পৃথিবীকে বিছানা, পাহাড়গুলোকে পেরেক (-এর মতো করে পয়দা করিনি)? তোমাদের কি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করিনি? বানাইনি কি তোমাদের নিদ্রাকে আরামের বস্তু, রাতকে (আচ্ছাদনকারী) পোশাক এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময়? এরপর (তোমাদের মাথার ওপর) সাতটি মযবুত আসমান কি বানাইনি ? তারপর কম্পমান আলোকমালা দ্বারা এগুলোকে কি সজ্জিত করিনি? এরপর খাদ্যশস্য, শাকসবজি এবং ঘন সন্নিবেশিত বাগবাগিচা তৈরী করার জন্য মেঘমালা থেকে পানি কি বর্ষণ করিনি?

বাস্তব জীবনের এসকল উদাহরণ দ্বারা সূরাটির মধ্যে সেইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যে সম্পর্কে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিলো। যখন তারা সেদিনকে প্রত্যক্ষভাবে জানবে, তখন সেদিনটি তাদের ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যেন বলতে চান, কি সে জিনিস এবং কোন সে জিনিস (তোমরা তো বলতে পারো)? অবশ্যই ফয়সালার দিনটি নির্দিষ্ট রয়েছে, সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে এগিয়ে আসবে। সে সময় আকাশকে খুলে দেয়া হবে, আর তা বহু দরজায় পরিণত হয়ে যাবে, পাহাড়গুলোকে সঞ্চালিত করা হবে, যা ধুলাবালির স্তূপে পরিণত হয়ে যাবে।

এরপর ভয়ংকর কঠিন আযাবের দৃশ্যের কথা পেশ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে। যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে পড়ে থাকবে। ঠান্ডা অথবা পানীয় বস্তুর স্বাদ তারা সেখানে পাবে না। শুধু গরম পানি ও যখমের ধোয়ানী (বা পুঁজ, রক্ত) ছাড়া। এটাই হবে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান। বলা হবে, (এগুলোর স্বাদ), ভোগ করো আমি (আজ) শাস্তি ছাড়া অন্য কিছুই বাড়াবো না।

অনুরূপভাবে তাঁর নেয়ামতের বিবরণও দেয়া হয়েছে, ছন্দের তালে তালে যার আলোচনা এগিয়ে আসছে। বলা হচ্ছে, অবশ্যই মোত্তাকী পরহেযগারদের জন্যে চূড়ান্ত সাফল্য আসবে, হাজির হবে সোহাগিনী সমবয়সী তরুণীরা কানায় কানায় ভরা পানপাত্র নিয়ে। যার মধ্যে থাকবে না কোনো বাজে বকাবকি। তোমার রবের পক্ষ থেকে দেয়া হবে এ প্রতিদান।

সূরাটির সমাপ্তি টানতে গিয়ে ওই মহাদিবসের চমৎকার এবং গৌরবজনক এক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই দিবসটি আগমনের পূর্বেই তার দৃশ্যের অবতারণার মধ্যে ফুটে উঠেছে সতর্কীকরণ ও সুসংবাদ দানের এক চমৎকার উপস্থাপনা। মালিক তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর। এ দুইয়ের মধ্যে আর যা কিছু আছে সে সবকিছুর প্রতিপালক। তিনি রহমান, দয়াময় প্রভু। আর সেদিন কেউ তাঁকে সম্বোধন করে কিছু বলার ক্ষমতা রাখবে না। সেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। দয়াময় আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সেদিন কোনো কথা বলবে না, আর (অনুমতি পেলে) যা বলবে তা সত্যই হবে। ওই সঠিক দিনটি নিশ্চিতভাবে আসবে।

এখন যে তার পরোয়ারদেগারের কাছে আশ্রয় পেতে চায় সে আশ্রয় নিক। আমি তোমাদেরকে আসন্ন এক আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করছি। সে দিন এবং এই দিনকে অস্বীকারকারী প্রতিটি কাফের ব্যক্তি বলতে থাকবে 'হায়, আফসোস! (মানুষ না হয়ে) যদি আমি আজ মাটি হয়ে যেতাম!

তাফসীর

এটিই হচ্ছে সেই মহা খবর, যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতভেদ করেছিলো, আর তা শীঘ্রই সংঘটিত হবে। সেদিন তারা অবশ্যই সে মহাখবর সম্পর্কে জানতে পারবে।

সূরাটির সূত্রপাত হয়েছে এমনভাবে যে, জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু ও জিজ্ঞাসাকারী উভয়কেই এতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেয়ামতকে কেউ অস্বীকার করতে পারে এ বিষয়েও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে, আর ওরা এই কাজটিই করছিলো। একে অপরকে পুনরুত্থান ও কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটিই জিজ্ঞাসাবাদ করছিলো। এটা ছিলো এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে তারা ভীষণ তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো। আসলে ওরা সেই ভয়ানক দিনের আগমন সম্পর্কে আদৌ কল্পনা করতে পারছিলো না, যদিও কেয়ামতের আগমন ছিলো সম্পূর্ণ বুদ্ধিসঙ্গত।

কোন্ জিনিস সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছে এবং কোন্ বিষয়ে তারা কথা বলছে? এর পরেই এ সূরার মধ্যে এবং জবাব আসছে, এতে বুঝা গেলো, তাদের থেকে জবাব পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছিলো এমন নয়, বরং এ প্রশ্ন ছিলো তাদের অবস্থার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের বৈচিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, যাতে করে ওদের জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে বাস্তব সত্যটি প্রকাশ পেয়ে যায়।

'কোন বিষয়ে তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত?' যে বিষয়ে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছিলো, সে বিষয়টিকে কোনো নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়নি, বরং 'সেই মহাখবর' সম্পর্কে বলে ওসব ব্যক্তি ও তাদের কাজ সম্পর্কে এক বিস্ময়ের অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। কেয়ামতের এই মহা দিবস সংঘটিত হবে কি না সে বিষয়ে ঈমানদার ও বে-ঈমানদের মধ্যে মতভেদ চলছিলো। কিন্তু প্রশ্নটি আসছিলো শুধুমাত্র শেষোক্ত কাফের দলের পক্ষ থেকে।

তারপর তারা পরস্পরকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলো তার কোনো বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়নি এবং যে বিষয়ের ওপর প্রশ্ন আসছিলো, সে বিষয় সম্পর্কেও কোনো কথা বলা হয়নি। বিতর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি কোনো ধমক না দিয়ে, শুধুমাত্র 'মহা খবর' বা 'বিরাট জিনিস'-বলেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এটা অবশ্য সরাসরি জবাব দেয়া থেকে বেশী ক্রীয়াশীল এবং ভীতি প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে বেশী উপযোগী। সরাসরি তিরস্কার করা থেকে কেয়ামতের ভয়াবহতার অনুভূতি জাগ্রত করার ব্যাপারে এটা অধিক কার্যকর পন্থা। যা ভাবছে ওরা (কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে) কিছুতেই তা হবার নয়। শীঘ্রই ওরা জেনে যাবে, আবারও বলছি, কিছুতেই নয়, শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে। 'কাল্লা' (কিছুতেই নয়) এ শব্দটি কোনো কিছুকে প্রতিহত করার জন্যে অথবা কাউকে ধমক দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে 'কাল্লা' শব্দটির প্রয়োগ, বারবার উল্লেখ এবং বাক্যটির বারবার পুনরাবৃত্তি উল্লেখিত বিষয়ের ভয়াবহতাকে তীব্রভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।

সৃষ্টির আদিগন্ত

এরপর এই যে 'মহাখবর'-এর আলোচ্য বিষয়টি, যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত, সে বিতর্কিত বিষয়টিকে স্পষ্টতই (সাময়িকভাবে) এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যদিও তা এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য যেন পরে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যায়। সূরাটি আমাদেরকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিয়ে যায় বিশ্বের চতুর্দিকে, যেখানে আমাদের হয় বহু জীবন্ত জিনিস, অসংখ্য রহস্যরাজি দৃষ্টিগোচর, যা যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। দেখুন- 'আমি বানাইনি কি এই পৃথিবীকে বিছানা (স্বরূপ), পাহাড়গুলোকে পেরেক (স্বরূপ), আর

তোমাদের কি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করিনি? আর বানাইনি কি তোমাদের ঘুমকে আরামের বস্তু, রাতকে কি পোশাক-এর মতো করে বানাইনি, আর দিবসকে কি জীবনসামগ্রী যোগাড় করার জন্যে উপযুক্ত সময় (হিসেবে) বানাইনি? বানাইনি কি তোমাদের ওপর সাতটি শক্ত আসমান এবং তাকে সুসজ্জিত করিনি কি কম্পমান উজ্জ্বল আলোকমালা দ্বারা? তারপর বর্ষণ করাইনি কি মেঘমালা থেকে প্রচুর (বৃষ্টির) পানি, যাতে করে আমি উৎপন্ন করতে পারি খাদ্যশস্য, শাকসবজি এবং ঘন সন্নিবেশিত ছায়াভরা বাগবাগিচা?

সূরাটির এই পর্যায়ে এসে আমরা যখন বিশাল এই বিশ্বের আদিগন্ত দিক চক্রবালের দিকে তাকাই, তখন সেখানে আমরা বহু দৃশ্য ও রহস্যরাজির সন্ধান পাই, যা প্রকাশ করার মতো কোনো শব্দ ও ভাষা আমাদের জানা নেই। যার সৌন্দর্য ও সুরের মূর্ছনা হৃদয় দুয়ারে আঘাত হেনে বার বার তাকে বিদ্ধ করতে থাকে। এ আঘাত চলতে থাকে উপর্যুপরি এবং অবিরামভাবে। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বিষয়টিকে প্রশ্ন আকারে পেশ করা হয়েছে। যারা জানে না তাদেরকে যেন এক শক্ত হাত দ্বারা ঝাঁকিয়ে সজাগ করে তোলা হয়েছে। তাদের চোখ ও মনোযোগকে আকৃষ্ট করা হয়েছে সমগ্র সৃষ্টি ও তার রহস্যরাজির দিকে, যার সৃষ্টির মূলে এক সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা রয়েছে বলে মযবুত প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকন্তু এ কথাও বুঝা যায়, যিনি কোনো অস্তিত্ব বর্তমান না থাকা থেকে অস্তিত্বকে বর্তমানে এনেছেন, তিনি এগুলোকে পুনরায় অবশ্যই জীবন দান করতে পারেন। এগুলোকে উদ্দেশ্যহীন পয়দা করা হয়েছে, অথবা কারো কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে না বা যারা সৎ কর্ম করে তাদেরকে কোনো পুরস্কার দেয়া হবে না– এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। অতএব সেই মহা ভয়াবহ দিন আসবেই, সেই দিনটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ খবর দেয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, এ বিষয়েই তারা মতভেদ করছে।

বিশ্বরহস্য ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতগুলোর দিকে তাকাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি পৃথিবীকে কি বিছানা (করে) বানাইনি এবং বানাইনি কি পাহাড়গুলোকে পেরেক (স্বরূপ)?

'মেহাদ' (বিছানা) বলতে ভ্রমণ ও চলাফেরার জন্যে সমভূমি, আবার দোলনার মতো নরম বিছানা– এ দুটি অর্থই বুঝায় এবং এখানে এ দুটি অর্থের মধ্যে চমৎকার মিল রয়েছে। এ এমন একটি সত্য, যা সাধারণভাবে যে কোনো মানুষ বুঝতে পারে। এদিকে একটু মনোযোগ দিলে একজন সেকেলে এবং সাধারণ বুদ্ধির মানুষের পক্ষেও এ কথাগুলো বুঝা কঠিন নয়। এগুলো বুঝার জন্য কোনো সুক্ষ্মদৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানেরও প্রয়োজন হয় না। পাহাড়সমূহকে পেরেকের মতো গেড়ে দেয়া হয়েছে যাতে পাহাড় নড়েচড়ে না বেড়ায়। এ কথাটিও সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে, অবশ্য যদি তারা একটু খেয়াল করে বুঝার চেষ্টা করে।

যতোই জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটছে এবং মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন রহস্য ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে উন্নততর প্রজ্ঞার অধিকারী হচ্ছে ততোই এই উভয় জিনিস সম্পর্কে তার বুঝ শক্তি বেড়ে যাচ্ছে। অনুভূতি তীব্রতর হচ্ছে, সৃষ্টি রহস্যের নতুন নতুন জট তার কাছে খুলে যাচ্ছে এবং বিশ্ব সম্পর্কে আল্লাহর বিস্তারিত পরিকল্পনা সে জানতে ও বুঝতে পারছে। সে জানতে পারছে বিভিন্ন জিনিসের পৃথক পৃথক সৃষ্টি কৌশল এবং সেগুলোর প্রয়োজন ও প্রয়োগ সম্পর্কে। মানুষের বসবাস উপযোগী পৃথিবীর সৃষ্টি প্রকরণ পদ্ধতি এবং প্রতিটি পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার মতো মানুষের যোগ্যতা সম্পর্কেও সে জানতে পারছে। আর পৃথিবীকে যে মানুষের জন্যে বিশেষভাবে আরামদায়ক বিছানা বানানো হয়েছে এটা তার সৃষ্টি নৈপুণ্যের এক অনস্বীকার্য দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে

প্রাপ্ত কোনো অবস্থার কারণ কোনো সম্পর্ককে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে অথবা জীবনের জন্যে কোনো প্রয়োজনীয় অবস্থা তার প্রকৃতির কারণেও নষ্ট হতে পারে। এমতাবস্থায় পৃথিবী আর মানুষের বসবাস বা পদচারণার জন্যে আরামদায়ক ঘর হিসেবে কাজ নাও করতে পারে।

তিনি পাহাড়গুলোকে পেরেক (স্বরূপ) বানিয়েছেন। সাধারণ দৃষ্টিশক্তি দ্বারা যে কেউ বুঝতে পারে যে, পাহাড়-পর্বতগুলো অবিকল কোনো তাঁবুর খুঁটির মতো। এর সত্যতা আমরা কোরআন থেকেই জানতে পারি যে, এ পবর্তগুলো পৃথিবীকে দৃঢ়ভাবে স্থির করে রেখেছে এবং পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রেখেছে। এই পর্বতমালা সমুদ্রের গভীর গর্তে প্রোথিত এবং স্থলভাগের উপরে সংস্থাপিত। এটাও বাস্তবে সংঘটিত হচ্ছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের ও উপরিভাগের সংকোচনকে এই পর্বতগুলোর ভারত্ব বিভিন্ন অঞ্চলকে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ও অভ্যন্তরীন প্রকম্পন থেকে রক্ষা করে। আরও অনেক ব্যাখ্যা হয়তো ভবিষ্যতে আসবে যা এখন ও মানুষের জ্ঞানসীমার বাইরে আছে কোরআনে করীম তো এ দিকে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে মাত্র। এরপর শত শত বছর ধরে মানুষ জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে সেসব জানতে পারবে।

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্নভাবে আলোচনা এসেছে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে। বলা হয়েছে, 'তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি।' এটা অত্যন্ত স্পষ্ট কথা এবং নানা পর্যালোচনার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে। সকল মানুষই এটা সহজে বুঝতে পারে। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পুরুষ ও নারী হিসেবে পয়দা করেছেন। পুরুষ ও নারীর মিলনে পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি ও তার বিস্তার এগিয়ে চলেছে। এরা প্রত্যেকেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই মিলনের ফলে পার্থিব জীবনের যে আনন্দ, স্বাদ ও বৈচিত্র্য তারা পায় সে কথা সহজেই বুঝা যায়, এজন্য কোনো গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। কোরআন মজীদে উপস্থাপিত এ কথাটি প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সমাজই মূল্যায়ন করেছে এবং এর থেকে শিক্ষা নিয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা, ব্যবস্থাপনা ও চেষ্টা যে কার্যকর ভূমিকা পালন করে তাও মানুষ সহজেই অনুভব করতে পারে।

মানুষের অগ্রগতি ও জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে এ অস্পষ্ট চেতনা সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞান গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা চলছে। এ বিচিত্র সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় একই শুক্র-বিন্দুর কোনোটাতে পুরুষ শিশু এবং কোনোটাতে কন্যা শিশু কিভাবে জন্ম নিচ্ছে তা বুঝার কোনো উপায় নেই। এ বিষয়ে যতোই জ্ঞান গবেষণা করা হয়েছে, ততোই মানুষ বুঝেছে যে, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা ছাড়া এখানে অন্য কারো ইচ্ছাই কার্যকর নেই। তিনি এসব কিছু তাঁর ক্ষমতাবলে অতি সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর ব্যবস্থাপনা ও ইচ্ছাতেই পুরুষ সন্তান ও কন্যা সন্তানের জন্ম, বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটে।

অসাধারণ একটি নেয়ামত

'তোমাদের নিদ্রাকে আরামের বস্তু বানিয়েছি, রাতকে বানিয়েছি পোশাক (স্বরূপ) আর দিনকে বানিয়েছি জীবিকা আহরণের সময়।'

একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষ আল্লাহর ব্যবস্থাপনার অধীনে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ অক্ষম ও অচেতন হয়ে যায়। এ এমন একটি অবস্থা যে একে মৃতাবস্থাও বলা যায় না, জীবিতাবস্থাও বলা যায় না। অথচ এই নিদ্রাই তার ক্লান্তি দূর করে ও পরবর্তী সময় জীবনপথে আরও কঠিন পরিশ্রম করার জন্যে নতুন করে তাকে শক্তি ও অবসাদ যোগায়। এসব কিছু এমন এক আশ্চর্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে যে, মানুষ এর রহস্য উদঘাটন করতে অক্ষম। এখানে অন্য কারো মর্জির দখল নেই। প্রকৃতির এ নিয়ম কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা মানব বুদ্ধির অগম্য। নিদ্রা শেষে মানুষ যখন জেগে ওঠে, তখন সে কিছুই বলতে পারে না নিদ্রাবস্থায় সে কোথায় কি অবস্থায় ছিলো। ঘুম যখন

তাকে কাবু করে ফেলে তখন সে নিজের অবস্থা দেখতেও পারে না, বুঝতেও পারে না। মানুষ ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির সৃষ্টি বৈচিত্রসমূহের মধ্যে এ এক অত্যাশ্চর্য রহস্য, যা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তিনি এর গোপনীয়তাকে অক্ষুন্ন রেখেছেন, কোনোভাবেই প্রকাশ হতে দেননি এবং এর ওপর তার জীবনকে নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। কোনো প্রাণী একটি নির্দিষ্ট সময়ের বেশী না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে পারে না। সেই সীমার বাইরে তাকে জেগে থাকতে বাধ্য করলে সে অবশ্যই মারা যাবে।

ঘুম মানুষের শুধু শারীরিক ও মানসিক চাহিদাকেই পূরণ করে না, বরং তার কঠিন সংগ্রামপূর্ণ জীবনে স্নিগ্ধ প্রশান্তিও বয়ে আনে। এ এমন একটি আরামপ্রদ বস্তু যা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাকে তার অস্ত্রশস্ত্র বা ঢাল তলোয়ার ফেলে দিতে বাধ্য করে এবং কিছু সময়ের জন্য সে পূর্ণ প্রশান্তির কোলে ঢলে পড়ে। এ এমন শান্তি, যা খাদ্য পানীয় থেকে কোনো অংশে কম নয়। যখন মানুষ কোনো বিষয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে, তখন মানসিক ক্লান্তি বোধ করে, ভীত সন্ত্রস্ত হয় বা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন কিছু সময়ের জন্যে হলেও নিদ্রা এসে তার সকল কষ্টের অবসান ঘটিয়ে যায় এবং তার সবকিছুর মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। নিদ্রা শুধুমাত্র তার শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে না বরং ঘুম থেকে যখন সে জেগে ওঠে, তখন সে অনুভব করে যেন সে একজন পুরোপুরি পরিবর্তিত মানুষ। এটা অলৌকিক ব্যাপার মনে হলেও এটাই সত্য। এ আলৌকিক ব্যাপারই সংঘটিত হয়েছিলো বদর ও ওহুদ যুদ্ধের সময় যখন আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামকে ঘুম দান করে তাদের অস্থিরতাকে দূর করে দিয়েছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'যখন তন্দ্রা এসে তোমাদেরকে ঢেকে ফেললো এবং শান্তির কোলো শুইয়ে দিলো।' আবার এরশাদ হয়েছে, 'তারপর তিনি দারুণ দুঃখের পরে পরম শান্তিদায়ক তন্দ্রা দান করলেন, যা তোমাদের একদলকে ঢেকে ফেললো।' এই ধরণের সংকটাপন্ন অবস্থায় আল্লাহ পাক এমনি করে যে শান্তি দান করেন আমাদের অনেকের জীবনেই তার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে!

এই কর্মবিরতি, অর্থাৎ ঘুমের মাধ্যমে মাঝে মাঝে চেতনা ও কর্মতৎপরতার অবসান প্রত্যেক জীবের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। এ নেয়ামত মহান স্রষ্টার ক্ষমতা ভান্ডারের এক অতি গোপন রহস্য এবং আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামতের মধ্য থেকে এমন এক নেয়ামত যা তিনি ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন না। কোরআনে এ বিষয়ের উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন যে, মানুষ তার সৃষ্টি বৈচিত্রের কথা চিন্তা করুক এবং ভেবে দেখুক কোন্ মহা শক্তিমান হাত তার প্রকৃতিতে এমন চমৎকার জিনিস দান করেছেন। এ থেকে আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সে অবহিত হোক্।

এমনি করে আল্লাহ তায়ালার ব্যবস্থপনার আর একটি দিক হচ্ছে, প্রকৃতির জড় পদার্থসমূহকে তিনি জীবজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল করেছেন। যেমন তিনি মানুষকে নিদ্রা ও বিশ্রাম-রূপ বিস্ময়কর জিনিস দান করেছেন, তেমনি করে বিশ্ব সৃষ্টির অন্যান্য জিনিসকে তিনি দিয়েছেন রহস্যপূর্ণ বহু বৈশিষ্ট, যেমন পোশাকের মতো রাত এসে মানুষকে ঢেকে ফেলে এবং তাকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দান করে। এরপর দিনের আগমন মানুষকে জীবিকা আহরণের সুযোগ করে দেয়। এভাবে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে এবং এ বিশ্ব-জগতটি সৃষ্টির বাসোপযোগী থাকে। মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তুর জন্যে মহা শক্তিধর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কি চমৎকার এ মহা পরিকল্পনা।

সৃষ্টির এক মহাবিস্ময়

তৃতীয় হৃদয়স্পর্শী বিষয় হচ্ছে আকাশ সৃষ্টি, যা জীবজন্তু সম্বলিত এই পৃথিবীর সাথে গভীর সামঞ্জস্যশীল।

'তোমাদের ওপর সাতটি মযবুত আকাশ বানিয়েছি এবং বানিয়েছি কম্পমান একটি উজ্জ্বল বাতি। বর্ষণ করেছি পানিভরা মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিধারা, যাতে আমি তার দ্বারা ফসল, রবি শষ্য, তরুলতা ও ঘন সন্নিবেশিত ফলের বৃক্ষাদি উৎপন্ন করতে পারি।'

'দুনিয়াবাসীর উপরে বানিয়েছি সাতটি মযবুত জিনিস' বলতে আল্লাহ তায়ালা থরে থরে সজ্জিত সাতটি আকাশকে বুঝিয়েছেন। অন্য স্থানে সাতটি কক্ষপথ বলা হয়েছে। এ সকল সৃষ্টির প্রকৃতি ও এর পেছনে কোন মহান উদ্দেশ্য বর্তমান তা একমাত্র রাব্বুল আলামীনই জানেন। তারকামালা– যার মধ্যে দশ কোটিরও বেশী তারকা বর্তমান রয়েছে। আমাদের সৌরজগত বা গ্রহের ওপর এর যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান রয়েছে। অবশ্য এই বাক্যাংশটি দ্বারা আরও অনেক কিছু হয়তো বুঝানো হয়েছে যা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কেউ সামান্য কিছু বুঝলেও বুঝতে পারে।

উল্লেখিত আয়াতটি নিশ্চিতভাবে এই ইংগিত বহন করছে, এই সাতটি শক্ত জিনিসের গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত মযবুত, তাদের কাঠামো খুবই শক্ত এবং একটি অপরটির সাথে এমনভাবে আবদ্ধ যে, কোনোটিকে কোনোটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। উর্ধাকাশ বলতে আমরা কী বুঝি? নিশিদিন যা দেখছি ও জানছি তা হচ্ছে, আমাদের মাথার ওপর বহু যোজন দূরে যখন তাকাই, দৃষ্টিসীমা যেখানে ফুরিয়ে যায় সেখানে যে নীল ছাদের মত দেখি, তাকেই আমরা বলি আকাশ। এমনি করে সাতটি শক্ত জিনিস (স্তর) পৃথিবী ও মানব জগতের সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল, আর এভাবেই পৃথিবী ও মানব জীবনের জন্যে আল্লাহর সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনাকে উপযোগী করা হয়েছে– পরবর্তী আলোচনা এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। 'আর আমি কম্পমান উজ্জ্বল আলো বানিয়েছি।' এই উজ্জ্বল আলো হচ্ছে দেদীপ্যমান সূর্য যা তাপ ও কিরণ দেয়, যার ওপর পৃথিবীর ওপরের ও ভেতরের সকল প্রাণীর জীবন নির্ভরশীল। এর দ্বারাই মেঘমালা গঠিত ও সঞ্চালিত হয়, যা মহাসাগর থেকে বাষ্প সঞ্চয় করে মেঘের সৃষ্টি করে। বৃষ্টি আকারে নেমে আসে এবং সকল জীবজন্তুর প্রয়োজন মেটায়। 'আর আমি পানি ভরা মেঘ থেকে প্রচুর পানিবর্ষণ করি।' মেঘ ঘনীভূত হয়ে ভারী হয়ে যায় এবং পানি আকারে বৃষ্টি আনে। কে সেই মহান সত্ত্বা যিনি মেঘকে ঘনীভূত করে পানির নির্ঝরিণী ঝর্ণা ঝরান? তিনি সবার প্রতিপালক মহান আল্লাহ তায়ালা। মেঘ সঞ্চিত হওয়ার পর বায়ুর প্রবাহ ঘটান। মহাশূন্যে মেঘের ঘর্ষণে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। তারপর সেই মহা কুদরতের অদৃশ্য হাত এই প্রকৃতির মধ্যে সেসব গতি দান করেন, ফলে এ বাতি জ্বলে এবং তা তাপ ও আলো দিতে থাকে। সূর্যের মধ্যেই এই পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো ও তাপ সৃষ্টি হয়, এই জন্যেই এর আওতাভুক্ত আমাদের এই সৃষ্টিজগতকে সৌরজগত বলে, আর এই কারণেই সূর্যকে বাতি বলা হয়েছে।

আবার এই কম্পমান বাতি ও তার মধ্য থেকে উদগত রশ্মি ও তাপ বের হয়ে আসে। মেঘমালা গঠিত হয় ও তার থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি নির্গত হয়। পরতে পরতে মেঘের ওপর মেঘ সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবারই বর্ষণের সময় মেঘে মেঘে ঘর্ষণের কারণে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। একেই 'প্রকম্পমান' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই সূর্যরশ্মি ও পানি থেকে খাদ্যশস্য, শাকসবজি উৎপন্ন হয় যা প্রানীকুল খেয়ে থাকে। আরও উৎপন্ন হয় শাখা-প্রশাখায় ভরা ঘন ফলমূলের বৃক্ষরাজি।

প্রকৃতির সব কিছুর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যেই এই সকল ব্যবস্থাপনা। মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা ছাড়া সবকিছুর মধ্যে এই পারস্পরিক যোগাযোগ ও একে অপরের এই সহযোগিতা সম্ভব নয়। হৃদয়, মন ও অনুভূতি দিয়ে যখন কেউ এগুলো বুঝার চেষ্টা করে, তখন এসব রহস্যের দ্বার তার সামনে উদঘাটিত হয়ে যায় এবং পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি

রহস্যের সূক্ষ্ম তথ্য ও জ্ঞান তাকে অভিভূত করে ফেলে। তার বুদ্ধি আর কাজ করতে চায় না, সে হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং এমনভাবে তার চিন্তা চেতনা রুদ্ধ হয়ে যেতে চায় যে, এ বিষয়ে কোনো রকর আলোচনার ক্ষমতাই সে হারিয়ে ফেলে। এর ফলে এই অসীম সৃষ্টি রহস্য ও এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আরও বেশী জ্ঞান গবেষণা করার মতো মন ও আগ্রহ তার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সে তখন আত্মহারা হয়ে বলে ওঠে, অবশ্যই এ বিশ্বপ্রকৃতির একজন স্রষ্টা আছেন, রয়েছে এর পেছনে এক সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা-ভাবনা, ব্যবস্থাপনা এবং পূর্বনির্ধারিত ইচ্ছা। কোরআনে পাক এই সকল সত্য ও রহস্যের দ্বার উন্মোচন করেছে। বলেছে, তিনি সেই মহান সত্ত্বা, যিনি পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন এবং বানিয়েছেন পাহাড়-পবর্তগুলোকে খুঁটি। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জোড়ায় জোড়ায়। তাদের ঘুমকে বানিয়েছেন আরামের বস্তু। এর সাথে রাতকে পোশাক আকারে বানিয়ে তার গোপনীয়তাকে রক্ষা করেছেন। দিনকে বানিয়েছেন জীবিকা উপার্জনের সময় হিসেবে, যাতে করে সে জীবনের প্রয়োজন যথাযথভাবে মেটাতে পারে। এর পর তার ওপর রয়েছে সাতটি শক্ত আসমান ও কম্পমান উজ্জ্বল বাতি, বর্ষিত হচ্ছে মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত, যাতে করে সে উৎপন্ন করতে পারে খাদ্যশস্য, শাকসবজি ও ফলমূলের বাগবাগিচা। একের পর অন্যটির পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, সৃষ্টি মল্লিকার প্রতিটি ফুল একটি অপরটির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। এই সৃষ্টি নৈপুণ্য মানুষের অন্তরে সেই মহান সত্ত্বার মহাজ্ঞানী হওয়ার অনুভূতি জাগায়, যিনি এসব কিছুর পরিকল্পনা তৈরী করেছেন, জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক চেতনা জাগিয়ে প্রতিটি অন্তরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এই কারণেই পুনরায় সেই মহা খবরের স্মরণ করাতে হয় যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে চলেছে।

কেয়ামত অবধারিত

এসব কিছুর উল্লেখ এ জন্যেই করা হয়েছে, যাতে মানুষ সঠিক কাজ করতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সে তার বিনিময় পেতে পারে। যেহেতু জীবনাবসান শেষেই রয়েছে প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ ও প্রতিদান। ফয়সালার সেই দিনটি সম্পর্কে ওয়াদা করা আছে যা নির্দিষ্ট সময়েই সংঘটিত হবে।

'অবশ্যই ফয়সালার দিনটি সুনির্দিষ্ট রয়েছে। সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সবাই দলে দলে সমাগত হবে, আকাশকে খুলে দেয়া হবে, আর তার সবটুকুই অসংখ্য দরজায় পরিণত হবে এবং পর্বতমালাকে সঞ্চালিত করা হবে যা মরু-মরীচিকার আকার ধারণ করবে।'

মানবসৃষ্টি অযথা নয় এবং উদ্দেশ্যহীনভাবেও তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়নি। যিনি তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করেছেন তিনি সেই মহান সত্ত্বা যিনি মানব ও বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এবং মানুষের জন্ম ও মৃত্যুকে অর্থহীন করেননি। পৃথিবীতে ভালো অথবা মন্দ কাজ করে মরণের পরে মাটির মধ্যে সে হারিয়ে যাবে এটাও হতে পারে না। আবার এটাও হতে পারে না যে, তারা সঠিক পথে চলুক অথবা ভুল পথে চলুক সবাইকে একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। আবার পৃথিবীতে সে ইনসাফ করুক বা যুলুম করুক সবার দশা একই হবে– সেটাও কিছুতেই সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই একটি দিন এমন আসবে যেদিন সত্য মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। সেই দিনটি চিহ্নিত এবং ওয়াদাকৃত। তবে সেই স্থিরীকৃত দিনটি কবে কখন আসবে তা আল্লাহর এলম (জ্ঞান)-এর মধ্যেই আছে এবং একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তা আবদ্ধ রয়েছে।

'সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আর তখন সবাই দলে দলে এসে হাযির হবে। আকাশকে খুলে দেয়া হবে। তা অসংখ্য দরজায় পরিণত হয়ে যাবে। আর পর্বতমালাকে এমনভাবে চালিয়ে দেয়া হবে যে তা এক গোলকধাঁধায় পরিণত হয়ে যাবে।'

'সূর' বিউগলসম এক মহা জাগরণী বাঁশী। আমরা এই নামটি ব্যতীত এই বাঁশীর ব্যাপারে আর কিছুই জানি না, শুধু এতোটুকু জানি যে, এতে ফুঁক দেয়া হবে। এ বাঁশীর প্রকৃতি কেমন হবে সে বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামানোও শোভা পায় না। কেননা এটা নিয়ে কথা বলা বা চিন্তা ভাবনা করার ওপর আমাদের ঈমান নির্ভর করে না। এসব গোপন ও অজানা বিষয় নিয়ে অযথা সময় ও শক্তি ক্ষয় করা থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন। তবে এ বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন করে উপকৃত হওয়ার তাওফীক অবশ্য তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। নিশ্চিতভাবে এ ধারণা আমরা করতে পারি যে, এ এমন শিঙ্গা যার মহাধ্বনিতে সকল মানুষ জেগে উঠবে এবং সবদিক থেকে একত্রিত হয়ে তারা দলে দলে হিসাব দেয়ার জন্যে এগিয়ে যাবে। সেই দিনে কবর থেকে উঠে আসা অগণিত মানুষের দল যারা পৃথিবীর বুকে পর্যায়ক্রমে জন্মগ্রহণ করেছিলো, সকল দিক থেকে সমবেত হবে, এইটুকু মাত্র ধারণা করা ছাড়া আর আমাদের কিছু করার নেই। এ মহা সমাবেশ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তা আমরা জানি না। কারণ পৃথিবীর সকল মানুষ তার সীমাবদ্ধ আভ্যন্তরীণ বাসস্থান থেকে বিশাল সে মহা উদ্যানে যখন একত্রিত হবে, তখন তার শুরু ও শেষ কিছুই বুঝা যাবে না। এমন বিশাল মানব সমাগম পূর্বে কখনও হয়নি এবং এই দিন ছাড়া আর কখনও হবে না। তা কোথায় কেমনভাবে হবে তা আমাদের কল্পনারও বাইরের ব্যাপার। 'আর (তখন) আকাশকে খুলে দেয়া হবে আর তা হয়ে যাবে এক উন্মুক্ত দরজা সমষ্টি। পর্বতমালাকে চালিয়ে দেয়া হবে, যা হয়ে যাবে মরু-মরীচিকাসম এক গোলকধাঁধা।'

অত্যন্ত মযবুতভাবে গঠিত এ মহাকাশ নিশ্চিতভাবে খুলে যাবে। এর প্রবেশ পথগুলো হবে এতো প্রশস্ত যেন উন্মুক্ত অসংখ্য দরজা। এইভাবে অন্যান্য আরও কয়েকটি প্রসঙ্গে এভাবে এ কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে। তখন এগুলো বড়োই অদ্ভুত মনে হবে। আর খুঁটির মতো দৃঢ়ভাবে প্রোথিত পবর্তমালাকে সঞ্চালিত করা হবে এমনভাবে যে, সেগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মরু-মরীচিকার মতো হবে এবং ধূলাবালির মতো উড়তে থাকবে। সেগুলোর অস্তিত্ব এমনভাবে বিলুপ্ত হবে যে, ধুলাবালি ছাড়া আর কিছুই নযরে পড়বে না। এভাবেই অন্যান্য আরো কিছু সূরাতে এগুলোর বর্ণনা পাওয়া যায়। তখন সেগুলো মরু-মরীচিকার ধোকার মতো চোখকে ঝলসে দেবে।

সব দিক থেকে এটা হবে গোটা বিশ্বে এমন এক ভয়ংকর অবস্থা যে, তা সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে। শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথেই সবকিছু এক বিশাল হাশরের ময়দান হয়ে যাবে এবং সেখানেই এ অবস্থার অবতারণা হবে। এটাই হবে মহাশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্যের পূর্ব নির্ধারিত শেষ অবস্থা।

শিংগায় ফুঁক ও মহা হাশর (মহাসমাবেশ) সংঘটিত হওয়ার পর পরবর্তী অবস্থা এগিয়ে আসবে এবং পূর্বে যারা এ দিনকে অস্বীকার করেছিলো সেই সকল বিদ্রোহী, যারা এ দিনের আগমন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলো এবং আল্লাহকে ভয় করার কারণে যারা তাকওয়া পরহেযগারীর জীবনযাপন করেছিলো তারা পর্যায়ক্রমে এগিয়ে আসবে।

পাপিষ্ঠদের অপেক্ষায় জাহান্নাম

'সেদিন জাহান্নাম মরণফাঁদের মতো বিদ্রোহীদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকবে। সেখানে তারা শীতল অবস্থা বা সুপেয় পানীয় বস্তুর স্বাদ পাবে না। ....সুতরাং বলা হবে স্বাদ গ্রহণ করো, (আজ) আমি আযাব ছাড়া আর কিছুই তোমাদের বাড়াবো না।'

প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামকে (পূর্বেই) সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এখনও তা বর্তমান আছে। মৃত্যু ফাঁদসম এ জাহান্নামকে বিদ্রোহীদের জন্যে তো ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে এবং তাদের ওপর নিরন্তর নযর রাখছে। এই জায়গায় হবে তাদের যাত্রার পরিসমাপ্তি ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

ওই দাউ দাউ আগুনে ভরা জাহান্নাম তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তখন যেন অবস্থাটা এমন হবে যে, পৃথিবীতে তারা সফরে ছিলো, যাত্রাপথ অতিক্রম করে তারা তাদের আসল ঘরে ফিরে যাবে। তাদের সে আশ্রয়স্থলে তারা যুগ যুগান্তর ধরে বসবাস করবে।

'তারা (সেখানে) কোনো ঠান্ডা (বস্তু) ও সুপেয় পানীয় বস্তুর স্বাদ পাবেনা।' এর ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু পানীয় পাবে তারা, আর তা হবে আরও ভয়ানক ও তিক্ত। তা হবে শুধু গরম পানীয় ও যখমের ধোয়ানী (পুঁজ-রক্ত)। তা এমন উত্তপ্ত পানীয় বস্তু যা তাদের কণ্ঠনালী ও পাকস্থলীকে ঝলসে দেবে। এটাই হবে গরম পানীয়ের পরিবর্তে সুশীতল বস্তু! হ্যাঁ, সে ধোয়ানী আসবে জ্বলে-পুড়ে যাওয়া ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ-রক্ত হতে। এটাই হবে সে পানীয়, যা সেদিন তাদের জন্যে বরাদ্দ হবে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে এর প্রতিদান দেয়া হবে। অতীতে তারা যা করেছিলো এবং যে কাজ ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য করণীয় হিসেবে রেখে এসেছিলো তারই প্রতিদান দেয়া হবে তাদের পাওনা। সেগুলোর সাথে সংগতি রেখেই সকল প্রতিদানের ব্যবস্থা রচিত হয়েছে। কারণ তারা তো হিসেব দিতে হবে বলে কখনও ভাবেনি এবং তার কোনো পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে আশাও করেনি। আর এ কারণেই 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার আয়াতগুলোকে তারা অস্বীকার করেছে।' এখানে ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে তাদের অস্বীকৃতি ও হঠকারিতার কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে।

ওদের এসব দুষ্কৃতির প্রত্যেকটিকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে হিসেব করে সংরক্ষণ করে রেখেছেন, যার থেকে একটি হরফও বাদ পড়ছে না। বলা হচ্ছে, প্রত্যেকটি বস্তুকে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সংরক্ষণ করে রেখেছি।

হতাশ হৃদয়ে তারা বারবার এ আযাবের পবির্তন অথবা হ্রাসের ব্যর্থ আশা করতে থাকবে। বলা হবে, 'মজা করে স্বাদ গ্রহণ করো ওই আযাবের, আজ আমি কিছুতেই আযাব ছাড়া আর কিছুই বাড়াবো না।'

মোত্তাকীদের সাফল্য

এরপর আর একটি দৃশ্যের অবতারণা করা হচ্ছে, এ দৃশ্য হবে মোত্তাকী পরহেযগার (আল্লাহভীরু) লোকদের, যারা আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের মধ্যে থাকবে। বিদ্রোহী মহাপাপী যারা উত্তপ্ত অবস্থার মধ্যে থাকবে, তাদের পাশাপাশি হবে এ মোত্তাকীদের বাস। এরশাদ হচ্ছে,

অবশ্য মোত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য, বাগবাগিচাসমূহ ও আঙ্গুরের গুচ্ছ। আরও রয়েছে (অপেক্ষমান) সোহাগিনী সমবয়সী উন্নতবক্ষা তরুণীরা। আরও আছে কানায় কানায় ভরা পানপাত্র। সেখানে শুনবে না তারা কোনো বাজে বা মিথ্যা কথা। তোমার পরোয়ারদেগারের পক্ষ থেকে হিসেব করে রাখা এ প্রতিদান। এরপর পুনরায় বলা হচ্ছে, এ সময় যখন জাহান্নাম মরণফাঁদ (সম) ও বিদ্রোহীদের আবাসস্থল হবে, সেখান থেকে বেরুনো অথবা এ অবস্থার পরিবর্তনের কোন উপায় থাকবে না।

সেই সময় মোত্তাকীরা এ অবস্থা থেকে রেহাই পেয়ে সাফল্য ও মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। ওই আনন্দদায়ক অবস্থার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'বাগ-বাগিচাসমূহ ও আংগুরের মধ্যে তারা চিরদিন থাকবে'। আংগুরের কথা বিশেষভাবে ও নির্দিষ্টভাবে উল্লেখের কারণ হচ্ছে, নেয়ামতের মধ্যে বড়ো নেয়ামত হিসেবে মানুষ আঙ্গুরকেই বুঝে। 'কাওয়ায়েব' বলে বুঝানো হয়েছে ওইসব তরুণীদেরকে যারা সুডৌল ও স্ফীতবক্ষা। 'আতরাব' বলতে বুঝনো হয়েছে তাদেরকে যারা সমবয়সী ও সুন্দরী, আর 'কা'সান দেহাকা' বলতে বুঝানো হয়েছে কানায় কানায় ভরা পেয়ালাকে।

এইসব নেয়ামতের এক বাস্তব ও বাহ্যিক বিবরণ পেশ করা হয়েছে যাতে করে যে কোনো মানুষ তা বুঝতে পারে। এসব বিলাস-সামগ্রীর স্বাদ কেমন হবে এবং কেমনভাবেই বা তা ভোগ করা হবে তা আমাদের জানা নেই এবং জানা সম্ভবও নয়। কারণ এ জগতে আমাদের জানার মতো উপায় ও সময় সবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, নেক লোকেরা শুধু শারীরিক ভোগ্য সামগ্রীই লাভ করবে না, অভূতপূর্ব মানসিক শান্তিও তারা লাভ করবে। এজন্যই বলা হয়েছে,

'তারা কোনো বাজে বকাবকি বা মিথ্যাচার সেখানে শুনবে না।'

সে হবে এমন এক জীবন, যা, সব রকম বাজে বকাবকি ও মিথ্যা বা ঝগড়াঝাটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সকল সত্য সেদিন উদঘাটিত হয়ে যাবে। সেদিন যুক্তিহীন তর্কবিতর্কের কোনো সুযোগ থাকবে না। এটা হবে এমন পরম সুখকর ও মনোরম অবস্থা যা সেই অমর জীবনের সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এ ব্যাপারে কোরআনের বাণী,

'তোমার পরোয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এ হচ্ছে এমন এক মহাদান যা হিসেব করে রাখা হয়েছে।'

এ কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা নেয়ামতের সাধারণভাবে এর বাহ্যিক রূপটা দেখি এবং প্রতিদান ও পুরস্কারের মধ্যকার পার্থক্যটাও অনেকাংশে অনুভব করি। কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটি নিকট সম্পর্কের বাঁধনও যে আছে, তাও মোটামুটি অনুভব করি।

হাশরের ময়দান

সে দিনের যে চূড়ান্ত দৃশ্যের অবতারণা হবে তা হচ্ছে এই যে, সেদিন সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। সে দিনটি সম্পর্কে প্রশ্নকারীরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছে ও মতভেদকারীরা নানা প্রকার মত পেশ করছে। সে দিনের দৃশ্যের বিবরণ পুরোপুরিভাবেই এ সূরাতে ফুটে উঠেছে। এ সময়ে জিবরাঈল (আ.) ও ফেরেশতারা মহা দয়াময় পরওয়ারদেগারের দরবারে বিনীত অবস্থায় অপেক্ষমান থাকবে। মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো সাথে কথা বলবে না। অপেক্ষা করার স্থানটি হবে অতি গুরুগম্ভীর ও ভীতি আনয়নকারী। এরশাদ হচ্ছে,

'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সেসব কিছুর প্রতিপালক তিনি, তাঁর সামনে কেউ কথা বলার ক্ষমতা রাখেনা। সেদিন ফেরেশতা ও আত্মা (রূহ) সমূহ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। মহা দয়াময় রাব্বুল আলামীন যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্য কেউ কথা বলবে না এবং যে কথাই সে বলবে, তা হবে সত্য সঠিক,

অর্থাৎ যুক্তিহীন বা অন্যায় কোনো কথা সে বলবে না বা বলতে পারবে না। মোত্তাকী পরহেযগার লোকদেরকে যে প্রতিদান ও পাপী লোকদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে তা পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এ প্রতিদান তোমার মালিকের পক্ষ থেকে দেয়া হবে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে সেসব কিছুর প্রতিপালক, তিনি পরম দাতা, মহা দয়াময়। তিনি চিরন্তন মহাসত্য। মহান সেই পরওয়ারদেগারের প্রভুত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে মানুষ ও আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও আখেরাত সব কিছুর ওপর। তিনি বিদ্রোহী ও মোত্তাকীদেরকে তাদের পাওনা অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রতিদান দেবেন এবং তাঁর কাছে পূর্ব ও পরের সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে। এমতাবস্থায় প্রাসঙ্গিক আলোচনা কতো সুন্দরভাবেই না এখানে পেশ করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে তিনি এমন দয়াময় যার দান অযাচিতভাবে পাপীতাপী ও আল্লাহভীরু সবার ওপর রয়েছে। এমনকি

অন্যায়কারী অপরাধী ও বিদ্রোহীদের জন্য নির্ধারিত যে শাস্তি সেও মহা দয়াবানের রহমতের দান। যালেমদেরকে তাদের যুলুম অনুযায়ী সাজা দান, সেও তাঁর রহমতের এক অমোঘ দাবী। কারণ ভালো ও মন্দের পরিণতি এক হতে পারে না, এক হওয়াও উচিত নয়।

আল্লাহ তায়ালা, পরওয়ারদেগারে হাকীম-এর পবিত্র গুণাবলীর মধ্যে এটাও একটি দিক যে, 'তাঁকে সম্বোধন করার ক্ষমতা কারো হবে না।' সেই মহা ভয়ংকর দিনে যেদিন জিবরাঈল (আ.) ও অন্যান্য ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষমান থাকবে। সেইদিন মহা দয়াবান পরওয়ারদেগারের অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলবে না। অনুমতি পেলে যে কথা বলবে সে কথাও হবে সত্য সঠিক কথা। যেহেতু দয়াময় প্রভু অনুমতি প্রার্থীকে এ জন্যই অনুমতি দেবেন যে তিনি জানেন সে সঠিক কথাই বলতে চায়।

আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত এ সকল ব্যক্তির অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা গুনাহখাতা বিদ্রোহাত্মক কাজ থেকে পবিত্র থাকবে। চুপচাপ থেকে তারা অপেক্ষা করতে থাকবে, তারা অনুমতি ছাড়া হিসেবের বাইরে কথা বলবে না। আল্লাহর দাপট ও পরাক্রমের কারণে গোটা পরিবেশ থমথমে হয়ে থাকবে। এহেন দৃশ্যের মধ্যে এক ভয়ংকর চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হবে, যা সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে থাকবে এবং এমনভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তুলবে যে, সে হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটির আগমন অবশ্যম্ভাবী। অতএব, তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য যে ব্যক্তি ইচ্ছুক হবে সে এখন থেকেই তার পথ করে নিক। অর্থাৎ সে এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নিতে। 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আসন্ন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি 'সেদিন, মানুষের দুটি হাত যা এগিয়ে দিয়েছে সে তা দেখতে পাবে এবং (সে দিনকে) অস্বীকারকারী কাফের ব্যক্তি বলে উঠবে, হায়, আফসোস! আমি যদি (মানুষ না হয়ে) মাটি হয়ে থাকতাম!'

কেয়ামত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে যারা নানা প্রশ্নের জালে আবদ্ধ তাদেরকে কঠিন ভাবে নাড়া দিয়ে বলা হচ্ছে, এ দিনের আগমন অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং প্রশ্ন তোলা বা মতভেদ করার কোনো সুযোগ নেই। এখনও ভুল সংশোধনের সময় আছে। অতএব যার মনে চায় সে তার প্রভুর কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা করে নিক।' জাহান্নাম তার ফাঁদ ও স্থায়ী ঘর হওয়ার পূর্বেই এটা তার করা উচিত।

ঘুমন্ত ব্যক্তিকে তার গাফেলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য এ এক শক্ত সতর্কবাণী। 'আমি অবশ্যই আসন্ন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম।' জাহান্নাম মোটেই দূরে নয়। অতএব, জাহান্নাম তোমাদের অপেক্ষা করছে এবং তোমাদেরকে দৃষ্টিতে রেখেছে, সেই দিকে সে নিয়ে যেতে চায় যা তোমরা দেখছো। দুনিয়ার জীবনটা পুরোপুরি একটি সংক্ষিপ্ত সফর ও স্বল্প সময়ের জন্যই তোমরা এই বয়স পেয়েছো।

এই ভীতির আযাব এতোই কঠিন হবে যে কাফেররা এর মুখোমুখি যখন হবে তখন সে বিকট চীৎকার করে আশা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলে উঠবে যে, সে যদি পয়দাই না হতো। সে দিন মানুষ দেখতে পাবে যা তার দুটি হাত এগিয়ে দিয়েছে এবং প্রতিটি কাফের ব্যক্তি বলবে, হায়, আফসোস! যদি মাটি হয়েই থাকতাম।' চরম বিপদাপন্ন অবস্থায় এই হবে তার চীৎকারধ্বনি।

তার এ অনুভূতি হবে নিদারুণ ভয় ও লজ্জার ফলশ্রুতি। এমনকি সে ব্যর্থ আশা করতে থাকবে যদি তার অস্তিত্বই না থাকতো! এবং এই কঠিন অবস্থার সম্মুখীন তাকে না হতে হতো! কাফের ও সন্দেহবাদীদের এই ভয়ানক অবস্থাই হচ্ছে প্রশ্নকারীদের আলোচ্য বিষয়। যা নিয়ে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং সন্দেহবাদ ব্যক্ত করছে। এটাই হচ্ছে এ মহা খবরের মূল বক্তব্য বিষয়।

সূরা আন্ নাযেয়াত

আয়াত ৪৬ রুকু ২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾ فَالسّٰبِقٰتِ
سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا
الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا
لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا
كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ
اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٥﴾ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. শপথ (সেই ফেরেশতাদের), যারা নির্মমভাবে (অবিশ্বাসীদের আত্মা) ছিনিয়ে আনে, ২. শপথ (সেই ফেরেশতাদের) যারা সহজভাবে (নেককারদের রূহ) খুলে দেয়, ৩. শপথ (সেই ফেরেশতাদের), যারা (আমার হুকুম তামিল করার জন্যে) সাঁতরে বেড়ায়, ৪. শপথ (সেই ফেরেশতাদের), যারা (হুকুম পালনে) দ্রুত এগিয়ে চলে, ৫. শপথ (সেই ফেরেশতাদের), যারা (সব ক'টি) কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। ৬. (কেয়ামত অবশ্যই আসবে), সেদিন ভূকম্পনের এক প্রচন্ড ঝাঁকুনি হবে, ৭. (কবর থেকে সবাইকে ওঠানোর জন্যে) সাথে সাথে আরেকটি ধাক্কা হবে; ৮. (এ অবস্থা দেখে) সেদিন মানুষের অন্তরসমূহ ভয়ে কম্পমান হবে, ৯. তাদের সবার দৃষ্টি হবে সেদিন নিম্নগামী (ও ভীত-সন্ত্রস্ত)। ১০. কাফেররা বললো, সত্যিই কি আমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে? ১১. আমরা পচে-গলে হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও? ১২. তারা (এও) বলেছে, যদি আমাদের আগের জীবনে ফিরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে সেটা তো হবে খুবই লোকসানের বিষয়। ১৩. অবশ্যই তা হবে বড়ো ধরনের একটি গর্জন; ১৪. (এ গর্জন শেষ না হতেই দেখা যাবে,) তারা (কবর থেকে ওঠে যমীনের ওপর) সমবেত হয়ে গেছে; ১৫. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে? ১৬. তাকে যখন তার মালিক পবিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন,

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾
وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ
وَعَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ
الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً
لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا
فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾
اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ

১৭. যাও ফেরাউনের কাছে, কারণ সে বিদ্রোহ করেছে, ১৮. তাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি (ঈমান এনে) পবিত্র হতে চাও? ১৯. (তাকে এও বলো,) আমি তোমাকে তোমার মালিকের (কাছে পৌঁছার একটা) পথ দেখাতে পারি, এতে তুমি হয়তো তাঁকে ভয় করবে, ২০. অতপর সে তাকে (আমার পক্ষ থেকে) নবুওতের বড়ো একটি নিদর্শন দেখালো, ২১. কিন্তু সে ব্যক্তি (নবীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো এবং সে (তার) বিরুদ্ধাচরণ করলো, ২২. অতপর (ষড়যন্ত্র করার মানসে) সে পেছনে ফিরে গেলো, ২৩. সে লোকজন জড়ো করলো এবং তাদের ডাক দিলো, ২৪. তারপর বললো, আমিই হচ্ছি তোমাদের সবচেয়ে বড়ো 'রব', ২৫. অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন; ২৬. অবশ্যই এমন সব লোকের জন্যে এতে শিক্ষার নিদর্শন রয়েছে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, ২৭. (তোমরা বলো,) তোমাদের (দ্বিতীয় বার) সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন, না আকাশ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন? আল্লাহ তায়ালা তা বানিয়েছেন। ২৮. আল্লাহ তায়ালা (শূন্যের মাঝে) তা উঁচু করে রেখেছেন, অতপর সুবিন্যস্ত করেছেন, ২৯. তিনি রাতকে (অন্ধকারের চাদর দিয়ে) ঢেকে রেখেছেন, আবার তা থেকে (আলো দিয়ে) দিনকে বের করে এনেছেন, ৩০. এরপর যমীনকে তিনি (বিছানার মতো করে) বিছিয়ে দিয়েছেন; ৩১. তা থেকে তিনি বের করেছেন পানি ও উদ্ভিদরাজি, ৩২. তিনি পাহাড়সমূহ (যমীনের গায়ে পেরেকের মতো) গেড়ে দিয়েছেন, ৩৩ তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ারদের উপকারের জন্যে; ৩৪. তারপর যখন বড়ো বিপর্যয় (তোমাদের সামনে) হাযির হবে, ৩৫. সেদিন মানুষ একে একে সব কিছুই স্মরণ করবে যা (সে দুনিয়ায়) করে এসেছে, ৩৬. সেদিন সে ব্যক্তি দেখতে পাবে, তার জন্যে জাহান্নাম

مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾ وَاٰثَرَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾
يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴿٤٣﴾ اِلٰى رَبِّكَ
مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا
اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾

খুলে ধরা হবে। ৩৭. অতপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে, ৩৮. এবং (পরকালের তুলনায়) দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে, ৩৯. জাহান্নামই হবে তার (একমাত্র) আবাসস্থল; ৪০. (আবার) যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে দাঁড়ানো (-র এ দিন)-কে ভয় করেছে এবং (এ ভয়ে) নিজের নফসকে কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, ৪১. অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা; ৪২. তারা তোমার কাছে জানতে চায় কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? ৪৩. (তুমি তাদের বলে দাও,) সে সময়ের কথা বর্ণনা করার সাথে তোমার কি সম্পর্ক (তা তুমি জানবে কি করে)? ৪৪. তার (আগমনের) চূড়ান্ত (জ্ঞান একমাত্র) তোমার মালিকের কাছেই রয়েছে; ৪৫. তুমি হচ্ছো সাবধানকারী সে ব্যক্তির জন্যে, যে একে ভয় করে; ৪৬. যেদিন এরা কেয়ামত দেখতে পাবে, সেদিন (এদের মনে হবে) তারা এক বিকাল অথবা এক সকাল পরিমাণ সময় (দুনিয়ায়) অতিবাহিত করে এসেছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আখেরাত সংঘটিত হওয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে ৩০ পারার অন্যান্য সূরার মধ্যে যেসব উদাহরণ দেয়া হয়েছে, এ সূরাটিতেও অনুরূপ যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। আখেরাতের আগমন যে অবশ্যম্ভাবী, তা কতো ভয়ানক, তার দৃশ্যাবলী কতো কঠিন এবং এই পৃথিবীর পরিণতির জন্যে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার গুরুত্ব কতো বেশী, এই সূরার ছত্রে ছত্রের তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে মহান স্রষ্টার সুনিপুণ তৈরী পৃথিবীর উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগের প্রতিটি জিনিসের পরিণতির আভাস। তারপর এর বাসিন্দাদের যে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে তার বহু যুক্তি ও এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে মানব মনে প্রত্যয় জন্মানোর উদ্দেশ্যে প্রথমেই এক ভীষণ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধির জন্যে এই ভীতিজনক বিস্ময়কর ও কঠিন অবস্থার বর্ণনার সাথে সাথে কতো দ্রুতগতিতে কেয়ামত সংঘটিত হবে সে বিষয়ে পাঠককে সচকিত করা হয়েছে।

ওই ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করতে গিয়ে প্রথমেই যে বর্ণনা এসেছে তা মানুষ শুধু কল্পনাই করতে পারে এবং এ বর্ণনা মানুষের মনকে ভীষণ ভয়ে বিহ্বল করে দেয়। তার হৃদয়ে এমন কাঁপুনি সৃষ্টি করে যে, তার হৃদয়ের তারগুলো যেন ছিঁড়ে যেতে চায়। তার গোটা সত্ত্বা অবশ্যম্ভাবী ওই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করতে থাকে এবং গভীর পেরেশানীতে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়। 'গভীরভাবে ডুব দেয়া ও সজোরে বিচ্ছিন্নকারী ফেরেশতাদের কসম, আবার কসম ওই ফেরেশতাদের, যারা ধীর গতিতে ও আসানিতে জানগুলো কবয করে নেয়। কসম তাদের যারা রূহগুলো নিয়ে (উন্মুক্ত আকাশের পরিমন্ডল) সাঁতার কেটে চলে যায়। তাদেরও কসম, যারা (নেককার রূহগুলো নিয়ে) প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যায় এবং পরপর আল্লাহর সকল হুকুম পালন করে চলে।

মানুষের কল্পনার চোখে ওই কাঁপিয়ে তোলার মতো ঘটনাবলী তুলে ধরে সে দিনের ভীষণ দৃশ্যাবলীর প্রথম অবস্থাটি তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য অবস্থাগুলো পরপর এমনভাবে আসতে থাকবে যেন এগুলোর আগমন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে এবং অতি সংগোপনে একটি ঘটনার পরিণতিতে অপরটি আসা অবধারিত হয়ে আছে। দেখুন, বর্ণনা ধারা– সেদিন আসবে ভীষণ কম্পনসৃষ্টিকারী প্রচন্ড এক ধাক্কা, যার পরে আসবে আবারও ....(আয়াত–৬-১৪)

পরবর্তী অবস্থাগুলোও পরপর আসতে থাকবে। মহাশূন্য ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে স্থির হয়ে যাবে। এভাবে সবকিছু এক বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। মূসা ও ফেরাউনের সময়কার যে সব বিদ্রোহী সীমালংঘনকারী ব্যক্তি আল্লাহর আযাবে পতিত হয়েছিলো তাদের মতো অন্যান্য সবাই এই ধ্বংসাত্মক অবস্থায় পতিত হবে। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবে তাদের সম্পর্কে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হবে। এরশাদ হচ্ছে–এসেছে কি তোমার কাছে মূসার কাহিনী? স্মরণ করে দেখো সে সময়ের কথা, যখন তার রব তাকে তুয়া নামক উপত্যকায় ডেকে বললেন, যাও ফেরাউনের কাছে, ...পাকড়াও করলেন। এর মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে সেসব ব্যক্তির জন্যে যে (তাঁকে) ভয় করে।' (আয়াত-১৪-২৬)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা ওই মহাসত্য জানানোর জন্যে এখানে একটি ভূমিকা পেশ করছেন।

এরপর এ ঐতিহাসিক পটভূমির বর্ণনা শেষে প্রকৃতির উন্মুক্ত গ্রন্থ তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে তাঁর সর্বশক্তিমান মহান সত্ত্বার অস্তিত্বের বহু চিহ্ন ফুঠে রয়েছে। যা সেই মহান সত্ত্বার অপ্রতিরোধ্য

ইচ্ছার কথা জানায়, জানায় দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুর ওপর তাঁর কর্তৃত্বের কথা, তাঁর তদারকির কথা! সেই মহাশক্তিই যে অতি সংগোপনে সবকিছুকে পরিচালনা করছে এবং তাঁর ইচ্ছাক্রমেই যে সবকিছু চলছে এ সূরার শুরুতে তারই আভাস দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, 'তোমাদের সৃষ্টিটা বেশী কঠিন, না আকাশ সৃষ্টি বেশী কঠিন? এই মহাকাশকে তিনি তৈরী করলেন, এর ছাদকে সমুন্নত করলেন এরপর সুসমন্বিত করলেন এর গঠন প্রণালীকে। এরপর ঢেকে দিলেন রাতকে (অন্ধকারের চাদর দিয়ে), আর বের করলেন তার থেকে উদীয়মান দিনের উজ্জ্বল আলো। তারপর বিছিয়ে দিলেন যমীনকে, তার থেকে পানি ও তার চারণভূমি বের করলেন, আর তার মধ্যে পর্বতমালাকে গেড়ে দিলেন, যে পানি তোমাদের জন্যে জীবন সামগ্রী এবং তোমাদের গবাদিপশুর জন্যেও প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করে।' (আয়াত-২৭-৩৩)

এই হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা ও প্রাণসঞ্চারী অনুভূতি জাগানোর পর মহাপ্রলয়ের দৃশ্য এবং দুনিয়ার জীবনে কৃত যাবতীয় কাজের পরিণতির বিবরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যে প্রতিদান (নেককার লোকদেরকে) দেয়া হবে তার কিছু দৃষ্টান্ত এমনভাবে প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান রয়েছে, যা দেখে পাপচারীদের সর্বনাশা পরিণতি বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাঁর হেদায়াতের বাতিকে নিভিয়ে দেয়ার জন্যে মানুষ যা কিছু চেষ্টা সাধনা বা ষড়যন্ত্র করেছিলো সেদিন তা খুব ভালোভাবেই সে স্মরণ করবে এবং (সেদিন) জাহান্নামকে এগিয়ে আনা হবে সে ব্যক্তির জন্যে যে তা নিজের চোখে দেখতে পাবে অর্থাৎ সেই-ই সেদিন তার উপযুক্ত হবে। অতএব যে সীমালংঘন করেছিলো এবং দুনিয়ার জীবনকে বড়ো করে দেখেছিলো, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা এবং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করেছিলো এবং তার মনকে প্রবৃত্তির দাসত্ব করা থেকে থামিয়ে রেখেছিলো নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার ঠিকানা।

সেই মহাপ্রলয়ের বিভীষিকাময় দৃশ্যের বর্ণনা শুনে যখন আমাদের অন্তর অভিভূত হয়ে পড়ছে সেই মুহূর্তেই বলা হচ্ছে— 'দোযখকে তার ভয়ংকর চেহারাসহ তাদের সামনে এগিয়ে দেয়া হবে, যারা নিজ চোখে দেখতে পাবে ওই উন্মত্ত দোযখকে। যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের তুলনায় বড়ো করে দেখেছে, আর যারা তাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে— এ চিন্তায় মনকে তার লাগামছাড়া চাহিদা পূরণ করা থেকে দমন করবে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার ঠিকানা।' এই পর্যায়ে এসে সূরার মোড় ফিরে যাচ্ছে ওই ভয়ানক কেয়ামতের অস্বীকারকারীদের দিকে, যারা রসূল (স.)-এর কাছে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। ওদের প্রশ্ন প্রসংগে কেয়ামতের ভয়াল চিত্র তুলে ধরায় তাদের অন্তরের ভয় আরও বেড়ে গেলো। কেয়ামতের সর্বগ্রাসী চেহারার হৃদয় বিদারক বর্ণনা অপরাধীদের মনকে ভয়ে বিহ্বল করে দিলো। দেখুন সে বর্ণনা— 'ওরা জিজ্ঞাসা করছে কেয়ামত সম্পর্কে ....তাদের কাছে মনে হবে (দুনিয়ার সুখের জীবনে) একটি মাত্র রাত অথবা একটি মাত্র উজ্জ্বল প্রভাত তারা কাটিয়েছে। মাদ্ চিহ্ন বিশিষ্ট 'হা' দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী কেয়ামতকেই বুঝানো হয়েছে, যার ভয়ানক অবস্থা ও বিশালত্বও মনকে কাঁপিয়ে দেয়। (আয়াত-৪২-৪৬)

তাফসীর

'কসম গভীরভাবে ডুব দিয়ে (প্রাণ) বিচ্ছিন্নকারী (আযাবের ফেরেশতা)দের, আবার কসম সুনিপুণভাবে ও ধীর মন্থর গতিতে (নেককার লোকদের) রূহ কবযকারী ফেরেশতাদের), কসম সন্তরণকারী ফেরেশতাদের, যারা রূহগুলো নিয়ে উন্মুক্ত আকাশে সাঁতার কেটে চলে যায়। তারপর ওই রহমতের ফেরেশতাদের কসম, যারা (নেককার লোকদের রূহ নিয়ে) প্রতিযোগিতা করে

অগ্রগামী হয়। তারপর আরও কসম কার্যনির্বাহী ও দায়িত্বশীল ফেরেশতাদের'। এই বাক্যগুলোর তাফসীর করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন ওই সকল ফেরেশতা হলেন তারা, যারা মৃদু-মন্থর গতিতে অতি নিপুণভাবে রূহ কবয করে, উড়ে যায় উর্ধাকাশে– যেন সাঁতার কেটে চলে যায়। তাঁরা তাদের রবের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশে অগ্রগামী ভূমিকা রাখে এবং হুকুম পাওয়ার সাথে সাথেই তা তামিল করে।

আবার কেউ বলেছেন, ওরা হচ্ছে সেই তারকারাজি যারা নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে নড়েচড়ে বেড়ায় আর অতি সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় এবং আল্লাহর ঝুলন্ত মহাশূন্যলোকে সন্তরণ (বা বিচরণ) করতে থাকে। আর এই বিচরণকালে প্রত্যেকেই একে অন্যের থেকে এগিয়ে যেতে চায়। এর ফলে পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে, যার ফলে নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কারও মতে 'নাযেয়াত', 'নাশেতাত', 'সাবেহাত', ও 'সাবেকাত', বলতে ওই তারকারাজিকে বুঝায় যার এন্তেযাম ও পরিচালনায় রয়েছে ফেরেশতারা। আর এক মত হচ্ছে, 'নাযেয়াত', 'নাশেতাত' এবং 'সাবেহাত' হলো তারকারাজি এবং 'সাবেকাত' (প্রতিযোগিরা) ও মুদাব্বেরাত (কার্য সম্পাদনকারিরা) এরা হলেন ফেরেশতাকুল। এসব শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা যাই-ই করা হোক না কেন কোরআনের এই বিশেষ বর্ণনাভংগী সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে আমাদের অন্তরে এক কাঁপন সৃষ্টি করেছে এবং এক অজানা ভয়ের অনুভূতি মনকে ছেয়ে ফেলেছে। এভাবে সর্বপ্রথম এসেছে হিসেব দেয়ার দুশ্চিন্তা, তারপর এসেছে মহা ধ্বংসলীলার সংবাদে অন্তরে প্রচন্ড এক প্রকম্পন। এই কারণে আমরা এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খুব বেশী বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না। আয়াতগুলোতে বর্ণিত কথাগুলো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অন্তরে এক বিশেষ ক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলে আমরা মনে করি। হৃদয়ের মধ্যে কাঁপন সৃষ্টি হওয়া এবং অন্তর জেগে ওঠাই ওই কথাগুলোর আসল লক্ষ্য, যা কোরআনের অতি চমৎকার ও বিভিন্ন বর্ণনাভংগী আমাদের মধ্যে পয়দা করতে চেয়েছে।

এ বিষয়ে আমাদের সামনে হযরত ওমর বিন খাত্তাবের একটি উদাহরণ রয়েছে। তিনি একবার সূরা 'আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা' (ভ্রুকুঞ্চিত করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো) পড়তে শুরু করলেন। আল্লাহর সুমধুর আশ্বাসবাণী, 'ওয়া ফাকেহাতাঁও ওয়া আব্বা (ফলমূল ও খাদ্যশস্য) পর্যন্ত পড়ার পর তিনি থেমে গিয়ে বললেন, ব্যস, আমরা ফলমূল (ফাকেহাতান) কি তা বুঝে গেলাম, কিন্তু 'আব্বা' কী জিনিস? তাতো বুঝলামনা তারপর নিজেকে তিরস্কার করতে করতে বললেন, তোমার জীবনের কসম, হে ওমর বিন খাত্তাব, তুমি খামাখা এই বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো? আল্লাহর কেতাবের কোনো একটি কথা (আল আব্বু) যদি নাই-ই বুঝে থাকো তাতে তোমার এমন কী অসুবিধা হলো? তারপর বললেন, আল্লাহর কেতাবের যেটুকু স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছো, সেটুই পালন করো, আর যেখানে সংকট বোধ করো, সেখানে থেমে যাও (কোনো নির্দেশ জানতে না পারলে চুপ হয়ে যাও)। এটাই হচ্ছে আদবের দাবী। এই আদবই আমরা আল্লাহর মহান কালাম থেকে শিখেছি। এটাই মহান প্রভু প্রতিপালকের সামনে বান্দার আদব। এই আদবের প্রতি প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত। তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আশা করা যায়।

মহাপ্রলয়ের সেই দিন

সূরাটি এক শপথবাণী দ্বারা শুরু হয়েছে। এর দ্বারা পরবর্তীতে বর্ণীত বিষয়ের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'যেদিন প্রচন্ড বেগে কাঁপতে থাকবে গোটা পৃথিবী, তারপরেই আসবে আর এক প্রচন্ড ধাক্কা। সেদিন বহু হৃদয় কাঁপতে থাকবে। অনেক চোখ ভয়ের চোটে অবনমিত থাকবে। তারা বলবে পচাগলা হাড্ডি হয়ে যাওয়ার পরও আমরা কি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবো ? তাহলে তো এ প্রত্যাবর্তন হবে ভীষণ ক্ষতির ও অপমানজনক। এ সময় একটি মাত্র ঝাঁকুনি আসবে আর অমনি এক বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিণত হয়ে যাবে সবকিছু। প্রচন্ড ভূমিকম্পে পৃথিবীর যে বিপর্যয় ঘটবে তা কোরআনে কারীমের অপর একটি সূরাতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, সে দিন পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতগুলো প্রকম্পিত হবে। এরপর এর অনুসরণকারী (অনুরূপ আর একটি ধাক্কা) বলতে কেয়ামতকে বুঝানো হয়েছে, যা ভূমির কম্পনের পরপরই এসে সবকিছু লন্ডভন্ড করে দেবে। তখন সবকিছু ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং আকাশের তারাগুলো সব চতুর্দিকে ছিটকে পড়বে।

এভাবে কথাটা এসেছে যে, ওই কাঁপুনি হচ্ছে প্রথম মহাপ্রলয়, যা এক বিকট চিৎকার ধ্বনির ফলে সংঘটিত হবে। যার কারণে পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত এবং জীবজন্তু সবকিছু কাঁপতে থাকবে। এর ফলে আকাশমন্ডলীর সবকিছু এবং পৃথিবীবাসী সবাই বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ তায়ালা যদি কাউকে রেহাই দেন তার কথা আলাদা। পেছনে আগমনকারী (ধাক্কাটি) হচ্ছে (শিংগার) দ্বিতীয় ফুঁক, যার প্রচন্ড শব্দ সবার ওপর ছেয়ে যাবে, তারা সবাই হাশরের ময়দানে হাযির হয়ে যাবে।

(যেমন এসেছে সূরায়ে ঝুমারের ৬৮ নং আয়াতে) এর অর্থ এটা হোক বা সেটা হোক– এটা নিসন্দেহে সত্য যে, আলোচ্য সূরাতে ও অন্যান্য সূরার বর্ণনায় যে কথাগুলো এসেছে তাতে মানব হৃদয় ভূমিকম্প, প্রকম্পন, আতংক ও পেরেশানীই অনুভব করছে। ভয়ে চমকে ওঠা, থরথর করে কাঁপতে থাকা এবং আতংকে পেরেশান হয়ে যাওয়া– আলোচ্য আয়াতগুলোতে এই অনুভূতিই করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন সেদিন যে ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হবে তার তীব্র অনুভূতি মানব হৃদয়ে জাগুক এবং সে সময়ের বাস্তবতা স্বীকার করুক। অবশ্য আল্লাহর কথাগুলো মানুষ ঠিক মতোই বুঝেছে এবং সে তা অনুভবও করেছে। যাতে বলা হয়েছে, 'মানুষের হৃদয়গুলো ভয়ে কাঁপতে থাকবে, তাদের চোখগুলো ভয়ে অবনত হয়ে যাবে।'

এটা হবে মৃত্যুর ওই কঠিন আতংক, যার শুরুতে থাকবে হীনমন্যতা, এরপর আসবে ভয় ও নুয়ে পড়া অবস্থা, আরও আসবে থর থর করে কাঁপন ও কষ্টকর গোংগানি। এরপর যে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো সেই সময়ের অবস্থা যখন কেয়ামতের কাঁপন সবকিছুকে ঝাকিয়ে তুলবে। যার পেছনে আসবে আর একটি প্রচন্ড ঝাঁকুনি, আর এই অবস্থাকে বুঝাতে গিয়েই 'নাযেয়াতে গারকান' (সজোরে বিচ্ছিন্নকারী) 'নাশেতাতে নাশতান', (সহজে কবযকারী) 'সাবেহাতে সাবহান' (সাঁতার কাটা সাতারু), 'সাবেকাতে সাবকান' (পাল্লা দিয়ে অগ্রগামী) তারপর 'ফাল মোদাবেবরাতে আমরান' কর্ম সম্পাদনকারী শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এ সূরার মধ্যে বর্ণিত দৃশ্যাবলীর বিবরণ এর সূচনাতে যে কসম খাওয়া হয়েছে তার সাথে কেয়ামতের অবস্থা পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল।

পুনরুত্থান কিভাবে হবে

তারপর সূরাটির বর্ণনার মধ্যে যে আলোচনা এগিয়ে চলেছে তাতে দেখা যায়, কবর থেকে যখন তারা উঠে আসবে, তখন তাদের বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়া, আশ্চর্যান্বিত হয়ে বিস্ফোরিত নেত্রে তাকিয়ে থাকা এবং আতংকে অস্থির হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে। তখন কবর থেকে উঠে ওরা বলে উঠবে, আমাদের কি আগের মতোই কোনো যেন্দেগী দান করা হবে, যাতে পূর্বের মতো

কাজকর্ম করতে পারি? পচাগলা হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কি সেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব? 'হাফেরাতুন' মধ্যে ফিরে যাওয়া বলতে বুঝানো হয়েছে ওই পথে ফিরে যাওয়া যে পথ একবার পার হয়ে আসা হয়েছে। ওরা বিস্ময় ও পেরেশানীর হালতে জিজ্ঞাসা করবে যে, তাদেরকে পূর্ব জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হবে কি না। ওই অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বে যে, পঁচাগলা হাড্ডিতে পরিণত হওয়ার পর আবার আগের মতো জীবন লাভ করা কি করে সম্ভব! এই পর্যায়ে এসে তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়।

তবে হাঁ, পূর্নজীবন লাভ, অবশ্যই সম্ভব কিন্তু এটা সেই দুনিয়ার হারানো জীবন নয়, তা হবে নতুন আর একটি জীবন। এ কারণে এই প্রত্যাবর্তনকে তারা ভীষণ ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক মনে করবে এবং তাদের মুখ থেকে এ কথাগুলো বেরিয়ে আসবে। ওরা বলবে, ওটাতো বড়োই ক্ষতিকর অবস্থা হবে! এমন প্রত্যাবর্তনের কোনো চিন্তাই তারা কোনোদিন করেনি। আর সে জন্যে কোনো পাথেয় তারা সঞ্চয় করেনি। নিরেট ক্ষতিই হবে সেদিন তাদের পাওনা। এখানে এই দৃশ্যকে সামনে রেখে অনাগত ভবিষ্যতে যে অবস্থা অবশ্যই আসবে তার বর্ণনা কোরআন পেশ করছে। বলা হচ্ছে, ব্যস, তা হবে একটিমাত্র ভীষণ শব্দ অমনি তারা উন্মুক্ত এক মহা প্রান্তরে নিজেদের হাযির দেখতে পাবে।

'ঝাজরাতু'ন ভীষণ শব্দ চিৎকার ধ্বনি কিন্তু এই কঠিন শব্দটি এখানে ব্যবহার করে সূরার মধ্যে বর্ণিত অন্যান্য দৃশ্যের সাথে এর সংযোগ দেখানো হয়েছে এবং এ শব্দটির মাধ্যমে তখনকার অবস্থার ভয়াবহতা আরো তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। 'সাহেরাহ' বলতে বুঝানো হয়েছে শুভ্র উজ্জ্বল খোলা ময়দান (যেমন ধূসর বালুময় বিশাল সাহারা মরুভূমিকে সাহারা বলা হয়)। এটাই হাশরের ময়দান, যা কখন সংঘটিত হবে তা আমাদের কারো জানা নেই। আর এর খবর আমরা সেই থেকে পাই যা স্বয়ং আল্লাহর বাণী। অতএব তার সাথে কোনো কিছু আমরা নিজেদের ইচ্ছেমতো যোগ করতে পারি না, সেটা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। কোরআনে বর্ণিত এ এক মহা ভয়ংকর শব্দ এবং তা হচ্ছে সম্ভবত দ্বিতীয় শিংগার ফুঁক, যার সাথে সাথে পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানে সবার সমবেত হওয়া সংঘটিত হবে। এ সূরার মধ্যে বর্ণিত সকল অবস্থাই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একের পর এক আসবে। ভীত সন্ত্রস্ত অন্তরগুলোও তীব্রভাবে দুরুদুরু করতে থাকবে, সুতরাং এ সূরার মধ্যে বর্ণীত ওই সময়ে ঘটিতব্য প্রতিটি অবস্থা, দৃশ্য ও অনুভূতির মধ্যে বর্ণিত পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকবে।

মূসা (আ.) ও ফেরাউনের কাহিনী

এরপর বর্ণনাশৈলীর গতিকে কিছুটা শ্লথ মনে হয়। যাতে পরবর্তী অবস্থার সাথে তার সামস্য টিকে থাকে। কারণ এর পর এসেছে মূসা (আ.) ও ফেরাউনের মধ্যেকার সংলাপ। এ আলোচনা শেষ হয়ে ফেরাউনের বাড়াবাড়ি ও যুক্তি ও নৈতিকতার সকল সীমালংঘনের পরিণতির বিবরণ দিয়ে। এরশাদ হচ্ছে– এসেছে কি তোমার কাছে মূসার ইতিহাস? ওই সময়ের কথা একবার স্মরণ করো, অবশ্য অবশ্যই ওই ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে ওইসব ব্যক্তির জন্যে যে ভয় করে। আয়াত ১৫-২৬

মূসার কাহিনী এমন শিক্ষণীয় কাহিনী, যা কোরআনে কারীমের মাঝে সব চাইতে বেশী এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার পূর্বে আরও বহু সূরায় এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে বিভিন্নভাবে, নানা ভংগিতে। প্রত্যেক স্থানেই প্রাসংগিক আলোচনার সাথে পূর্ণ সংগতি রেখে বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনার ভংগিমায় অবস্থার বিশেষ গুরুত্ব

অনুভূত হয়েছে। বর্ণনাভংগির এই বৈচিত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐতিহাসিক পটভূমি ও ঘটনার সাথে এ বর্ণনার যোগসূত্র তুলে ধরা। অর্থাৎ যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে ওই ঘটনা ঘটেছিলো এবং আলাপ আলোচনা হয়েছিলো তার সাথে আলোচ্য বিষয়ের একটা সাযুজ্য পেশ করা।

এখানে এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে এবং 'তুয়া' নামক উপত্যকায় মূসাকে ডাকা থেকে নিয়ে ফেরাউনের পাকড়াও পর্যন্ত ঘটনা ব্যক্ত করে দুনিয়া ও আখেরাতে তার শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যাতে করে সূরাটির আসল আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ আখেরাতের বাস্তবতা বুঝা সহজ হয়। আখেরাত সংঘটিত হবেই– এই বাস্তব সত্যটিকে তুলে ধরার জন্যেই যাবতীয় ঘটনা ও দৃশ্যের অবতারণা। কথার শুরুতে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, তোমার কাছে কি মূসার ইতিহাস পৌঁছেছে? এভাবে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে কথা শুরু করে প্রকৃতপক্ষে পাঠকের মন ও কানকে ওই কাহিনী শোনার জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। মূসার প্রতি আল্লাহর ডাকের কথা স্মরণ করার মাধ্যমে এটা শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, যখন ডাকলেন তাকে তার রব 'তুয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায়। 'তুয়া' সম্ভবত একটি উপত্যকার নাম, উত্তর হেজায থেকে আসার পথে তুর পাহাড় পড়ে, তার ডানদিকে অবস্থিত এই উপত্যকা।

যে সময়ে ডাকা হয়েছিলো সে সময়টি ছিলো দারুণ ভীতিকর। কারণ এ ছিলো স্বয়ং মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর বান্দাদের একজনের প্রতি অতি আশ্চর্য এক ডাক। এ এমন এক ভীতিপ্রদ ডাক, যা মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রাব্বুল ইযযতের রহস্যরাজির মধ্য থেকে এ ছিলো এক অত্যাশ্চর্য রহস্য, যা গোটা সৃষ্টির মধ্যে তিনি নিহিত রেখেছেন, যা মানুষকে আল্লাহ তায়ালা না জানালে নিজ চেষ্টায় কেউ জানতে পারে না।

কোরআনের অন্য স্থানে আল্লাহ তায়ালা ও মূসা (আ.)-এর মধ্যকার এই নিভৃত আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। এখানে সংক্ষেপে এই ঘটনার উল্লেখ করে মূসা (আ.)-কে 'তুয়া' উপত্যকায় ডেকে যে মূল দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো পবিত্র সে বিষয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছিলো, যাও ফেরাউনের কাছে– অবশ্যই সে বিদ্রোহ করেছে। গিয়ে তাকে বলো, তুমি কি পবিত্র হতে চাও? তাহলে আমি তোমাকে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে সঠিক পথ দেখাবো, যার ফলে তুমি তাঁকে ভয় করতে পারবে।

'যাও ফেরাউনের কাছে, অবশ্যই সে বিদ্রোহ করেছে।'

আল্লাহর যমীনে কারো বিদ্রোহ করা বা বিদ্রোহে টিকে থাকার কোনো সুযোগ নেই। এটা যেমন অপ্রিয় কাজ তেমনই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী। প্রথমত এটা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ এবং এ কাজ অন্যান্য সকল অপ্রিয় কাজের সূচনা করে। এ জন্যেই এই জঘন্য কাজকে তার সকল বান্দার জন্যে চিরদিনের জন্যে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ জন্যে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর নেক বান্দাদের মধ্য থেকে একজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন যাতে করে সে অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করে, মালিকের রাজ্যে বিশৃংখলা বন্ধ করে এবং বিদ্রোহের যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে দেয়। এটা এমন এক অপছন্দীয় কাজ যে, এটা বন্ধ করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের এক বান্দাকে সম্বোধন করে ওই অহংকারী ব্যক্তির কাছে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে এই পাপের পরিণতি হিসেবে তাকে পাকড়াও করা হলে তাকে সতর্ক করা হয়নি বলে কোনো ওযর সে যেন পেশ করতে না পারে। তাই বলা হচ্ছে, 'যাও ফেরাউনের কাছে, নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহ করেছে।' তারপর তাকে (মূসাকে) আল্লাহ তায়ালা শেখাচ্ছেন কেমন করে ওই সীমালংঘনকারী মহাপাপীকে সম্বোধন করতে হয়। সুন্দরতম ও মর্মস্পর্শী পদ্ধতিই এই দাওয়াতী কাজের জন্যে

ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যাতে সে অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসে, বিদ্রোহাত্মক কাজকর্ম বন্ধ করে এবং আল্লাহর গযব ও পাকড়াওকে ভয় করতে শুরু করে। এরশাদ হচ্ছে– (তাকে) বলো তুমি কি পবিত্র হতে চাও? তুমি কি বিদ্রোহের খারাবী ও নাফরমানীর পাপ থেকে মুক্ত হতে চাও? তুমি কি রহমত ও বরকতের পথে চলতে চাও? চাইলে আমি তোমাকে তোমার মালিকের নৈকট্য লাভের পথ বাতলাবো, আর এর ফলে তুমি তাঁকে ভয় করে চলতে পারবে। তুমি কি চাও তোমার মালিকের কাছে পৌঁছানোর পথ তোমাকে আমি দেখিয়ে দেই? যখন তুমি তা জানতে পারবে, দেখবে তোমার অন্তর ভরে গেছে তাঁর ভয়ে। আসলে মানুষ তখনই বিদ্রোহ করে এবং নাফরমানিতে লিপ্ত হয় যখন সে তার মালিক থেকে দূরে চলে যায়। যখনই কেউ আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যায় তখনই তার দিল শক্ত হয়ে যায় এবং সে নানা প্রকার অশান্তিকর কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। আর তখনই তার থেকে বিদ্রোহ ও অহংকার প্রকাশ পায়।

ফেরাউন কর্তৃক আহূত জনাকীর্ণ সমাবেশে এ কথাগুলো পৌঁছানোর দায়িত্ব দিতে গিয়ে মূসাকে এ কথাগুলো বলা হলো। এরপর আসছে সমবেত জনতার সামনে কথাগুলো সরাসরি পেশ করা ও যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার দৃশ্য। এই তাবলীগের পর জনতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে অযথা এর পুনরাবৃত্তি থেকে তিনি বিরত হয়ে গেলেন। কথাগুলো গুটিয়ে নিলেন ও সংক্ষিপ্ত করে ফেললেন। তার কথাগুলো নিয়ে সে প্রতিক্রিয়াশীল মজলিসে অনেকক্ষণ বাকবিতন্ডার ওপর এখানে যবনিকাপাত করা হলো। তারপর আল্লাহ তায়ালা মূসাকে সে মহা নিদর্শন দেখালেন যা দেখে ফেরাউন অস্বীকার করলো এবং মূসাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে চরম নাফরমানী করলো।

অবশ্যই মূসা (আ.) তাকে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সেইভাবেই ফেরাউনের কাছে কথা পৌঁছে দিয়েছিলেন যেভাবে তাঁর মালিক তাকে হুকুম দিয়েছিলেন এবং যে পদ্ধতিতে জানাতে বলেছিলেন সেভাবেই তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু আত্মম্ভরী ও দেমাগী হৃদয় থেকে নবীর যবানীতে তার রবের কথাগুলো ঠোকর খেয়ে ফিরে এলো। যার কারণে মূসা (আ.) তাকে এক মহা নিদর্শন দেখালেন। সে নিদর্শন হলো লাঠি ও শুভ্র সমুজ্জ্বল হাত, যার বিবরণ অন্যান্য স্থানে এসেছে। কিন্তু সে এসব কিছু অমান্য করলো ও স্পষ্ট নাফরমানী করলো। এভাবে অবজ্ঞাপূর্ণ অস্বীকৃতি ও নাফরমানীর সংক্ষেপে ও অল্প সময়ে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বার্তা পৌঁছানোর দৃশ্যের ইতি টানা হলো। এরপর আসছে আর একটি দৃশ্য। মূসার কাছ থেকে ফেরাউনের মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য। যেখানে যাদু ও সত্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ফুটে উঠেছে এবং সে সময়ে সত্য ও সঠিক পথের কাছে নতি স্বীকার করতে সে বাধ্য হয়েছে। বলা হচ্ছে, তারপর পরাজিত মনোভাব নিয়ে দুরভিসন্ধির মানসে ওখান থেকে সে চলে গেছে। অতপর সে অসংখ্য লোকজনকে জড়ো করেছে এবং ঘোষণা করেছে– আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব, প্রতিপালনকারী, আইনদাতা।

এ আলোচনা প্রসংগে ওই মহা অহংকারী কাফেরটির দম্ভভরা উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তভাবে তার ষড়যন্ত্রের বর্ণনা দেয়ার পর যাদুকরদের জড়ো করার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে– আলবৎ, দুরভিসন্ধির মানসে সে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলো ও নানা প্রকার চেষ্টা চালালো। এ অপচেষ্টায় সে যাদুকর ও জনতার এক মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত করলো'। এরপর আসছে ওই হঠকারী মূর্খ ব্যক্তির চরম লজ্জাকর দম্ভভরা উক্তি, 'আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব, প্রতিপালক'। এই দম্ভোক্তি করলো সেই দাম্ভিক ও ধোকাবাজ ব্যক্তি, যে তার প্রজাদের অন্ধ আনুগত্যকে ব্যবহার করেছিলো। তবে এটা চিরসত্য যে, এ স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিরা বরাবরই নিসংগ ও একাকী থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে এদের নিজেদের কোনো শক্তি ও ক্ষমতাই থাকে না। যেহেতু প্রজারা হীনমন্যতায় ভোগে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে উদাসীন থাকে। এই সুযোগে তারা ওদের পিঠে সওয়ার হয়ে তাদের মুখে লাগাম পরিয়ে তাদের ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে বেড়ায়।

এই হীনমন্যতার কারণে তারা ওই দাম্ভিক রাজাদের সামনে মাথানত করে থাকে এবং ওই রাজারা তাদের ওপর প্রভুত্ব চালিয়ে যায় ও তাদের মানসম্ভ্রম কেড়ে নিয়ে তাদেরকে অসহায় গোলামে পরিণত করে। অপরদিকে হতভাগারা ভয় ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে এই করুণ অবস্থা বরণ করে নেয়।

এই ভয়ের সূত্রপাত হয় এক অলীক কল্পনা থেকে। অথচ এই ধরনের দাম্ভিক নরপতিরা এক একজন একক ব্যক্তি ছাড়া আর কোনোদিনই কিছু ছিলো না এবং হয়ও না। সে লাখ লাখ ব্যক্তি থেকে কখনোই শক্তিশালী হতে পারে না। হায়! সাধারণ জনগণ যদি মানবতা, আত্মসম্ভ্রম ও মানুষের গোলামী থেকে মুক্তির চেতনায় বলীয়ান হতো! হীনমন্যতা ও উদাসীনতার কারণেই বিশাল জনতার প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী শাসকদের হাতে বন্দীত্ব বরণ করে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ এক সাংঘাতিক প্রতারণা, যার মাধ্যমে জনগণের ওপর শাসকশ্রেণী প্রভুত্ব কায়েম রাখার সুযোগ করে নেয়। কোনোদিন কোনো আত্মসম্ভ্রম বোধসম্পন্ন অথবা চেতনাশীল ব্যক্তি তার সামনে মাথা তুলতে সক্ষম হয় না। গোটা জাতির মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তিত্ববান লোক থাকে না যে, সে তার আসল মালিককে চিনতে পারে এবং তাঁর ওপর ঈমান আনতে পারে। আসলে কোনো শাসক কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। ফেরাউনের প্রকৃত অবস্থা এটাই ছিলো যে, সে তার জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন পেয়েছিলো। তারা চরম হীনমন্যতায় ভুগছিলো এবং আসল মালিকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিলো না।

এই কারণেই তারা এই পাপাচারী অহংকারী ব্যক্তির অহংকারপূর্ণ দাবীকে উপেক্ষা করতে পারেনি। সে বলেছিলো, আমিই তো তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব। একথাটা কস্মিনকালেও সে বলতে পারতো না যদি সচেতন আত্মসম্ভ্রমশীল কোনো একদল ঈমানদার লোক সেখানে হাযির থাকতো। আর তখনই সে বুঝতে পারতো যে, আসলে সে কতো দুর্বল, কতো অক্ষম এবং কতো অসহায়। সে এতো দুর্বল যে, কোনো একটি মাছি তার থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিলে সে জিনিসটি ফেরত নেয়ার মতো ক্ষমতা পর্যন্ত তার নেই।

ওই নরাধম ব্যক্তি চরম ঘৃণা অহংকারের সাথে মূসা (আ.)-এর প্রতি যে নির্লজ্জ ব্যবহার করেছিলো তার পরিপ্রেক্ষিতে মহাশক্তিমান আল্লাহর শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠলো এবং এই কারণেই তিনি তাকে পাকড়াও করলেন শুধু আখেরাতের আযাবেই নয়- দুনিয়ার শাস্তিতেও।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এখানে দুনিয়ার শাস্তির কথা বলার আগে আখেরাতের আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ আখেরাতের আযাব দুনিয়ার কষ্ট থেকে অনেক বেশী কঠিন ও অধিক দীর্ঘস্থায়ী। এটাই হচ্ছে ওই আসল শাস্তি যা বিদ্রোহী ও নাফরমানদের জন্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তা যেমনি কঠিন তেমনি চিরস্থায়ী। এই আলোচনা প্রসংগে আখেরাতের কথাটাই প্রধানত বলা হয়েছে এবং এটাই এখানকার মূল আলোচ্য বিষয়। এখানে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো অনুষ্ঠিতব্য প্রকৃত মূল ঘটনার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। দুনিয়ার পাকড়াও নিসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন পাকড়াও হবে, কিন্তু এ শাস্তি ও কষ্ট যতো কঠিনই হোক না কেন আখেরাতের শাস্তি তার থেকেও অনেক অনেক বেশী কঠিন ও ধ্বংসাত্মক। ফেরাউন ছিলো একজন শক্তিশালী ও একচ্ছত্র অধিপতি। সে ছিলো সম্ভ্রান্ত ও সদ্বংশজাত; কিন্তু এসব কিছু তার কোনো কাজেই লাগেনি। আলোচনায় আরো একটি শ্রেণীর কথা অস্বীকারকারীদের মধ্য থেকে যাদের এসব শক্তি ক্ষমতা ছিলো না ওই সকল মোশরেকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর পর যখন তারা তা কবুল করেনি তখন প্রশ্ন আসে যে, তাহলে কোন কারণে তারা সত্যকে অস্বীকার করলো এবং তাদের পরিণতিই বা কি হতে পারে! এসব চিন্তা জাগানোর উদ্দেশ্যে এরশাদ হচ্ছে,

অবশ্যই সে অবস্থার মধ্যে এক বিরাট শিক্ষা রয়েছে তাদের জন্যে, যারা ভয় করে চলতে চায়।

অতএব, যে মানুষ তার রবকে চেনে ও ভয় করে, সে অবশ্যই ফেরাউনের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তির অন্তরে তাঁর ভয় নেই, সে শিক্ষা নেয়ার ব্যাপারে অন্তরের মধ্যে এক প্রবল বাধা অনুভব করবে, কোনো উপদেশ তার কাজে লাগবে না। অবশেষে তার নির্ধারিত শেষ পরিণতি উপস্থিত হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তখন তাকে আখেরাতের আযাবে পাকড়াও করবেন এবং দুনিয়ার শাস্তিতেও। এটা চির সত্য কথা যে, প্রত্যেক ভাগ্যখেলার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে এবং সত্যিকারে তারাই শিক্ষা নিতে পারে যারা আল্লাহকে ভয় করে। পৃথিবীর বলদর্পী, শক্তি মদোন্মত্ত ও অহংকারী ব্যক্তিদের ঘটনা পরিক্রমার পর একইভাবে ওই মোশরেকদের ইতিবৃত্ত আসছে, যারা নিজেদের শক্তির বড়াই করেছিলো।

পুনরুজ্জীবনের যৌক্তিক বাস্তবতা

প্রকৃতির যে সকল জিনিসের মাধ্যমে মহা শক্তিমান আল্লাহ তায়ালার শক্তির প্রকাশ ঘটেছে, যার রহস্য আজও মানুষ বুঝতে সক্ষম হয়নি, তার কোনো কোনোটির দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করাটা কি বেশী কঠিন, না সুদূর নীল আসমানের সৃষ্টিটা বেশী কঠিন? এই আকাশকে তৈরী করার পর তিনি তার ছাঁদকে সুউচ্চে তুললেন এবং তাকে সুবিন্যস্ত করলেন (যেভাবে সাজালে তা সুন্দর হয় ও মানুষের জন্যে উপকারী হতে পারে সেইভাবে তাকে সাজালেন)। আর রাতকে করলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং তার মধ্য থেকে সমুজ্জ্বল দিবাভাগের উন্মেষ ঘটালেন। এরপর (বিছানার মতো আরামদায়ক করে) যমীনকে বিছিয়ে দিলেন। বের করলেন তার থেকে পানি ও চারণভূমি এবং মযবুত পাহাড় পর্বতগুলোকে গেড়ে দিলেন তার মধ্যে। এগুলো তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর জন্যে ফায়দার জিনিস এবং তোমাদেরকে জীবন ধারণ সামগ্রী হিসেবে এগুলো দান করলেন যাতে করে তোমরা খুশী হতে পারো।

এটা এমন একটি প্রশ্ন, যার একটিই মাত্র জবাব হতে পারে, যার মধ্যে দ্বিরুক্তি বা দ্বিমতের কোনো উপায়ই নেই। অবশ্যই আসমান সৃষ্টি বেশী কঠিন। এর মধ্যে কোনো দ্বিমত পোষণ করা বা বিতর্কের সুযোগ নেই। এখন এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে এ কথা বলে ধোকা দেবে যে, আকাশ সৃষ্টির তুলনায় তোমাদের সৃষ্টি বেশী কঠিন এবং সৃষ্টিকর্তার তুলনায় তোমরাই বেশী শক্তিশালী? প্রশ্নের এ হলো একটি দিক, অপর দিক হচ্ছে, তোমাদেরকে একবার সৃষ্টি করার পর পুনরায় সৃষ্টি করাটা কি তার জন্যে বেশী কঠিন হয়ে গেলো! অথচ অনেক অনেক বেশী কঠিন আকাশ সৃষ্টি– তা যখন তিনি করতে পেরেছেন তখন পুনরায় সৃষ্টি করাটা তার জন্যে অবশ্যই অনেক সহজ কাজ, তা কেন তিনি পারবেন না? নিসন্দেহে আকাশ সৃষ্টি সব থেকে কঠিন কাজ, যা তিনিই করেছেন। আর একথা কি ঠিক নয় যে, যে কোনো ইমারত বানাতে হলে শক্তি ও সরঞ্জাম উভয়ের প্রয়োজন হয়। আকাশ সৃষ্টির জন্যে অনুরূপ মাল মশলা বা যোগাড়যন্ত্রের প্রয়োজন ছিলো বৈকি, যাতে এক অংশ অপর অংশকে মযবুতভাবে ধরে রাখতে পারে। এর তারকারাজি ও গ্রহ উপগ্রহগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। একটি অপরটির সাথে মিশতেও পারে না বা নিজ কক্ষপথ থেকে বিচ্যুতও হতে পারে না।

একে তিনি উঁচুতে তুলেছেন এবং তাকে পূর্ণাংগ আকৃতি দিয়েছেন। এভাবে সবকিছুকে উঁচুতে তুলে তাদের অবস্থান ও পরস্পর সুসম্পর্কের ভিত্তিতে পরিভ্রমণের জন্যে তাদেরকে সুবিন্যস্ত

করেছেন। খোলা চোখের সাধারণ দৃষ্টিতেও গ্রহ নক্ষত্রের এই সহযোগিতাপূর্ণ পরিভ্রমণ ধরা পড়ে। এই রহস্যপূর্ণ বিষয়টিই এই আয়াতের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু বিরাজ করছে এবং যা কিছু যোগ হচ্ছে তার অতি সামান্যই মানুষের জ্ঞানে ধরা পড়েছে। যেটুকু তারা জেনেছে তাতেই তারা হয়রান হয়ে গেছে, নিসাড় হয়ে গেছে। তাদের চেতনা অবরুদ্ধ হয়ে গেছে এবং এক ভয়ংকর আতংক তাদের পেয়ে বসেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসব কর্মকান্ডের পেছনে যে যুক্তি বুদ্ধি কাজ করেছে তা নির্ণয় করতে মানুষ অক্ষম। অবশেষে মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, এক মহান পরাশক্তি এসব কিছুর পরিকল্পনা করেছেন এবং তিনি নিজেই এসব কিছু পরিচালনা করেছেন। এই পরম সত্যকে সে সকল মানুষও আজ মেনে নিয়েছে, যারা আদৌ কোনো ধর্ম মানে না।

'তিনি এই রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং আলোকোজ্জ্বল করেছেন এর প্রথম দিবাভাগকে'। এ আয়াতে যে আরবী শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার সুর ও অর্থের মধ্যে শক্তির ইংগিত পাওয়া যায়। যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এসব কিছু এক মহা শক্তিমান সত্ত্বার কীর্তি। 'আর ঢেকে দিয়েছেন (অন্ধকার দিয়ে) এর রাতকে'। অর্থাৎ রাতকে অন্ধকার করেছেন, আর দিন থেকে বের করেছেন তার আলো; অর্থাৎ দিনকে আলোকময় করেছেন, কিন্তু একটি অবস্থার সাথে আর একটি অবস্থার সম্পর্ক বুঝানোর জন্যে যে উপযুক্ত আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যায় আরও অনেক কথা জানা যায়, যেগুলো এ আলোচনার সংগে সংগতিপূর্ণ। রাতের অন্ধকার ও তার পেছনে পেছনে দিনের আলো ফুটে ওঠা তো সবার সামনে আছে এবং এটা সবার বোধগম্য। একটির পর আর একটি আসছে এ জন্যে এ বিষয়ে তেমন কোনো গভীর চিন্তা আসতে চায় না। তাই কোরআন প্রতিটি হৃদয়ের তন্ত্রীতে এই আগমন ও প্রত্যাগমনের তাৎপর্য তুলে ধরেছে। চিন্তাশীল হৃদয়ে এ দৃশ্যাবলী প্রতিদিন চির নতুন এক মাধুর্য জাগায়। চেতনা তাজা হয়ে ওঠে এবং নতুন কর্মোদ্দীপনায় সজীব হয়। এই আবর্তনের ওপর প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণ এতো সংক্ষিপ্ত ও অত্যাশ্চর্য যে, এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির সাথে সাথে হৃদয়ও মুগ্ধ আবেগে বিগলিত হয়।

'এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন, বের করেছেন এর থেকে পানি ও তৃণগুল্মলতায় ভরা চারণভূমি। আর তার পরে পাহাড় পর্বতকে (মযবুত করে) গেড়ে দিয়েছেন, যমীনকে বিছিয়ে দেয়া বলতে বুঝায় এর উপরিভাগকে সমতল করে দেয়া। যাতে করে এর উপরে চলাচল করা সহজ ও আরামদায়ক হয় আর যমীন সমান্তরাল হলে তা শাক সবজি ও তরিতরকারি উৎপাদনে ও ফসল চাষের উপযোগী হয়। অপরদিকে পাহাড় পর্বতকে গেড়ে দেয়ার দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, মানুষের বাসোপযোগী করে পৃথিবীকে সাজানোর পর এর মধ্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা দান করা হয়েছে, যাতে করে আল্লাহর বান্দারা আরামে জীবন ধারণ ও বসবাস করতে পারে। এরপর এই অবস্থার স্থিতিশীলতাকে টিকিয়ে রাখার মানসে প্রয়োজনমতো ছোটো বড়ো পাহাড় শ্রেণী গোটা পৃথিবীকে কোমরবন্ধের মতো বেঁধে রেখেছে। এগুলো থেকে বের করা হয়েছে স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা, যার থেকে মানুষ ও গবাদি পশু তৃপ্তি সহকারে পান করে, ফসল ফলায় এবং নদ নদী প্রবাহিত হয়ে ভরে দেয় আবাদী ভূমিতে সবুজ শ্যামল গাছপালা ও তরুলতায়। পর্বতমালার উপরিভাগ থেকে নেমে আসে যে প্রস্রবণ, তার প্রবাহ থেকে বাষ্পীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয় এবং যার থেকে বৃষ্টি আকারে পানি নেমে এসে এক বিশেষ মাপ মতো মানুষকে তৃপ্তিদান করে। তৃণলতা, গুল্ম, ফলমূল এবং তরিতরকারি উৎপন্ন করে ও এর চারণভূমিকে সুশোভিত করে। এর দ্বারা বিভিন্নভাবে মানুষ ও গবাদিপশু উপকৃত হয় এবং অন্যান্য জীব জন্তু কখনও সরাসরি এর থেকে খাদ্য পায় আবার কখনও অন্যের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন মেটায়।

এসব কিছুর ব্যবস্থা হয়েছে আকাশ সৃষ্টি, রাতের অন্ধকার নেমে আসা এবং দিনের আলোর আগমনের ওপর। জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কৃত অতি সাম্প্রতিক তত্ত্ব ও তথ্য কোরআনের এ বর্ণনাকে সমর্থন করে জানিয়েছে যে, পৃথিবী সমতল ও বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে এর রাত ও দিনসহ কোটি কোটি বছর ধরে এটা তার কক্ষপথে আবর্তন করছিলো। তারপর এক সময়ে এ পৃথিবীকে গাছপালা জন্মানোর উপযোগী তাপমাত্রায় নামিয়ে আনা হয় কিন্তু তখনও পৃথিবী বর্তমানের আকৃতি লাভ করেনি এবং এতে পাহাড় পর্বত, উপত্যকা ও সমভূমির উৎপত্তি হয়নি।

কোরআন ঘোষণা করছে যে, এসব উৎপত্তি তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ফায়দার জন্যে। এই বর্ণনা দ্বারা মানুষকে স্মরণ করানো হচ্ছে যে, তার জীবনধারণ ও প্রয়োজন মেটানোর জন্যে আল্লাহর পরিকল্পনা কতো পূর্ণাংগ ও কতো ব্যাপক। আকাশের এই আকৃতি লাভ হঠাৎ করে হয়ে যায়নি, প্রয়োজনীয় সকল উপকরণে ভরা সাজানো গোছানো এই পৃথিবী কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। খলীফা হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটিকে সামনে রেখেই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অনেকগুলো উপায় উপাদানের ওপর মানুষের অস্তিত্ব ও অগ্রগতি নির্ভর করে যা সাধারণভাবে বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে বিরাজ করে আর বিশেষভাবে তা নির্ভর করে সৌরজগতের আবর্তনের ওপর। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে হয় তা নির্ভর করে পৃথিবীর নিজস্ব অবস্থার ওপর। অবশ্য এককভাবে এর কোনোটাই ক্রিয়াশীল নয়। এগুলোর সবকিছু পারস্পরিক পূর্ণ সহযোগিতা ও সহকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর গৃহিত পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

এ বিষয়ে কোরআনের বর্ণনাভংগী হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ও মূল সত্যকে বুঝার লক্ষ্যে ইংগিতবাহী ও বিভিন্ন জিনিসের উদাহরণ দ্বারা বোধোদয়ের জন্যে এক কার্যকর প্রচেষ্টা। এই লক্ষ্যে আকাশের নির্মাণশৈলী, রাতকে ঢেকে ফেলার বিবরণ, দিনের আলোর প্রকাশ, পৃথিবীর বিস্তার দান, তার থেকে পানি ও তৃণভূমির উন্মেষ এবং পবর্তমালাকে মযবুতভাবে প্রোথিত করার দৃষ্টান্তগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

বলা হয়েছে, এসব কিছু মানুষ ও গবাদিপশুর ফায়দার জন্যে। এ বর্ণনার মাধ্যমে বিশ্বের অনেক কিছুর এমন বিশদ পরিকল্পনা জানা যায়, যা সবাই বুঝতে পারে। সারা বিশ্বের সবকিছুর মধ্য দিয়ে এমন অনেক কিছুর বহিপ্রকাশ ঘটছে যা বুঝার জন্যে বিশেষ কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের পরিচিত বুদ্ধিগ্রাহ্য এই তথ্যাদি অতি প্রা. ল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে, যাতে করে সব যামানার সব এলাকার লোক তা সহজে বুঝতে পারে। এই সহজ সরল মহাসত্য জিনিসগুলোর বাইরে আরও অনেক জিনিস আছে যা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। তা হচ্ছে এ বিশ্ব সৃষ্টি কোনো আকস্মিক ঘটনার পরিণতি হতে পারে না। সবকিছুর আশ্চর্যজনক সম্মিলনের মাঝে একই সুরের ঝংকার কোনো আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। সবকিছুর মধ্যে পারস্পরিক মিল, অবিচ্ছেদ্য ও একসাথে চলার অভ্যাস বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা থেকেই শুরু হয়েছে এবং তা সৌরজগত থেকে নিয়ে কোটি কোটি নক্ষত্রমন্ডলীর সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। নক্ষত্রমন্ডলী ও সৌরমন্ডল এবং সবগুলোর মধ্যে পৃথিবী এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে যাকে মানুষের বসবাস ও জীবন ধারণোপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে।

এই প্রকৃতির অধিকারী দ্বিতীয় আর কোনো গ্রহ এমন নেই, যেখানে মানুষ নিশ্বাস ফেলতে পারে এবং সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। আজ পর্যন্ত মানুষ অনুরূপ কোনো গ্রহের সন্ধান পায়নি। হাঁ, এটিই একমাত্র গ্রহ যা মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ উপযোগী। এ গ্রহটিকেই একমাত্র এমন উপকরণ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে যার মধ্যে মানুষেরা বেঁচে থাকার মতো উপায় উপাদান

খুঁজে পায় এবং যার মধ্যে মানুষের বংশধারা বৃদ্ধি ও বিস্তার সম্ভব। প্রতিটি আয়তনসম্পন্ন সৃষ্টির বাস করার জন্যে উপযোগী জায়গা প্রয়োজন। যে কোনো গ্রহে মানুষ বাস করতে পারে যদি সেখানে তার বাস করার মতো উপযোগী কিছু ব্যবস্থা থাকে।(১)

যেমন মহাশূন্যে তারার চতুস্পার্শে যে গ্রহগুলো থাকে সেগুলোকে ওই তারকারা নিজ নিজ আকর্ষণে নিজেদের দিকে টেনে রাখে যাতে করে সেগুলো ছিটকে অন্যত্র চলে না যায়। এই নির্দিষ্ট জ্যোতিষ্ক থেকে পরিমাপ মতো এক নির্দিষ্ট দূরত্বে পৃথিবীর অবস্থান। বেশী কাছে থাকলে তা গলে যাবে, আর বেশী দূরে চলে গেলে জমে তা বরফ হয়ে যাবে, যেখানে কোনো প্রাণীর পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আবার সেখানে এমন কিছু উপাদান থাকতে হবে যা খেয়ে এবং ব্যবহার করে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। আবার এ গ্রহের অবস্থানটাও এমন হতে হবে যে এই শর্তগুলোর সব কটা তার মধ্যে বর্তমান থাকবে। কারণ জীবনধারনের জন্যে ওইসব এক সাথে প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব বলে আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। এ শর্তগুলোর সব ক'টি একমাত্র পৃথিবীর মধ্যেই বর্তমান আছে।

এই মহাবিশ্বের বিস্তারিত নির্মাণ পরিকল্পনা তৈরী করা এবং এর মধ্যে মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দান করা এমন একটি বিষয় যা হৃদয় ও স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিকে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে জানায় এবং হিসাব গ্রহণ করে প্রতিদান দেয়া সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করে ও প্রশান্ত মনে তা মেনে নিতেও উদ্বুদ্ধ করে।

বিশ্ব সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে যদি কেউ এমন উদ্ভট চিন্তা করে যে, কোনোদিন এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না, ভালোমন্দ যে যাই-ই করুক, তার কোনো প্রতিদান দেয়া হবে না, অহংকারী ও অন্যায়কারী যুলুমবাজ লোকেরা অবলীলাক্রমে নাজাত পেয়ে যাবে এবং নেক, ইনসাফকারী ও হক পথের পথিকরা কোনো প্রতিদান পাবে না, নশ্বর এ ধরার বুকে মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে, তাহলে তা হবে অনুমান প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান নিয়মনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই কারণে আলোচ্য সূরার এই অংশে যে সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে তা আখেরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করার জন্যে অন্তর ও বুদ্ধিতে বিপুল পরিমাণে সাড়া জাগায়।

কেয়ামতের খন্ডচিত্র

আলোচনার শেষাংশে মহাপ্রলয় কখন কোথায় ঘটবে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে–

'তারপর যখন সেই মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে সেই দিন মানুষ স্মরণ করবে তার কৃতকর্মকে এবং সেদিন জাহান্নামকে এমনভাবে তার সামনে তুলে ধরা হবে যে, সে তা নিজ চোখে দেখতে পাবে। অতএব, যে বিদ্রোহ করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে বড়ো করে দেখেছে, নিশ্চয়ই জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা এবং যে তার রবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে বলে ভয় করেছে এবং মনকে তার স্বাধীন ইচ্ছামত চলা থেকে বিরত রেখেছে নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার ঠিকানা।

---

(১) ইদানীং অবশ্য চাঁদ ও মংগলগ্রহে পানির অস্তিত্ব রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা কিছু প্রমানাদী পেয়েছেন। কে জানে ভবিষ্যতে হয়তো অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহেও পানির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হবে, আর পারিনর সাথে যেহেতু জীবনের সম্পর্ক রয়েছে তাই অন্য কোথাও যদি জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় তাতেও আশ্চর্য্যয়িত হবার কিছু থাকবে না। আল্লাহ তায়ালার কুদরত অনন্ত অসীম।–সম্পাদক

অবশ্যই দুনিয়ার জীবন এক আনন্দময় অবস্থা এবং আরামদায়ক জীবন যা সংক্ষিপ্ত এবং এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মানুষকে দেয়া হয়েছে। মহাবিশ্ব ও মানব জীবনের সাথে সঙ্গতি রেখে সৃষ্টির যে মহা পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে সেই অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের স্থিতিকাল নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু এটা এক মজার জীবন, যা এক নির্দিষ্ট সময় শেষে খতম হয়ে যাবে। তারপর যখন সেই মহাপ্রলয় আসবে, তখন তা সব কিছুকে লন্ডভন্ড করে দেবে এবং সব কিছুকে হতবুদ্ধি করে দেবে, পরিসমাপ্তি ঘটবে সীমাবদ্ধ আনন্দ অভিলাষের। দুনিয়ার চলমান জীবনের এই গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সমগ্র বিশ্ব, এর মযবুত আকাশ, প্রশস্ত পৃথিবী, দৃঢ়ভাবে প্রোথিত পর্বতমালা, জীবন্ত প্রাণী এবং সকল জীবজগত ও জড় পদার্থ সব কিছু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং দিকবিদিক ছুটোছুটি করতে থাকবে। এটা হবে সকল বিপদের বড়ো বিপদ।

এই সময়ে মানুষ স্মরণ করবে তার অতীত জীবনের সকল কৃতকর্মকে। মানব জীবনে করা সকল কাজকর্মের সংরক্ষিত রেকর্ড সে সামনে দেখতে পাবে, যেগুলোকে সে জীবদ্দশায় সুখ-শান্তিতে মেতে থাকাকালে খেয়াল করতে পারেনি এবং ভোগবিলাসের দ্রব্যসামগ্রী এই দিনের স্মরণ থেকে তাকে ভুলিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু সময় হারিয়ে এই স্মরণ সেদিন আর কোনো কাজে লাগবে না। শুধু দুঃখ ও আফসোস এবং কোন আযাব ও বিপদ সামনে রয়েছে সেই চিন্তাই তার গোটা সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সেদিন বাস্তবে প্রকাশ করা হবে জাহান্নামকে সেই ব্যক্তির সামনে এবং সে তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। সেদিন জাহান্নাম উন্মুক্ত হয়ে সকল চোখওয়ালাদের সামনে হাযির হয়ে যাবে।

'বুররেঝাত' শব্দটি এক বিশেষ শক্তিপূর্ণ শব্দ অর্থাৎ শব্দটি যেন কঠিন এক দৃশ্য তুলে ধরে। অর্থাৎ এ শব্দটি শোনার সাথে সাথে যেন এক কঠিন অবস্থা সামনে ভেসে উঠতে চায়, তেমনই শব্দটির সুরের মধ্যে কঠোরতার এক ঝংকার ফুটে ওঠে। পরিণতি ও গন্তব্যস্থল বিভিন্ন হওয়ার কারণে সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ব জীবনের মূল লক্ষ্য সেদিন সব প্রকাশ হয়ে পড়বে।

সুতরাং যে বিদ্রোহ করেছিলো ও দুনিয়ার জীবনকে বড়ো করে দেখেছিলো তার জন্যে জাহান্নামই হবে ঠিকানা। চিরস্থায়ী আবাসস্থল। 'তুগইয়ান' (বিদ্রোহ বা সীমালংঘন) বলতে ওই ব্যক্তির কাজকে বুঝায় যে সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। রাজা বাদশাহ বা স্বৈরাচারী শাসকের ক্ষমতাদর্পী দাপট থেকে বিদ্রোহী শব্দটির মধ্যে আরও কঠিন অর্থ বুঝা যায়। এতে সত্য সঠিক পথকে সর্বতোভাবে পরিহার করা বুঝায়, আর বিদ্রোহী বলতে বুঝায় প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে যে দুনিয়ার জীবনকে অধিক গুরুত্ব দেয়। সে আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকেই গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী ধন সম্পদ অর্জনে আমরণ চেষ্টা সাধনা করে চলে। এ ধরনের লোকেরা আখেরাতের ভালোমন্দের কোনো পরোয়াই করে না, আর আখেরাতের গুরুত্বের অর্থ হচ্ছে মানুষের নিজ যুক্তি বুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে প্রতিটি জিনিসের মূল্যায়ন, সুতরাং যে আখেরাতের হিসেবকে উপেক্ষা করবে অথবা তার ওপর দুনিয়ার জীবনকে বড়ো করে দেখে, সে নিজ হাতে জীবনের সঠিক মূল্যবোধকে গলা টিপে হত্যা করে। সে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বোধশক্তি ও সঠিকভাবে জীবন পরিচালনার নিয়মনীতিকে উপক্ষো করলো এবং সে অহংকারী বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারী হয়ে গেলো। এমন ব্যক্তির জন্যে জাহান্নামই হবে শেষ পরিণতি অর্থাৎ উন্মুক্ত জাহান্নাম যা তার সর্বগ্রাসী ভয়াল মূর্তি নিয়ে দ্রুতগতিতে ওই বিদ্রোহীর কাছে এসে যাবে।

অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হবে বলে ভয় করেছে এবং মনকে তার লাগামছাড়া চাহিদা মেটানো থেকে ঠেকিয়ে রেখেছে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা চিরকালীন বাসস্থান।

পাপ থেকে বাঁচার উপায়

আসলে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার চিন্তা যার মধ্যে আছে এবং যার মনে আল্লাহর ভয় আছে সে গুনাহের কাজে অগ্রসর হতে পারে না। কোনো সময়ে মানবীয় দুর্বলতার কারণে অগ্রসর হলেও আল্লাহ তায়ালার ভয় তাকে অনুতপ্ত হতে, এস্তেগফার ও তাওবা করতে উদ্বুদ্ধ করে। যার কারণে সে আনুগত্যের গন্ডীর মধ্যে পুনরায় ফিরে আসে।

নফসের খাহেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই হচ্ছে আনুগত্যের বৃত্তের মধ্যে মূল কেন্দ্রবিন্দু। কুপ্রবৃত্তি বা লাগামছাড়া চাহিদা হচ্ছে যে কোনো অন্যায়, বিদ্রোহাত্মক কাজ ও সীমালংঘনের প্রধান কারণ। এটাই সব সর্বনাশের মূল ও যাবতীয় অন্যায়ের উৎস। যে কোনো অন্যায় কাজে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে মানুষের অন্তরে এর জন্যে প্রবল একটা চাহিদা সৃষ্টি হয়। এরপর অজ্ঞতা ও ভুলে যাওয়ার স্বভাব (যা অনেকের মধ্যে বর্তমান আছে) ওই চাহিদারূপ ব্যধি নিরাময়ে সহায়তা করে অথবা নিজের অজানা অবস্থায় কোনো দিকে মন ঝুঁকে পড়লে তাকে ফেরানো যায়; কিন্তু জেনে বুঝে কেউ কোনো অন্যায়ের প্রতি ধাবিত হলে সেটা যে কোনো ব্যক্তির জন্যে এমন এক বিপদ হয়ে দাঁড়ায় যে, তা সংশোধন করা বড়োই কঠিন। অপরাধ থেকে ফিরে আসার জন্যে তাকে দীর্ঘ সময় ধরে কঠিন চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন হয়।

আল্লাহ তায়ালার ভয় নফসের কঠিন খাহেশকে দমন করার জন্যে এক মযবুত ঢাল বা বর্ম হিসেবে কাজ করে। এই আল্লাহভীতি ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস কদাচিত মানুষকে নফসের বাঁধনছাড়া চাহিদাকে রুখতে পারে। এই জন্যেই আল্লাহ তায়ালা একই আয়াতে দুটি অবস্থার আকর্ষণ ও পরিণতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। যিনি এ বিষয়ে কথা বলছেন তিনি মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। তিনিই মন (নফস)কে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভালো করেই জানেন মনের এ ব্যধি সম্পর্কে এবং এর কার্যকর ওষুধ তাঁরই জানা আছে। এ ব্যাধি কোন গোপন পথে অনুপ্রবেশ করে, সে তো একমাত্র তাঁরই জানার কথা এবং কোনভাবে তাকে প্রতিরোধ করা যাবে তাও তিনিই ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা এতো নিষ্ঠুর নন যে, মনের মধ্যে কোনো মন্দ ভাবের উদয় হবে আর অমনি তিনি তাকে দায়ী করবেন ও পাকড়াও করবেন। কারণ তিনি তো নিজেই জানেন যে, এটা মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবণতা। একে নির্মূল করা তার সাধ্যের বাইরে এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন একে নিয়ন্ত্রণ করতে, দমন করতে এবং লাগাম কষতে আর আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে রেখে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে। এ ভয় পয়দা হবে সর্বশক্তিমান ও জব্বার কাহহার আল্লাহর দরবারে একদিন হাযির হতে হবে এই অনুভূতি থেকে। তাঁর নির্দেশের জন্যে তাকে নিজ নফসের বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে নামতে হবে, যার বিনিময়ে সে চিরস্থায়ী জান্নাত পাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা।

এই আশ্বাসবাণী এ জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে যে, তিনি জানেন যে এ সংগ্রাম কতো কঠিন। তাই সভ্য, ভদ্র ও মযবুত হৃদয়ের এই সকল ব্যক্তিকে তিনি অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন করবেন।

হাঁ, প্রকৃতপক্ষে সেই-ই মানুষ যে এইভাবে মনকে দমন করেছে, এইভাবে সার্বক্ষণিক জেহাদে লিপ্ত হয়েছে এবং এভাবে নিজের মর্যাদাকে উঁচুতে তুলেছে। সে তো মানুষই নয়, যে তার নফসকে তার খুশীমত চলার জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। একটা সহজাত চাহিদা ও তুচ্ছ আকর্ষণের বস্তু লাভের জন্যে তার কুপ্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করেছে। নিসন্দেহে এটা সত্য যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেমন আবেগ-অনুভূতি ও বিশেষ বিশেষ চাহিদা দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং নিজেকে শৃংখলায় রাখার মতো মানসিক শক্তি, আর যখন সে এই শক্তির সদ্ব্যবহার করে এবং নফসের সাথে নিরন্তর সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে মানবতার উচ্চতম শিখরে নিজেকে উন্নীত করে, তখন তার জন্যে বিনিময় হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন চিরস্থায়ী বাসস্থান জান্নাত। মানুষকে দু'টি বিষয়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহর তরফ থেকে তাকে প্রদত্ত সম্মানের এক সমুজ্জ্বল প্রতীক। তার একটি হলো নফসের খাহেশ ও লোভ লালসাকে দমন করার ক্ষমতা, যার মাধ্যমে সে আল্লাহর কাছে নিজের মান মর্যাদা উন্নীত করে।

যখন সে নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয় তখন সে দেখতে পায় যে সীমাহীন চাহিদা ও লোভ-লালসা তাকে আর পীড়া দিতে পারছে না বরং এক নিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তার চাহিদাগুলোকে সে কাজে লাগাতে পারবে। এটাই তো প্রকৃতপক্ষে তার স্বাধীনতার দাবী। অপরদিকে নফসের চাহিদার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, মন যা চায় তাই-ই করতে থাকা এটাই পাশবিক চাহিদা, এটাই তথাকথিত স্বাধীনতা। এখানে এসেই সে নফসের কাছে পরাভূত হয় এবং নফসের খাহেশের দাসত্ব করতে গিয়ে তার মানবতার হয় চরম পরাজয়। এ স্বাধীনতা প্রকৃত ক্ষমতা নয়। হতে পারে না এটা সত্যিকারে কোনো ক্ষমতা বরং ক্ষমতার নামে এটা হচ্ছে মানবতার চরম গ্লানি। এর দ্বারা মনুষ্যত্ব থেকে সে অনেক দূরে চলে যায়।

আল্লাহর কাছে যারা সম্মানিত

আল্লাহর কাছে তারাই প্রথম শ্রেণীর মানুষ যারা নিজেদের মর্যাদা উন্নত করেছে এবং পরবর্তীকালের স্থায়ী বসবাসের স্থান জান্নাতের সুন্দর ও মধুময় জীবনের জন্যে প্রস্তুত করেছে। অপরদিকে সেখানে পাপিষ্ঠরা বঞ্চিত হবে এবং তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে এমন স্থানে যেখানে লেলিহান আগুনকে সারাক্ষণ প্রজ্বলিত রাখা হবে। তার জ্বালানি হবে এই পাপাচারী শ্রেণীর মানুষ এবং পাথর।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উভয় শ্রেণীর জন্যে এটিই হচ্ছে স্বাভাবিক পরিণতি, যার ভিত্তিতে প্রত্যেককে তার ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়া যায়। অবশেষে সূরাটির পরিসমাপ্তিতে যে বর্ণনা এসেছে তাতে এক তীব্র ভীতিজনক অনুভূতি পয়দা হয়। এরশাদ হচ্ছে, 'ওরা তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, (বলছে) কবে তা সংঘটিত হবে? এর সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এর জ্ঞান তো একমাত্র তোমার প্রতিপাল জ্ঞানভান্ডারে সীমাবদ্ধ (অর্থাৎ একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না)। তুমি তো শুধুমাত্র সতর্ককারী সে ব্যক্তির জন্যে, যে একে ভয় করে। যখন তারা ওই (কেয়ামতের) অবস্থা স্বচক্ষে দেখবে, তখন তাদের কাছে মনে হবে যে (পৃথিবীর বুকে) একটি মাত্র সন্ধ্যা অথবা একটি মাত্র সকাল তারা কাটিয়েছে।

যতোবারই এই কঠিন হৃদয়ের মোশরেকরা কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের কথা ও বিবরণ জেনেছে এবং হিসাব গ্রহণ করার পর তাদের পুরস্কার বা শাস্তির সতর্কবাণীর কথা শুনেছে ততোবারই তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এর নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে।

(বলছে), 'কখন এটা সংঘটিত হবে?'

জবাবে বলা হয়েছে,

ওই বিষয় বলার সাথে তোমার কী সম্পর্ক অর্থাৎ ঐ বিষয়টি জানানো তো তোমার কাজ নয়। অত্যন্ত গুরুগম্ভীরভাবে ও সম্ভ্রমের সাথে জবাব দেয়া হয়েছে। এভাবে জবাব দেয়ার কারণে বুঝা যাচ্ছে যে, কেয়ামতের ওই মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানতে চাওয়া এক চরম বেওকুফী এবং দুঃখজনক ব্যাপার। একমাত্র নির্বোধ লোকেরাই এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারে। মহানবী (স.)-কেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ওই সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক? কেয়ামতের ব্যাপারটা তো এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, তোমার পক্ষে বা অন্য কারো পক্ষে তার সুনির্দিষ্ট সময় জানতে চাওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারটি শুধু আল্লাহ তায়ালাই জানেন, আর কারো জ্ঞানের পরিধির মধ্যে এটা আসা সম্ভব নয়। এই বিষয়ের চূড়ান্ত জ্ঞান তো তোমার রব আল্লাহর কাছেই রয়েছে। তিনি নিজেই সবকিছুর মালিক। নবী করীম (স.)-এর দায়িত্ব কর্তব্যের সীমারেখা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সীমা অতিক্রম করা তার উচিত নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। এরশাদ হচ্ছে,

তোমার দায়িত্ব শুধু তাদেরকে সতর্ক করা, যারা একে ভয় করে।

তাদেরকেই তাঁর সতর্ক করতে হবে যারা এ সতর্কীকরণকে ভালো মনে গ্রহণ করে এবং উপকৃত হয়। এই সকল ব্যক্তিই কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাকে সত্য বলে বুঝবে এবং এর পরিণতিকে ভয় করবে। তারাই নির্দিষ্ট সময়ে এর আগমন অবশ্যম্ভাবী বলে বিশ্বাস করবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে।

মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে কেয়ামতের বর্ণনা যে গভীর প্রভাব ফেলে এবং রোজ হাশরের স্থায়িত্বের সাথে বর্তমান জীবনের সময়কালের যে তুলনা তারা করে, এগুলোর মাধ্যমেই তারা ঐ দিনের বিভীষিকা ও ভয়াবহতার ব্যাখ্যা বুঝতে পারে। এরশাদ হচ্ছে–

'যে দিন তারা সেই (ভয়াবহ) দিনটি দেখবে, সেই দিনই তাদের কাছে মনে হবে যে, দুনিয়ায় তারা একটি মাত্র সন্ধ্যা বা একটিমাত্র সকাল কাটিয়েছিলো।'

ওই দিনের ভয়ানক দৃশ্য মানুষের অন্তরকে এমনভাবে হতবিহ্বল করে ফেলবে যে, পার্থিব জীবনের সকল আনন্দ অভিলাষ ও সুখসম্পদের ভোগবিলাস সব কিছু মনে হবে যেন একটিমাত্র সন্ধ্যা বা একটিমাত্র সকালের স্থিতিকাল। জগতের শত শত বছরের উত্থান পতন ও বিবর্তন সবই এক সকাল সন্ধ্যার সময়কাল থেকে বেশী সেদিন মনে হবে না। সবকিছুই যেন সংকুচিত হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি কাটাকাটি করে একে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, মানুষকে কষ্ট দিয়ে এবং নানাপ্রকার অপরাধ করে যে আরামের জীবন সে গড়তে চেয়েছিলো, তার সবকিছু সেদিন অতি তুচ্ছ বিষয় হয়ে যাবে। আজ, তাই তাকে স্মরণ করানো হচ্ছে, সাবধান হয়ে যাও, সময় থাকতেই সতর্ক হও এবং অবশ্যম্ভাবী সেই মহা ভয়ংকর দিনের জন্যে উপযুক্ত পাথেয় সঞ্চয় করো। দুনিয়ার এই ক্ষয়িষ্ণু ভোগ বিলাসের জন্যে আখেরাতের ওই চিরস্থায়ী আবাসস্থলকে যদি বিঘ্নিত করো তাহলে এর মতো বেওকুফী ও ধৃষ্টতা আর কিছুই হবে না। নবীর মুখনিসৃত বাণীর প্রতি খেয়াল করো, চিন্তা-ভাবনা করো এবং সময় থাকতেই বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আখেরাতের যেন্দেগীর প্রাপ্যকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করো, তবেই তুমি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী লাভে ধন্য হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

সূরা আবাসা

আয়াত ৪২ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ﴿١﴾ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ﴿٣﴾ اَوْ
يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾ وَمَا
عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾ فَاَنْتَ
عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾
مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ الْاِنْسَانُ
مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. সে (নবী) ভ্রূকুঞ্চিত করলো এবং (বিরক্ত হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নিলো, ২. কারণ, তার সামনে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে; ৩. তুমি কি জানতে– হয়তো সে (অন্ধ)-ই নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতো, ৪. (কিংবা) সে উপদেশ গ্রহণ করতো, তা তার জন্যে হয়তো উপকারীও (প্রমাণিত) হতো; ৫. (অপরদিকে) যে (হেদায়াতের প্রতি) বেপরোয়াভাব দেখালো, ৬. তুমি তার প্রতিই (বেশী) মনোযোগ প্রদান করলে; ৭. এবং সে ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করতেই হবে এমন কোনো দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করা হয়নি; ৮. (অপর দিকে) যে ব্যক্তি (পরিশুদ্ধির জন্যে) তোমার কাছে দৌড়ে আসে, ৯. এবং সে (আল্লাহকে) ভয় করে, ১০. তুমি তার থেকেই বিরক্ত হলে, ১১. কখনোই (এমনটি উচিত) নয়, এ (কোরআন) হচ্ছে একটি উপদেশ, ১২. যে চাইবে সে-ই তা গ্রহণ করবে।১৩. যা সম্মানিত স্থান (লওহে মাহফুয)-এ (সংরক্ষিত) আছে, ১৪. উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও সমধিক পবিত্র, ১৫. এটি সংরক্ষিত থাকে মর্যাদাবান লেখকদের হাতে, ১৬. (তারা) মহান ও পূত চরিত্রসম্পন্ন; ১৭. মানুষের প্রতি অভিসম্পাত! সে তাই অস্বীকার করলো; ১৮. আল্লাহ তায়ালা কোন্ বস্তু থেকে তাকে পয়দা করেছেন; ১৯. তিনি তাকে এক বিন্দু শুক্র থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি তার (দেহে সব কিছুর) পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন,

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝٢٠ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝٢١ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۝٢٢ كَلَّا لَمَّا
يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝٢٣ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝٢٤ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ
صَبًّا ۝٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝٢٦ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝٢٧ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝٢٨
وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝٢٩ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝٣٠ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝٣١ مَتَاعًا لَكُمْ
وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝٣٢ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۝٣٣ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝٣٤
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝٣٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝٣٦ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝٣٧ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۝٣٨ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۝٣٩ وَوُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝٤٠ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝٤١ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝٤٢

২০. অতপর তার চলার পথ আসান করে দিয়েছেন, ২১. এরপর তিনি তাকে মৃত্যু দিয়েছেন, অতপর তাকে কবরে রেখেছেন, ২২. অতপর তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন; ২৩. কোনো সন্দেহ নেই, তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা সে (কখনো) পালন করেনি; ২৪. মানুষ তার আহারের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখা দরকার, ২৫. আমি (শুকনো ভূমিতে এক সময়) প্রচুর পরিমাণ পানি ঢেলেছি, ২৬. এর পর যমীনকে বিদীর্ণ করেছি, ২৭. (অতপর) তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যদানা, ২৮. আংগুরের থোকা ও রকমারি শাকসবজি, ২৯. (আরো) উৎপন্ন করেছি) যয়তুন ও খেজুর-সহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল), ৩০ (আরো রয়েছে) শ্যামল ঘন বাগান, ৩১. উৎপন্ন করেছি ফলমূল ও ঘাস, ৩২. (এ সবই) তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের উপকার ও উপভোগের জন্যে; ৩৩. অতপর যখন বিকট আওয়ায আসবে, ৩৪. সেদিন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে পালাতে থাকবে, ৩৫. (পালাতে থাকবে) তার নিজের মা থেকে, নিজের বাপ থেকে, ৩৬. সহধর্মিনী থেকে, (এমন কি) তার ছেলেমেয়েদের থেকেও; ৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের জন্যেই পরিস্থিতি এমন (ভয়াবহ) হবে যে, তাই তার (ব্যস্ততার) জন্য যথেষ্ট হবে। ৩৮. কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হবে, ৩৯. তারা সহাস্য ও প্রফুল্ল থাকবে, ৪০. (অপর দিকে) সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা (কুৎসিত) হবে, তার ওপর (যেন) ধুলাবালি পড়ে থাকবে, ৪১. মলিনতায় তা (সম্পূর্ণ) ছেয়ে যাবে, ৪২. এ লোকগুলোই হচ্ছে (কেতাব) অস্বীকারকারী এবং এরাই হচ্ছে পাপিষ্ঠ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আখেরাত সংঘটিত হওয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে ৩০ পারার অন্যান্য সূরার মধ্যে যেসব উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে, এ সূরাটিতেও অনুরূপ যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। আখেরাতের আগমন যে অবশ্যম্ভাবী, তা কতো ভয়ানক, তার দৃশ্যাবলী কতো কঠিন এবং এই পৃথিবীর পরিণতির জন্যে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার গুরুত্ব কতো বেশী, তা এই সূরার ছত্রে ছত্রে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। মহান স্রষ্টার সুনিপুণ তৈরী পৃথিবীর উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগের প্রতিটি জিনিসে এর পরিণতির আভাসও এখানে ফুটে উঠেছে। তারপর এর বাসিন্দাদের যে আখেরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে তার বহু যুক্তি এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতের বাস্তবতা সম্পর্কে মানব মনে প্রত্যয় জন্মানোর উদ্দেশ্যে প্রথমেই এক ভীষণ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধির জন্যে এই ভীতিজনক বিস্ময়কর ও কঠিন অবস্থার বর্ণনার সাথে সাথে কতো দ্রুতগতিতে কেয়ামত সংঘটিত হবে সে বিষয়ে পাঠককে সচকিত করা হয়েছে।

এ সূরাটিতে অত্যন্ত দৃঢ় ও সিদ্ধান্তকারী কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে বহু সূক্ষ্ম এবং হৃদয়গ্রাহী তথ্য, উপস্থাপনা বৈচিত্র্যের অনুপম দৃষ্টান্ত, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং অনুভূতিকে গভীরভাবে নাড়া দেয়ার মতো সুরের মূর্ছনা রয়েছে।

সূরাটির প্রথম অংশে ইসলামের প্রথম যুগের একটি বিশেষ ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। একদিন নবী করীম (স.) কোরায়শ নেতাদের একটি দলকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমন সময়ে আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম (রা.) সেখানে এসে হাযির হলেন। তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র ও অন্ধ ব্যক্তি। রসূল (স.) তখন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে যে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এ কথা তিনি জানতেন না। তাই তিনি এসে রসূল (স.)-কে অনুরোধ করলেন আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষা থেকে তাকে কিছু শেখাতে। এ সময় রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে ব্যাপারটা একটু খারাপ লাগলো, তাই তিনি একটু বেজার হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তার পরপরই কঠোর ভাষায় তিরস্কার স্বরূপ কোরআনের এই সূরাটি নাযিল হলো।

এই সূরাতে একটি মযবুত মুসলিম সমাজের বুনিয়াদ কিভাবে গড়ে ওঠে এবং ইসলামী দাওয়াতের মূলকথা ও প্রকৃতি কী– সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে–

ভ্রূকুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো এই কারণে যে, একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে। তুমি কি জানো? ....(আয়াত-১-১৫)

এ সূরার দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ওই মহামূল্যবান কেতাবের প্রতি মানুষের অস্বীকৃতি ও আল্লাহর প্রতি লজ্জাকর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পর্কে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে স্মরণ করাচ্ছেন কিভাবে সে অস্তিত্ব পেলো, কিভাবেই বা তার জন্মের সূচনা হলো, আর কেমন করেই বা আজ তার জীবন সহজ-সুন্দর হলো। আর পরিশেষে মৃত্যুর পর তার রবের কাছে হাশরের ময়দানে সে হাযির হবে, এতদসত্তেও কেমন করে আজ তার রবের হুকুম অনান্য করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে,

'ধ্বংস হোক (অপরিণামদর্শী) মানুষ, কী নিদারুণ অকৃতজ্ঞ সে! জানো কোন জিনিস দিয়ে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন? একবিন্দু শুক্র থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এক নির্দিষ্ট পরিমাপ মতো তার গঠন কাজ সম্পন্ন করেছেন। এরপর তার জীবন যাপনের পথকে সহজ করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে তাকে মৃত্যু দান করে কবরস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন। এরপর যখন তিনি চাইবেন তাকে হাযির করবেন হাশরের ময়দানে। এতদসত্তেও কিছুতেই সে বিবেকের ডাকে সাড়া দিচ্ছে না এবং যে নির্দেশ তাকে দেয়া হয়েছে তা পালন করছে না'।

সূরাটির তৃতীয় অংশে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে তার দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্তি এমন কিছু জিনিষের দিকে ফেরানো হয়েছে যেগুলোর সাথে তার সার্বক্ষনিক সম্পর্ক বিদ্যমান সেগুলো হচ্ছে তার ও তার পশুর খাদ্যদ্রব্য। আরো মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে ওই সকল জিনিসের দিকে যেগুলো চেষ্টাসাধ্য করলে অর্জন করা যায়, যেগুলো তার ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে, যার ফলে সে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে–

'মানুষের (অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে) তাকানো উচিত তার খাদ্যদ্রব্যের দিকে। অবশ্যই আমি প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়েছি, তারপর ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়েছি যমীনকে, অতপর তার থেকে বের করেছি খাদ্যশস্য, আংগুর ও শাকসবজি। আরও বের করেছি বিভিন্ন ফলমূল। যেমন যায়তুন ও খেজুর, ঘন সন্নিবেশিত পত্রপল্লবে সজ্জিত বাগবাগিচা, আরও বহু প্রকারের ফল ও তৃণলতা, যা তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ভোগের বস্তু'।

সূরাটির সমাপ্তি পর্যায়ে কেয়ামতের বিকট চিৎকারধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। যেদিন সেই মহাবিপজ্জনক দিন তার ভয়াল মূর্তি নিয়ে হাযির হবে, সেদিনকার ওই দৃশ্যের ভয়াবহতা আলোচ্য অংশে বিবৃত শব্দগুলোর মাধ্যমে যেন ঠিক সেইভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, সেদিনকা মানুষের অবস্থা এমন হবে থেকে একমাত্র নিজেকে বাচাতেই ব্যস্ত হয়ে যাবে এবং বাকী সবকিছু থেকে গাফেল হয়ে যাবে। নিদারুণ সে কষ্টের ছাপ লেগে থাকবে অনেকের চেহারায়। এরশাদ হচ্ছে–

'যখন এসে যাবে সেই বিকট চিৎকারধ্বনি, সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে পালাতে থাকবে, মা থেকে, বাপ থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তান থেকেও। প্রত্যেক ব্যক্তির সেদিন এমন এক কঠিন অবস্থা হবে, যা তাকে অন্য সবকিছু ভুলে যেতে বাধ্য করবে। কিছু চেহারা থাকবে সেদিন শুভ্র-সমুজ্জ্বল, হাস্যোদ্ভাসিত, সুসংবাদের আনন্দে মাতোয়ারা। আবার কিছু চেহারা থাকবে সেদিন কালিমালিপ্ত ও ধূলোমলিন। এরাই হবে তারা, যারা ছিলো অকৃতজ্ঞ ও সত্যকে অস্বীকারকারী চরম পাপাচারী'।

তাফসীর

আলোচ্য সূরার বিভিন্ন অংশে ও আয়াতগুলোতে পরপর বর্ণিত কথাগুলো পাঠকের মনে ভীষণভাবে দাগ কেটে যায়। এর মধ্যে প্রদত্ত সংবাদগুলো ও বর্ণনাভংগি এতো বেশী শক্তিশালী যে, কোনো মানব হৃদয়ই এতে বিগলিত না হয়ে পারে না। এখন আমরা এ সূরাটির এমন কিছু বিষয় তুলে ধরতে চাই, যা অত্যন্ত গভীরভাবে মনের ওপর রেখাপাত করে। যদিও প্রথম নযর ও ভাসাভাসা দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। এরশাদ হচ্ছে–

'ভ্রুকুঞ্চিত করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো সে .... উপদেশ গ্রহণ করবে আর সে উপদেশ তার কাজে লাগবে।'

অপরদিকে যে ব্যক্তি তোমার কথার কোনো গুরুত্বই দেয়নি তুমি তার দিকেই বেশী মনোযোগ দিলে অথচ তোমার ওপর মানুষকে পবিত্র করার দায়িত্ব অর্পন করা হয়নি। যে ব্যক্তি ভীত-বিহ্বল অবস্থায় তোমার কাছে দৌড়ে এসেছে, তুমি তার থেকে গাফেল হয়ে যাচ্ছো এবং তাকে অবহেলা করছো? তুমি হয়তো ভেবেছো যে, নেতাগোছের লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের বিজয় হবে? না– তা কিছুতেই হবার নয়। এ তো এক যুক্তিপূর্ণ সদুপদেশ, যার ইচ্ছা এর থেকে শিক্ষা নিক! এ কথাগুলো একটি মর্যাদাবান কেতাবে লেখা রয়েছে। এ কেতাবের মরতবা হচ্ছে অতি উর্ধে। যাবতীয় সন্দেহ ও ভুল ভ্রান্তি থেকে এ কেতাব পবিত্র। ওই পাক সাফ লোকদের হাতেই এ কেতাব শোভা পায়, যারা সম্মানিত ও নেককার!

মানুষের সঠিক মূল্যায়ন

যে ঘটনাটির কারণে সূরাটি নাযিল হয়েছিলো তা অবশ্যই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথম দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব যতোই বুঝা যাক না কেন, তার থেকেও অনেক অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে ঘটনাটি। এ উপদেশটি নিশ্চিত একটি মোজেযা। এ উপদেশবাণী এবং এগুলোর মাধ্যমে যে আসল সত্যকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, আর এগুলো দ্বারা তিনি সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন, তা সম্ভবত ইসলামের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রত্যক্ষ মন্তব্যের মাধ্যমে এই উপদেশগুলো দেয়া হয়েছে। কোরআনে আল্লাহর পেশকৃত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে এটা এক বিশেষ প্রক্রিয়া। এই ঘটনার মাধ্যমে ইসলামের এক মৌলিক এবং স্থায়ী নীতি তুলে ধরা হয়েছে।

সত্য বলতে কি, যে মূলনীতিটি এখানে পেশ করা হয়েছে এবং সমাজ জীবনে তার যে প্রতিফলন ঘটে তাই হচ্ছে বাস্তব ইসলাম। জীবনের এই বাস্তব দিকটি সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে যতোগুলো আসমানী কেতাব এসেছে সবগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো এটিই ছিলো এবং এই ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই ছিলো সেগুলোর মূল কাজ। যদিও আজ সেগুলো মুল অবস্থায় না থাকার কারণে বাস্তব জীবন সম্পর্কিত কথা সেখানে তেমন বেশী কিছু পাওয়া যায় না।

এ সত্যটি আজ অবিমিশ্র নেই। সংমিশ্রণ-দুষ্ট হওয়ায় বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়েছে এবং বিষয়টি আজ একারণে খুব সহজ সরলও নেই। প্রশ্ন হলো, এসব ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি একটি জনপদ বা এক জনগোষ্ঠীর সাথে কিভাবে ব্যবহার করা হবে। এই ঘটনার ভিত্তিতে কোরআনের যে মন্তব্য আমাদের সামনে আছে তা-ই হচ্ছে সূরাটির মূল তাৎপর্য, যাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এটাই সূরার তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী আলোচ্য বিষয়। মানুষ কিভাবে জীবনের সকল বিষয়কে মূল্যায়ন করে, সে সম্পর্কে এখানে বিশদ আলোচনা এসেছে। আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কোত্থেকে মানুষ তাদের আসল মূল্যবোধ লাভ করে এবং এ মূল্যায়নের মাপকাঠিই বা কী? সূরাটির শুরুতে আল্লাহর যে নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে তার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে এ কথা স্পষ্টভাবে জানানো যে, মানুষ যেন পৃথিবীর জীবনে তার যাবতীয় কাজ ও ব্যবহারকে আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতে পরিমাপ করে।

এ নির্দেশগুলো তো সরাসরি আসমান থেকে নাযিল হয়েছে যার মধ্যে পার্থিব কোনো জিনিসের বা কোনো জায়গার স্থানীয় কোনো প্রভাব স্বার্থ বিজড়িত নেই, কোনো সংকীর্ণ গন্ডি বা কারো কোনো সংকীর্ণ ধ্যান-ধারণার দখলও সেখানে নেই। এ নির্দেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই কঠোর। নিজ মান সম্ভ্রম, মূল্যবোধ ও জীবন যাপন করা অবশ্যই বড়ো কঠিন। এরপর মানবতার অবমাননা ও অবমূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম তার বক্তব্য নিয়ে হাযির হয়েছে। বলা হয়েছে,

'অবশ্যই তোমাদের মধ্যে সে-ই সব থেকে বেশী সম্মানী যে আল্লাহর কাছে সব থেকে বেশী পরহেযগার'

মানুষের জীবনে সাধারণভাবে যেসব জিনিস গুরুত্বপূর্ণ এবং যে মাপকাঠি দিয়ে মানুষকে মানুষের মান মর্যাদাকে মাপা হয় সে বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাদের চেতনার মধ্যে এক দায়িত্ববোধ কাজ করে। এটা মানুষের মর্যাদাকে পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাই সেই ধ্যান ধারণার ওপর কঠিন আঘাত হেনে এই বস্তুবাদী মূল্যবোধকে বদলে দেয়া হচ্ছে এবং তাতে নতুন চেতনা সংযোজন করা হচ্ছে। এটা সরাসরি আকাশ থেকে তাদের জানানো হচ্ছে। মহান আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় মর্যাদার একমাত্র মান হিসেবে এই তাকওয়া-পরহেযগারীই একমাত্র স্বীকৃত।

এরপর অবস্থার প্রেক্ষিতে জীবনের সঠিক মূল্যবোধকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্যে তাতে ওই তীব্র সতর্কবাণী আসছে। আসছে মাপের যন্ত্র বা দাঁড়িপাল্লা, এখানে অন্য কোনোটির কোনো মূল্য নেই। একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহর নিক্তিতে যার মূল্য আছে তাই হচ্ছে আসল মূল্য। মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য হচ্ছে মানুষ দুনিয়াবী দৃষ্টিতে যে জিনিসটাকে মূল্যবান বলে গণ্য করে, তা প্রত্যাখ্যান করা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মানুষের মান মর্যাদা সম্পর্কে যে ধারণা বিরাজ করছে, যে সকল জিনিস দিয়ে মানুষের মর্যাদা পরিমাপ করে ও স্বীকৃতি দেয় মহান আল্লাহর কাছে তার এক কানাকড়ি মূল্য নেই। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মর্যাদা যেভাবে দিচ্ছেন সেটাই হচ্ছে প্রকৃত মর্যাদা।

একবার তাকিয়ে দেখুন দৃশ্যের দিকে, আসছে সেই দরিদ্র অন্ধ ব্যক্তিটি। কে সে? ইবনে উম্মে মাকতুম। আসছে কার কাছে আসছে? স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে। দৃশ্যটি ছিলো এমন, রসূলুল্লাহ (স.) কোরায়শদের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথায় ব্যস্ত। এরা রাবিয়ার দুই পুত্র ওৎবা ও শায়বা, আবু জাহল আমর ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং রসূল (স.)-এর আপন চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালেব। ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে এদের সাথে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কথা বলছেন আল্লাহর রসূল (স.)। বড় আশা তাঁর মনে, এরা ইসলাম গ্রহণ করলে মক্কায় ইসলামের যে দুর্দিন চলছে, যে কঠিন অবস্থার মোকাবেলা তাঁকে ও মুসলমানদেরকে করতে হচ্ছে তার অবসান ঘটবে।

ওই দলটিই তাদের ধন-সম্পদ, সামাজিক দাপট ও শক্তি-ক্ষমতা নিয়ে তাঁর পথের কাঁটা হয়ে রয়েছে। প্রবল বাধা সৃষ্টি করে তারা জনগণকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ফেলে রেখেছে। এভাবে তারা এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিলো যাতে করে শেষ পর্যন্ত মক্কায় ইসলামের প্রসার থেমে যায় এবং কেউ প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলতে না পারে। মক্কার বাইরেও যাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে না পারে তার জন্যে এসব ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলো। এ জন্যে তারা সর্বপ্রথম তাদের গোত্রীয় সংহতিকে কাজে লাগিয়েছে কারণ আরবে গোত্রীয় বন্ধন ছিলো খুবই মযবুত। ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক, স্বগোত্রীয় হলেই যে কোনো মূল্যে এবং সর্বাবস্থায় তাকে সমর্থন দিতে হবে– এটা ছিলো তৎকালীন জাহেলিয়াতের এক বিরাট বৈশিষ্ট্য।

এই পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তিটির আগমন ঘটছে, আর তিনি ওই দলটিকে কিভাবে দ্বীনের পথে আনা যায় যায় সেই ব্যাপারে আলোচনা ব্যস্ত। এ উদ্যোগ ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের কারণে নয়, নয় কেনো ব্যক্তিগত উপকারের জন্যে, কেবলাত্র ইসলামের জন্যে এবং ইসলামের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির খাতিরেই এই প্রচেষ্টা। একমাত্র এই অনুভূতিই তাঁর মধ্যে কাজ করছিলো যে, ওরা ইসলাম গ্রহণ করলে মক্কায় বিরাজমান ইসলামের কঠিন বিরোধিতা ও ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর যে নির্যাতন চলছিলো তা বন্ধ হয়ে যাবে। মক্কার বাইরে আশপাশে যে সকল গোত্র আছে তাদের অপতৎপরতাও এদের ইসলাম গ্রহণ করার কারণে থেমে যেতে বাধ্য হবে। এমনই এক কঠিন মুহূর্তে এই ব্যক্তিটি এসে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি যে কী বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছেন এটা তার মোটেই অজানা নয়।

এমতাবস্থায় মাঝপথে তাঁর কথাকে কেটে দেয়া ও তাঁর কথার গুরুত্বকে হালকা করে দেয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর খারাপ লেগেছে এবং খারাপ লাগাটা তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠেছে, যা ওই

অন্ধ ব্যক্তিটি দেখতে পায়নি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.)-এর মুখ বেজার হয়ে গিয়েছে এবং তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ওই দরিদ্র অন্ধ ব্যক্তি থেকে, যে এমন এক জরুরী বিষয়ে আলোচনার ধারাটা কেটে দিয়েছে, যে আলোচনার মাধ্যমে তিনি আশা করেছিলেন যে, মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকেরা দ্বীন গ্রহণ করবে ও ইসলামের সাহায্যে হাত বাড়াবে। এখানে তাঁর বেজার হওয়াটা দাওয়াতী কাজে তাঁর একনিষ্ঠতার পরিচয়ই বহন করছিলো। তাদের সাথে আলোচনায় এই যে, মহব্বত ও আন্তরিকতা সে তো ইসলামের জন্যেই। তাঁর উৎকণ্ঠা ও একাগ্রতা একমাত্র ইসলামের প্রসারের জন্যেই।

তারপরও মহানবী (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা কঠোরভাবে তিরস্কার করছেন। যাকে কোরআনে পাকের অন্য স্থানে মহান চরিত্রের অধিকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাঁর নিকটতম বন্ধু বলা হয়েছে। তাঁকে এভাবে ধমক দেয়ার কারণ হচ্ছে, যে বিষয়ে তাকে তাঁর ব্যবহারকে আপত্তিকর বলা হয়েছে সে বিষয়টি দ্বীন ইসলামের ওই মৌলিক জিনিসগুলোর অন্যতম, যেগুলোর ওপর ইসলামের গোটা প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। যে ভাষায় কোরআনের মধ্যে এই তিরস্কারটি এসেছে, তাও এমন এক স্বতন্ত্র ভাষা, যা মানুষের তৈরী কোনো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিলো না। সাধারণভাবে লেখ্য ভাষায় তা যে কোনো ভাষারই হোক তার নিজস্ব একটি পদ্ধতি প্রকাশভংগি থাকে যাতে কোনো না কোনো ব্যক্তি বা জাতির বাকরীতরি অনুকরণ দেখা যায়। এই ধরনের কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করলে কোরআনে বর্ণিত এই বিশেষ প্রকাশভংগির সাবলীলতা এবং হৃদয়ের ওপর তার প্রভাব বিস্তারকারী ভাবগাম্ভীর্য মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হতে পারে।

কতো মর্মস্পর্শীভাবে ছোট ছোট বাক্যাংশের মাধ্যমে কথাগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে,

'সে ভ্রু কুঞ্চিত কালো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো, এ কারণে যে, এই অন্ধ ব্যক্তিটি তার কাছে এসেছে'।

কথাটি এমনই অসন্তোষজনক ও অপ্রিয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও পরম বন্ধুকে সরাসরি ওই কঠিন কথাটি বলা পছন্দ করেননি বরং নাম পুরুষের বা তৃতীয় ব্যক্তির জন্যে বলা পদ্ধতিতে বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। এতে একদিকে যেমন ওই ব্যবহারের প্রতি ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সরাসরি সম্বোধন করে তিরস্কার করার কারণে যে বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারতো সেটাও এড়ানো সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে নবী (স.)-এর মর্যাদা, তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণা ও সম্মান ওই অপ্রিয় কথাটি উল্লেখ করার কারণে কোনোক্রমেই ক্ষুণ্ন হয়নি।

এভাবে যে ব্যবহারটি কঠিন তিরস্কার ও অসন্তোষ ছিলো তা প্রকাশ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে তাঁকে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এ জন্যে পরক্ষণে সরাসরি সম্বোধনটি অত্যন্ত হালকাভাবে করা হয়েছে, বলা হয়েছে—

'তোমার কি জানা আছে, হয়তো সে-ই পবিত্রতা গ্রহণ করবে অথবা সে-ই শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সে শিক্ষা তারও কাজে লাগবে'।

তোমার কি জানা আছে যখন এই মহা কল্যাণ সংঘটিত হবে তখন হয়তো সেই অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তিটিই পবিত্রতা অর্জন করবে। আগ্রহ নিয়ে এই অন্ধ ব্যক্তিটি তোমার কাছে কিছু কল্যাণ লাভের আশায় এবং তার অন্তরকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছে। যার ফলে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে এবং সে শিক্ষা তার কাজ লাগবে। তুমি জানো যে, এই হৃদয়টি দরিদ্র বেচারার অন্তরটি আল্লাহর নূরের আলোকে আলোকিত হয়ে যাবে এবং এই উর্ধলোকের নূরের সাথে সংযোগ লাভে ধন্য হবে। হেদায়াত কবুল করার জন্যে যে এভাবে উন্মুক্ত হয়ে যায় তখন

তাকে দেখে আরও বহু অন্তর হেদায়াতের আলোকে আলোকিত হয়। এই আন্তরিক মহব্বত ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনাই হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যা আল্লাহর পাল্লায় ভীষণ ভারী হয়ে ওঠে।

পরবর্তী কথায় তিরস্কার আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে, আরও কঠোর হয়ে আসছে কথার সুর। সে সুরে তিরস্কার কিছুটা বিস্ময়ে রূপান্তরিত হয়েছে। বলা হচ্ছে,

'কী আশ্চর্য! যে ব্যক্তি তোমার কথার কোনো পরোয়াই করেনি, তুমি তাকে নিয়েই ব্যস্ত। তোমার কিসের মাথা ব্যথা? সে যদি পবিত্র না হতে চায়, না হোক। ভীতসন্ত্রস্ত হৃদয় নিয়ে যে তোমার কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো, তুমি তার প্রতি গাফেল হয়ে গেলে!'

অর্থাৎ তোমার থেকে, তোমার দেখানো জীবন পথ থেকে, তোমার কাছে হেদায়াত ও কল্যাণের যে ব্যবস্থা আছে যে সত্যের আলো ও পবিত্রতা আছে, তা থেকে যে হঠকারী ব্যক্তিটি মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং দুনিয়ার লোভ লালসায় মজে থাকা যেসব মানুষ সত্যের প্রতি উদাসীন ভাব প্রকাশ করলো, তাদের জন্যেই তুমি ব্যস্ত হয়ে ওই গরীব বেচারার প্রতি উদাসিনতা দেখালে! তোমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে রইলো দুনিয়াপাগল লোকদের জন্যে? তোমার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা জারি রইলো কেবল তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে?

তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে ওই অন্ধ ব্যক্তিটি থেকে, তাও আবার এমন লোকদের জন্যে, যারা তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। তোমার কি এসে যায় যদি তারা পবিত্র না-ই হয়? তারা যদি পাপ পংকিলতায় ডুবে থাকে, যদি জীবনভরে অপবিত্র থাকে, তাতে তোমার ক্ষতি কী? তোমাকে তো তাদের অপরাধের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না বা তোমার কাছে তাদের ব্যাপারে কোনো কৈফিয়তও তলব করা হবে না। তাদের তারা দ্বীন গ্রহন করলে তুমি যে কোনো সাহায্য পাবে এমনও তো নয়। কেয়ামতের দিন তাদের মোকদ্দমা নিয়ে তুমি আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তাও তো নয়। অপরদিকে যে ব্যক্তি আগ্রহ ভরে তোমার কাছে ছুটে এলো, এলো স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে। যে ব্যক্তি মনে প্রাণে। অন্যায়-অপবিত্রতা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে তুমি তার থেকেই গাফেল হয়ে গেলে! যে ব্যক্তি সঠিক পথপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এসেছে, তার প্রতি উদাসীনতা দেখানোর কারণেই সাংঘাতিকভাবে ঘটনাটি এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

দ্বীনের দাওয়াত নিজস্ব গতিতে চলবে

এরপর আরও তীব্র হচ্ছে তিরস্কারের সুর। এমনকি শেষ পর্যন্ত চরম ধমকের সুরে বলা হয়েছে, তুমি কি ভেবেছো, ওই সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কারণে ইসলামের ইযযত বাড়বে, তাই না? না, কিছুতেই তা হবে না। এভাবে সম্বোধন করে এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝার জন্যে চিন্তা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তারপর এই দাওয়াতের মূল তাৎপর্য, এর মূল্যমান এবং এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে এটাও বলা হয়েছে যে, ইসলাম কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নয়। এ এক মহান দাওয়াত। কেউ সমর্থন করুক আর না করুক, ইসলাম আপোষহীনভাবে নিজ পথে চলবে। যে ইসলাম গ্রহণ করবে একমাত্র তার জন্যেই ইসলাম চিন্তা ভাবনার পথ খুলে রাখবে। যে এর স্বাদ গ্রহণ করতে চাইবে একমাত্র সে-ই এর উপকার লাভে ধন্য হবে– সমাজে তার মর্যাদা বা গুরুত্ব যাই-ই হোক না কেন। এরশাদ হচ্ছে–

'নিশ্চয়ই এ হচ্ছে এক উপদেশ, যার ইচ্ছা হয় সে একে গ্রহণ করুক। এ উপদেশসমূহ লিখিত রয়েছে সম্মানিত কেতাবে, যার মর্যাদা অতি উচ্চে। এ কেতাব অতি পবিত্র। এ কেতাব থাকে পাক-সাফ লোকদের হাতে, তারা সম্মানিত, তারা নেককার।'

মর্যাদাবান এ কেতাব, সকল বিবেচনায় তা নির্ভুল, এর পাতাগুলো পবিত্র এবং সম্মানিত। এ মহান কেতাব সেই নিবেদিতপ্রাণ নেতৃস্থানীয় বার্তাবাহক ফেরেশতাদের মাধ্যমে রসূলদের কাছে

পৌছানো হয়েছে, পৌছানো হয়েছে নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌছে দেয়ার জন্যে। এ কারণে সেই রসুলরাও সম্মানিত। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে সঠিক পথের খোঁজে যারা হাতড়ে মরেছে, তাদের কাছেই ইসলামের দাওয়াত পৌছানো প্রয়োজন, যেন তারা এর থেকে জীবনের অমানিশায় সঠিক পথের সন্ধান পায়। সুতরাং এর থেকে সে-ই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে, যে এর মর্যাদা বুঝবে এবং এর মাধ্যমে পবিত্রতা লাভ করতে চাইবে।

এটিই আসল মানদণ্ড, এটা আল্লাহর নিজস্ব পরিমাপ যন্ত্র। এ পাল্লার দ্বারা সকল কাজ ও ব্যবহারের মূল্যায়ন করা যায় এবং সমস্ত মানুষকে এ দিয়ে পরীক্ষা করা যায়। এ কথাটিই এখানে আল্লাহ তায়ালা তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং এই মাপকাঠিতেই সব রকমের পরিবেশ পরিস্থিতিতে যে কোনো জিনিসই বিচার বিশ্লেষণ করা যায়।

এখন প্রশ্ন আসে, কোথায় এবং কখন এ ঘটনাটি ঘটেছিলো? ঘটনাস্থল ছিলো মক্কা নগরী। যেখানে ইসলামের দাওয়াত সকল দিক থেকে বাধা বিপত্তি প্রতিরোধ ও ষড়যন্ত্রের স্বীকার হচ্ছিলো। মুসলমানদের অবস্থা ছিলো অতি করুণ। সংখ্যায় তারা ছিলো নগণ্য। এ সময়ে মক্কার গোত্রপতিদের একটি দলকে খাতির করা এবং তাদের মন জয় করার চেষ্টা করাটা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে ছিলো না এবং একটু গভীরভাবে ভাবলে এটা বুঝা যায় যে, ওই দরিদ্র অন্ধ ব্যক্তির সাময়িক প্রতি অমনোযোগিতাও কোনো স্বার্থের কারণে ছিলো না।

কোনো ব্যক্তি বিশেষকে অবহেলা বা অবজ্ঞার যা-ই এখানে ঘটেছে তা ছিলো একমাত্র দাওয়াতী কাজের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে। এই মুল্যবোধের ভিত্তিতেই মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পরিমাপ করেন, তার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা কতোটুকু আছে বা আদৌ আছে কি না তা পরখ করেনেন। এই মূল্যবোধকে জীবনের কোনো পর্যায়ে বা কোনো অবস্থাতে উপেক্ষা করা যেতে পারে না। কারণ এর ওপরই ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা এবং মানবমন্ডলীর জন্যে ইসলামের কল্যাণকামিতা নির্ভর করছে। এই মূল্যবোধের ওপরই এর মর্যাদা, এর শক্তি এবং সকল দিক ও বিভাগ থেকে এর প্রতি সমর্থন ও বাস্তব সাহায্য নির্ভর করে।

ইসলামী সমাজের প্রাণ

ওপরে বর্ণিত এই বিচ্ছিন্ন ঘটনার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান হচ্ছে সেই আসল কথাটি যাকে বলা যায় ইসলামর প্রাণ। তা হচ্ছে, মানুষকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সকল সাহায্য সহযোগিতা, গৌরব, শক্তি সামর্থ্য, একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। পার্থিব কোনো উপায় উপাদান থেকে তা আসতে পারে না। সাঁময়িকভাবে কোনোটি মূল্যবান হলেও তা নিছক সাময়িক। এই কথাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কোরআনে ঘোষিত হয়েছে,

'অবশ্যই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সব থেকে বেশী সম্মানিত, যে সব থেকে বেশী আল্লাহকে ভয় করে চলে'।

আর এটা নিশ্চিত যে, যার মধ্যে ওই তাকওয়ার গুণটি আছে, সে-ই বেশী মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য। তার দিকেই বেশী খেয়াল দেয়া কর্তব্য এবং তার প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টাই আগে করা উচিত।

যদিও তার মধ্যে অন্যান্য গুণ, যোগ্যতা, ধনসম্পদ, বংশীয় মর্যাদা, শক্তি সামর্থ বা সামাজিক তেমন কোনো পরিচিতি না থাকে। আল্লাহর কাছে এমন মানুষের কোনো মূল্যই নেই যার মধ্যে ঈমান, তাকওয়া ও পরহেযগারীর গুণ নেই। যে যোগ্যতা আল্লাহর কাছে স্বীকৃতি পাবে তা হচ্ছে ঈমান, তাকওয়া বা পরহেযগারী। আলোচ্য এই সূরাটির মধ্যে এই মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই

আল্লাহ তায়ালা তুলে ধরেছেন এবং ওই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটির বর্ণনার মাধ্যমে এই মূল সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

আল্লাহ রব্বুল ইযযত যেভাবে এ বিষয়টি উল্লেখ করে ইসলামের মূল শিক্ষাটি তুলে ধরেছেন এবং কঠোরভাবে তিরস্কার করে যে কঠিন সত্যটিকে তার সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাতে রসূলুল্লাহ (স.) গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি ভীষণভাবে চমকে উঠেছেন। এরপর তিনি নিজের জীবনে ও গোটা মুসলিম সমাজে এই মহা সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন।

এ ব্যাপারে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিলো এই যে, এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তাঁকে যে শিক্ষা দেয়া হলো এবং যে কঠোর তিরস্কার করা হলো তা ঘোষণার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেয়া। প্রকৃতপক্ষে, ঘোষণাটি ছিলো বড়ই চমকপ্রদ। একমাত্র আল্লাহর রসূলের পক্ষেই এই কঠিন তিরস্কারের কথা জনসাধারণের সামনে ঘোষণা করা সম্ভব ছিলো। একজন রসূল ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের পক্ষে এভাবে নিজের এই সাময়িক দুর্বলতা ও ত্রুটির কথা প্রকাশ করার চিন্তাই করা যায় না। অবশ্যই এ এক চরম সত্য যে, একমাত্র রসূলই পারেন অকপটে নিজের দুর্বলতাকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিতে। কারণ নবী রসূলের দুর্বলতাকেই আল্লাহ তায়ালা দূরীভূত করেছেন।

মানুষকে একথা জানানো হয়েছে, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কারণে তাকে এমন কড়াভাবে তিরস্কার করা হয়েছে– তাও শুধুমাত্র একটি পদস্খলনের কারণে, এটা কোনো সহজ ব্যাপার ছিলো না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য যে কোনো মহৎ ব্যক্তির জন্যে এটাই যথেষ্ট হতো যে, তিনি নিজের ত্রুটি বুঝে এবং স্বীকার করে এর পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সে জন্যে পরবর্তীতে সতর্ক থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন। কিন্তু এতোটুকু করেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হননি এবং একে যথেষ্টও মনে করেননি, বরং তাঁর ব্যবহার ছিলো অন্যরূপ। কোরায়শদের ওই সম্পদশালী, শক্তিমান ও অহংকারী লোকদের দলের প্রত্যেকের আসল চেহারা মুসলমানদের সেই চরম দুর্দিনে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরা, এটা কোনো চাট্টিখানি ব্যাপার ছিলো না। এ ছিলো এক চরম দুঃসাহস।

এমন সাহসিকতার পরিচয় একমাত্র নবীর পক্ষেই দেয়া সম্ভব ছিলো তাঁর মনের মধ্যে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার অনুভূতি সদা জাগরূক ছিলো বলেই এটা সম্ভবপর হয়েছিলো। পরিস্থিতি সেখানে তো এই বিরাজ করছিলো যে, হাশেমের পুত্র আব্দুল মোত্তালেব, তার মৃত পুত্র আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদের মুখ দিয়ে ওই সম্ভ্রান্ত কোরায়শ নেতাদের সম্পর্কে অমন বিরূপ মন্তব্য ছিলো তাদের জন্যে চরম অসহনীয় এবং ক্ষমার অযোগ্য ঔদ্ধত্য! তারা বলতো আল্লাহর কেতাব কোরআন মক্কা-মদীনার কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির ওপর নাযিল হলো না কেন?

যদিও মোহাম্মদ (স.)-এর পূর্বপুরুষরা মক্কার নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে মোহাম্মদ তো কোনো রাষ্ট্রের কর্তা বা শাসক ছিলেন না, এটাই ছিলো তাদের প্রশ্নের মূল বিষয়। এ সমাজে এবং ওই কঠিন সময়ে এতো বড় কঠিন নীতিকে চালু করা একমাত্র ওহীর অধিকারী হওয়ার কারণেই রসূলুল্লাহর পক্ষে সম্ভব ছিলো। এটা পার্থিব কোনো শক্তি সামর্থের অবদান হতে পারে না।

গোটা সমাজের চরম বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে এতো দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের কঠিন নীতিগুলো চালু করার জন্যে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই ছিলো তাঁর সম্বল, আর এই সম্বলকে

অবলম্বন করেই নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই অবর্ণনীয় ও অব্যক্ত শক্তি অনুভব করতেন এবং সকল প্রকার বিরোধিতার মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে অবিচল হয়ে থাকার সাহস অনুভব করতেন। ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই নবী (স.) কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে অন্তরের মধ্যে এই প্রকার দৃঢ়তা ও শক্তি অনুভব করতেন।

এভাবে ওই সমাজের স্তরে স্তরে ইসলামী মূলনীতির যে শেকড় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম জাতিকে পৃথিবীতে মান-সম্ভ্রম নিয়ে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে, যে কোনো বড় থেকে বড় বিপদের মোকাবেলা করতে মানসিক শক্তি যুগিয়েছে। পৃথিবীর সব রকমের শক্তিকে উপেক্ষা করে ক্রমোন্নতির পথে তাকে এগিয়ে দিয়েছে। আর এ কারণেই বলা যায়, ইসলামের এই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ছিলো গোটা মানব জাতির জন্যে এক পুনর্জন্মের শামিল। সত্য বলতে কি, প্রথম মানুষ সৃষ্টির থেকেও এ পুনর্জাগরণ ছিলো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সংস্পর্শে এসে তৎকালীন আরবের মানুষ পার্থিব সম্পর্ক, মান সম্ভ্রমের নীতি ও উঁচু নীচুর ব্যবধান থেকে মুক্তি লাভ করে।

অপরদিকে আখেরাতকেন্দ্রিক জীবনধারা গড়ে ওঠার কারণে সমাজে মানুষের মূল্যায়নের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় যা দুনিয়ার চিন্তা চেতনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবশ্য মূল্যায়নের এ নতুন ধারা তৎকালীন নিগৃহীত মানবমন্ডলীর সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এবং প্রায় সকল মহলের কাছে ক্রমান্বয়ে এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলো। এ সময় এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেলো যাকে কেন্দ্র করে নবী মোহাম্মদ (স.)-কে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো। এই সতর্কীকরণের মাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণের বিবেকও সমধিক জাগ্রত হয়ে গেলো। সাথে সাথে গোটা মুসলিম সমাজ কিসের ভিত্তিতে মানুষের কদর হওয়া উচিত, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট এক দিক নিদের্শনা পেয়ে গেলো।

সম্ভবত মানবতার এই পুনর্জন্মের তাৎপর্য আমরাই ভালো করে বুঝতে পারবো না। কারণ যে সমাজে আমরা বাস করি, সেখানে মানুষের মান সম্ভ্রমের মানদন্ড অন্য কিছু। এ সমাজে মানুষের ঐতিহ্য, মূল্যায়ন ও ব্যবহার বহুকাল ধরেই গড়ে উঠেছে। আমরা হঠাৎ করে সে বলয়ের বাইরে চলে আসতে পারি না বা সে চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তও হতে পারি না। তবে এখানে আমরা এই সত্যই উপলব্ধি করছি যে, আমাদের সমাজে মানুষের মূল্যায়ন করা হয় তার সম্পদের ভিত্তিতে।

এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে বস্তুবাদের গোড়ার ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। বস্তুবাদের প্রবক্তারা বরাবরই ধনসম্পদের অধিকারী হওয়া-না হওয়ার ওপর মানুষকে মর্যাদা দিয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বস্তুবাদী সভ্যতায় মানুষের বিশ্বাস, সভ্যতা ও কৃষ্টি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, আইন কানুন, পরিচিতি, জীবন ও জগত সম্পর্কে এক বিশেষ ধ্যান ধারণা গড়ে উঠেছে। বস্তুবাদের এই উগ্র সভ্যতার মধ্যে ইসলামের আগমনে যে নতুন সভ্যতা ও ব্যবহার পদ্ধতি শুরু হলো এবং তৎকালীন সমাজের গোটা কাঠামোকে ভেংগে চুরে মানুষের দৃষ্টিভংগিতে আমুল পরিবর্তনের যে উত্তাল ঢেউ এলো– তা ছিলো ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ঢেউ, তা ছিলো রীতিমতো এক অত্যাশ্চার্য ব্যাপার। যাকে এক বিরাট মোজেযা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ ও ইসলাম

মানব সভ্যতার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা সবসময়ই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং অন্যান্য সকল দৃষ্টিভংগি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু তৎকালীন আরব পরিবেশ পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তন কোনো সরল ও সহজ ব্যাপার ছিলো না। মুসলমানদের

নিজেদের কাছেও প্রথম দিকে এই পরিবর্তন বড় কঠিন জিনিস বলে মনে হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই ঘটনার মাধ্যমে যে শিক্ষা পেলেন এবং যেভাবে তিনি প্রভাবিত হলেন, কোরআনে বর্ণিত সেই মহান নীতিকে তিনি তাঁর নিজের ব্যবহার ও বাস্তব কাজকর্মের দ্বারা তাঁর সংগী সাথীদের মধ্যে ও সমাজের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর নতুন লাগানো এই মূলনীতির চারাগাছটির পরিচর্যা করেছেন, একে সযত্নে গড়ে তুলেছেন।

অবশেষে এই মহান নীতি সমাজের গভীরে শেকড় গাড়তে এবং শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে তার ছায়াতলে বহু যুগ ধরে গোটা মুসলিম সমাজকে আশ্রয়দানে সমর্থ হয়েছে, যদিও একে উৎখাত করার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলরা যুগ যুগ ধরে বহু অপচেষ্টা চালিয়েছে।

এ ঘটনার পর থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে দেখলেই অত্যন্ত হৃদয়াবেগ নিয়ে অভিনন্দন জানাতেন এবং মুচকি হেসে সম্বোধন করে বলতেন, স্বাগতম বন্ধু হে আমার, বন্ধু তোমার খাতিরেই আল্লাহ তায়ালা আমাকে দারুণভাবে তিরস্কার করেছেন। মদীনায় হিজরত করার পর দু'দু'বার তিনি তাকে নিজের অনুপস্থিতিতে মদীনার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেছেন।

তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ভেদাভেদ ও উঁচু-নীচুর এই কৃত্রিম ব্যবধানকে খতম করার মানসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজ ফুফাতো বোন আসাদ গোত্রের যয়নাব বিনতে জাহশকে তাঁর আযাদ করা ক্রীতদাস হারেসার পুত্র যায়েদের সাথে বিয়ে দেন। যদিও বিবাহ ব্যাপারটা বড় নাযুক জিনিস এবং বিশেষ করে আরব দেশের সেই সমাজে সামাজিক ভেদাভেদের অবস্থা ছিলো আরও বেশী কঠিন। হিজরতের প্রথম যুগে রসূলুল্লাহ (স.) মদীনায় আগমনের পর মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করতে গিয়ে তাঁর নিজ চাচা হামযা (রা.)-এর সাথে তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলেন। ভাই ভাই বন্ধনে আবদ্ধ করলেন খালেদ ইবনে রোয়ায়হা আল খাসআমী ও বেলাল ইবনে রাবাহকে।

এরপর তিনি মুতার কঠিন রণক্ষেত্রে যায়েদকে সেনাপতি বানিয়ে পাঠালেন। এ যুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে যে তিন জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছিলো তাদের প্রথম জন ছিলেন যায়েদ (রা.)। (প্রকাশ থাকে যে, এক জনের শাহাদাতের পর পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনের দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলায় নামাংকিত ওই ব্যক্তিরা স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে, তারা অচিরেই শহীদ হয়ে যাবেন। অবশ্য এতে নিবেদিতপ্রাণ ওই মোজাহেদদের মধ্যে এতোটুকু ভাবান্তর ঘটেনি)। তৎকালীন বৃহত্তম শক্তি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত আনসার ও মোহাজেরীনের সম্মিলিত তিন হাজার মোজাহেদের এই ছোট্ট দলের পরিচালনা ভারের প্রথম দায়িত্ব দেয়া হলো যায়েদকে। তার অবর্তমানে পতাকা তুলে নেবেন জাফর ইবনে আবি তালেব এবং তিনি না থাকলে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রাওয়াহা এ দায়িত্ব পালন করবেন।

এ দলের মধ্যে মহাবীর খালিদ ইবনে ওলীদও ছিলেন। তবু প্রথম দায়িত্ব দেয়া হলো একজন মুক্ত ক্রীতদাসকে, এটা করা হয়েছিলো শুধুই সামাজিক ছোট বড় ভেদাভেদকে তুলে দেয়ার উদ্দেশ্যে। একবার কল্পনার চোখে তাকিয়ে দেখুন সে মহান ছোট্ট দলটির দিকে। অগ্রভাগে পতাকা হাতে রসূলুল্লাহ (স.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত যায়েদ, সংগে চলেছেন আনসার মোহাজেরদের বড় বড় নেতারা। কোন সে পরশমনি যার সংস্পর্শে এসে উচ্ছৃংখল দুর্ধর্ষ ও অনমনীয় আরব শার্দুলরা এমন ভারসাম্যপূর্ণ ও অনুগত হয়ে গেলো। কোন সে মহান বাণী ছিলো এটি; যার

সংস্পর্শে দুর্দম্য সামাজিক ব্যবধানের খোলস এভাবে খান খান হয়ে ভেংগে গেলো। যে সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সকল নবীর আগমন, যে সত্যের অনির্বাণ শিখা জ্বালাতে গিয়ে রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালাও অত্যন্ত আপন পেয়ারা হাবীবকে কঠিনভাবে ধমক দিলেন আল্লাহর কাছে ওই বিষয়টির গুরুত্ব কতো বেশী ছিলো তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য!

এই ছোট্ট মহান দলটিকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে স্বয়ং আল্লাহর রসূল মৃদু মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছেন। এই তো সেই যুদ্ধ, রসূলের নেতৃত্বে পরিচালিত মোজাহেদ দলের যুদ্ধ, এতে আল্লাহর রসূল নিজে ময়দানে শরীক না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর সরাসরি নিয়ন্ত্রনে এ দলটি এগিয়ে গিয়েছিলো এবং তারা সারাক্ষণই তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিলো। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তিনি পর পর তিনজন কমান্ডারের শাহাদাতের ঘোষণাও দিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর কী করতে হবে সে বিষয়ে মুসলিম বাহিনীর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করার হুকুমও দিয়ে দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধনীতি পার্থিব অন্যান্য যুদ্ধনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল পরিচালক, মোজাহেদদের আনুগত্য, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বিবেচনায় এবং যুদ্ধের ময়দানের সংকট নিরসনকল্পে বিশেষ ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ অধিকার দিতে পারেন, যেমন আল্লাহর রসূল সে রণক্ষেত্রের কিছু ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। সামাজিক দৃষ্টিভংগির মধ্যে এ পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে আল্লাহর রসূলের সর্বশেষ পদক্ষেপ ছিলো এই যায়েদের পুত্র ওসামাকে তৎকালীন শক্তিগর্বী রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে সেনাপতি বানিয়ে পাঠানো। যাকে বলা হয়েছে, 'গাযওয়ায়ে রোম'। এতে শরীক ছিলেন রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রধান দুই সংগী ও মন্ত্রণাদাতা, যারা পরবর্তীকালে মুসলমানদের সম্মিলিত রায়ে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই দু'জন ছিলেন আবু বকর ও ওমর (রা.)। এদের সাথে ছিলেন মোহাজের ও আনসারদের বিরাট একটি সংখ্যা। ওসামার নেতৃত্বে পরিচালিত ওই দলে আরও ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একান্ত কাছের সংগী ও একেবারে গোড়ার দিককার ইসলাম গ্রহণ করা সাহাবা সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস। যেহেতু ওসামা ছিলেন সে সময় একেবারেই একজন তরুণ যুবক, তাই এই দলটি রওয়ানা হওয়ার সময় কোনো কোনো সাহাবার মধ্যে কিছুটা অস্বস্তি ভাব পরিলক্ষিত হয়।

দেখুন এই যুবক সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-বলেন, স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পাঠাচ্ছেন এক বাহিনীকে, বাহিনীর সেনাপ্রধান নিয়োগ করেছেন নওজোয়ান ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে, এতে কোনো কোনো ব্যক্তি তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছু সমালোচনা করলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কানে কথাটি পৌঁছুলে তিনি দুঃখের সাথে বললেন, 'তোমরা আজ ওসামার সমালোচনা করছো, এমনি করে এর পূর্বে একদিন তার বাপ যায়েদের বিরুদ্ধেও তোমরা নানা কথা বলেছিলে। অথচ শোনো! আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, তখন সেনাপতি পদের জন্যে আমার বিবেচনায় সে (যায়েদ) ছিলো সব থেকে বেশী যোগ্য এবং সকল মানুষের থেকে বেশী প্রিয়, আর আজ তার ছেলে এই যে তরুণ যুবক ওসামা আমার কাছে সকল মানুষ থেকে উত্তম।'

আবার যখন সালমান ফারসী (রা.) সম্পর্কে নানা প্রকার নিন্দনীয় কথা শুরু হলো, যখন আরব ও আজম বা আরবী ও ফারসী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিষ ছড়ানো হতে লাগলো, উস্কানি দেয়া হতে লাগলো মানুষের মনের মধ্যে, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সে সকল হীন মনোবৃত্তিকে চিরতরে খতম করার জন্যে এক সিদ্ধান্তকরী ঘোষণা দিলেন। বললেন,

'সালমান আমাদের লোক, সে আহলে বায়তের (নবী ঘরের) একজন সদস্য।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘোষণা সকল প্রকার বংশমর্যাদার গরিমাকে স্তব্ধ করে দিলো। এ ঘোষণা আরবের জাতীয়তাবাদ ও গোত্রীয়বাদের সমস্ত অহংকারকে ধ্বংস করে দিলো। এভাবে আহলে বায়তের লোক বলে আখ্যা দিয়ে তাকে তিনি আরবদের ওপর নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দিলেন।

একদিন আবু যর গেফারী ও বেলাল ইবনে আবি রাবাহের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিলে হঠাৎ করে আবু যর (রা.)-এর মুখ থেকে একটি অপ্রীতিকর কথা বেরিয়ে গেলো। তিনি বলে ফেললেন, 'ওহে কালো মায়ের ছেলে।' এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ভীষণভাবে রেগে তার মুখের ওপর কথাটি ছুড়ে মেরে বললেন, শোনো আবু যর, তুমি খুব বেশী রকম বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো। তোমার আমলনামার প্রতি আফসোস, তুমি নিজের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছো। তুমি নিজে তোমার আমলনামাকে কালিমালিপ্ত করেছো। জেনে রেখো তোমার মতো ফর্সা মায়ের সন্তানের জন্যে কালো মায়ের সন্তানের ওপর গৌরবান্বিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই হচ্ছে ইসলামের সঠিক মূল্যায়ন, যা মূর্খ সমাজের মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলামের দৃষ্টিতে সে-ই ভালো, যে আল্লাহর দৃষ্টিতে ভালো। দুনিয়ার কোনো কিছুর কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করাই হচ্ছে জাহেলিয়াত বা নিদারুণ মূর্খতা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই কঠোর সতর্কবাণী আবু যর (রা.)-এর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। তিনি ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলেন এবং মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে কসম খেয়ে এই বলে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, বেলাল (রা.) নিজে তার মাথা পদদলিত না করা পর্যন্ত তিনি আর মাথা তুলবেন না। এভাবে তিনি তার কঠিন অপরাধ স্খলনের প্রায়েশ্চিত্ত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন।

হযরত বেলাল (রা.) আল্লাহর দরবারে বহু উঁচু সম্মান লাভ করেছিলেন। সমাজেও তিনি ছিলেন বেশ সম্মানী লোক। সাধারণভাবে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। তার মর্যাদার পরিমাপ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে, দুনিয়ার বিবেচনায় যদি নাও হয়ে থাকে তাতে কিছু আসে যায় না। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদিন বেলাল (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে বেলাল, কোন সে ভালো কাজ তুমি ইসলাম গ্রহণ করার পর করেছো যার কারণে আমি তোমাকে গত রাতে এক ভাগ্যবান ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পেলাম। আমি গত রাতে জান্নাতের সামনে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেলাম! তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করার পর তেমন কোনো ভালো কাজ করেছি বলে মনে পড়ে না, যার কারণে আমি বিশেষ কোনো মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী হওয়ার আশা করতে পারি। তবে, এটুকু আমার মনে পড়ে যে, দিনে রাতে যখনই আমি ওযু করেছি, তখনই আমি কিছু নফল নামায আদায় করেছি।(১)

আর একটি হাদীসে জানা যায়, একদিন হযরত ইবনে ইয়াসের এবং হযরত আম্মার (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, হাঁ, স্বাগত জানাই পবিত্র ও উত্তম আম্মারকে।(২) আরও এরশাদ হয়েছে, আম্মারের গোটা শরীর এমনকি তার মাথার চুলের আগা পর্যন্ত- সে পবিত্রতার এক প্রতিমূর্তি।(৩) হযরত হোযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধুমাখা বাণী উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেছেন, জানি না আমি আর কতোদিন তোমাদের মাঝে আছি। আমার পরে এ ব্যক্তিদের

---

(১) বোখারী ও মুসলিম. (২) তিরমিযি. (৩) নাসায়ী।

আনুগত্য করো। একথা বলে তিনি হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমরে (রা.)-র দিকে ইশারা করলেন। এরপরে বললেন, আম্মারদের দেখানো পথে চলবে, আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তোমাদের কাছে যে হাদীস বলবে, তা সত্য বলে গ্রহণ করো।(৪)

মদীনায় নতুন এসেছে এমন যে কোনো ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রা.)-কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাড়ীর মানুষ অর্থাৎ আহলে বায়তের একজন ভাবতো। হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ও আমার ভাই ইয়েমেন থেকে আসার পর বেশ কিছু দিন ধরে ইবনে মাসউদ (রা.) ও তাঁর মাকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে কাছে দেখতাম এবং প্রায় সব সময়েই তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে আসা যাওয়া করতেন।(৫)

জুলাইবীব ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। এক আনসারী মহিলার সাথে তার বিয়ের জন্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেই প্রস্তাব পাঠান। এতে ওই মহিলার বাপ-মা অস্বীকার করলে মহিলা বললেন, আপনারা কি আল্লাহর রসূল (স.)-এর প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন? তিনি যদি খুশী মনে ওই ব্যক্তির সাথে আপনাদের আত্মীয়তা করার জন্যে রাযি হয়ে থাকেন তাহলে আপনারাও খুশী মনে রাযি হয়ে যান এবং ওই ব্যক্তির সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন। তখন তারা রাযি হলেন এবং সেই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিলেন।(৬)

জুলাইবীব এ বিয়ের অল্প দিন পরে এক যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। এ বিষয়ে হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রা.)-এর বর্ণনা পাওয়া যায়, যাতে তিনি বলেছেন তিনি একটি যুদ্ধে শরীক হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে খুঁজতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কাউকে কি তোমরা খুঁজে পাচ্ছো না? সাহাবারা বললেন, হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ অমুক অমুক ব্যক্তিকে পাওয়া যাচ্ছে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আবারও বললেন, আর কেউ কি হারিয়েছে? উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন, জ্বি না ইয়া রসূলাল্লাহ, আর কেউ হারিয়ে যায়নি। তখন রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কিন্তু আমি তো জুলাইবীবকে খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর সবাই তার অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সাতটি মৃতদেহের কাছে তার লাশটিও পাওয়া গেলো। ওদেরকে হত্যা করার পর তিনি নিজেই শহীদ হয়েছেন। তখন নবী (স.) নিজে তার লাশের কাছে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বললেন, 'সে সাতজনকে হত্যা করার পর ওরা তাকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে, সে আমার পরিবারের লোক, আমিও তার পরিবারের একজন।'

তারপর রসূলুল্লাহ (স.) তাকে নিজের দু'হাতের ওপর তুলে নিলেন। তাকে কবরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দু'টি হাত ব্যতীত কোনো খাটিয়া ব্যবহার করা হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, জুলাইবীব কবর খোঁড়া হলো এবং রসূলুল্লাহ (স.) নিজ হাতে তার লাশ কবরে রাখলেন। অবশ্য তাঁকে গোসল দেয়া হয়েছে কিনা তা বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি।(৭)

মানবতার পুনর্জন্ম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ (স.)-এর পরিচালনায় নীতি নৈতিকতার এই নব মূল্যায়নের মাধ্যমে মানুষের পুনরুজ্জীবন লাভের কাজ এক অভিনব উপায়ে সম্পন্ন হলো এবং এভাবে সমাজের লোকেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে সঠিক মূল্য পেলো। তারা মুক্তি

(৪) তিরমিযি। (৫) বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযি। (৬) মোসনাদে ইমাম আহমাদ ও আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। (৭) মুসলিম-এ বর্ণিত

পেলো দুনিয়ার পারিপার্শ্বিকতার নানা প্রকার নিয়ন্ত্রণ থেকে। এটা ছিলো ইসলামের অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এই মহা আশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হওয়া আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব ছিলো না। আর যে ঘটনা কেন্দ্র করে এই কথাগুলো নাযিল হয়েছে এটাই প্রমাণ করে যে, এ জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং যার মাধ্যমে তা এসেছে তিনি অবশ্যই একজন রসূল।

এ কাজের জন্যে আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় আগত আর একটি জিনিস হলো রসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তেকালের পরে প্রথম ও দ্বিতীয় বিচক্ষণ ব্যক্তির পর পর দায়িত্ব গ্রহণ। এরা রসূল (স.) প্রদর্শিত পথে চলার ব্যাপারে ছিলেন সব থেকে বেশী অনমনীয়।

এদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা ছিলো যেমন গভীর, তেমনই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণ করে অন্যায় কাজগুলোকে বর্জন ও ন্যায় পরায়নতার পথ অবলম্বন করার ব্যাপারে এরাই ছিলেন সব থেকে বেশী দৃঢ়সংকল্প।

একই আদর্শে আবু বকর (রা.)

রোম সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চালিত অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব আবু বকর (রা.) গ্রহণ করেন এবং সঠিকভাবেই তিনি তা পালন করেন। তাই দেখা যায়, খেলাফতের পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর প্রথম যে কাজটি তিনি করেন তা ছিলো ওসামাকে সেনাপতি বানিয়ে যে বাহিনীকে প্রেরণের জন্যে আল্লাহর রসূল (স.) প্রস্তুত করেছিলেন সেই বাহিনীকে রওয়ানা করিয়ে দেয়া। এই বাহিনীকে বিদায় দিতে গিয়ে তিনি মদীনার বাইরে বেশকিছু দুর পর্যন্ত এগিয়ে যান। তাকিয়ে দেখুন সেই বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে, ওসামা এগিয়ে চলেছেন সওয়ারীর পিঠে চড়ে আর মুসলিম বিশ্বের খলীফা চলেছেন তার পাশাপাশি পায়ে হেঁটে। লজ্জায় অস্থির হয়ে ওঠেন তরুণ ওসামা। তিনি নওজোয়ান হয়ে থাকবেন সওয়ারীতে, আর বৃদ্ধ আবু বকর পায়ে হেঁটে চলবেন তার সাথে– এ কী করে হয়! তাই অধীর হয়ে তিনি বলে উঠলেন, হে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি, হয় আপনি কোনো সওয়ারীতে আরোহণ করুন অথবা আমি নেমে পড়ি। জবাবে খলীফা কসম দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি নামবে না। আর আমিও সওয়ারীতে চড়বো না। আমার কি এমন অবস্থা হলো যে, আমি আল্লাহর পথে জেহাদের কাজে একটি ঘন্টাও দু'টি পায়ে ধুলো মাখাতে পারবো না?

দেখুন আর একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, আবু বকর (রা.) ভাবছেন খেলাফতের কাজে সাহায্য করার জন্যে ওমর (রা.)-কে তার প্রয়োজন, কিন্তু তিনি তো ওসামার বাহিনীর একজন সৈনিক। ওসামা তার আমীর। অতএব তাকে পেতে হলে ওসামার অনুমতি প্রয়োজন। তখন খলীফা বলছেন, আপনি যদি অপছন্দ না করেন, ওমরকে ছুটি দিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করবেন? কী বিনীত অনুরোধ। মুসলিম জগতের খলীফা হয়ে তিনি অনুমতি চাইছেন খেলাফতের কাজের জন্যে তারই অধীনস্থ একজন তরুণ সেনাপ্রধানের কাছে। এ ধরনের মহানুভবতা প্রদর্শন একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানীতে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। তারপর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সময় এগিয়ে চলে আর আমরা দেখতে পাই ওমর (রা.) খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে কুফার গভর্নর পদে নিয়োগ করছেন।

ওমর (রা.)-এর উদাহরণ

আর একটি দৃশ্য, হযরত ওমর (রা) যখন আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) কুফার গভর্ণর নিয়োগ করছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলো মুক্ত স্বাধীন সম্ভ্রান্ত কোরায়শ নেতৃবৃন্দের একটি দল অপেক্ষমান। যাদের মধ্যে রয়েছেন সোহায়ল ইবনে আমর ইবনুল হারেস ইবনে হিশাম এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারবও। তাদের সামনেই ওমর (রা.) কথা বলার অনুমতি দিচ্ছেন সোহায়ব ও বেলাল (রা.)-কে। কারণ এরা দু'জনই প্রথম দিককার ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি এবং বদরী সাহাবা। এই ব্যবহারে আবু সুফিয়ানের নাক রাগে ফুলে উঠলো। জাহেলী যুগের অনুভূতি নিয়েই সে বলে উঠলো, আজকের মতো এ রকম অবস্থা আমি আর কখনো দেখিনি। আমাদেরকে বাদ দিয়ে এই ক্রীতদাসদের মতামত নেয়া হচ্ছে, আর আমরা সেখানে দরজায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে! ওমর (রা.) জবাবে বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের চেহারায় অসন্তোষবহ্নি দেখতে পাচ্ছি। তোমরা যদি ভয়ানক রেগে গিয়ে থাকো তো এ রাগ তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই হওয়া উচিত। সমগ্র জাতিকে যখন ইসলামের দিকে আহবান জানানো হয়েছে, তখন তোমাদেরকেও আহবান জানানো হয়েছিলো। সে সময় তারাই দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করলো, কিন্তু তোমরা দেরী করলে। কেয়ামতের দিন ওদেরকে যখন ডাকা হবে এবং তোমাদেরকে পরিত্যাগ করা হবে, তখন তোমাদের কেমন লাগবে? (৮)

ওমর (রা.) তার নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে ওসামা ইবনে যায়েদকে গনীমতের মাল বেশী দিতেন। বেশ কয়েকবার এরকম দেখে অবশেষে একদিন আব্দুল্লাহ এই তারতম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করে বসলেন। জবাবে তিনি তাকে বললেন, হে আমার পুত্র, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে তোমার পিতার থেকে যায়েদ অধিক প্রিয় ছিলেন এবং তিনি ওসামাকে তোমার থেকে বেশী ভালোবাসতেন।(৯) হযরত ওমর (রা.) ভালোভাবেই জানতেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি কারণে ভালোবাসার এ তারতম্য করেছিলেন।

একবার ওমর (রা.) আম্মার (রা.)-কে খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর হিসাব নিকাশ নেয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। অথচ হযরত খালেদ ছিলেন মুসলিম বাহিনীর চির বিজয়ী বীর সেনানায়ক এবং অত্যন্ত সদ্বংশজাত ব্যক্তি। প্রশাসনিক কারণে তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগের তদন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। আম্মার (রা.) হযরত খালেদের নিজের পাগড়ি দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় জানা যায় জিজ্ঞাসাবাদের পুরো সময় খালেদ (রা.)-কে তার নিজের পাগড়ি দিয়ে হযরত আম্মার হাত বেঁধে রেখেছিলেন। অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হলে এবং তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হলে আম্মার (রা.) তার হাতের বাঁধন খুলে দেন এবং নিজ হাতে তার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেন।

এ ব্যবহারকে খালেদ (রা.) মোটেই আপত্তিকর মনে করেননি, কারণ তিনি জানতেন যে, ওই ব্যক্তি ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটতম সাথী হযরত আম্মার, যিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রথম সারির লোক এবং যাঁর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ওমর

(৮) 'আল আদালাতুল ইজতেমায়িয়াতু ফিল ইসলাম' নামক একটি বই থেকে।

(৯) তিরমিযি।

(রা.) বলেছেন, 'তিনি আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের আর এক নেতাকে মুক্ত করেছেন অর্থাৎ বেলালকে মুক্ত করেছেন।' এই বেলাল (রা.) উমাইয়া ইবনে খালফের গোলাম ছিলেন এবং সে তাকে বড় কঠোর নির্যাতন করতো। শেষ পর্যন্ত আবু বকর (রা.) তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন। আর তার সম্পর্কেই ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলছেন আমাদের নেতা আর একজন নেতা বেলালকে মুক্ত করেছেন।

ওমর (রা.) সেই ব্যক্তি, যিনি সালেম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন, আবু হোযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমি তাকে আমার পরে খলীফা হিসেবে মনোনীত করতাম। তিনি একদিকে একথা বলছেন, অপরদিকে ওসামাকে খলীফা মনোনীত করছেন না, আলীকেও করছেন না, তালহাকেও নয়, যোবায়েরকেও নয়, বরং তিনি তারপর খলীফা নির্বাচনের জন্যে দায়িত্ব দিচ্ছেন ছয়জন ব্যক্তির ওপর।

আরো কিছু ঘটনা

আবার আলী ইবনে আবু তালেব– আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মানিত করুন– তাঁর ব্যবহার দেখুন। আয়শা (রা.)-এর সাথে যে বিষয়টি নিয়ে সাময়িক টানাপড়েন চলছিলো– তা নিয়ে কুফাবাসীরা যাতে কোনো রকম বাড়াবাড়ি না করে, সে জন্যে যখন তিনি হযরত হাসান ও আম্মার (রা.)-কে কুফায় পাঠাচ্ছিলেন। তখন আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, 'অবশ্যই আমি জানি তিনি আমাদের নবী (স.)-এর স্ত্রী। দুনিয়াতে যেমন তিনি তাঁর স্ত্রী ছিলেন, আখেরাতেও তিনি তার স্ত্রী থাকবেন। তবু আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে এক বিরাট পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। তোমরা হয়তো এই ব্যক্তির আনুগত্য করবে, না হয় তার আনুগত্য করবে। (১০) উম্মুল মোমেনীন ও আবু বকর সিদ্দীকের কন্যা হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে তাঁর মুখের এই কথা লোকেরা খেয়াল করে শুনছিলো।

আর একটি ঘটনা: বেলাল ইবনে আবি রাবাহ তার দ্বীনী সম্পর্কের এক ভাই আবী রুয়ায়হা আল খাসয়ামীর বিয়ের জন্যে ইয়েমেনের এক এলাকায় প্রস্তাব দিতে চাইছেন। এ প্রসংগে তিনি বলছেন, দেখো আমি বেলাল ইবনে আবি রাবাহ, আর এটি হচ্ছে আমার ভাই আবু রুয়ায়হা। সে স্বভাব ও দ্বীনদারী উভয় দিক থেকেই খারাপ। এটা জেনেও তোমাদের গোত্রের মেয়ে তার সাথে বিয়ে দিতে যদি আপত্তি না থাকে তবে দিতে পারো, আর তোমরা রাযি না থাকলে সেটাও তোমাদের ব্যাপার।

দেখুন, তাদেরকে তিনি ধোকাও দিচ্ছেন না বা তার ব্যাপারে কোনো কথা গোপনও করছেন না। এটা উল্লেখ করছেন না যে, তিনি মধ্যস্থতাকারী, অথচ যা বলছেন সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে সে কথাও ভুলে যাচ্ছেন না। তাই তিনি স্পষ্ট করে যা সত্য তা-ই বলছেন। তার এই সত্যবাদিতায় তারা সন্তুষ্ট হয়ে তার ভাইকে তাদের গোত্রে শাদী করিয়ে দিলো। তারা ছিলো আরবের অন্যতম সম্ভ্রান্ত জনপদ, তাদের সাথে বিয়ে শাদীর মধ্যস্থতা করছে একজন মুক্ত নিগ্রো ক্রীতদাস, তবু তারা খুশী মনে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। গুণের কদরই আসল কদর, ইসলামী সমাজে ওই মহাসত্যটি মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং ওই সময়ের পর আরও বহু শতাব্দী ধরে তা প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। যদিও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি এসে

(১০) বোখারী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

গিয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এমন শিক্ষাই তারা পেয়েছিলেন যে, সামাজিক উঁচুনীচু, ছোট বড়, কৃত্রিম ভেদাভেদ ও বহুদিন থেকে চলে আসা আজমী-আরবীর পার্থক্য সব তারা ভুলে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এ কারণেই দেখা যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নাম নিতে গিয়ে তার সাথে তার মুক্ত ক্রীতদাস ইকরামার নামও নেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর প্রসংগ যখন এসেছে, তখন তার সাথে তার মুক্ত ক্রীতদাসের নামও উল্লেখ হয়েছে। আনাস ইবনে মালেকের নাম নিতে গিয়ে তার মুক্ত ক্রীতদাস ইবনে সীরীনের নামও নেয়া হয়েছে। আবু হোরায়রা (রা.)–এর নাম নিতে গিয়ে তার মুক্ত.ক্রীতদাস আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুজের নামও নেয়া হয়েছে। আবার দেখুন বসরাতে বাস করতেন হাসান আল বাসরী, মক্কায় ছিলেন মোজাহেদ ইবনে জারীর, আতা ইবনে আবী রাবাহ, তাউস ইবনে ফায়সাল।

এরা সবাই ছিলেন বড় বড় ফকীহ। মিসরে ছিলেন মশহুর তরুণ ফকীহ ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব। তিনি ছিলেন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সময়ে দেনকালার অধিবাসী একজন নিগ্রো ক্রীতদাস।(১১)

সম্মানের মাপকাঠী

আল্লাহ রব্বুল ইযযতের তরফ থেকে এবং তাঁর ইচ্ছাক্রমে মোত্তাকী পরহেযগার লোকদেরকে সম্মান দানের এই ভাবধারা ইসলামী সমাজে বরাবরই চালু থেকেছে। যদিও পার্থিব ধন সম্পদ থেকে তারা পুরোপুরি বঞ্চিত ছিলেন। দুনিয়ার বিবেচনায় যার যথেষ্ট মূল্য আছে এমনকি ওই সকল জিনিসের মূল্য তাদের নিজেদের কাছেও আছে এবং আশপাশের লোকদের কাছেও আছে। তবু সেসব কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্তেও ইসলামী সমাজে বরাবরই তাকওয়ার গুরুত্ব ছিলো সর্বাধিক। সাম্প্রতিককালে অবশ্য তাকওয়ার গুরুত্ব থেকে বস্তুগত জিনিসের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে, যেহেতু আজকের নব্য জাহেলী যুগে দুনিয়ার সর্বত্র বস্তুবাদী সভ্যতার ঢেউ খেলে যাচ্ছে এবং এখন পাশ্চাত্যে পরাশক্তির অধিকারী নেতৃস্থানীয় মহাদেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একজন মানুষকে পরিমাপ করা হয়, ব্যাংকে তার কি পরিমাণ পুঁজি আছে তার ভিত্তিতে। অপরদিকে প্রাচ্যের নেতৃস্থানীয় দেশ রাশিয়াতে বস্তুবাদিতা চরম রূপ নিয়েছে, সেখানে মানুষের মূল্য যন্ত্র থেকেও অনেক কম।(১২)

বর্তমানে নামধারী মুসলিম দেশেও আদিকালের জাহেলী মন মানসিকতা আচার আচরণ মহামারীর মতো ছেয়ে গেছে, অথচ এই জাহেলিয়াত দূর করার জন্যেই ইসলামের আগমন ঘটেছিলো। যার থেকে ইসলাম মানুষের মুক্তি ঘোষণা করেছে বহুকাল আগে সেই জাহেলী মতবাদ, যার মূলোৎপাটন করে ঈমান ও তাকওয়ার বীজ বপন করাই ছিলো ইসলামের লক্ষ্য, তা আজ পুনরুজ্জীবিত হয়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশেই জেঁকে বসেছে।

এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে একটিমাত্র আশার আলো দেখা যাচ্ছে। ইসলামী দাওয়াত যেভাবে সফলতা লাভ করছে তাতে হয়তো অচিরেই আর একবার দুস্থ মানবতা জাহেলিয়াতের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করার এবং একবার যেমন মানবতার পুনরুজ্জীবন সংঘটিত হয়েছিলো এই নতুন আন্দোলনের হাতে। আশা করা যায় মানবতা পুনরায় তার সেই হৃত গৌরব ফিরে পাবে, ফিরে পাবে হয়তো সেই অবস্থা যার ঘোষণা এই সূরার শুরুতে চূড়ান্তভাবে দেয়া হয়েছে।

---

(১১) আবদুল হালীম আনজুনদীর কাছে আবু হানীফার লিখিত একটি পত্র থেকে।

(১২) এটা কমিউনিষ্ট শাসিত রাশিয়ার কথা।

আলোচ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় ওই মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো সূরার সূচনাতে আলোচনার লক্ষ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে যে, মানুষ জেনে বুঝে কেমন করে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে, ঈমান আনার ব্যাপারে উদাসিনতা দেখাচ্ছে এবং তার আসল মনীবের দিকে যখন তাকে ডাকা হচ্ছে তখন সে মুর্খের মতো অহংকার দেখাচ্ছে! এ অধ্যায়ের আলোচনায় মানুষের বিরোধিতাপূর্ণ অন্যান্য কাজের সাথে সাথে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার প্রতি তার অবিশ্বাস সম্পর্কেও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। কিসের থেকে তার অস্তিত্ব দুনিয়ায় এলো এবং কিভাবে সে বেড়ে উঠলো তা সে মোটেই চিন্তা করে না! দেখে না সে আল্লাহর মেহেরবানীকে। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে ও আখেরাতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই যে তার ওপর কর্তৃত্ব করছেন, অন্য কারো কোনো ক্ষমতা কোথাও নেই, সে বিষয়েও সে চিন্তা করে না। যিনি তাকে পয়দা করেছেন, খাদ্য-পানীয় দান করছেন এবং যার কাছে তাকে হিসেব দিতে হবে তার প্রতি এতোটুকু কৃতজ্ঞতাও তার নেই।

মানব সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়

এরশাদ হচ্ছে–

ধ্বংস হোক মানুষ, কতো অকৃতজ্ঞ সে! কোন সে বস্তু থেকে ....কিন্তু কিছুতেই সে কোনো প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেনি এবং তাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাও পালন করেনি।'

নিহত হোক মানুষ! তার অদ্ভূত ও যুক্তিহীন ব্যবহারের কারণে। তাকে হত্যা করাটাই ছিলো উচিত সাজা এবং ওটাই তার সঠিক প্রাপ্য। বাক্যের ধরণটাই অত্যন্ত ভয়ানক, যা মনের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে। এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জঘন্য ও নিন্দনীয় ব্যবহার এবং তার ফল কী হতে পারে সেই দিকে ইংগিত করেছেন। কতো অকৃতজ্ঞ সে অর্থাৎ তার অস্বীকৃতি, অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং আল্লাহ তায়ালাই যে তার লালন-পালন ও শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছেন, তা মানতে না চাওয়া যে কি চরম অকৃতজ্ঞতা তা ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। এ সকল বিষয়ের দিকে সে যদি এতোটুকু দৃষ্টিপাত করতো, তাহলে তার সৃষ্টিকর্তার শোকর না করে সে পারতো না, বরং দুনিয়াতে সে বিনয়ী হয়ে থাকতো এবং সদা সর্বদা আখেরাতকে স্মরণ করে চলতো।

যদি সে এটা না করে তাহলে সে বলুক, কোন্ জিনিসের বড়াই সে করে। কী নিয়ে সে উদাসীন হয় ও প্রকৃত সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। তার মূল্যই বা কি এবং শুরুই বা হয়েছে কিসের থেকে? কোন্ জিনিস দিয়ে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন? যা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা অতি তুচ্ছ ও সামান্য জিনিস, প্রকৃতির দিক দিয়ে তা বড়োই তুচ্ছ। আল্লাহর ইচ্ছা ও মেহেরবানী ছাড়া সে জিনিসের কোনো মূল্যই নেই। একটি শুক্রবিন্দু দিয়ে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এক নির্দিষ্ট পরিমাপ মতো তাকে গঠন করেছেন।

এ এমন এক জিনিস যার কোনো মূল্যই নেই এবং এটা এমনই মৌলিক পদার্থ যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু এর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনিই এর মূল্য বানিয়েছেন, মূল্যায়ন করেছেন অপরূপ সৃষ্টি বৈচিত্র্য দিয়ে ও বিভিন্ন নির্দেশ দান করার মাধ্যম। একে তিনি সুগঠিত করেছেন। তার প্রদত্ত এক বিশেষ পরিমাপ ও ব্যবহারোপযোগী গঠন দান করে তাকে করেছেন সুসামঞ্জস্য। এভাবে তাকে এক সম্মানজনক ও সম্ভ্রান্ত সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন। আর এভাবেই তো সেই মোলায়েম

মাটি প্রকৃতিতে তাকে গড়ে তুলেছেন নম্র, ভদ্র ও রুচিশীল মেযাজের মানুষ করে। তারপর তাকেই তিনি মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। এতো মর্যাদাবান করেছেন যে, পৃথিবীর ভেতর ও বাইরের জিনিসগুলোকে তারই নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন।

তারপর তার জীবন পথকে করে দিয়েছেন অত্যন্ত সহজ। জীবনের পথকে সহজ ও সুগম করে দিয়েছেন তার জন্যে। অথবা সুগম করে দিয়েছেন তার জন্যে হেদায়াতের পথকে এবং যে পথে চলতে বলা হয়েছে সে পথে চলা তার জন্যে সহজ করে দেয়া হয়েছে। জীবন পথ-পরিক্রমা অথবা জীবন পথকে চিনতে পারা দুটো অর্থই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

অবশেষে এ জীবনের সফর শেষে যখন সকল প্রাণীকে অপরিহার্য পরিসমাপ্তিতে পৌঁছতে হবে, তখন তার কোনো ইচ্ছা প্রয়োগের এবং পলায়নের সুযোগ থাকবে না।

'তখন তিনি তাকে মৃত্যুদান করবেন এবং কবরস্থ করার ব্যবস্থা করবেন।'

সুতরাং, পরিসমাপ্তিতে তার অবস্থা তেমনই হবে যেমন ছিলো প্রথম অবস্থা। তার হাতের মধ্যেই তাকে পৌঁছতে হবে, যিনি তাকে জীবন দান করেছেন, আবার যখন চাইবেন তার জীবনাবসান ঘটাবেন। সাময়িকভাবে পৃথিবীর পেটের মধ্যে তার আবাসস্থল নির্ধারণ করেছেন। এটা তার জন্যে সম্মানজনক এক পন্থায় জীবনধারার সাময়িক বিরতিপর্ব। কারণ হিংস্র পশুর খোরাক হিসেবে পৃথিবীর পিঠের ওপর তাকে অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে না দিয়ে পৃথিবীর পেটের মধ্যে সুরক্ষিত করে রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই তার জন্যে অবশ্যই এক বিশেষ ব্যবস্থা। এটা আল্লাহর ব্যবস্থাপনার একটি অতি সুন্দর দিক। আবার যখন তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন পুনরায় তাকে জীবন দান করা হবে। পুনরায় জীবিত করা হবে তার হিসেব গ্রহণ করার জন্যে। তারপর যখন চাইবেন তাকে তুলবেন। তাকে একেবারে বেকার ছেড়ে দেয়া হবে না, বিনা হিসেবে বা কোনো প্রতিদান না দিয়ে, এমনি এমনি তাকে রেখে দেয়াও হবে না। এজন্যেই তার এই উদাসিনতার দিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে হিসেব দেয়ার জন্যে তাকে কোনো প্রস্তুতি নিতে দেখেছো কি? কিছুতেই না, যে নির্দেশ তাকে দেয়া হয়েছে সে তা পালন করেনি।

সাধারণভাবে সকল মানুষ, যে কোনো ব্যক্তি এবং সকল জনপদ, প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কেউই আল্লাহর সকল হুকুম যথাযথভাবে পালন করেনি বা করতে পারছে না। অবশ্যই কিছু না কিছু ক্রটি সে করেছে ও করছে। কখনোই সে তার দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেনি। তার সূচনা কিভাবে হলো এবং কিভাবে বা সে গড়ে উঠলো সে তা স্মরণ করেনি। এমনকি তাকে স্মরণ করানোর পরও সে তা বুঝতে চায়নি। তার সৃষ্টিকর্তার শোকরিয়া আদায় করেনি, যিনি তাকে পথ দেখালেন এবং তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করলেন তার প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি সে। তারপর সে যতোদিন বেঁচে আছে ততোদিনে পরকালের জন্যে কোনো প্রস্তুতিও নেয়নি, চিন্তা করেনি হিসাব দিবসে কী হিসাব সে দেবে। এ কথাটা গোটা মানব জাতির জন্যেই প্রযোজ্য। তারপরও বেশীর ভাগ মানুষই অহংকারপূর্ণভাবে আল্লাহর তরফ থেকে আসা পথনির্দেশনার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিয়েছে।

খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ভাবা প্রয়োজন

পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনার গতি ভিন্ন একটি প্রসংগের দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং তা হচ্ছে মানুষের প্রবৃদ্ধির প্রসংগ। একটু সন্ধানী দৃষ্টিকোণ নিয়ে কেন সে তাকায় না তার নিজের ও খাদ্যের

দিকে এবং তার গবাদিপশুর খাদ্যের দিকে? এদের বেঁচে থাকার জন্যে যে বিচিত্র ধরনের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করেছেন এ প্রসংগে সেগুলোরও উল্লেখ প্রয়োজন। তাই বলা হচ্ছে, তার খাদ্য খাবারের দিকে তার চিন্তাপূর্ণ ও উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরকার। এরশাদ হচ্ছে—

'কেমন করে আমি মুষলধারে পানি বর্ষণ করেছি, তারপর ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়েছি যমীনকে। তারপর তার মধ্যে জন্মিয়েছি খাদ্যশস্য, আঙুর, শাকসবজি, যায়তুন, খেজুর এবং ঘনসন্নিবেশিত বাগিচা, ফলমূল ও ঘাসপাতা, যা তোমাদের ও তোমাদের পোষা জানোয়ারদের প্রয়োজন মেটায়। এটা হচ্ছে মানুষের খাদ্য কাহিনী'।

পর্যায়ক্রমে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যাতে করে মানুষ এগুলো বুঝতে পারে। অতএব মানুষের এগুলো নিয়ে চিন্তা করা দরকার। এসব সৃষ্টির মধ্যে কারো কুদরতী হাতের নিয়ন্ত্রণ না থেকে কিভাবে পারে এগুলোর ব্যবস্থাপনায় কারো কোনো ভূমিকা কি কার্যকর নেই? একটু ভাবলে এটা সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সেই কুদরতি হাতই এগুলো সৃষ্টি করেছে, যে কুদরতি হাত মানুষ সৃষ্টি করেছে সুতরাং এগুলোর সৃষ্টি সমধিক বিস্ময়কর। তাই মানুষের চিন্তা করা দরকার তার খাদ্য সামগ্রী সম্পর্কে। এটা তার সব থেকে নিত্যসংগী নিকটতম দ্রব্য এবং এমন জিনিস যার সাথে তার সম্পর্ক সুনিবিড়। তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকানো দরকার সেই সহজ অথচ অতি জরুরী জিনিসের দিকে, যা তার জীবনে বারবার আসে।

এর সহজ সরল ও সহজলভ্যতার কারণে এর মধ্যে নিহিত বিস্ময়কর দিকটির কথা মানুষ প্রায়ই ভুলে যায়। বাস্তবে এটা তেমনই আশ্চর্যজনক যেমন তার সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি আশ্চর্যজনক তার প্রতিটি পদক্ষেপই সেই মহান সত্ত্বার নিয়ন্ত্রণে থাকে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন।

পানি জীবন ও উদ্ভিদের উন্মেষ

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'আমি মুষলধারে পানি বর্ষণ করেছি'। আসলে বৃষ্টি আকারে পানি বর্ষণ এমন একটি সত্য, যা প্রতিটি এলাকা, প্রতিটি পরিবেশের সকল মানুষই বুঝে, তা তার জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা যা-ই হোক না কেন। সুতরাং এখানে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার সকল শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করে কথাটি বলেছেন। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির সাথে সাথে মানুষ আরও তারা ব্যাপকভাবে এ কথাটির অর্থ বুঝবে। এর তাৎপর্য আরও গভীরভাবে তারা বুঝবে যা সাধারণ মানুষের নযরে হয়তো ধরা পড়ে না। আজকের মানুষ একথা সহজে বুঝতে পারে যে, মহাসাগরগুলো থেকে পানি বাষ্প আকারে উত্থিত হয়ে বাতাসের বিশেষ প্রক্রিয়ায় মেঘের আকার ধারণ করে এবং পরে বৃষ্টি আকারে নেমে আসে। এভাবে এটাও বুঝা সহজ যে, সাগরের পানি যা একসময় নীল আকাশে বিরাজমান ছিলো, তা মুষলধারে বৃষ্টি আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে বর্তমান সময়কার একজন মনীষীর মন্তব্য হচ্ছে, 'যদি এটা সঠিক হয়ে থাকে যে, পৃথিবী যখন সূর্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলো, তখন তার তাপ মাত্রা ছিলো প্রায় ১২,০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস, পৃথিবীর পৃষ্ঠের উত্তাপও ছিলো প্রায় একইরূপ, তাহলে এটাও ঠিক যে, পৃথিবীর সবকিছুই ছিলো একই প্রকার উত্তপ্ত এবং এর মধ্যকার সব কিছু ছিলো একটা থেকে অপরটি বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন। সুতরাং তার মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক যুক্ত পদার্থের অস্তিত্ব বর্তমান থাকা সম্ভব ছিলো না।

তারপর যখন পৃথিবী বা তার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অংশগুলো ধীরে ধীরে শীতল হতে শুরু করলো, তখন এই অংশগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে আমাদের জানা এই পৃথিবীর আকার ও রূপ ধারণ করলো। ৪,০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উত্তাপ না নেমে আসা পর্যন্ত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারে না। এই উত্তাপে নেমে আসার পরই ওই বস্তুকণাগুলো ছুটে এসে পরস্পর মিলিত হয়ে এ নতুন জিনিসের সৃষ্টি হয়। আমরা আজ পানি আকারে যা কিছু দেখছি তা সবই তখন বাতাসের আকারে বর্তমান ছিলো।

আজকের সকল সমুদ্র তখন পানি আকারে আকাশের মহাশূন্যতায় ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছিলো। পানি সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পারস্পরিক মিলনের পূর্বে বায়বীয় গ্যাস আকারে তা বর্তমান ছিলো। তারপর দীর্ঘদিন ধরে সে সব কিছু ঠান্ডা হয়ে পানিতে পরিণত হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে পৃথিবীতে নেমে আসতে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে পৌছানোর পূর্বেই পৃথিবী পৃষ্ঠের ভীষণ উত্তাপের কারণে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকতেই এগুলো গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। পরে একটি সময় আসে যখন এক ঝড়ো হাওয়া পৃথিবীর ওপর প্রবাহিত হয়ে পুনরায় তা বাষ্পের রূপ নেয়। এই সমুদ্রগুলো বাতাসের আকারে থাকাকালে ঠান্ডা হতে থাকার সাথে সাথে সীমাহীন ও কল্পনাতীত তীব্রতায় ঝড়োবন্যা আকারে সেখানে প্রবাহিত হয়। এ প্রবাহ কতোকাল চলতে থাকে তা বলা সম্ভব নয়।'(১৩)

যদিও কোরআনে বর্ণিত তথ্য ও এই বর্ণনার মধ্যে সুনিশ্চিত কোনো যোগসূত্র আছে বলে আমরা দাবী করি না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা পানি সৃষ্টি, বর্ষণ ও তা দিয়ে পৃথিবীবাসীর প্রয়োজন পূরণের যে ব্যাখ্যা দেয় তা বুঝা সহজ আর এ কারণে কোরআন ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সমন্বয়ে পানি সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা সঠিক বলে মনে হয়। অন্যান্য আরও কিছু ব্যাখ্যাও এখানে সেখানে দেয়া হয়েছে। অবশ্য কোরআন যে ব্যাখ্যাগুলোকে সমর্থন করে সেগুলোই সর্বযুগে এবং সকল সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে এসেছে।

খাদ্য সৃষ্টি ও তার প্রয়োগ প্রণালীর এই হচ্ছে এক বিস্ময়কর ইতিহাস।

'আমি বর্ষণ করেছি পানি প্রচুর পরিমাণে'। কেউ এ কথার দাবী করে না যে, সে পৃথিবীর কোনো এক পর্যায়ে বা কোনো কালে কোনো না কোনোভাবে পানি সৃষ্টি করেছে বা মানুষ ও জীবজন্তুকে খাদ্য সরবরাহ করার জন্যে পানি বর্ষণ করেছে।

'আর ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়েছি যমীনকে।'

এই পানি বর্ষণের ব্যাপারে কারো কোনো হাত আছে বলে দাবী করার মতো দুঃসাহস ইতিহাসে আজও পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেনি।

তারপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যমীন ফাটানোর দৃশ্য দেখাচ্ছেন এং পানি বর্ষণ করিয়ে এবং তা দিয়ে যমীনকে ভিজিয়ে গাছপালা, শাকসবজি, তরুলতা ও খাদ্যশস্য উৎপাদন করে মানুষ ও জীব জন্তুর প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক পাপিষ্ঠই নিজেকে রব বলে দাবী করেছে কিন্তু কেউই আজ পর্যন্ত এ বৃষ্টির পানি দ্বারা গাছপালা বৃদ্ধি ও হাওয়া বাতাস নিয়ন্ত্রণ এবং এসব কিছুর পারস্পরিক সহযোগিতায় পৃথিবীকে শস্য সম্ভারে ভরে দেয়ার দাবী করার

(১৩) Cressy Morison রচিত 'Man does not stand alone' পুস্তক থেকে, লন্ডন, ১৯৬২ p.p

মতো ঔদ্ধত্ব কেউ দেখিয়েছে বলে কোনো ইতিহাস নেই। কারণ এই দাবী করলে তাকে পাগল ছাড়া আর কিছু যে মানুষ বলবে না তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট।

অনাদিকাল থেকে মানুষ দেখে আসছে এবং এবং অনুধাবনও করছে যে, এগুলার কোনোটিরই ওপর কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই। সে দেখছে মাটির স্তরগুলো ভেদ করে ভেতরে পানি প্রবেশ করে। সে আরও দেখছে বীজ থেকে অংকুর গজিয়ে মাটির বুক চিরে আল্লাহর ইচ্ছাতে চারাগাছগুলো বেরিয়ে আসে। সে এটাও দেখছে, ভারি ও শক্ত যমীন থেকে অত্যন্ত নাযুক ও ক্ষীণ অংকুরের শুঁড় বেরিয়ে আসে, এসব কার ইচ্ছায়, কার ক্ষমতায়? একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা বলেই তা সম্ভব হয়। মানুষ চিন্তা করলে এর মধ্যে স্রষ্টারই ইচ্ছা ক্রিয়াশীল দেখতে পাবে। অনুভব করবে এই নাযুক ও সুচারু প্রতিটি অংকুর শীষে বিশ্বস্রষ্টার শক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ও গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে কোরআনের বর্ণিত এই তথ্য সম্পর্কে আরও অনেক নতুন জিনিস ধীরে ধীরে মানুষ জানতে পারবে।

যমীন ফেটে যাওয়ার ফলে শাকসবজি, গুল্মলতা ও গাছপালা উৎপাদনে এগুলো এতো বেশী সহায়ক হবে যার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। কোরআনে বর্ণিত এ কথাগুলো হয়তো এই বন্যায় প্লাবিত নতুন ভূমিস্তরের দিকে ইংগিত করছে যা বন্যাপ্লাবিত হওয়ার কারণে শতধা বিদীর্ণ হয় এবং পলিমাটির সংস্পর্শে এসে নতুন জীবন লাভ করে। ঝড়বাদল এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবর্তনে এগুলো শক্তি পায়, বিশেষ করে যখন পৃথিবীর উপরিভাগের শিলাস্তর ফেটে গিয়ে এক অভাবনীয় প্রক্রিয়ায় শক্তি সঞ্চয়ের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করে। একথাগুলো আধুনিক বিজ্ঞানীরা যদিও অনেক পরে জানতে পেরেছে কিন্তু আসমানী জ্ঞান থেকেঅনেক আগেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন।

ফলমূল উৎপাদন

সূর্যকিরণের ফলে হোক বা বন্যাপ্লাবনের ফলে হোক, শিলাপ্লাবনে শিলাগুলোর বিস্ফোরণে যখন বিবর্তন আসে তখনই সেখানে গাছপালাগুলোর বিভিন্নতা ও বৃদ্ধির প্রশ্ন আসে। এই তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনায় মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় গাছপালা, যা আল্লাহর রহমতে মাটি থেকে উৎপন্ন হয়, যা রং ও স্বাদ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে ছোটবড় নির্বিশেষে সবার প্রিয় ও সবার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম সেগুলোর প্রতি লক্ষ করার জন্যে মানুষদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে এই আলোচনার এই অবতারণা করা হয়েছে—

উৎপন্ন করেছি আমি খাদ্যশস্য, বীজ'। এ খাদ্যবীজ বা খাদ্যশস্য দ্বারা সে সব খাদ্য বুঝায় যা মানুষ ও জীবজন্তু খায় এবং যা থেকে তারা জীবন ধারনোপযোগী শক্তি ও সজীবতা লাভ করে। বেঁচে থাকার জন্যে যেমন এক প্রকার দানা বা খাদ্যশস্য প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শারীরিক প্রবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যে ফলমূল ও শাক সবজি যা মানুষকে সুন্দর এবং রোগমুক্ত থাকতে সাহায্য করে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

'আরও (উৎপন্ন করেছি) আংগুর'—

আংগুর এমন একটি ফল যার আকৃতি, রং, স্বাদ ও উপকারিতার কারণে সারা পৃথিবীতে এ ফল সর্বজন পরিচিত। শাকসবজির দ্বারা জীব জন্তু ও মানুষের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার শাকসবজিই বুঝায়, যার অভাবে মানুষ নানাবিধ রোগ ব্যধির শিকার হয়।

এগুলো টাটকা এবং তরতাজা অবস্থায় খাওয়াই নিয়ম। যেহেতু তরতাজা অবস্থায় এগুলো সবুজ শ্যামল থাকে। আর শ্যামলতাই চর্মরোগসহ আরও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সমর্থ। এগুলো শুধু মানুষের জন্যেই নয়, পশু পাখীর জন্যেও প্রয়োজন। এ জন্যেই সহজলভ্যতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং এ কারণেই দুনিয়ার সর্বত্র কিছু না কিছু শাকসবজির ব্যবস্থা মজুদ রাখা হয়েছে

'আরও উৎপন্ন করেছি যায়তুন ও খেজুর, ঘনসন্নিবেশিত বাগ-বাগিচা এবং ফলমূল ও ঘাসপাতা'।

সকল আরববাসীর কাছেই যায়তুন ও খেজুর সুপরিচিত। 'হাদীকা' শব্দটির বহুবচন 'হাদায়েক' অর্থাৎ বাগিচাসমূহ। যার দ্বারা বুঝায় প্রাচীর ঘেরা ফলবান গাছে ভরা বিস্তীর্ণ স্থান। 'গুলবা' শব্দটি একবচন, 'গুলবা'-উ' বহুবচন, এর দ্বারা বুঝায় এক বিরাট বাগিচা যা ঘন ঘন গাছে ভরা এবং 'ফাকেহাত' বলতে বুঝায় বাগিচাসমূহের মধ্যে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল। আর 'আব্বা' অর্থে বেশীর ভাগ লোক মনে করেন সেই সবুজ তরতাজা ঘাস, যা খেয়ে গবাদিপশু জীবন ধারণ করে। এ বিষয়েই ওমর (রা.) (নিজেকে অথবা কাউকে) জিজ্ঞাসা করার পর নিজের প্রতি রুষ্ট হয়ে কিছু কথা বলেছিলেন যা সূরা নাযেয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

যেসব ফল খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে ও জীবনের সজীবতা অনুভব করে, সেগুলোর মধ্যে যায়তুন ও খেজুর বিশেষভাবে কোরআনে উল্লেখ হয়েছে। হাদীসের ভাষায় ও কোরআনে যায়তুনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে বুঝা যায় যে, এতে খাদ্য ও ফল উভয়ের প্রয়োজনই মেটে। খেজুর সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, 'আজওয়া' বা উৎকৃষ্ট মানের ৭টি খেজুর খেলে এক বেলা খাবারের কাজ হয়। অর্থাৎ খাবারের মধ্যে যেমন কার্বোহাইড্রেটসহ তরিতরকারিজাত অন্যান্য আরও বহু উপাদান থাকে, ৭টি পুষ্ট খেজুরের মধ্যে সেগুলো তো আছেই আরও আছে ফলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য! ফল মূল ও সবুজ ঘাসপাতার উপকারিতা।

খাদ্য তালিকা দেয়ার পর এই সম্পূরক শব্দদ্বয় ব্যবহার করে জীবন ধারণের জন্যে এগুলোর অপরিহার্যতা ব্যক্ত করা হয়েছে। উল্লেখিত বস্তুগুলো দিয়ে মানুষ ও জীব জানোয়ারের জন্যে এক পরিপূর্ণ খাদ্য তালিকা যিনি দান করেছেন। মূলত তাঁর পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছে এ দুই ধরনের উপাদানসমৃদ্ধ জিনিস। এগুলোর সঠিক ব্যবহারে মানুষ জীবনধারণসহ রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ করার প্রচুর উপাদান পেতে পারে। এগুলোর ওপর গবেষণা চালালে মানুষ অচিরেই এমন কিছু হাসিল করতে পারবে যাতে সে চমৎকৃত হয়ে যাবে এবং অনেক অনেক কষ্ট থেকে সে নাজাত পাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এগুলোর ওপর গবেষণা অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। হাকিমী চিকিৎসা বিদ্যায়ও এগুলোর ওপর খুব বেশি গবেষণা হয়নি। যার কারণে বেশীর ভাগ মানুষই খাদ্য ও ফল মূলের সমন্বিত ব্যবহার না বুঝে ক্যামিক্যাল জাতীয় ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

এগুলো তো গেলো খাদ্য খাবারের কাহিনী। এগুলো সবই সেই মহান হাতের সৃষ্টি যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ সকল জিনিসের উৎপাদনে কোনো পর্যায়েই মানুষের নিজের কোনো হাত আছে বলে সে দাবী করতে পারে না। এমনকি যে বীজ ও শস্যদানা সে বপণ করে তাও সে নিজে তৈরী করেনি বা আবিষ্কারও করেনি। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এ বীজ ও খাদ্যদানা কিভাবে প্রথম আবিষ্কৃত হলো তা মানুষের ধ্যান-ধারণা ও বোধের সম্পূর্ণ অগম্য। একই যমীনে বিভিন্ন প্রকারের বীজ ও খাদ্যদানা বপণ করার পর একই পানি থেকে সেচ দেয়ার পরও দেখা যায় প্রতিটি দানা নিজ নিজ জাতের ফসল উৎপাদন করছে।

এ হচ্ছে সে মহান কীর্তিমান কুদরতী হাতের ক্রিয়া, যিনি প্রত্যেক ফসল ও ফলের বীজের মধ্যে নিজ নিজ জাতের ফসল ও ফল আনয়ন করার ক্ষমতা সুপ্ত রেখেছেন, যা উপযুক্ত পরিবেশ ও অনুকূল আবহাওয়া পেলে নিজ নিজ প্রকৃতিতে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এসব কিছু মানুষের জ্ঞান ও দৃষ্টির আলোকে কোন বীজটি জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে আর কোন্‌টি আসবে না তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা নয়। কোন প্রক্রিয়ায় সে সকল দানা অংকুরিত হবে তাও মানুষের সম্পূর্ণ অজানা। এর ওপর মানুষের কোনোই কর্তৃত্ব নেই।

এগুলো সবই আল্লাহর নিজস্ব সৃজন পদ্ধতির অবদান। মানুষের নিজেদের ও তাদের ঘরে পালিত পশুর কল্যাণ ও প্রয়োজ মেটানোর জন্যে এ সকল ব্যবস্থা।

কেয়ামতের কিছু চিত্র

একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ কল্যাণ অব্যাহত থাকবে, তারপর একদিন সব শেষ হয়ে যাবে। যতোদিন জীবন আছে ততোদিনের জন্যে এ সকল ভোগ সামগ্রী তোমাদেরকে আনন্দই দেবে। তারপর সকল ভোগ-বিলাসের পেছন পেছন আসবে আর একটি অবস্থা। সে সময়টি আসার পূর্বেই সে সময়ের জন্যে মানুষের চিন্তা করা দরকার। বলা হচ্ছে,

'যখন আসবে সেই মহা চিৎকারধ্বনি, সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে তার ভাই থেকে, মা থেকে, বাপ থেকে, জীবন সংগিনী থেকে এবং এমনকি আপন সন্তান থেকেও। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে সেদিন এমন এক আতংকজনক অবস্থা হবে যা সবকিছু থেকে তাকে উদাসীন করে দেবে। সেদিন কিছু চেহারা থাকবে উজ্জ্বল, হাসিখুশী এবং সুসংবাদের আনন্দে মাতোয়ারা, আর কিছু চেহারা থাকবে ধূলাবালিতে ঢাকা এবং কালিমালিপ্ত, তারাই হচ্ছে অস্বীকারকারী কাফের।'

এ অবস্থা আসার সাথে সাথে তার সম্ভোগ ও বিলাসিতার সমাপ্তি ঘটবে।' আর এই অবস্থাই তার দীর্ঘ ভাগ্যলিপি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। এই ভাগ্যলিপিতে মানুষের ক্রমোন্নতির পর্যায়গুলোও লিপিবদ্ধ রয়েছে। সূরার পরিশেষে যে দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে প্রথমদিকে বর্ণিত দৃশ্যের সাথে তা পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। যাতে বলা হয়েছে, কেউ এগিয়ে আসবে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় আর অনেকে আসবে ধূলোমলিন মুখ নিয়ে। এক দল হবে তারা– যারা ছিলো হেদায়াতের আলো থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। এই দুই দলকেই আল্লাহর ইনসাফের পাল্লায় মাপা হবে এবং আল্লাহর সামনে তাদের অবস্থা খুলে যাবে।

'সাখখাহ'-র অর্থ একটি আরবী প্রতিশব্দের কাছাকাছি যার অর্থ হচ্ছে ভীষণ এক কড়া শব্দ। যখন সে শব্দ উত্থিত হবে তখন তা কানের গভীরে প্রবেশ করে পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইবে এবং বাতাস চিরে এগিয়ে যাবে। ওই শিংগা থেকে উত্থিত বিকট শব্দ আমাদের সামনে সেই দৃশ্য তুলে ধরে যার বর্ণনা ওপরে এসেছে। অর্থাৎ মানুষ মানুষ থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন মানুষ তার ভাই, মা বাপ, স্ত্রী ও ছেলে থেকে পালাতে থাকবে। এরা সে সকল ব্যক্তি, যাদের মধ্যে পরস্পরের সাথে রয়েছে সাধারণ পরিস্থিতিতে এক অবিচ্ছেদ্য গভীর সম্পর্ক; কিন্তু এই ভয়ংকর গগণবিদারী শব্দ এ সমস্ত সম্পর্ককে পুরোপুরিভাবে কেটে দেবে এবং যাবতীয় আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করে ফেলবে।

এ দৃশ্যের মধ্যে মানসিক ভীতি হবে অত্যন্ত গভীর, যা মনকে এতো বেশী ভারাক্রান্ত করবে যে, আশপাশের সবকিছু থেকে সে অমনোযোগী হয়ে যাবে এবং সমস্ত মন ভয়ে বিহ্বল হয়ে যাবে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন অবস্থা নিয়ে অস্থির থাকবে। মানুষের চিন্তা তার মনকে এমনভাবে ছেয়ে রাখবে যে, আত্মরক্ষা করা বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করার মতো কোনো অবস্থাই তার থাকবে না। প্রত্যেকের এমন এক অবস্থা হবে, যা তাকে সবকিছু থেকে ভুলিয়ে দেবে। ওই সময়ে যে ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হবে, তা বুঝানোর জন্যে এখানে যে বর্ণনা এসেছে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং গভীর অর্থবোধক। এই কঠিন দিনে মন ও আত্মার ওপর যে বিষাদ ছেয়ে যাবে, তার বর্ণনা আরও সংক্ষেপে এবং আরও ব্যাপকভাবে দেয়ার মতো অন্য কোনো ভাষা নেই। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে এমন এক কঠিন অবস্থা আসবে, যা তাকে অন্যদের থেকে উদাসীন করে দেবে।(১৪)

সেই ভয়ানক দিনে যখন সেই মহা চিৎকারধ্বনি আসবে তখন ভয়াবহ আতংকের কারণে সমগ্র মানব সৃষ্টির একই অবস্থা হবে। তারপর আল্লাহর আদালতে বিচার অনুষ্ঠিত হবে প্রত্যেকের অবস্থা ও পরিণতি কী হবে তা স্থির হয়ে গেলে মোমেন ও কাফেরদের কার কি অবস্থা হবে, তা আবার পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে–

'কিছু সংখ্যক চেহারা সেদিন থাকবে উজ্জ্বল আভায় সমুজ্জ্বল, হাস্যোজ্জ্বল, সুসংবাদের খুশীতে মাতোয়ারা।'

এ চেহারাগুলো থাকবে সেদিন আনন্দভরা এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তিতে এতো উজ্জ্বল যে দেখলে মনে হবে সে চেহারাগুলোর ওপর উজ্জ্বল আলোর আভা পড়ে রয়েছে এবং ঝলমল করছে। নেককার ব্যক্তি তার পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার বুকভরা আশা নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির চেতনায় নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত থাকবে।

এই আনন্দের অনুভূতি কেয়ামতের ভয়ভীতি থেকে তাদের মনকে মুক্ত করে দেবে। যে নিদারুণ আতংক অপরাধীদেরকে একান্ত আপনজন থেকে গাফেল করে দেবে, মোমেনরা তার প্রভাবমুক্ত থেকে মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার সুসংবাদ প্রাপ্তির কারণে হাসি খুশীতে আনন্দোচ্ছল থাকবে। প্রকৃত অবস্থা এদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আর এ কারণেই তাদের চেহারা আনন্দে ঝলমল করে উঠবে। প্রথম দিকে যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তাদেরকে আপনজন থেকে উদাসীন হতে বাধ্য করবে, পরে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের সুসংবাদপ্রাপ্তির কারণে তাদের মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে।

আবার কিছু চেহারা থাকবে এমন– যেগুলোর ওপর হতাশা ও ব্যর্থতার ছাপ ফুটে উঠবে। দুঃখের গ্লানিতে সে মুখগুলো থাকবে কালিমালিপ্ত। এরা হলো সেই মহা অপরাধীর দল যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছিলো, অস্বীকার করেছিলো এই পরম সত্যকে।

এ দলের লোকদের চেহারায় দুঃখ ও আফসোসের গ্লানি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। হীনতা ও হৃদয়ের সংকীর্ণতার কালিমা তাদেরক আচ্ছন্ন করে রাখবে। এরা হবে সেই সব লোক, যারা তাদের পূর্বেকার সব কীর্তি সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারবে। সুতরাং তাদের জন্যে যে প্রতিদান নির্দিষ্ট রয়েছে তারা তার জন্যে অপেক্ষমান থাকবে। এরাই হচ্ছে অস্বীকারকারী কাফের। এরা

(১৪) 'মাশাহেদুল ক্বেয়ামাহ ফিল কোরআন'–নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

ভীষণ গুনাহগার, যারা আল্লাহকে সর্বশক্তিমান ও মুখাপেক্ষীহীন বলে বিশ্বাস করে নি এবং তিনি যে তাঁর মনোনীত রসূলদের মাধ্যমে মানুষকে সুপথ দেখানোর জন্যে কোনো পয়গাম পাঠিয়েছেন, তাও বিশ্বাস করে নি। তারা আল্লাহর সীমানা বা নিয়ন্ত্রণ লাইন থেকে বের হয়ে গেছে এবং তারা তাঁর নিষিদ্ধ জিনিসগুলো ও পরিত্যাগ করেনি। এরা শক্তভাবে ভুল পথ আঁকড়ে ধরেছে এবং গুনাহের কাজগুলোকে ছেড়ে দেয়নি। এসব পাপিষ্ঠদের মধ্যে এমন শ্রেণীও রয়েছে যারা যিদ করেই আল্লাহর নির্দেশগুলোকে কথা ও কাজের মাধ্যমে উপেক্ষা করেছে।

এ সকল কারণেই প্রত্যেক শ্রেণীর পরিণতি কি হবে তা তাদের চেহারায় পরিস্ফুট হয়ে থাকবে অর্থাৎ চেহারা দেখলেই তাদের চেনা যাবে। ওইসব লোকদের পরিণতি সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত প্রকাশভংগি বড়ই অভিনব। বলা হচ্ছে–

তাদের চোখগুলো স্থির হয়ে যাবে।

এই বর্ণনা-পরিক্রমায় আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছি যে, সূরার শুরুতে আলোচিত কথাগুলোর সাথে শেষের কথাগুলো পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। শুরুতে পাপপুণ্যের পরিমাপ করে প্রতিদান বা সাজা দেয়ার যুক্তি পেশ করা হয়েছে এবং পরিসমাপ্তিতে হিসাব গ্রহণের পর তার ফল কী দাঁড়াবে তার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে, আর এটা যথার্থ কথা যে, এ ছোট্ট সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বহু তথ্য একত্রে বর্ণনা করেছেন। বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্যে উপমা অনেক দৃশ্য পেশ করেছেন, দিয়েছেন বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার বিবরণ, এসব বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি এমন অভূতপূর্ব, হৃদয়গ্রাহী ও চমৎকার বর্ণনাভংগী ব্যবহার করেছেন, যা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষের হৃদয়ে দাগ কেটে যায়।

সূরা আত তাকওয়ীর

আয়াত ২৯ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْجِبَالُ
سُيِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا
الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝٨
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا
أَحْضَرَتْ ۝١٤ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦ وَاللَّيْلِ إِذَا
عَسْعَسَ ۝١٧ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে, ২. যখন তারাগুলো খসে পড়বে, ৩. যখন পর্বতমালাকে (আপন স্থান থেকে) সরিয়ে দেয়া হবে, ৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীকে (নিজের অবস্থার ওপর) ছেড়ে দেয়া হবে, ৫. যখন হিংস্র জন্তুগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে, ৬. যখন সাগরসমূহে আগুন প্রজ্বলিত করা হবে, ৭. যখন (কবর থেকে উত্থিত) প্রাণসমূহ (তাদের নিজ নিজ) দেহের সাথে জুড়ে দেয়া হবে, ৮. যখন (নির্মমভাবে গেড়ে ফেলা) সদ্যপ্রসূত মেয়েটি জিজ্ঞাসিত হবে, ৯. কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো, ১০. যখন আমলের নথিপত্র খোলা হবে, ১১. যখন আসমান খুলে দেয়া হবে, ১২. যখন জাহান্নাম প্রজ্বলিত করা হবে, ১৩. যখন জান্নাতকে (মানুষের) কাছে নিয়ে আসা হবে, ১৪. প্রত্যেক ব্যক্তিই (তখন) জানতে পারবে সে কি নিয়ে হাযির হয়েছে; ১৫. শপথ সেসব তারকাপুঞ্জের যা (চলতে চলতে) পেছনে সরে যায়, ১৬. (আবার) যা অদৃশ্য হয়ে যায়, ১৭. শপথ রাতের যখন তা নিশেষ হয়ে যায়, ১৮. (শপথ) সকাল বেলার যখন তা (দিনের আলোয়) নিশ্বাস নেয়, ১৯. এ কোরআন হচ্ছে একজন সম্মানিত (ও মর্যাদাসম্পন্ন) বাহকের (মাধ্যমে পৌঁছানো) বাণী,

ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم

بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ

بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا

ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن

يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

২০ সে বড়ো শক্তিশালী, আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছে তার অবস্থান (অনেক মর্যাদাপূর্ণ), ২১. যেখানে তাকে মান্য করা হয়, (অতপর) সে সেখানে গভীর আস্থাভাজনও; ২২. তোমাদের সাথী (কিন্তু) পাগল নয়, ২৩. সে তাকে স্বচ্ছ দিগন্তে দেখেছে, ২৪. অদৃশ্য জগতের ব্যাপারে তিনি কখনো কার্পণ্য করেন না, ২৫. এটা অভিশপ্ত শয়তানের কথাও নয়, ২৬. অতএব তোমরা (এর থেকে মুখ ফিরিয়ে) কোন দিকে যাচ্ছো? ২৭. এটা সৃষ্টিকুলের জন্যে এক উপদেশ বৈ কিছুই নয়। ২৮. যারা সঠিক পথ ধরে চলতে চায় (এটি শুধু) তাদের জন্যেই (উপদেশ); ২৯. (আসলে) তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না, হ্যাঁ চাইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রত্যেক ভাগে ইসলামী আকীদার মূলনীতিসমূহের প্রধান প্রধান এক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে কেয়ামতের বাস্তব দৃশ্য তুলে ধরা এবং সংঘটিত হওয়ার সময় সৃষ্টিরাজির মধ্যে যে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে আলোচনা। এ বিপর্যয় আসবে সূর্যে, তারকারাজিতে, পাহাড়-পর্বতসমূহে, সমুদ্রে, পৃথিবীতে, আকাশে, গৃহপালিত পশু ও হিংস্র জীব-জন্তুতে এবং মানুষের মধ্যে, সবখানে।

দ্বিতীয় বাস্তব সত্যটি হচ্ছে ওহী এবং যে ফেরেশতা এ ওহী বহন করে এনেছেন তার বৈশিষ্ট্য ও যার কাছে ওহী পৌঁছেছে সেই নবী সম্পর্কে। তারপর আলোচনা করা হয়েছে ওই জাতি সম্পর্কে, যাদেরকে সম্বোধন করে ওহী পাঠানো হয়েছিলো।

সূরাটির মধ্যে যে ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে তা হচ্ছে মহা প্রলয়ংকর এক আলোড়ন। যা শুরু হয়ে সবকিছু লন্ডভন্ড করে ফেলবে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়ে যাবে প্রতিটি জিনিস। স্থির পদার্থগুলো ছুটে বেড়াতে থাকবে এবং যারা নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছিলো তারা সব ভয়ে বিহ্বল হয়ে যাবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে মানুষ সকল পরিচিতদের থেকে। চেনা জিনিসকেও আর কেউ চিনতে পারবে না। বিপদের এই ঘনঘটায় মানুষ বহু সময় ধরে ভীষণভাবে দুলতে থাকবে। দুনিয়াতে যাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিলো তাদের সকল সম্পর্ক পুরোপুরিভাবে কেটে যাবে। কিছুতেই এক সাথে থাকতে পারবে না তারা, যারা জীবনভর এক সাথে থেকেছে। সেদিন যে ভয়ানক তুফান প্রবাহিত হবে তা পাখীর পশমের মতো সবকিছুকে এমনভাবে ঝাঁট দিয়ে নিয়ে যাবে যেন সেগুলোর কোনো ওযনই নেই এবং কোনো স্থায়িত্ব

কোনোদিন ছিলো না। সেদিন সকল শক্তির মালিক এক আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ কোনো আশ্রয় অথবা মাথা গোজার ঠাঁই পাবে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই চিরন্তন, শাশ্বত ও স্থায়ী। শুধু তাঁর এবং একমাত্র তাঁর কাছেই দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া যাবে ও প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব হবে। চূড়ান্তভাবে সে দিনই মানুষ এ কথা বুঝবে।

এ সূরাটিতে একথাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে যে, সে যাদের কাছে নিশ্চিন্ত মনে সারা জীবন থেকেছে এবং যার সাহায্যের ওপর নির্ভর করেছে সেসব থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যাতে করে সে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশ্রয় নিতে পারে, তার আশ্রয়েই এগিয়ে আসে এবং তাঁর কাছেই নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব কামনা করে।

সূরাটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি তুলে ধরার কারণে। এতে যেমন আমাদের জানা বর্তমান জগতের অনেক চমকপ্রদ ছবি-তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি তুলে ধরা হয়েছে আখেরাতের বহু দৃশ্যের বিবরণ।

তখন এমন অনেক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন সংঘটিত হবে, যেগুলো আমাদের জানাও নেই, আর সেগুলোর কল্পনাও আমরা করতে পারি না। যে বর্ণাঢ্য বর্ণনা সূরাটিতে পেশ করা হয়েছে তাও এর শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। সূরাটি ছোট্ট হলেও এর বর্ণনাভংগির বৈচিত্র, শব্দগুলোর চমৎকার মিল, ভাবমূর্তি ও প্রকাশের স্বচ্ছতা, সবকিছু মিলে একে করেছে অনবদ্য। যার ফলে অর্থবুঝে মনোনিবেশ সহকারে সূরাটি পড়লে মনের গভীরে দাগ কাটে এবং সে চিহ্ন দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকে।

কিছু অপরিচিত শব্দ সূরাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে যা বর্তমান যমানার পড়ুয়াদের বোধগম্যের বাইরে। তা না হলে আমি হয়তো এর ওপর কোনো ব্যাখ্যা বা মন্তব্য করতাম না। কিন্তু আমি অনুভব করেছি যে, এর মধ্যে এমন কিছু জটিল ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, কিছু তথ্য ও দৃশ্যের বিবরণ এসেছে, যা মানুষের ভাষায় প্রকাশিত হতে পারে না, কিন্তু তা হৃদয়পটে গভীরভাবে রেখাপাত করে ও মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। মানুষের ভাষা সেই তথ্যগুলো পেশ করতে সক্ষম না হলেও মানুষের স্রষ্টা সেগুলো পেশ করতে এবং সেগুলোর তাৎপর্য সার্থক ও ক্রিয়াশীলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম। আমাদের এ যমানায় কোরআনকে বুঝার জন্যে যে গুরুত্ব দিয়ে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, তা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি।

এটাই আমাদের দুর্ভাগ্যের সব থেকে বড়ো কারণ। এরশাদ হচ্ছে, 'সূর্যকে যখন জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে, তারাগুলো যখন আলোহীন হয়ে ম্লান হয়ে যাবে ....তখন মানুষ জানবে কোন জিনিস নিয়ে সে হাযির হয়েছে। (আয়াত-১-১৪)

এটাই হচ্ছে সেই সর্বগ্রাসী বিপর্যয়, যা পৃথিবীর সবকিছুকে নিমেষে গ্রাস করে ফেলবে। এ হবে এমন এক বিপর্যয়, যা থেকে কোনো কিছু রেহাই পাবে না। আকাশ ও পৃথিবীর সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ থেকে নিয়ে হিংস্র প্রাণী, গৃহপালিত পশু এবং সকল মানুষ স্থানচ্যুত হয়ে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। সেদিন সকল অপ্রকাশিত জিনিস প্রকাশিত হবে এবং সকল অজানা তথ্য বেরিয়ে পড়বে।

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামনে ওই সকল কাজ, কথা ও ব্যবহার দেখতে পাবে, যা সে পরকালের পাথেয় হিসেবে জমা করে রেখেছে। সেদিন চতুর্দিকের সবকিছু বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকবে এবং কোনো কিছুই তার আসল অবস্থায় টিকে থাকতে পারবে না। এ সূরাতে বর্ণীত সেদিনকার সেই সর্বগ্রাসী বিপর্যয় এই ইংগিত বহন করছে যে, যখন আসবে সেই ভয়ংকর দিন,

তখন বর্তমানের আকাশ, পৃথিবী ও সকল প্রাণীর মধ্যে আজ যে শৃংখলা বিরাজ করছে, পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য– যা পরম দয়াময় সতর্ক ও চরম শৃংখলা বিধানকারীর সৃষ্টি, সে সবকিছু সেই মহা প্রলয়ের দিনে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। থাকবে না কোনো নিয়ম শৃংখলা এবং বস্তুসমূহের মধ্যে আজকের বিরাজমান সম্পর্ক সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেদিন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে যা পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত। আসবে নতুন জীবন ও জগত, যা হবে আজকের জীবন ও জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এ সূরার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরে অবশ্যম্ভাবী ওই মহা প্রলয়ের অনুভূতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাতে করে তারা পার্থিব জীবন ও তার সুখ সম্পদের প্রতি অধিক গুরুত্ব না দেয়। এই সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তার তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। কেয়ামতের ঘটনা হচ্ছে সেই মহা সত্য, যা আমাদের চিন্তা ভাবনা, বুঝ ও জ্ঞানের উর্ধ্বের জিনিস। এ নিয়ে যতো চিন্তাই আমরা করি না কেন, তা সম্যক উপলব্ধি করা কোনোভাবেই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে আমরা যতো প্রকার ঝড় তুফান ও ভূমিকম্প দেখি বা কল্পনা করি তার থেকে অনেক অনেক বেশী ভয়ংকর সে অবস্থা। ভীষণ আগ্নেয়গিরি যা শত সহস্র জনপদ ধ্বংস করে দেয়, সমুদ্রের উচ্ছ্বাস যা শহর, নগর, বন্দরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এসব কিছু থেকেও কেয়ামতের দৃশ্য অতি ভয়ংকর। বোমা ফাটার শব্দ, বাজ পড়ার কর্ণবিদারক ধ্বনি এবং ওই ধরনের যতো কিছুর কল্পনা আমরা করি না কেন, কোনোটি দ্বারাই আমরা কেয়ামতের সঠিক অবস্থা বুঝতে পারি না। এমনকি পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত সূর্যের মধ্যে যে বিস্ফোরণ ঘটার অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়ানক হলেও কেয়ামতের দিনে যা সংঘটিত হবে তার তুলনায় এগুলো অতি তুচ্ছ এবং অনেকটা ছেলেখেলার মতো

প্রকৃতপক্ষেই যদি আমরা কেয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা বুঝতে চাই, তাহলে যতো প্রলয় এ পর্যন্ত বিশ্বের বুকে ঘটেছে সেগুলোর সাথে শুধু একটু তুলনা করতে পারি মাত্র।

তাফসীর

সূর্যের ম্লান হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সম্ভবত এটাই যে, তা ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে অনন্তকাল ধরে যে সূর্যরশ্মি বিকীর্ণ করে তা স্তিমিত হয়ে যাবে। সূর্যের অত্যধিক উত্তাপের কারণে এটা বাষ্প আকারে বর্তমান রয়েছে এবং তাপের সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে ১২,০০০ ডিগ্রী। এর অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার অর্থ সম্ভবত এটাই যে, ভূপৃষ্টের তাপের মতো এর তাপের মাত্রা সমমাত্রায় নেমে আসবে এবং এর আকৃতি প্রসারিত না হয়ে গোলাকারই থাকবে।

কেয়ামতের কিছু খন্ডচিত্র

ওপরে বর্ণিত অর্থই সম্ভবত সূরাটির গোড়ার দিকে ব্যক্ত করা হয়েছে। অবশ্য অন্য অর্থও হতে পারে। কিভাবে এ বিপর্যয় সংঘটিত হবে এবং কোন কোন কারণে এটা সংঘটিত হবে তার খবর একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তায়ালাই জানেন, আমাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

তারকারাজির পতনের অর্থ হয়তো এই হবে যে, সেগুলো কক্ষচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়বে এবং যে ব্যবস্থার বন্ধনে আজকে সেগুলো আবদ্ধ রয়েছে সে মহা বিপর্যয়ের কারণে সে ব্যবস্থা ভেংগে যাবে এবং একটির সাথে অন্যটির কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আলো বিকিরণের যে ব্যবস্থা আজ আছে তা শেষ হয়ে যাবে এবং তার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কোন কোন তারকা এর প্রভাব বলয়ে পড়বে। যেগুলো ভূ-পৃষ্টের কাছাকাছি আছে বা সৌরমন্ডলে সূর্যের নিকটবর্তী এবং তার প্রভাববলয়ের সকল তারকা অথবা সমগ্র ওই তারকারাজি, যার সংখ্যা

হবে বহু কোটি এবং যাদের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে অথবা জানা-অজানা সকল তারকারাজি, যার সংখ্যা কতো ও কোথায় কোনটা কিভাবে আছে এবং কি কাজ করছে এর কোনো জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও কাছে নেই। এটা অবশ্য জানা গেছে যে, মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য ছায়াপথ আছে এবং প্রত্যেক ছায়াপথের আওতায় আছে এক একটি বিরাট শূন্যতা।(১)

পর্বতমালার সজোরে সঞ্চালিত হওয়া বলতে সম্ভবত একথা বুঝায় যে, সেগুলো ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে এবং অন্যান্য সূরার বর্ণনামতে সেগুলো স্থানচ্যুত হয়ে ধূলাবালিতে পরিণত হবে এবং সেগুলো এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।(২)

অন্যত্র বলা হচ্ছে, পর্বতগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং বিক্ষিপ্ত ধূলাবালিতে পরিণত হবে। আরও বলা হচ্ছে, পর্বতগুলোকে এতো দ্রুত বেগে সঞ্চালিত করা হবে যে, সেগুলো মরুর মরীচিকায় পরিণত হবে। অর্থাৎ এতো তীব্র বেগে ধূলাবালির রূপ নিয়ে সেগুলো উড়তে থাকবে যে, ধু-ধু মরীচিকায় যেমন কম্পমান বাতাস মানুষকে পানি বলে প্রতারিত করে, তেমনি পর্বতগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে তার সূক্ষ্ম বালু কণাগুলো দর্শকদের চোখে পানির প্রবাহরূপে দেখা দেবে।

এ সকল আয়াতেই পাহাড় পর্বতের সঞ্চালিত হওয়ার বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইংগিত রয়েছে। প্রোথিত পর্বতমালার দৃঢ়তা শিথিল হয়ে যাবে। মাটির অভ্যন্তরে যে শেকড় গেড়ে থাকায় তা নিজ নিজ জায়গায় মযবুত হয়ে রয়েছে, সে জায়গার বন্ধন সেগুলোকে আর ধরে রাখতে পারবে না। যার কারণে তাদের স্থায়িত্ব খতম হয়ে যাবে। কেয়ামতের ধ্বংসলীলা শুরু হবে ভূমির প্রচন্ড কম্পন থেকে, যার সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা, 'যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে প্রচন্ড বেগে এবং যমীন তার মধ্যে লুকানো সব ভারি বোঝাগুলোকে বের করে দেবে। আর এসব কিছু সেই দীর্ঘস্থায়ী (কেয়ামতের) দিনে সংঘটিত হবে।

আল্লাহর বাণী, 'আর দশ মাসের (গর্ভবতী) উটনীকে (অযত্নে-অবহেলায়) ছেড়ে দেয়া হবে।' দশ মাসের উটনী বলতে বুঝায় সেই উটনী, যে গর্ভধারণ করার পর দশম মাসে পড়েছে এবং যেকোনো সময়ে বাচ্চা দিতে পারে। এই পর্যায়ে এসে এই জীবটি দেখতে যেমন সুশ্রী হয় তেমনি এর মূল্যও হয় সবচে' বেশী।

যে কোনো আরব বেদুইনের কাছে এ পর্যায়ের গর্ভবতী উটনী তার কাছে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। এ অবস্থায় তার মূল্য সর্বাধিক হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, সে তখন বাচ্চা ও প্রচুর পরিমাণে দুধ উভয়টি দান করার পর্যায়ে এসে গিয়েছে। তার থেকে সর্বোচ্চ যে উপকার পাওয়া যায়, তা দেয়ার জন্যে সে সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

এমনি পর্যায়ে আসার পর যখন উটনীর মালিক ও তার গোটা পরিবার তৃপ্তির সাথে দুধ খাবে বলে আশা করছে ঠিক সেই মুহূর্তেই ওই লোমহর্ষক বিপদ আসার কারণে তারা এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে যে, ওই মহামূল্যবান জীবের প্রতি খেয়াল দেয়ার মতো মানসিকতা ও ক্ষমতা তাদের থাকবে না। এমনকি ওই জিনিসের কোনো মূল্যই তাদের কাছে তখন অনুভূত হবে না। আরব বেদুইনদের লক্ষ্য করেই প্রথমত কথাটি বলা হয়েছে, এ কথাটি বলা তাদের জন্যে যথোপযুক্ত। যেহেতু ওরা সর্বাত্মক মহা বিপদ ছাড়া এমন মূল্যবান জানোয়ারকে অবহেলায় ছেড়ে দেয় না বা দিতে পারে না।

---

(১) আরো জানার জন্যে আমার 'প্রজন্মের প্রহসন' বইটি আপনার কাজে লাগবে।–সম্পাদক

(২) কোরআন ২০-১০৫।

'হিংস্র জন্তুগুলোকে যখন একত্রিত করা হবে।' এই সকল বন্য হিংস্র জন্তু যখন দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে, তখন বনের মধ্যেও অপর বন্য জন্তুর জন্যে এরা এক আতংক হিসেবে বিরাজ করে। কিন্তু সেই ভয়ানক দিনে এরা পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ভুলে গিয়ে সবাই একত্রিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ এ ভয়ংকর দিনটি এতোই কঠিন হবে সবার জন্যে যে, কেউ কারো দিকে তাকানো বা অন্য কোনো চিন্তার অবসর পাবে না। ওই কঠিন দুঃসময়ের ভয়াবহতায় এরা নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে না বা যারা গর্তের মধ্যে থাকবে, তারা বেরও হতে পারবে না, অন্য কোনো জন্তুকে আক্রমণের তো কথাই আসতে পারে না। জীব জন্তুর অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে মানুষের অবস্থা কী হতে পারে একবার ভেবে দেখা দরকার।

সমুদ্রে আগুন!

এরপর আসছে সমুদ্রে আগুন ধরে যাওয়ার প্রশ্ন। আরবী শব্দ 'তাসজীর' দ্বারা এর একটি অর্থ এই বুঝায় যে, সমুদ্র স্ফীত হয়ে উপরে পড়বে। অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি ও পর্বতসমূহ সমুদ্রগুলোকে যে বিভক্ত করে রেখেছে, সেগুলো সব একত্রিত হয়ে গিয়ে এক মহা তুফান, পানির উচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণি বায়ুর সৃষ্টি হবে। পানিবাহী সেই ঘূর্ণি হাওয়ার গতির তীব্রতায় সমুদ্রে আগুন ধরে যাবে এবং দাবানলের মতো সে আগুন সবখানে ছড়িয়ে পড়বে। (সূরা নাযেয়াত-এ আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি)। অর্থাৎ উত্তাল তরংগের আঘাতে সমুদ্রে ভীষণ অগ্নিকান্ডের সৃষ্টি হবে। এই আরবী শব্দটি (তাসজীর)-এর আর একটি অর্থও হয়, তা হচ্ছে সমুদ্র বিস্ফোরিত হবে এবং আগুন ধরে যাবে। কোরআনের অন্যত্র এই অর্থ ব্যক্ত হয়েছে। সমুদ্র যখন বিস্ফোরিত হবে, এর ফলে পানির মধ্যে বিদ্যমান উপাদান হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দু'টি পৃথক হয়ে যাবে।

এ দু'টি উপাদানের একটিতে আগুন জ্বলে এবং অপরটি জ্বলতে সাহায্য করে। এই সকল বস্তুর মধ্যে বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার নাম হচ্ছে অণু (এটম)। ভীষণ ঝড়ের তান্ডবলীলা, সাগরের বুক ফেটে আগ্নেয়গরির সংস্পর্শে আসা, উত্তাল তরংগের বাষ্পীভূত হয়ে ওই অনুগুলো পৃথক হয়ে যাওয়া এবং প্রচন্ড ঘূর্ণি হাওয়ার ঝাপটায় পানির কণাগুলো পৃথক পৃথক হয়ে গিয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে আলাদা করে দেবে। এভাবে সমগ্র পানিভাগে আগুন ধরিয়ে দেয়া– এসবই সম্ভব হবে সেই মহা বিপর্যয়ের দিন। এ অবস্থা হবে কতো ভয়াবহ, তা মানুষের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাশক্তির আয়ত্বের বাইরে। এই মহা সাগরের বাইরে রয়েছে যে জাহান্নাম, তাও আমাদের ধ্যান-ধারণার বাইরে।(৩)

'যখন মানুষের আত্মাগুলো নিজ নিজ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হবে।' এ কথার অর্থ এটা হতে পারে যে, মানুষের আত্মা ও দেহ কেয়ামতের দিন একত্রিত হয়ে যাবে। আর এও হতে পারে যে, আত্মাগুলোর সমশ্রেণীর দল অপর দলের সাথে মিলিত হবে অথবা নিজ নিজ দলে গিয়ে মিশবে। যেমন কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, তোমরা হয়ে যাবে তিনটি দলে বিভক্ত। অর্থাৎ এক দল হবে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত, আর একটি ডানপন্থী এবং অপরটি হবে বামপন্থী। অথবা অন্য আরও কোনো পন্থায় এই বিভক্তি আসতে পারে।

জীবন্ত কবর

আবার 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে– কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো?' জাহেলিয়াতের যুগে লজ্জা অথবা দারিদ্রের ভয়ে কন্যা সন্তানকে হত্যা করার

(৩) সম্প্রতি মহাসাগরসমূহের অভ্যন্তর থেকে যে আগ্নেয় গিরীর বিস্ফোরিত হচ্ছে তাতে আল্লাহ তায়ালার কালামের সত্যতাই প্রমাণিত হয়।–সম্পাদক

প্রবণতা সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে ছিলো। সেই বদভ্যাসের কথা কোরআনে বর্ণীত হয়েছে। এ অভ্যাস ছিলো জাহেলী যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। ইসলাম এসে আরবদের মধ্যে এই বদভ্যাসের অবসান ঘটায় এবং এভাবে মানবতাকে সে মহা পাপ থেকে রক্ষা করে।

অন্যত্র বলা হয়েছে, আর তোমাদের কাউকে যদি কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়, তখন তোমাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং তোমাদের হৃদয় হয়ে যায় দুঃখে ভারাক্রান্ত। যে কি না লালিত পালিত গহনা গাটির মধ্যে, আর ঝগড়া-বিবাদ বা যুক্তিতর্ক করার সময়ে নিজের কথাকে যে স্পষ্ট করে বলতে পারে না, তাকেই তোমরা আল্লাহর সন্তান বলে অভিহিত করছো? আরও এক জায়গায় বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমি সর্বশক্তিমান (আল্লাহ) তাদেরকে রেযেক (জীবনধারণ সামগ্রী) দান করি এবং তোমাদেরকেও দিই।

তখন যেন্দা দাফন করে ভীষণ নিষ্ঠুর পন্থায় কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হতো। যখন কন্যাটিকে মাটিতে প্রোথিত করা হতো, তখন সে জীবিতই থাকতো। অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় দাফন করা হতো। যারা তাৎক্ষণিকভাবে যেন্দা দাফন করতো না অর্থাৎ জন্মের সাথে সাথে দাফন না করে দেরী করতো, তারা বিভিন্ন চক্রান্তের আশ্রয় নিতো। ওদের কেউ কেউ এভাবে করতো যে, কারও কন্যা সন্তান হলে ছয় বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতো।

তারপর ছয় বছর পূর্তির পর কোনো এক দিন তার মাকে বলতো তাকে গোসল করিয়ে ভালো কাপড় চোপড় পড়িয়ে সাজিয়ে দাও, আমি ওকে ওর নানী বাড়ী নিয়ে যাবো। পূর্বেই সে মরুভূমিতে একটি কুয়া খুঁড়ে রাখতো। সেই কুয়ার কাছে পৌঁছে সে মেয়েটিকে বলতো, দেখো তো এর মধ্যে কী আছে? মেয়েটি কুঁয়ার মধ্যে তাকানোর জন্যে এগিয়ে গেলে তাকে ধাক্কা মেরে তার মধ্যে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে মেরে ফেলতো। আরও এক পন্থায় হত্যা করা হতো বলে জানা যায়, আর তা হচ্ছে মায়ের প্রসব বেদনা উঠলে সে একটি গর্তের কিনারায় গিয়ে বসতো এবং বাচ্চাটি কন্যা সন্তান হলে তাকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে মাটিচাপা দিয়ে দিতো। বেটা ছেলে জন্ম নিলে তাকে রাখতো।

কোনো কোনো ব্যক্তি কন্যা সন্তান জন্ম হলে ছাগল চরানোর বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত ঘৃণার সাথে তাকে জীবিত রাখতো ও চরম দুর্ব্যবহার করতো। তারপর একদিন পশমী জুব্বা পরিয়ে অথবা লোমের তৈরী জুব্বা পরিয়ে তাকে উট চরাতে মাঠে পাঠিয়ে দিতো।

নারীর মর্যাদা দানে ইসলাম

যারা কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত কবর দিতো না বা উট ছাগল চরানোর জন্যে মাঠে পাঠাতো না তারা অন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতো, যাতে সে জ্যান্ত কবরস্থ হওয়ার বা হীন জীবনযাপন করার স্বাদ পেতে পারে। এমনও করতো যে, মেয়েটির বিয়ে হওয়ার পর স্বামী মারা গেলে তার অভিভাবক এগিয়ে এসে তার জামা সে মেয়েটির ওপর নিক্ষেপ করতো। এর অর্থ ছিলো অন্য কেউ তাকে আর বিয়ে করতে পারবে না।

এরপর তাকে ওই অভিভাবক বিয়ে করতে চাইলে করতো। কিন্তু মেয়েটির মতামতের কোনো তোয়াক্কা করতো না বা সে সমাজে তার মতামতের কোনো মূল্যই ছিলো না। আর বিয়ে না করলে সে অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে দিতো এবং মৃত্যু পর্যন্ত অন্য কারো সাথে তার বিয়ে হতে দেয়া হতো না। কেউ এভাবেও নির্যাতন করতো যে, সে স্ত্রীকে তালাক দিতো এবং শর্ত বসিয়ে দিতো, তার অনুমতি ছাড়া বা তার পছন্দমতো ব্যক্তি ছাড়া অন্য আর কারো সাথে বিয়ে বসতে পারবে না।

তবে সে যা দিয়েছে তা ফেরত দিলে তাকে স্বাধীনতা দেয়া হতো। আবার কেউ কেউ এমনও করতো যে, কোনো ব্যক্তি মারা গেলে সে ব্যক্তির স্ত্রীকে বাচ্চা মানুষ করার জন্যে পুনরায় বিয়ে বসতে না দিয়ে আবদ্ধ করে রেখে দিতো। বাচ্চাটা বড়ো হলে তাকে বিয়ে করতো। আবার কোনো সময় এমনও করতো যে, অভিভাবক এতীম মেয়েকে নিজের কাছে রেখে লালন-পালন করতো। এই উদ্দেশ্যে বিয়ে দিতো না যে, তার বর্তমান স্ত্রী মারা গেলে তাকে বিয়ে করবে। অথবা তার না-বালেগ ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে রাখতো। যাতে তার সম্পদ-সম্পত্তি ও সৌন্দর্য ভোগদখল করা যায়।

এই ছিলো জাহেলী যুগে মেয়েদের সাথে ব্যবহারের দশা। শেষ পর্যন্ত ইসলামের আগমন ঘটলো যা মেয়েদেরকে এসব হীনতা, দীনতা, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি দিলো। জ্যান্ত কবর দেয়ার রীতি চিরতরে খতম করে দিলো এবং তাদের সাথে যে কোনো দুর্ব্যবহারের জন্যে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে ঘোষণা জারী করলো। নারী তথা মানবতার প্রতি এই চরম অবমাননার দ্বার রুদ্ধ করে মাতৃ জাতিকে ইসলাম দিলো তার ন্যায্য অধিকার। জানিয়ে দিলো কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার তাদের প্রতি করা হলে তার জন্যে পাকড়াও হতে হবে আল্লাহর দরবারে। জীবন্ত প্রোথিত কন্যাদেরকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন্ অপরাধের জন্যে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো এবং সেই ভয়ংকর দিনে তাদের ন্যায্য পাওনা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

যে মান মর্যাদা ও অধিকার ইসলাম নারীদেরকে দিয়েছে, জাহেলী সমাজের কোনো পর্যায়েই সে মর্যাদা দেয়া হয়নি। আর ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হলে মানব রচিত কোনো ব্যবস্থায় তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিলো না। মায়ের জাতির প্রতি এ মর্যাদাবিধান প্রকারান্তরে গোটা মানবজাতির জন্যে ছিলো এক মহা নেয়ামত। মেহেরবান আল্লাহর প্রিয়তম সৃষ্টি রক্ষার্থে এবং তাদের জন্যে পরিপূর্ণ শান্তিবিধান করলেন, তাদেরকে মর্যাদা দান নারীত্বের জন্যে যথাযথ এবং এক অপরিহার্য শর্ত। এ শর্ত পূরণ করা ব্যতীত অন্য কোনোভাবে শান্তির আশা করা বৃথা।

ইসলামের আগমনের পর নারীদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে অসাধারণ সম্মান দান করা হলো। তার ফলে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হলো। যতোদিন ইসলাম বিজয়ী ব্যবস্থা হিসেবে চালু থেকেছে, ততোদিন মানুষের অর্ধেক নারী সমাজ সহ গোটা মানবজাতি শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু যখন ইসলাম বিজয়ী অবস্থা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং বস্তুবাদিতার প্রসার হয়েছে, তখন থেকে নারী সমাজ পুনরায় নির্যাতন ও অবিচারের শিকারে পরিণত হয়েছে। আজ নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকারের নামে এবং স্বাধীনতার নামে ঘর থেকে বের করে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে যে অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে প্রকৃতপক্ষে তাদের মর্যাদা বাড়েনি বরং তাদেরকে নির্যাতন করার নতুন নতুন পথ খুলে গেছে। এ ব্যবস্থা মানুষের তৈরী, যা নির্ভুল ও নিখুঁত হতে পারে না।

কেয়ামতের আরো কিছু খন্ড চিত্র

'আর যখন (আমলনামার) পাতাগুলো খুলে তুলে ধরা হবে' ওই পুস্তক হচ্ছে কর্মসমূহের পুস্তক বা আমলনামা। এই পুস্তক খুলে তুলে ধরার মাধ্যমে তার কাজগুলোকে তার গোচরীভূত করা হবে। প্রত্যেক হৃদয়ে কিছু গোপন কথা থাকে। এগুলো প্রকাশ করে দিলে সে লজ্জিত হয় ও প্রকম্পিত হয় নিজ কীর্তিকলাপ দেখে। সে গোপন কথাকে চাপতে চাইলেও সেদিন তা পারবে না।

এই প্রকাশ করে দেয়া- এটাও সেই ভয়াবহ দিনের ভীতিজনক পরিস্থিতির অন্যতম, বরং সকল গোপন তথ্য ও কথা যা বুকের মধ্যে লুকায়িত থাকে, যা মানুষ কোনো অবস্থায় প্রকাশ করতে চায় না, সেদিন সেগুলো প্রকাশ করে দেয়া সে দিনকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বুকের অভ্যন্তরের কথাগুলো প্রকাশ হওয়া এবং আকাশের পর্দা উঠে যাওয়ার মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। আকাশের নীলাভ স্তর, যা আমাদের কাছে দূরত্বের কারণে অনুভূত হয় তা তখন থাকবে না। 'আর যখন আকাশের পর্দা তুলে নিয়ে তাকে গুটিয়ে দেয়া হবে।' এ কথাগুলো পাঠ করার সময় মন-মগযে এ কথাটা সংগে সংগে এসে যায় যে এখনকার যে পর্দাটা ওপরের দিকে তাকালেই আমাদের নযরে পড়ে তা আর থাকবে না। গুটিয়ে নেয়া অর্থ সরিয়ে নেয়া বুঝায়। কেমন করে এটা সংঘটিত হবে এবং কোন পদ্ধতিতে এই অপসারণের কাজ সম্পন্ন হবে তা বুঝার কোনো উপায় নেই। তবে এতোটুকু আমরা কল্পনা করতে পারি যে, ওপরের দিকে যে গম্বুজাকৃতি আমরা দেখি তা আর দেখা যাবে না। এটাই হবে পর্দা তুলে নেয়া বা আকাশের ওই পর্দাকে গুটিয়ে নেয়ার ফল, এর বেশী অনুমান করা বা বুঝার মতো চিন্তাশক্তি আমাদের নেই।

তারপর শেষের দু'টি আয়াতে সেই ভয়াবহ আতংক সৃষ্টিকারী দিনের শেষ দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, 'যখন জাহান্নামকে ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত করা হবে এবং জান্নাতকে কাছে এগিয়ে আনা হবে।'

কোথায় জাহান্নামকে আগুন লাগানো হবে বা জাহান্নাম জ্বলতে শুরু করবে, এর মধ্যে কোথায় আগুনের স্ফুলিংগ বাড়তে থাকবে কি দারুণ দাউ দাউ বেগে এটা জ্বলবে, কতো হবে এর উত্তাপ, কোথায় হবে এ জাহান্নামের স্থান? ধরানো হবে কিভাবে এবং কি দিয়েই বা আগুনকে উস্কে দেয়া হবে, কোন দ্রব্য হবে এর জ্বালানি- এসব কিছুর জবাব আল্লাহর এ নিম্নবর্ণীত বাণী ছাড়া আর কিছুই নেই যে, 'এর জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।' কিন্তু সে তো হবে পাপী মানুষকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করার পর। তার আগে কি হবে তার জ্বালানি বা কিভাবে তা জ্বলবে? এর জবাব আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

কোথায় জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে এবং কেমন করে তাকে জান্নাতবাসীদের কাছে নিয়ে আসা হবে? প্রকাশিত হবে তাদের সামনে সহজ প্রবেশ পথ। কি সহজ পদ্ধতিতে তারা প্রবেশ করবে এগুলোর কোনো জবাব আমাদের কাছে নেই। কোরআনের মাধ্যমে শুধু আমাদেরকে জানানো হচ্ছে, জান্নাতকে তার প্রাপকদের জন্যে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত করে এগিয়ে নিয়ে আসা হবে তাদের কাছে। যে শব্দ এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে বুঝা যায়, ঘষা অবস্থায় টেনে আনা হবে জান্নাতকে এবং স্ক্রু খোলার মতো জান্নাতীদের পাতগুলোও ওই রকম ঘষা অবস্থায় এগিয়ে যাবে।

যেদিন এ সকল ভয়ংকর ঘটনা সৃষ্টিলোকের সর্বত্র সংঘটিত হবে, যেদিন জীবন্ত ও জড় সবকিছুর মধ্যে আসবে এই বিবর্তন, সেদিন কোনো ব্যক্তির কাছে তার কাজের সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকবে না যা সে দুনিয়ার বুকে করেছে। অর্থাৎ দুনিয়ার বুকে সে যা কিছু করেছে, কোনো কম বেশী না করে অবিকলভাবে সেগুলো নিয়েই সে হাযির হবে। আর যে পাথেয় ওই দিনের জন্যে সে সঞ্চয় করেছে সেগুলো নিয়েই আল্লাহর আদালতে হিসেবের মুখোমুখি হবে। এরশাদ হচ্ছে, (সেদিন) মানুষ 'জানবে যা সে হাযির করেছে।' ওই কঠিন দিনে প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো না কোনো আমল নিয়ে হাযির হবে। নেক আমল হলে পুরস্কার আর বদ আমল হলে তার কঠিন ফল তাকে ভোগ করতে হবে। জানবে ওই ভয়ানক পরিণতির কথা, যা তাকে ঘিরে ফেলবে এবং যা

তার ভরাডুবি ঘটাবে। এমন সময় এবং এমনভাবে জানবে যে, তখন আর তার কিছু করার থাকবে না। তার আনীত পাথেয়র মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন আনার সাধ্য তার থাকবে না। কোনো উপায়ে কম বেশী করারও কোনো ক্ষমতা থাকবে না, কারণ তার কষ্ট লাঘব করার জন্যে কোনো দরদী এগিয়ে আসবে না কোনো কিছু নিয়ে। সেদিন সকলের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক কেটে যাবে। সে নিজেও যেমন কারো সাথে সম্পর্ক রাখবে না, অন্য কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে না। সেদিন সব কিছু আকারে প্রকারেও অন্যান্য সকল দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। থাকবে সেদিন মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর ইচ্ছার কার্যকারিতা- যা টলবে না, বদলাবে না। সুতরাং আজই সেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিবিধানের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার চেয়ে ভালো জিনিস আর কি হতে পারে! এর পরিণতিতে মানুষ অবশ্যই সে দিনই উচিত বিনিময় পাবে যেদিন সৃষ্টির সবকিছুই বদলে যাবে।

এভাবে সূরাটির প্রথম অধ্যায় শেষ হচ্ছে, যা মানুষের অনুভূতিকে ওই ভয়াবহ দিনের বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করে।

বিস্ময়কর শপথ বাক্য

এরপর আসছে আলোচ্য সূরাটির দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা। এ আলোচনা শুরু হয়েছে বিশ্বের অতি চমৎকার কিছু দৃশ্যের কসম খেয়ে। ওই সুন্দর জিনিসগুলোর কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অবতীর্ণ কথাগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। রসূলের গুণাবলীকে জনসমক্ষে তুলে ধরা, যিনি সে ওহী বহন করে এনেছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী মানুষের কাছে যথাযথভাবে তা পৌঁছে দিচ্ছেন। বলা হচ্ছে,

অতএব আমি কসম খাচ্ছি, সরে সরে যায় যে তারকাগুলো তাদের, যারা.........তাহলে তোমরা কোথায় যাচ্ছো? যা সে বলছে তা এছাড়া আর কিছুই নয় যে, সেগুলো গোটা বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ স্বরূপ। (আয়াত-১৫-১৭)

'আল খুন্নাস, আল জাওয়ারিল কুন্নাস' বলতে বুঝায় সেই তারাগুলোকে যেগুলো, কক্ষপথে চলার সময় ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় আসে। যেমন দ্রুতগতিতে সেগুলো চলে যায়, তেমনি (অপর গোলার্ধে যাওয়ার কারণে) আমাদের নযরে গোপন হয়ে লুকিয়ে যায়। এই তারাগুলোর চমৎকার গতিকে বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ওদেরকে ওই চঞ্চলা হরিণীদের সাথে তুলনা করেছেন, যারা দ্রুতগতিতে ছুটে যায়। হঠাৎ করে থামে, এদিকে ওদিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে তাকায়, সচকিত পদে আবার দৌড়ায়। আবার সে অন্য এক স্থান থেকে ফিরে আসে। হরিণীর এই দৌড়াদৌড়ির মধ্যে তার লুকানো, পুনরায় আত্মপ্রকাশের মধ্যে দারুণ এক সৌন্দর্য আছে যা অনুভূতিশীল মনকে আনন্দে আত্মহারা করে তোলে। এই সৌন্দর্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে অতি সুন্দর শব্দ ও প্রকাশভংগী ব্যবহার করা হয়েছে।

'আর রাত যখন ধরণীকে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে।' অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে গোটা বিশ্বকে। কিন্তু ওই অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে মনে হয় রাত একটি জীবন্ত কিছু। যা তার নিজ অদৃশ্য হাতে বা পায়ে যেন অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে দেয়। রাত সম্পর্কে কথা বলার এ এক অভিনব পদ্ধতি এবং রীতিমতো রহস্যজনক। আরবী ভাষার এ প্রকাশভংগী এতোই চমৎকার, যা অন্য কোনো ভাষায় কল্পনা করা যায় না।

অনুরূপ আর একটি চমৎকার বাক্য 'আর প্রভাত বেলার কসম, যা দিনের আলোয় নিশ্বাস নেয়।' এ আয়াতটির 'প্রভাত' যেন একটি জীবন্ত কিছু। তার প্রাণশক্তি আরও অধিক মূর্ত হয়ে উঠেছে আরবী ওই শব্দগুলোতে। ভাবখানা এই যে, প্রভাতবেলা এমন কোনো জীবন্ত প্রাণী– যা শ্বাস প্রশ্বাস নেয়। হাঁ, তার বিশ্বাস হচ্ছে ওই স্নিগ্ধ আলো যা জীবন ও সঞ্চালন শক্তি দান করে অন্য বহু জীবন্ত প্রাণীকে। আমার মনে হয় প্রভাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে এতো মধুর ও চমৎকার

শব্দ আর কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। আর রাত শেষে দিনের প্রথম আগমনে মন-দিল যেভাবে প্রফুল্ল হয় এবং দেহে যে সজীবতা আসে তাতে মনে হয় প্রভাত বুঝি সত্যিই নিশ্বাস ফেলছে এবং তার মাধুর্যে সকলকে করছে বিমুগ্ধ। উপরন্তু আরও একটি ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই কথাটি আরও জোরদার হয় যে, আঁধারের ঘোর কেটে গিয়ে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো মৃদু-মন্দ প্রভাতী সমীরণ ও আরও অনেক অজানা জিনিস ওই সময় পাওয়া যায় যা হয়তো আমাদের এখনও জানতে অনেক বাকী।

যে কোনো সৌন্দর্য পিয়াসী মানুষ উল্লেখিত চারটি আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। যেখানে বলা হচ্ছে, 'কসম থেমে থেমে আসা তারকারাজির, যারা দ্রুতগতিতে আসে, আবার হঠাৎ করে লুকিয়ে যায়। কসম ওই রাতের, যা বিশ্বকে আঁধার দিয়ে ঢেকে দেয় এবং কসম প্রভাত বেলার, যা দিনের আলোয় নিশ্বাস ছাড়ে।' এর ব্যাখ্যা মানুষের অনুভূতিরাজ্যে প্রবল এক আবেগ সৃষ্টি করে, যখন সে বিশ্বের এসব রহস্যের দিকে খেয়াল করে তাকায়। এসব আয়াত বিশ্ব ভান্ডারের যে তথ্যের সন্ধান দেয় তা যেমন মহা মূল্যবান, তেমনি অতি সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর, যা মানুষের অনুভূতিরাজ্যে স্থায়ীভাবে দাগ কেটে যায়। বিশ্বের এই রহস্যরাজি যে কোনো কবি মনকে দারুণভাবে দোলা দেয়।

মহাবিশ্বের এই সকল দৃশ্য থেকে যে জীবন বা সজীবতার সন্ধান পাওয়া যায়, তা সকল মনকেই সজীব ও বলীয়ান করে। এর ব্যাখ্যা থেকে সজীব ও সুন্দর মানুষের মন আরও চাংগা ও প্রফুল্ল হয়। তার সামনে নিত্যনতুন রহস্য উন্মোচন হয়। যে ঈমান আনার আহ্বান জানিয়ে তাদের কাছে দাওয়াত পেশ করা হয়েছে তা গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। সেই সত্যটিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে সাধারণ বুদ্ধির লোকেরাও প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

জিবরাইলের গুণাবলী

দেখুন সে মর্মস্পর্শী কথা, 'অবশ্যই এটা এক সম্মানিত রসূলের কথা, যে শক্তিমান এবং আকাশবাসীর (আল্লাহর) কাছে সম্মানজনক স্থান পাওয়ার যোগ্য। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যার আনুগত্য করা হয়। সেখানে সে রসূল বিশ্বসী বলে পরিচিত।' এ কোরআন হচ্ছে আখেরাতের বিবরণ সম্বলিত একজন মহান রসূলের (আনীত) বাণী। সে (বার্তাবাহক) হলেন জিবরাইল। যিনি বহন করে এনেছেন এ কথাগুলো এবং পৌঁছে দিয়েছেন তা যথাযথভাবে। এই দায়িত্বের কারণেই তাকে বার্তাবাহক বা রসূল বলা হয়েছে।

এ বার্তাবাহকের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তাকে এ বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্যে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি (জিবরাইল) সম্মানিত তার মনীবের কাছে, আর তার রব তিনি, যিনি তার সম্পর্কে বলছেন 'শক্তিমান' এবং তা হচ্ছে তাঁর ওহী বহন করার কারণেই। কেননা এই মহাবাণী বহন করার জন্যে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন। 'তিনি আরশবাসীর কাছে সম্মানজনক স্থানের অধিকারী।' সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আরশের মালিক। সেখানে তার কথা যথাযথভাবে মানা হয়। তিনি সকল মর্যাদাপূর্ণ ফেরেশতাদের কাছে বিশ্বস্ত বলে পরিচিত। যেহেতু তিনি তার রবের সম্মানিত বাণী বহন করেন ও নবীদের কাছে পৌঁছে দেন।

সামগ্রিকভাবে তাকে এ গুণাবলী দেয়া হয়েছে ওই মহাবাণীর ধারক ও বাহক হওয়ার কারণেই। সুতরাং এ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোরআন মহাসম্মানিত এক গ্রন্থ যা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং বহু মূল্যবান বাণী সম্বলিত। আর এ বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোতে একথাও স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের ব্যাপারে খুবই যত্নবান। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যেই এ বাণী পাঠানোর ব্যবস্থা এমন একজন বার্তাবাহক মহান ফেরেশতার মাধ্যমে করা হয়েছে যিনি আল্লাহর মনোনীত। মানুষকে পথ দেখানোর জন্যে এই সুনিপুণ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা দরকার এবং বিনীত ও লজ্জিত হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহর এ মহা সাম্রাজ্যে সে তুচ্ছ এক সৃষ্টিমাত্র। কী এমন হতো যদি তার প্রতি আল্লাহ তায়ালা এভাবে যত্নবান না হতেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা জীব বলে এই সম্মান না দিতেন।

মোহাম্মাদ (স.)-এর গুণাবলী

এতো গেলো ওই বার্তাবাহক সম্পর্কে কিছু কথা যিনি স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে ওই বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন এবং পৌঁছে দিয়েছেন যথাযথ স্থানে। এখন বিবরণ দেয়া হচ্ছে সেই বার্তাবাহকের যিনি তোমাদের কাছে সে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। তাকে তোমরা সঠিকভাবে চেনো জানো। দীর্ঘ চল্লিশটি বছর ধরে তাকে দেখার সুযোগ তোমরা পেয়েছো। সুতরাং তিনি যখন তোমাদের কাছে সেই মহা সত্যকে নিয়ে এলেন, তখন তোমরা কেন এটা ওটা বলতে শুরু করলে? তাঁর ব্যাপারে তোমরা নানা মতে বিভক্ত কেন হতে লাগলে? তিনি তো তোমাদের অতি কাছের সংগী এবং তিনি তোমাদের অপরিচিত কেউ নন। আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বস্ত, যার নিশ্চিত প্রমাণ তার কাজকর্ম ও চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যেই তোমরা পেয়েছো।

এরশাদ হচ্ছে, 'আর (শোনো) তোমাদের একান্ত প্রিয় সংগী, সে কোনো পাগল নয়। আর দিনের উজ্জ্বল আলোয় সে দেখেছে ওই জিবরাইলকে। আর গায়ব (অদেখা সে জিনিস) সম্পর্কে জানানোর ব্যাপারে সে মোটেই কৃপণ নয়। আর ওই কথাগুলো কোনো বিতাড়িত শয়তানের কথাও নয়। তবে (বলো) কোথায় তোমরা চলে যাচ্ছ? শোনো, ওই কথাগুলো গোটা বিশ্বের জন্যে ও তার অধিবাসীদের জন্যে এক মহা উপদেশ।'

ওরা সেই সম্মানিত নবী সম্পর্কে আপত্তিকর অনেক কথাই বলেছে। যাকে তারা সঠিকভাবে জানে, তাঁর বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কেও তারা খবর রাখে। তাঁর সত্যবাদিতা বিশ্বস্ততা ও ব্যক্তিত্বসহ সর্ববিষয়েই তারা ওয়াকেফহাল। তবু তারা বললো, ও পাগল, যে কথাগুলো সে বলছে তা এক শয়তান এসে ওকে বলে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ কথা তাঁর বিরুদ্ধে ও তাঁর আনীত দাওয়াতের বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হিসেবে বলতো যাতে করে ওই কথাগুলো অন্য কেউ মনোযোগ দিয়ে না শোনে। আবার কেউ ওই কথাগুলো বিস্মিত হয়ে এবং অনেক সময়ে ভয়ে পড়েও বলতো।

কেননা তাদের মধ্যকার দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি ওই সকল দেবদেবীর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতো না। তারা ওই দেব দেবীদেরকেও ভালোবাসতো, আর যেহেতু তাদের এক বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে, কবিদের সাথে সর্বদাই এমন কোনো জ্বিন থাকে, যে মাঝে মধ্যে নতুন ও অভিনব কথা তাদের শিখিয়ে দেয়। শয়তান অনেক সময় মানুষকে আছর করে এবং তার মুখ দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। এভাবে ওহীর মাধ্যমে যে সত্য কথাগুলো তাদের কাছে পৌঁছানো হচ্ছিলো, সেগুলোর যৌক্তিকতা খুঁজে দেখার মতো মানসিকতাও তারা হারিয়ে ফেলেছিলো। এভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহাবাণী থেকে তারা অনেক দূরে সরে থাকছিলো।

সুতরাং এ সময় কোরআন তার সর্বগ্রাহী সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা নিয়ে হাযির হলো। এ সূরার বর্তমান আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক চমৎকার বিবরণ দেয়া হয়েছে যা দেখে যে কোনো মানুষের মনে অবশ্যই এ কথা জাগে যে, কোরআনের এই সুমধুর বাণী এসেছে সেই মহিমান্বিত আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি দান করেছেন প্রকৃতির বুকে ওই অঢেল ও তুলনাহীন সুষমা আর তিনিই দিয়েছেন সেই রসূল (স.)-কে এক মহান চরিত্র।

তিনি কোরআনকে পৌঁছে দিয়েছেন পথহারা মানুষের দ্বারে দ্বারে। তিনি তো তাদের কাছে এমন কোনো নতুন ব্যক্তি নন যাকে তারা চেনে না বা জানে না। তিনি তাদের বহু বছরের চেনা জানা এক অতি মহান চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। তাদের কাছে পরম বিশ্বাসী ব্যক্তিই তো দেখেছেন সেই মর্যাদাবান ফেরেশতা জিবরাইলকে সঠিকভাবে নিজ চোখে এবং অতি স্পষ্টভাবে ওই দিকচক্রবালে। এ ব্যাপারে তাদের মনে কোনো প্রকার সন্দেহই ছিলোনা।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অন্তরেও সন্দেহের লেশমাত্র ছিলো না যে ওই মহান ফেরেশতা যে বাণী এনেছেন তা অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল ইযযতের কাছ থেকে পাওয়া এবং এ ব্যাপারে তার মন ছিলো সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন। অতএব, সে ফেরেশতার সততা ও সত্যবাদিতা ছিলো তাঁর কাছে নিশ্চিত বিশ্বাসের জিনিস।

এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'এগুলো কোনো মরদূদ শয়তানের কথা নয়।' এমন মযবুত স্থির, নিশ্চিন্ততার সাথে পরিপূর্ণ এবং নিশ্চয়তা দিয়ে কথা বলা কখনো শয়তানদের কাজ হতে পারে না। তাই চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং তাদের নির্বুদ্ধিতার দিকে ইংগিত করে বলা হচ্ছে, 'কোথায় চলেছো তোমরা?' অর্থাৎ কি কথা বলা স্থির করেছো তোমরা এবং কী করতে চাও বলো তো দেখি। সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ। যেখানেই তোমরা যাও না কেন সবখানেই আমার দূত তোমাদের মুখোমুখি হচ্ছে যুক্তি ও জ্ঞানের ক্ষুরধার তরবারি নিয়ে।

'অবশ্যই এ কালাম গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে এক মহা উপদেশ।' এমন উপদেশ, যা তাদেরকে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করে। জানায় তাদেরকে তাদের সৃষ্টির রহস্য এবং প্রকৃতির স্বরূপ। তাদেরকে সেই জিনিস অবহিত করে, যা তাদের চতুর্দিকে বিরাজ করছে। বিশ্ববাসীর জন্যে সে এক বিশ্বজনীন দাওয়াত। একেবারে গোড়াতেই এই দাওয়াত দান করা হয়েছে। কিন্তু মক্কায় এ দাওয়াত দানের পরিণতি হয়েছে বড়োই দুঃখজনক। এ দাওয়াত বার বার ঠোকর খেয়ে ফিরে এসেছে সাধারণভাবে। মক্কা ও মক্কাবাসীর আচার আচরণের দিকে তাকালে তাদের এ করুণ দৃশ্যই নযরে পড়ে।

হেদায়াত চেয়ে নিতে হয়

অপরদিকে ওহীলব্ধ এই সূক্ষ্ম বিবৃতি তাদেরকে একথাও স্পষ্ট করে জানাচ্ছে এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, হেদায়াতের সঠিক পথ যে পেতে চায়, তার জন্যে এ পথ বড়োই সহজ। সুতরাং তারা দায়ী হবে তাদের নিজেদের জন্যেই অর্থাৎ যে পথ পেতে চায় তাকে তো এ দাওয়াত অবশ্যই সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু যে এ দাওয়াতের বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা বুঝবে কিন্তু পার্থিব সুযোগ সুবিধা ও স্বার্থের কারণে তা গ্রহণ করবে না, তাদের এই হঠকারিতার জন্যে তাদের নিজেদেরকেই দায়ী হতে হবে।

অথচ পথ যারা পেতে চায়, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা সে পথপ্রাপ্তি সহজ করে দিয়েছেন। তাই ঘোষণা দেয়া হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যে চাইবে এ পথে দৃঢ় হয়ে থাকতে তার জন্যে এ দাওয়াত গ্রহণ করা সহজ'। যে মযবুত হয়ে থাকতে চায় আল্লাহর দেখানো পথে, যে চলতে চাইবে তাঁর রাস্তায়। এ কথাগুলো এসে যাওয়ার পর অবশ্যই এ দাওয়াত গ্রহণ সহজ। যে মযবুত হয়ে থাকতে চায় আল্লাহর দেখানো পথে, যে চলতে চাইবে তাঁর রাস্তায়, এ কথাগুলো এসে যাওয়ার পর অবশ্যই এ দাওয়াত গ্রহণ করা সহজ, যেহেতু এ বিবৃতি সকল সন্দেহ ঘুচিয়ে দেয় এবং সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করে দেয়। তখন অযুহাত দেখানোর আর কোনো উপায় থাকে না। কাজেই ভালো মনের অধিকারী ব্যক্তির কাছে এ ওহী সরল সঠিক ও সুন্দর পথকে কার্যকরভাবে

হাযির করে। এমতাবস্থায় দাওয়াত পাওয়ার পরও যে সত্যের পথকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে না, সত্য পথ থেকে ফিরে যাওয়ার জন্যে তাকেই দায়ী হতে হবে, যেহেতু তার সামনে সঠিক পথ দেদীপ্যমান ছিলো।

সত্য বলতে কি, সত্য পথের যৌক্তিকতা এবং ঈমান আনার জন্যে যে প্রমাণাদি প্রয়োজন তা মানুষের নিজের মধ্যে এবং বিশ্বের সবখানে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে প্রয়োজন ইচ্ছাকৃত এক পদক্ষেপ এবং অনমনীয় এক হঠকারী জিদ। বিশেষ করে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে যেসব যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো জানার পর তা না-বুঝা এবং সত্যকে গ্রহণ না করা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওই বিরোধীদের কাছে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে অবশেষে সেই মহাসত্য প্রতিষ্ঠার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা এসে গিয়েছে এবং হেদায়াতের পথ গ্রহণ করা মানুষের জন্যে অনেকাংশে সহজ হয়ে চলেছে তখন বাধ্য হয়ে তারাও সত্য পথ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে এলো এবং এটাও তারা বুঝলো যে, সবকিছুর ওপর পরাক্রমশালী আল্লাহর ইচ্ছাই আসল ইচ্ছা। এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী, 'তোমরা যা কিছু চাও তা হবার নয়, হবে তাই যা আল্লাহ তায়ালা চান।' আর এ কথা সম্ভবত এ জন্যেই বলা হয়েছে, যেন এ কথা তারা না বুঝে যে, তাদের ইচ্ছা আল্লাহর সেই ইচ্ছা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস যার দিকে সবকিছু ফিরে যাবে। এটা আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী যে তিনি সবাইকে স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন পথ বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিয়েছেন এবং হেদায়াতের পথ পাওয়াকে সহজ করে দিয়েছেন। অবশ্যই সবকিছু আল্লাহর সেই সর্বব্যাপী ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে, যা চিরদিন বিজয়ী ছিলো এবং বিজয়ী হবে।

মহান সৃষ্টিকর্তা রব্বুল ইযযতের ইচ্ছার বর্ণনা কোরআনে কারীমের যতো জায়গাতে এসেছে, সে সবখানেই এ সকল যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানী চিন্তা-চেতনাকে সঠিক বলে ঘোষণা করা এবং আল্লাহর মহান ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করা। বিশ্ববাসীকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে তার সবকিছুকে অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছাই মেনে নিতে হবে। এখন একটি প্রশ্ন জাগে যে, মানুষের কিছু ইচ্ছা যে বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়, তা কিভাবে হয়? তার জবাব হচ্ছে, মানুষকে দেয়া কিছু ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষমতা তাও আল্লাহর ইচ্ছার একটি অংশ মাত্র। যেমন রয়েছে অন্যান্য স্থানে তাকদীর ও তাদবীরের সম্পর্ক। তার সঠিক মর্যাদা বুঝতে হলে ফেরেশতাদের দিকে তাকাতে হবে, যারা নিরন্তর আল্লাহর নির্দেশগুলো যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে এবং যেসব নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হচ্ছে তা পালন করতে তারা পুরোপুরি সক্ষমও বটে। মানুষকেও শিক্ষাদান করা এবং সবকিছুর বিবরণ জানানোর পরে, ভালো ও মন্দের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেয়ার যে স্বাধীনতা- এই স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের যে ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়েছে তাও সেই মহামহিমের মহান ইচ্ছার একটি দিক মাত্র।

মোমেনদের ধ্যান-ধারণার মধ্যেও এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করা জরুরী যাতে করে তারা প্রকৃত সত্যকে যথাযথভাবে বুঝে। সাহায্য ও সক্ষমতা লাভের জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছেই প্রার্থনা জানায় এবং এ পথে চলতে গিয়ে কী প্রয়োজন এবং কোন্ পথ গ্রহণ করা উচিত তা বুঝার জন্যে তার সাথেই যোগাযোগ করে।

সূরা আল এনফেতার

আয়াত ১৯ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبِحَارُ
فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥
يٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝٦ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ
فَعَدَلَكَ ۝٧ فِيْٓ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝٩
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝١٠ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝١١ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝١٢
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۝١٤ يَّصْلَوْنَهَا
يَوْمَ الدِّيْنِ ۝١٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝١٦ وَمَآ أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٧

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. যখন আসমান ফেটে পড়বে, ২. যখন তারাগুলো ঝরে পড়বে, ৩. যখন সাগরকে উত্তাল করে তোলা হবে, ৪. যখন কবরগুলো উপড়ে ফেলা হবে, ৫. (তখন) প্রতিটি মানুষই জেনে যাবে, সে (এখানকার জন্যে) কি পাঠিয়েছে এবং কি সে (অসমাপ্ত) রেখে এসেছে: ৬. হে মানুষ, কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার মহামহিম মালিকের ব্যাপারে ধোকায় ফেলে রাখলো? ৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি তোমাকে সোজা সুঠাম করিয়েছেন এবং তোমাকে সুসমঞ্জস করেছেন, ৮. তিনি যেভাবে চেয়েছেন সে আংগিকেই তোমাকে গঠন করেছেন; ৯. না (এ কি), তোমরা শেষ বিচারের দিনটিকেই অস্বীকার করছো, ১০. অথচ তোমাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত (করা) আছে, ১১. এরা (হচ্ছেন) সম্মানিত লেখক, ১২. যারা জানে তোমরা যা কিছু করছো। ১৩. নিসন্দেহে নেক লোকেরা (সেদিন আল্লাহর) অসীম নেয়ামতে (পরমানন্দে) থাকবে, ১৪. আর পাপী-তাপীরা অবশ্যই থাকবে জাহান্নামে, ১৫. শেষ বিচারের দিন তারা (সবাই ঠিকমতো) সেখানে পৌঁছে যাবে। ১৬. সেখান থেকে তারা আর কোনোদিনই নিষ্কৃতি পাবে না; ১৭. তুমি কি জানো শেষ বিচারের দিনটি কি?

ثُمَّ مَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ

وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

১৮. হ্যাঁ, (সত্যিই) যদি তোমরা সে দিনটির কথা জানতে; ১৯. যেদিন কোনো মানুষই একজন আরেক জনের কাজে আসবে না; আর সেদিন ফয়সালার সব ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই ক্ষুদ্র সূরাটিতে পূর্ববর্তী সূরা আত্-তাকওয়ীরে আলোচিত একই মহাজাগতিক বিপ্লব সম্পর্কিত আলোচনা অব্যহত রয়েছে। তবে এ সূরাটি নিজের এক ভিন্নতর বলয় সৃষ্টি করে, একটা সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশ দান করে, স্বতন্ত্র কতোগুলো পরিমন্ডলের দিকে আসল বক্তব্যকে কেন্দ্রীভূত করে এবং তার অভ্যন্তরেই মানব হৃদয়কে আবর্তিত করে। এ সূরা মানুষের চেতনায় পূর্ববর্তী সূরা থেকে ভিন্নতর প্রকৃতির এক পরশ বুলায় এটা অত্যন্ত গভীর, শান্ত ও মৃদু। সেই পরশ কিছুটা ভর্ৎসনা ধরনের, আবার পরোক্ষভাবে কিছুটা হুমকি এবং হুশিয়ারীও তার ভেতরে বিদ্যমান।

এজন্য সূরাটিতে সেই বিপ্লবের বিভিন্ন দৃশ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। তবে সূরা তাকওয়ীরের ন্যায় এ বিষয়টি এখানে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়নি। কেননা, ভর্ৎসনার পরিবেশ ও পরিমন্ডল এখানে অপেক্ষাকৃত মৃদু ও গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং তার প্রভাব বিস্তারের গতিও অপেক্ষাকৃত শ্লথ। সূরার সুর ব্যঞ্জনার প্রভাবও এখানে তদ্রূপ। সুতরাং বলা যায়, এই মৃদু ভর্ৎসনাই এ সূরার মূল ভাবধারা। কাজেই সূরার সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এ বৈশিষ্টটির পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাযুজ্য রয়েছে।

সূরাটির প্রথম প্যারায় আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্রমন্ডলীর বিক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়া, সমুদ্রের উদ্বেলিত ও আলোড়িত হওয়া এবং কবর উন্মোচিত হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। এগুলোকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন তা সংঘটিত হবেই এবং প্রত্যেক জীব আগে ও পরে কী পাঠিয়েছে, তা সে অবহিত হবেই। এগুলো সবই যেন সেই ভয়াল সময়ের দৃশ্যমান পার্শ্বচিত্র।

দ্বিতীয় প্যারায় প্রছন্ন হুমকি মিশ্রিত ভর্ৎসনার সূচনা করা হয়েছে। যে মানুষ আপন ব্যক্তিসত্ত্বা ও দেহ কাঠামোতে নিরন্তর স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অগণিত অনুগ্রহ লাভ করে থাকে অথচ সেই অনুগ্রহের যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়না এবং আপন প্রতিপালকের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত নয়, আর তার দেয়া সম্মান, মর্যাদা ও অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞও নয়, সেই সব অকৃতজ্ঞ মানুষের প্রতিই উচ্চারিত হয়েছে এ ভর্ৎসনা। বলা হয়েছে, হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুঠাম করেছেন, সুসামস্য করেছেন, তিনি যেমন চেয়েছেন তেমন আকৃতিতেই তোমাকে গঠন করেছেন।

তৃতীয় প্যারায় এই অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাসের কারণ নির্ণয় করা হয়েছে। সে কারণটি হলো, কর্মফল দিবস তথা হিসাব নিকাশের দিনকে অস্বীকার করা। এই জিনিসটি অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা থেকেই সকল ধরনের অপকর্মের উৎপত্তি হয়। এ কারণেই এই হিসাব-নিকাশের কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে। সেই সাথে এই হিসাব-নিকাশের অবধারিত ফলাফল সম্পর্কেও সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত বিশ্বাস জন্মানো হয়েছে। বলা হয়েছে, না, 'কখনো না, তোমরা তো কর্মফল দিবসকে অস্বীকার

করে থাকো। নিসন্দেহে তোমাদের ওপর প্রহরীর মতো নিয়োজিত রয়েছেন সম্মানিত লেখকরা। তোমরা যাই করো, তা তারা জানেন।'

সর্বশেষ প্যারাটিতে হিসাব-নিকাশের দিনটির ভয়াবহতা ও বিশালতা সম্পর্কে এবং সেদিন যে মানুষের কোনো শক্তি-সামর্থ থাকবে না সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। সেদিন একমাত্র আল্লাহই হবেন সর্বময় কর্তা। বলা হয়েছে, তুমি জানো বিচার দিবস সম্পর্কে? আবার বলছি, তুমি কি জানো বিচার দিবস সম্পর্কে? সেদিন কোনো প্রাণীরই কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে না। সকল ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহর!

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গোটা আমপারায় মানব মনকে বিবিধ পন্থায় ও উপায়ে প্রভাবিত করা ও তাতে করাঘাত করার যে ধারা প্রবহমান রয়েছে, আলোচ্য সূরাটি সামগ্রিকভাবে সেই ধারারই একটি অংশ।

তাফসীর

'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন গ্রহ-নক্ষত্রগুলো বিক্ষিপ্ত হবে, যখন সমুদ্রগুলোকে উদ্বেলিত করা হবে এবং যখন কবরগুলোকে খুলে দেয়া হবে, তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী সে পেছনে রেখে গেছে।'

মহাবিশ্বের গভীর পর্যবেক্ষণের ফলে মানুষের স্নায়ুতে যে মর্মবাণী ছড়িয়ে যায়, সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী সূরায় আমি আলোচনা করেছি। পরিবর্তনের যোগ্যতাসম্পন্ন হাত মাত্রই এ মর্মবাণীকে ধারণ করে এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিপ্লবের ঝাঁকুনিতে তা আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়। এ বিশাল বিশ্বে কোনো বস্তুই অপরিবর্তিত থাকে না। এই মর্মবাণী মানুষকে তার আকর্ষণ ও আসক্তির যাবতীয় বস্তু বর্জনে উদ্বুদ্ধ করে, কেবলমাত্র আল্লাহকে ছাড়া, যিনি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং যিনি সকল বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন, আর সেই চিরন্তন মহাসত্য– যার পরিবর্তন নেই এবং স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনায় এই মহাসত্যের কাছ থেকেই মানুষ সহায়তা লাভ করতে পারে। মহান স্রষ্টা ও মাবুদ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ স্থিতিশীল ও চিরঞ্জীব নয়।

মহা প্রলয়

কেয়ামতের সেই মহাপ্রলয়ের আলামত হিসাবে এখানে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। কিঞ্চিৎ শাব্দিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্যান্য স্থানেও এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন সূরা আর রহমান'-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যেদিন আকাশ চৌচির হবে, সেদিন তা রক্তের মতো লাল চামড়ার রূপ ধারণ করবে। সূরা 'আল হাক্কা'তে বলা হয়েছে, 'আকাশ খানখান হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।' সূরা এনশেকাকে বলা হয়েছে, 'যখন আকাশ ফেটে যাবে।' বস্তুত আকাশের বিদীর্ণ হওয়া বা ফেটে চৌচির হওয়াটা সেই সংকটময় দিনের অন্যতম একটি বাস্তব ঘটনা। তবে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য কী, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা দুস্কর। অনুরূপভাবে বিদীর্ণ হওয়া বা ফেটে যাওয়ার রূপটা কেমন হবে, তাও বলা কঠিন। তবে এ দ্বারা যে জিনিসটি চেতনার ফলকে প্রতিফলিত হয়, তাহলো আমাদের নিত্য পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বজগতের কাঠামোতে একটা আমূল পরিবর্তন, তা বর্তমান ব্যবস্থার অবসান এবং তার প্রচলিত এই সূক্ষ্ম প্রশাসনিক অবকাঠামোর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার একটা দৃশ্য।

এই দৃশ্যটির আরেকটি পার্শ্বচিত্র হলো সূরায় আলোচিত নক্ষত্রমন্ডলীর বিক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়ার বিষয়টি। বর্তমানে এই নক্ষত্রমন্ডলী যেরূপ অটুট বন্ধনে আবদ্ধ থেকে প্রচন্ড গতিবেগে

মহাশূন্যের নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, যেভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ সীমানার মধ্যে থেকে অন্যের সীমানাকে বিন্দুমাত্রও না মাড়িয়ে অবাধে বিচরণ করেছে, যেভাবে কোনো নক্ষত্র এই বিশাল মহাশূন্যে–যার সীমা-সরহদ কারো জানা নেই–এমনভাবে বিচরণ করছে যে, কখনো সে নিজ কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়ছে না, তারপরও সেদিন তাতে এই অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দেবে। এই নক্ষত্রমন্ডলীর আয়ুস্কাল যেদিন সত্যিই ফুরিয়ে যাবে। সেদিন তারা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়বে এবং নিজ নিজ অদৃশ্য ও অটুট সংযোগসূত্র ও রক্ষাব্যূহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়বে, তখন তা সমগ্র মহাশূন্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়বে, ঠিক যেমন অণু স্বীয় বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে যায়।

সমুদ্রের উদ্বেলিত হওয়ার ব্যাপারটা এভাবে ঘটতে পারে যে, তার পানি স্ফীত হয়ে শুষ্কমন্ডলকে ও নদ নদীকে প্লাবিত করবে। আবার এর অর্থ পানির দু'টি উপাদান-অক্সিজেন ও হাউড্রোজেনকে পানি থেকে আলাদা করে ফেলাও হতে পারে। এতে করে সমুদ্রের সমস্ত পানি এই দু'টি গ্যাসে রূপান্তরিত হবে, যেমন আল্লাহর ইচ্ছায় ওই দু'টি গ্যাস একত্রিত হওয়া ও তা দ্বারা সমুদ্র সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত তা এমনি ছিলো। এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ দুটি গ্যাসের অণু-পরমাণুগুলো একটা অপরটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যেমন আজকাল আণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হয়। যদি এই শেষোক্ত ব্যাপরটিই ঘটে, তাহলে এ বিস্ফোরণটি এমন প্রচন্ড ও ভয়াবহ হবে যে, তার মোকাবেলায় বর্তমানে প্রচলিত ত্রাস সৃষ্টিকারী বোমাগুলো শিশুদের খেলনার মতো মনে হবে। অথবা এ ব্যাপারটা বর্তমান মানবজাতির অজানা অন্য কোনো উপায়েও সংঘটিত হতে পারে। তবে যে উপায়েই তা ঘটুক, তা যে মানুষের চিন্তা ও কল্পনা-বহির্ভূত পর্যায়ের আতংকজনক ঘটনা হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কবর উন্মোচিত হওয়ার ব্যাপারটা পূর্ববর্তী এই সব ঘটনার কোনোটির কারণে সংঘটিত হতে পারে, আবার সেই ঘটনাবহুল দিনে আলাদাভাবে সংঘটিত ব্যাপারও হতে পারে। অতপর সেই কবর থেকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্নির্মিত দেহসমুহ বের হবে– ঠিক যেভাবে তাকে ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে। অতপর তারা হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলের সম্মুখীন হবে। এই দৃশ্যের বর্ণনা দেয়ার পর এর দ্বারা সমর্থিত ও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর একটি বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে এবং তা হচ্ছে 'প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখে গেছে।' অর্থাৎ কী সে প্রথম জীবনে করেছে এবং কী শেষ জীবনে করেছে। অথবা কী সে নিজ জীবনে করেছে এবং কী সে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে রেখে এসেছে। অথবা কী সে দুনিয়াতে ভোগ করে নিঃশেষ করে এসেছে এবং কী সে আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে।

এর অর্থ যাই হোক না কেন, এটা সুনিশ্চিত যে, মানুষ যখন নিজের কৃতকর্মের কথা জানবে এবং একই সাথে সেই ত্রাসজনক ঘটনাবলীও সংঘটিত হবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই এ দৃশ্যাবলী ও ঘটনাবলী যেমন আতংকজনক হবে, তেমনি তার জন্যে তার নিজের কৃতকর্মও উদ্বেগজনক হবে।

বস্তুত কোরআনের এ উক্তি 'প্রত্যেকে জানবে সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখে গেছে–' এক অতীব চমকপ্রদ বর্ণনাভংগির উদাহরণ পেশ করে। অনুরূপভাবে মানুষের সেদিন নিজের কৃতকর্মের অগ্র-পশ্চাৎ জানা যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট সীমায় গিয়ে থেমে থাকবে না, তাই এই জানা হবে সেদিনকার আতংকজনক ঘটনাবলীর মতোই ভীতিপ্রদ। এ বিষয়টা শব্দের মাধ্যমে

স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে কেবল অভিব্যক্তির ওপরই এখানে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। একারণেই এটি অধিকতর তাৎপর্যবহ ও প্রভাবশালী।

মানুষের দৈহিক গঠন প্রক্রিয়া

বিবেকবুদ্ধি ও চেতনা জাগ্রতকারী এই দৃশ্যের বর্ণনা দেয়ার পর কোরআন মানুষের বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়েই দেখতে পারবে, সে এ ব্যাপারে একেবারেই গাফেল ও উদাসীন। এখানে এসেই সে তার হৃদয়ে একটি স্নেহমাখা তিরস্কারের পরশ বুলিয়ে দেয়, প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয় এবং তার ওপর আল্লাহ তায়ালা যে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সে অনুগ্রহটি হচ্ছে তাকে ভারসাম্যপূর্ণ সুঠাম একটি দেহ দান করা। অথচ তাকে কি ধরনের আকৃতি দেবেন সেটা স্বয়ং তার প্রতিপালকেরই নিরংকুশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার ছিলো। তথাপি নিজ অনুগ্রহে তিনি এই সুসাম স্য ও সুন্দর দেহ দান করলেন। এ জন্য সে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না এবং তার মুল্যায়নও করে না।

'হে মানুষ!' 'এখানে 'হে মানুষ' বলে সম্বোধন করার তাৎপর্য হলো, তার সত্ত্বার সবচেয়ে সম্মানজনক দিকটি তুলে ধরা। সেটি হচ্ছে তার মনুষ্যত্ব। এটি দ্বারাই সে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের সুবাদেই সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে।

অতপর সেই সম্ভ্রমপূর্ণ সুন্দর ভর্ৎসনাটি উচ্চারণ করে বলেন যে, 'তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করলো?' হে মানুষ! যাকে তোমার প্রতিপালক সম্মানিত করেছেন, যিনি তোমার লালন পালনকারী ও তত্ত্বাবধায়ক, তোমার মহান মনুষ্যত্বের যিনি একমাত্র সংরক্ষক, কিসে তোমাকে তোমার সেই প্রতিপালকের ব্যাপারে বিপথগামী করলো, যার ফলে তুমি তাঁর অধিকার আদায়ে গাফলতি করছো, তাঁর প্রতি অশালীন আচরণ করছো, তাঁর প্রতি উদাসীন থাকছো? অথচ তিনি তোমার সুমহান প্রভু ও মনিব! যিনি তোমাকে মনুষ্যত্ব দান করেছেন, যা দ্বারা তুমি গোটা সৃষ্টির সেরা হয়েছে যা দ্বারা তুমি ন্যায় ও অন্যায়ের বাছবিচার করতে শিখেছো?

অতপর আল্লাহর এই বদান্যতা ও অনুগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে, যা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতের শুরুতে মানুষকে তার মনুষ্যত্বের নামে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এই মনুষ্যত্ব হচ্ছে তাকে প্রদত্ত আল্লাহর অপার দান। এরপর এই দানের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে তার দেহের সুঠাম, সুন্দর সুসামঞ্জস্য গঠনের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজ ইচ্ছামতো যে কোনো ধরনের দৈহিক গঠন দিতে পারতেন। কিন্তু তাকে এই সুঠাম গঠন দিয়েছেন আপন ইচ্ছাক্রমে। এটা তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও মহানুভবতা। অকৃতজ্ঞ মানুষের ওপর তিনি এহেন মহানুভবতা দেখিয়েছেন। শুধু অকৃতজ্ঞ নয়, গর্বিত ও উদাসীন মানুষের ওপরও।

'হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুগঠিত করেছেন ও সুসামঞ্জস্য করেছেন?' এটি এমন একটি সম্বোধন, যা জাগ্রত মানব সত্ত্বার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে শিহরণ তোলে, অন্তরের অন্তস্থলে চেতনার সঞ্চার করে। তার মহানুভব প্রতিপালক তাকে এই ভাবগম্ভীর ভর্ৎসনা করেন এবং তাকে দেয়া এই অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেন তখন, যখন সে অলসতা ও উদাসীনতায় নিমজ্জিত, যখন সে তার স্রষ্টা, তার সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য সত্ত্বার নির্মাতা মনিবের মর্যাদা সম্পর্কে অচেতন।

বস্তুত মানুষকে তার বর্তমান সুন্দর, সুঠাম, সুসামঞ্জস্য আকৃতি ও কর্মক্ষমতা উভয় দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বা দিয়ে সৃষ্টি করার এই অতুলনীয় কীর্তি মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে তার সুদীর্ঘ চিন্তা, সুগভীর কৃতজ্ঞতা, অবিমিশ্র বিনয় ও ভালোবাসার প্রেরণা যোগায়। কেননা তিনি ইচ্ছা করলে তাকে অন্য কোনো আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু নিছক স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারেই তিনি এই সুন্দর সুসামঞ্জস্য আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ শুধু যে সুন্দর, সুগঠিত ও সুসামঞ্জস্য আকৃতির অধিকারী তা-ই নয়, বরং তার সত্ত্বায় এতো বিস্ময়কর ও অতুলনীয় সৃষ্টিকর্মের সমাবেশ ঘটেছে যে, তা তার নিজের উপলব্ধি ক্ষমতারও আয়ত্বের বাইরে এবং তার আশপাশে যতো সৃষ্টি দৃশ্যমান তার চেয়েও চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। তার দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাতিক সত্ত্বা একই পর্যায়ের সৌন্দর্য, সমতা ও ভারসাম্য বিরাজমান, আর তা তার সমগ্র সত্ত্বা অত্যন্ত সুন্দর ও সুষমামন্ডিত ভাবে দৃশ্যমান।

মানুষের আংগিক গঠন-প্রকৃতি, তার সূক্ষ্মতা ও জটিলতা এবং তার সংগতি ও অখন্ডতার চমকপ্রদ বিবরণ নিয়ে এ যাবত বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে এই দৈহিক কাঠামো সংক্রান্ত বিস্ময়কর তথ্যসমূহ পুরোপুরিভাবে তুলে ধরার অবকাশ নেই। আমি শুধু এর কয়েকটির প্রতি ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট মনে করবো।

মানুষের দৈহিক কাঠামোর সাধারণ অংশগুলো হলো, অস্থিমন্ডল, অন্দ্রিমন্ডল, চর্ম, পরিপাকযন্ত্র, রক্ত সঞ্চালন প্রণালী, শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা, জননেন্দ্রী প্রণালী, স্নায়ুমন্ডল, প্রস্রাব যন্ত্র, আস্বাদন ব্যবস্থা, আঘ্রাণ ব্যবস্থা, শ্রবনেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয়। উল্লেখিত অংশগুলোর প্রত্যেকটি এমন বিস্ময়কর, যার সাথে আধুনিক যুগের হতবুদ্ধিকর শৈল্পিক বিস্ময়গুলোর কোনো তুলনাই হয় না। বস্তুত মানুষ তার নিজ সত্ত্বার এসব বিস্ময়কে ভুলে থাকলেও এর চেয়ে গভীর, সুক্ষ্ম ও বৃহৎ বিস্ময় আর কল্পনা করা যায় না।

ইংলিশ সায়েন্স ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে যে, মানুষের হাত হচ্ছে এক অতুলনীয় বিস্ময়। দ্রুত সংকোচন ও সম্প্রসারণশীল। সহজ কর্মক্ষমতা ও ব্যবহারের ব্যাপকতায় হাতের সমকক্ষ কোনো যন্ত্র তৈরী করা শুধু কঠিন নয় বরং একবারেই অসম্ভব। যখন কেউ একটা বই পড়তে ইচ্ছা করে, তখন সে নিজ হাত দ্বারা তা প্রথমে ধরে, তারপর তাকে পড়ার উপযুক্ত অবস্থানে রাখে। এই সময় এই হাতই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার অবস্থানকে শুধরে দেয়। যখন সে তার একটি পাতা ওল্টাতে চেষ্টা করে, তখন তার আংগুলগুলোকে পাতার নিচে স্থাপন করে। অতপর যতটুকু চাপ দিলে পাতা ওল্টানো যায় আংগুলে ততোটুকুই চাপই সে দেয়। তারপর পাতা ওল্টানোর সাথে সাথে সেই চাপের ক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। হাতই কলম ধরে এবং তা দিয়ে লেখে। চামচ থেকে শুরু করে ছুরি ও টাইপযন্ত্র পর্যন্ত মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামকে এই হাতই ব্যবহার ও নাড়াচাড়া করে। জানালা-দরজা খোলে ও বন্ধ করে, মানুষ যা চায় তা বহন করে। দুই হাতে ২৭টি অস্থি রয়েছে এবং প্রত্যেক হাতের ১৯টি শিরাতন্ত্রী রয়েছে।' ('আধুনিক বিজ্ঞান ও আল্লাহ' অধ্যাপক আবদুর রাযযাক নওফেল)।

'বিজ্ঞান মানুষকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করে' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে 'মানুষের কানের একটি অংশ (অর্থাৎ কানের ভেতরে অংশ) প্রায় চার হাজার সূক্ষ্ম ও জটিল বক্র যন্ত্রের সমষ্টি। এর প্রত্যেকটি যন্ত্র ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে ধারাবাহিকভাবে এক সাথে বাঁধা। বলা যেতে পারে যে, এই ক্ষুদ্র যন্ত্রগুলো বাদ্যযন্ত্র সদৃশ্য। মনে হয়, এটি এমন একটি হাতিয়ার, যা মেঘের গর্জন থেকে শুরু করে গাছের পাতার মর্মরধ্বনি পর্যন্ত এবং বাদ্যযন্ত্রের মিহিসুর পর্যন্ত সকল তীব্র বা মৃদু শব্দকে মগজ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।'

'আধুনিক বিজ্ঞান ও আল্লাহ' নামক গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, দর্শন-যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে চোখ, যা নিজে ১৩ কোটি আলো বিকিরণকারী যন্ত্রের সমষ্টি এবং এই সকল যন্ত্র হচ্ছে স্নায়ুর কেন্দ্রবিন্দু। ভ্রূআচ্ছাদিত চোখের পাতায়, চোখের দিনরাত রক্ষণাবেক্ষন করে এবং এই পাতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নড়াচড়া করে। এটি নাড়াতে কোনো ইচ্ছার দরকার হয় না। ধূলাবালি, মাটি, কংকর প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষতিকর বহিরাগত জিনিস থেকে এই পাতাই চোখকে রক্ষা করে। অনুরূপভাবে ভ্রূর ছায়া তাকে সূর্যের উত্তাপের প্রখরতা থেকেও রক্ষা করে। চোখের পাতার ক্রমাগত উত্থান-পতন চোখকে বহিরাগত ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করা ছাড়াও চোখের শুষ্কতা প্রতিরোধ করে। চোখের পানি, যাকে অশ্রু বলা হয়ে থাকে, তা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী নিষ্কাশক।

মানুষের আস্বাদন-যন্ত্র হলো জিহ্বা। প্রতিটি মানুষের শৈল্পিক ঝিল্লীর জীবাণুসমূহের মধ্যে বিরাজমান বিপুল সংখ্যক আস্বাদন কোষই জিহ্বার কর্মতৎপরতার উৎস। আর এ সব জীবাণু হয় বিভিন্ন আকৃতির। কতক আছে সুতোর মতো, কতক ছত্রাক ধরনের, কতক মসুরের দানার মতো। জিহ্বার যে স্নায়ুতন্ত্রী ও স্বাদতন্ত্রী খাদ্যনালীর সাথে সংযুক্ত তার শাখা-প্রশাখাই এই সব জীবাণুর খাদ্য যোগায়। আহারের সময় কেবল স্বাদতন্ত্রীতেই প্রতিক্রিয়া হয় এবং এই প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ মগজে পৌঁছে যায়।

জিহ্বা মানুষের মুখগহ্বরের সম্মুখভাগেই বিদ্যমান, যাতে ক্ষতিকর জিনিস মাত্রকেই সে সংগে সংগে উগলে ফেলে দিতে পারে। কোনো জিনিস তিক্ত না মিষ্টি, ঠাণ্ডা না গরম, টক না লোনা, কোমল না কটু, তা মানুষ এই যন্ত্রটি দ্বারাই টের পায়। জিহ্বার রয়েছে, ৯ হাজার সূক্ষ্ম আস্বাদন কেন্দ্র, যার প্রতিটি একাধিক স্নায়ুতন্ত্রী দ্বারা মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত। এখন স্নায়ুতন্ত্রীর সংখ্যা কতো ও আকৃতি কেমন এবং কিভাবে তা স্বতন্ত্র ও এককভাবে কাজ করে এবং কিভাবেই মস্তিষ্কের সাথে অনুভূতির সংযোগ ঘটায় সে প্রশ্নের জবাব ও জানা প্রয়োজন।

সমগ্র দেহের ওপর পূর্ণাংগ প্রধান্য বিস্তারকারী স্নায়ুতন্ত্রী এক ধরনের সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট নল দ্বারা তৈরী। এই নলের সংখ্যা বহু এবং তা শরীরের সবত্র বিস্তৃত। এই নলগুলো তার চেয়েও বড় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রীর সাথে সংযুক্ত হয়। তাই শরীরের কোনো একটি অংশও যখন কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়, চাই তা চারপাশের পরিবেশের বিরাজমান তাপের সামান্য পরিবর্তনের কারণেই হোক না কেন, স্নায়ূতন্ত্রীগুলো সেই অনুভূতিকে সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে থাকা কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছিয়ে দেয়, আর এই কেন্দ্রগুলো সেই অনুভূতিকে পৌঁছিয়ে দেয় মস্তিকে। এই অনুভূতি মস্তিষ্ককে কর্মক্ষম ও সক্রিয় করে তোলে। স্নায়ূতন্ত্রীতে ইংগিত ও সংকেতের যাতায়াতের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে একশো মিটার। (আল্লাহ ওয়াল-ইলমুল জাদীদ-আল্লাহ ও আধুনিক বিজ্ঞান)।

আর যখন আমরা হজম প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দেই এবং পরিপাকযন্ত্রকে একটা রাসায়নিক কারখানা হিসাবে এবং যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তাকে অপ্রক্রিয়াজাত দ্রব্য হিসাবে বিবেচনা করি, তখন আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বুঝতে পারি, ওটা একটা বিস্ময়কর প্রক্রিয়া। কারণ এই প্রক্রিয়া খোদ পরিপাক যন্ত্রটি ছাড়া আর প্রায় সকল ভুক্ত দ্রব্যকে হজম করে ফেলে। প্রথমে তো আমরা এতো হরেক রকমের খাদ্য নিক্ষেপ করি কাঁচা মাল হিসাবে। এ সময়ে খোদ কারখানা সম্পর্কে যেমন আমরা কোনো কথা বিবেচনায় আনি না, তেমনি পরিপাকক্রিয়া কিভাবে কোন্ রাসায়নিক তত্ত্ব অনুসারে পরিচালিত হয় তাও ভেবে দেখি না। আমরা গোশ্‌ত ভুনা, মাছ ও তরি তরকারি ইত্যাদি খাই এবং যে কোনো পরিমাণ পানি দ্বারা তাকে পাকস্থলীতে ঠেলে দেই।

অতপর এই মিশ্রন থেকে পাকস্থলী বেছে নেয় শুধুমাত্র উপকারী দ্রব্যগুলোকে। প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যকে সে চূর্ণবিচূর্ণ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন করে। এ ক্ষেত্রে বেঁচে যাওয়া অতিরিক্ত জিনিসগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। অতপর বাদবাকী দ্রব্যগুলোকে সে পুনরায় নতুন প্রোটিনে পরিণত করে—যা বিভিন্ন কোষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরিপাকযন্ত্র দেহের জন্য প্রয়োজনীয় চুন, গন্ধক, আয়োডিন, লোহা এবং অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করে। সেই সাথে এ ব্যাপারেও যত্নবান থাকে যাতে এ সব জিনিসের মৌলিক উপাদানগুলো নষ্ট না হয়, হরমন উৎপাদনের সম্ভাবনা অক্ষুণ্ন থাকে, জীবনের জন্যে অত্যাশ্যক যাবতীয় জিনিস যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং যে কোন প্রয়োজন মেটানোর জন্য তা সদা প্রস্তুত থাকে। পরিপাকযন্ত্র বা পাকস্থলী ক্ষুধাসহ যে কোনো জরুরী অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য তেল ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে রাখে।

মানুষের যাবতীয় চিন্তা গবেষণা কিংবা যুক্তিতর্ক প্রদর্শন সত্তেও উল্লেখিত কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। বস্তুত আমরা এই সমস্ত উপকরণ উল্লেখিত রাসায়নিক কারখানায় প্রতিনিয়ত সরবরাহ করে থাকি। কিন্তু আমরা কি কি জিনিস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করছি, সেগুলো প্রায় পুরোপুরিই আমাদের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত থাকে। (অর্থাৎ প্রতিটি আহার্য দ্রব্যের দোষগুণ বিবেচনা করি না)।

জীবন ধারণের জন্যে এই স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার ওপরই আমরা নির্ভর করে বসে থাকি। যখন এই সকল ভুক্ত দ্রব্য হজম হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং নবতর জিনিসে পরিণত হয়, তখন দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান কোটি কোটি কোষের মধ্য থেকে প্রতিটি কোষের কাছে তাকে প্রতিনিয়ত পৌঁছানো হাতে থাকে। এক একজন মানুষের দেহে বিদ্যমান এই সব কোষের সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যার চেয়েও বেশী।

প্রতিটি স্বতন্ত্র কোষের কাছে এই সরবরাহ প্রতিনিয়ত চালূ থাকা জরুরী। আর এটাও জরুরী যে, সেই নির্দিষ্ট কোষটির জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন, তা ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ যেন তাকে সরবরাহ করা না হয়। নির্দিষ্ট কোষটির এ উপকরণগুলোর প্রয়োজন হয় ওগুলোকে দিয়ে হাড়, নখ, গোশ্‌ত, চুল, চোখ ও দাঁত গঠনের জন্য। সংশ্লিষ্ট কোষটি এ সব উপকরণ পাওয়া মাত্রই হাড়, গোশত, দাঁত, চোখ ইত্যাদি গঠন করা শুরু করে দেয়।

'অতএব এটা এমন একটা রাসায়নিক কারখানা যা মানুষের মেধা দ্বারা উদ্ভাবিত যে কোনো কারখানার তুলনায় ঢের বেশী উৎপাদন করে। এখানে এমন একটা সরবরাহ ব্যবস্থাও তৎপর, যা দুনিয়ার মানুষের চেনাজানা যে কোনো পরিবহন ব্যবস্থা বা বন্টন ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বড় ও বিশাল। এখানে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন হয় সর্বোচ্চ পর্যায়ের শৃংখলার সাথে।' (আল-ইল্‌মু ইয়াদ্‌দূ ইলাল ঈমান'-ঈমানের প্রেরণা সৃষ্টিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

মানুষের দেহের অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ সম্পর্কে অনেক কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু এ সব অংগ স্পষ্টতই অলৌকিকত্বের দাবীদার। যদিও এগুলোতেও কোনো না কোনোভাবে অন্যান্য জীব-জানোয়ার অংশীদার, তথাপি এগুলো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ও আধ্যাত্মিক বিশেষত্বের প্রতীক হিসাবে বিরাজ করছে। আর এ কারণেই এগুলো আলোচ্য সূরায় বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে স্থান পেয়েছে। সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াতে 'হে মানুষ' বলে সম্বোধন করার পর বলা হয়েছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন।'

এই বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তির উপলব্ধির নিগূঢ় রহস্য আমাদের অজানা। কেননা বুদ্ধিবৃত্তি বা বিবেক স্বয়ং আমাদের বোধশক্তি বা উপলব্ধির হাতিয়ার। বিবেক নিজেকে কখনো উপলব্ধি করতে পারে না। সে যা কিছু উপলব্ধি করে, তাও কিভাবে করে সেটা সে বুঝতে অক্ষম।

এই সমস্ত বোধকযন্ত্র যে সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে, সেটা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, সে এগুলোর অর্জিত তথ্যসমূহ কোথায় সংরক্ষণ করে। মস্তিষ্ক যদি একটি রেকর্ডকারী টেপ হতো, তাহলে মানুষের গড় বয়স ষাট বছরে লক্ষ লক্ষ মিটার টেপের প্রয়োজন হতো, যাতে এত বিপুল সংখ্যক ছবি, কথা, তত্ত্ব ও তথ্য এবং আবেগ ও অনুভুতিকে রেকর্ড রাখা যায় এবং যাতে পরবর্তী সময় তা স্মরণ করা যায়। কার্যতও মানুষ বহু দশক পরেও অতীতের অনেক কিছুই স্মরণ করতে পারে।

আরো প্রশ্ন জাগে যে, ব্যক্তিগত কথাবার্তা, ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা, ব্যক্তিগত ঘটনাবলী ও ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিসমূহের কিভাবে সমন্বিত করা যাবে, যাতে তা দ্বারা একটা সামষ্টিক সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করা যায়? কিভাবেই বা ছিটেফোঁটা তথ্যসমূহকে একটা বিদ্যায়, ইন্দ্রিয়ার্জিত তথ্যসমূহকে প্রজ্ঞায় এবং অভিজ্ঞতাসমূহকে একটা সুনির্দিষ্ট জ্ঞানে রূপান্তরিত করা যায়?

এই কাজটি করতে পারাই হলো মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট। কিন্তু এটাই তার সর্ববৃহৎ বৈশিষ্ট নয়, সর্বশ্রেষ্ট গুণও নয়। কেননা এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত রূহ বা আত্মার আলোকরশ্মীর অবদানও রয়েছে। মানুষের এই অসাধারণ রূহ বা আত্মা সৃষ্টিজগত ও তার স্রষ্টার সৌন্দর্যের বদৌলতেই মানুষের কাছে পৌঁছে এবং সেই অসীম স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়ার কয়েকটি অত্যুজ্জ্বল মুহূর্ত তাকে দান করে।

এই রূহের প্রকৃত রহস্য মানুষ জানে না। রূহ তো দূরের কথা, তার চেয়ে ক্ষুদ্র ও নগন্য জিনিসও মানুষের অজানা রয়ে গেছে। যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহু জিনিস তার জ্ঞান বহির্ভূত। এই রূহ মানুষকে তার ইহলৌকিক জীবনেই উর্ধতন জগতের আনন্দ দিতে ও আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। তাকে মহান ফেরেশতাদের সাথে মিলিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত করতে পারে, তাকে বেহেশতে জীবন যাপন ও সেখানে আল্লাহর সাক্ষাত অর্জনের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে।

সুতরাং এ রূহ মানুষের প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় দান। এ দ্বারাই মানুষ 'মানুষ' হতে পেরেছে। 'হে মানুষ' বলে তাকে যখন কোরআনে সম্বোধন করা হয়, তখন আসলে এই আত্মাকেই সম্বোধন করা হয়। আর তাকেই তিরস্কার করা হয় এই বলে 'কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রভু সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিলো?' এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে কৃত প্রতক্ষ্য সম্বোধন ও প্রত্যক্ষ তিরস্কার। এ সময় সে তার সামনে এমন একজন গুনাহগার বান্দা হিসাবে অবস্থান করে, যার মনে আল্লাহর পরাক্রম ও প্রতাপ সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি নেই এবং নিজেও তাঁর আদব-কায়দা সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই এরপরই তাকে দেয়া শ্রেষ্ঠতম নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় এবং সেই সাথে তার অহংকার ও বেয়াদবীর কথাও।

এই তিরস্কার ও ভর্ৎসনা মানুষের পাষাণ হৃদয়কেও গলিয়ে দিতে সক্ষম, যদি সে নিজের সৃষ্টির উৎস, নিজের স্রষ্টা এবং আপন প্রভুর সামনে তার মর্যাদা ও অবস্থান কি ধরনের, তা বিচার বিবেচনা ও পর্যালোচনা করে। তার প্রভুর নিম্নের উক্তিটির ভেতরে তার নিজের জন্মের উৎস, তার প্রভূ ও প্রভূর সামনে তার অবস্থান এই তিনটি বিষয়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'হে মানুষ! তোমার সেই মহান প্রভূ সম্পর্কে কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করলো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, ভারসাম্যপূর্ণ ও সুঠাম করেছেন এবং যেমন আকৃতিতে গড়তে চেয়েছেন গড়েছেন।'

বিভ্রান্তির কারণ

এরপর উদঘাটন করা হচ্ছে এই বিভ্রান্তি ও নাফরমানীর কারণ। সে কারণ হিসাব নিকাশের দিনকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণটি উন্মোচন করার পর ব্যাখ্যা করা

হয়েছে কিভাবে সেই হিসাব নিকাশ সংঘটিত হবে এবং তার ফলাফল বা কি হবে। এ বিষয়টি খুব জোর দিয়ে ও তাকিদ সহকারে বলা হয়েছে, 'না, বরঞ্চ তোমরা প্রতিফল দানের বিষয়টি অস্বীকার করো। অথচ তোমাদের ওপর পাহারাদার রয়েছে। তারা সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তোমরা যা কিছু করো, তা তারা জানেন। নিশ্চয়ই সৎ লোকেরা প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে আর পাপীরা থাকবে দোযখে। সেখানে তারা জ্বলবে, প্রতিফল দিবসে তারা তা থেকে দূরে থাকবে না।'

মানুষের চলমান অবস্থা ও ধ্যান ধারণাকে যারা আঁকড়ে ধরে আছে, তাদেরকে ধমক দেয়াই হলো 'কাল্লা' অব্যয়টি প্রয়োগের উদ্দেশ্য। 'কাল্লা' দ্বারা বুঝানো হয় পূর্ববর্তী বাক্য থেকে ভিন্ন ও নতুন ধরনের বাক্যের সূচনা। পূর্ববর্তী বাক্যে ছিলো তিরস্কার ও ভর্ৎসনা। আর এখানে আছে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, বর্ণনা দান ও নিশ্চিতকরণ। এটা ভর্ৎসনা ও তিরস্কার থেকে ভিন্ন জিনিস।

'না' বরঞ্চ তোমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করো।' অর্থাৎ হিসাব নিকাশ, জবাবদিহী ও প্রতিফল-সব কিছুকেই অস্বীকার করো। আর এটাই হচ্ছে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার আসল কারণ। যে মন হিসাব নিকাশ ও কর্মফলকে অস্বীকার করে, সেই মন যে হেদায়াত, কল্যাণ ও আল্লাহর আনুগত্যের ওপর স্থির থাকবে, তা কখনোই হতে পারে না। অনেকের অন্তর এতো উর্ধে উন্নীত হয়ে থাকে যে, শুধু ভালোবাসার কারণেই আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর শাস্তির ভয়েও নয় এবং তাঁর পুরস্কারের লোভেও নয়। তবে এ ধরনের লোকেরা কেয়ামতের কর্মফল দিবসে বিশ্বাস করে। তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর জন্য প্রতীক্ষায় থাকে।

কেননা সেদিন সে তার সেই মনিবকে দেখতে পাবে যাকে সে ভালোবাসে, যার সাক্ষাতের জন্যে উদগ্রীব থাকে এবং যার জন্যে প্রতীক্ষমাণ থাকে। তবে মানুষ যখন এই দিনটিকে একেবারেই অস্বীকার করে, তখন তার মধ্যে আর কোনো আনুগত্য, শিষ্টাচার ও হেদায়াতের আলো থাকতে পারে না। তার হৃদয় কখনো সজীব এবং তার বিবেক কখনো জাগ্রত থাকবে না।

কেরামান কাতেবীন

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'তোমরা কর্মফল দিবসকে অবিশ্বাস করো.'......অথচ তোমরা সেই দিনের দিকেই ধাবমান, তোমাদের সকল কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ সেদিন চূড়ান্ত করা হবে। তার মধ্যে থেকে কিছুই নষ্ট হবে না বা বিস্মৃত হবে না। তোমাদের ওপর প্রহরী নিযুক্ত রয়েছেন, তারা সম্মানিত লেখক, তোমরা যা-ই করো, তা তারা জানেন।'

এসব প্রহরী হচ্ছেন মানুষের তত্ত্বাবধান, সার্বক্ষণিক তদারক ও প্রতিটি কার্যকলাপ বা কথাবার্তাকে গুণে গুণে লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আল্লাহর ফেরেশতা। আমরা জানি না এই কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয়। এটা জানা আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তও নয়। এসব জিনিস জানা ও বুঝার ক্ষমতা ও যোগ্যতা যে আমাদের দেয়া হয়নি, সে কথা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এসব বিষয় জানার মধ্যে আমাদের জন্য কোনো কল্যাণও নিহিত নেই। কেননা এটা আমাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যেরও আওতাভুক্ত নয়।

কাজেই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অদৃশ্য বিষয়সমূহের মধ্য থেকে যেটুকু জানবার সুযোগ দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কোনো কিছু জানতে চেষ্টা করা আমাদের জন্য অনাবশ্যক। মানুষের মনে শুধু এতটুকু সাবধানবাণী দিয়ে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, তাকে যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনতা দেয়া হয়নি এবং তাকে বিনা জবাবদিহীতে ছেড়ে দেয়া হবে না। বরঞ্চ তার ওপর সম্মানিত লেখকদের প্রহরী নিয়োজিত করা হয়েছে, যারা তাদের প্রতিটি তৎপরতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, যাতে সে জাগ্রত ও সতর্ক হয় এবং শিষ্টাচারী হয়। এটাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

লক্ষণীয় যে, গোটা সূরার পরিবেশ সম্মান ও মর্যাদার পরিবেশ, প্রহরীদের সাথে 'সম্মানিত' বিশেষণটি যুক্ত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মনে যেন এই সম্মানিত ফেরেশতাদের সামনে শোভনীয় ও ভদ্রচিত কাজ করার প্রেরণা এবং অশোভন কাজের বিরুদ্ধে লজ্জার অনুভূতি গড়ে ওঠে। বস্তুত এটা মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার যে, সম্মানিত ও মর্যাদাবান মানুষের সামনে কোনো আজে বাজে বা অশোভন কাজ করতে সে লজ্জা অনুভব করে থাকে। মর্যাদাবান মানুষের সামনে যখন তার এ অবস্থা, তখন প্রতিটি মুহূর্তে একদল 'মর্যাদাবান' তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতার সামনে থাকার অনুভূতি যার মধ্যে বিদ্যমান, তার কি অবস্থা হতে পারে, এটা সহজেই অনুমেয়। বিশেষত তারা যখন এমন ফেরেশতা, যারা মানুষের পক্ষ থেকে ভালো কাজ ও ভালো কথা ছাড়া আর কিছুই আশা করে না।

কোরআন মানুষের হৃদয়ে তার সহজাত প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির অতি নিকটবর্তী এই ধ্যান-ধারণাকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে তার হৃদয়ে সর্বোচ্চ মানের প্রেরণা সৃষ্টি করে।

পাপিষ্ঠ ও পুণ্যবানদের পরিণতি

এরপর বলা হয়েছে হিসাবের পর সৎলোক ও অসৎ লোকদের পরিণতি ও কর্মফল কী হবে। আর বলাই বাহুল্য যে, এই হিসাব নিকাশের ভিত্তি হবে তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের লেখা রেজিষ্টারসমূহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পূণ্যবান লোকেরা অবশ্যই প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে আর পাপিষ্ঠরা থাকবে জাহান্নামে। কর্মফল দিবসে তারা তাতে জ্বলবে। আর জাহান্নাম তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে না।'

এর সুনিশ্চিত পরিণতি এই যে, সৎলোকেরা প্রাচুর্যে ভরা বেহেশতে এবং অসৎ লোকেরা জাহান্নামে যাবে। 'আবরার' শব্দটি 'বার' শব্দের বহুবচন এবং এ শব্দটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে পুণ্যের কাজ ও সৎকাজ করতে করতে সেটি তার সার্বক্ষণিক ও চিরস্থায়ী স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হয়। আর সৎকর্ম বা পুণ্যকর্ম বলতে যে কোনো ভালো কাজকেই বুঝায়। এর সাথে যে বিশেষণ যুক্ত হয়, সেটা এ ভালো কাজের প্রভাবাধীনেই মানবতা ও মহত্ত্বের সাথে সমন্বিত রূপ লাভ করে।

এর ঠিক বিপরীত বিশেষণ হলো 'ফুজ্জার' তথা পাপিষ্ঠ লোকেরা। এ শব্দটির মর্মমূলে রয়েছে বেয়াদবী এবং গুনাহ ও পাপ কাজের স্পর্ধা ও ধৃষ্টতা। 'জাহীম' হচ্ছে পাপ কাজের উপযুক্ত ও সমকক্ষ জায়গা। তারপর পাপিষ্ঠরা যখন সেখানে অবস্থান করবে, তখন তাদের অবস্থা আরো স্পষ্ট হবে। এ কথাই বলা হয়েছে এই আয়াতে-'কর্মফলের দিন তারা তাতে জ্বলবে।' তারপর এ বক্তব্যের ওপর আরো জোর দেয়া হয়েছে এই বলে যে, 'সেটি তাদের কাছ থেকে অন্তর্হিত হবে না।' অর্থাৎ শুরুতেও তারা তা থেকে পালিয়ে অব্যাহতি পাবে না, আর একবার সেখানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্য তারা বাইরে যেতে পারবে না। এভাবে পুণ্যবান ও পাপিষ্ঠ আর বেহেশ্‌ত ও দোযখের ঠিক বিপরীত অবস্থা ফুটিয়ে তোলা হলো। সেই সাথে জাহান্নামে নিক্ষিপ্তদের অবস্থা আরো বেশী করে স্পষ্ট করে দেয়া হলো।

যেহেতু কর্মফলের দিনটিই অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাসের শিকার, তাই সেটি একবার উল্লেখ করার পর তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি এমনভাবে করা হয়েছে যে, একদিকে ওই দিনটি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে তাকে আরো বিরাট ও ভয়াবহ জিনিস হিসাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অপরদিকে সেদিন মানুষ যে একেবারেই অসহায়, দিশেহারা এবং সর্বপ্রকারের সাহায্য ও

সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে একথা ব্যক্ত করার মাধ্যমে দিনটির ভয়াবহতা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, সেই ভয়ংকর বিপদের দিনে একমাত্র আল্লাহই হবেন সর্বেসর্বা।

'তুমি কি জানো কর্মফল দিবস কী? আবারো বলি, তুমি কি জানো কর্মফল দিবস কী? (কর্মফল দিবস হচ্ছে সেই দিন) যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না এবং সমস্ত ক্ষমতা সেদিন শুধু আল্লাহর (হাতে) থাকবে।'

অজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রশ্ন করা কোরআনের একটা সুপরিচিতি রীতি। এটি এমন একটি অনুভূতি দান করে যে, ব্যাপারটা এতোই বিরাট এবং এতোই ভয়াবহ যে, মানুষ তার সীমিত বোধশক্তি দিয়ে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। কেননা তা যে কোনো কল্পনার উর্ধে, যে কোনো প্রত্যাশার উর্ধে এবং যে কোনো পরিচিত জিনিসের আওতার বাইরে।

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি দিনটির ভয়াবহতাকে আরো বেশী কঠিন করে তোলে। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তির পরই এই চিত্রের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিবরণ দেয়া হয়। 'যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না।' বস্তুত এটি হচ্ছে চূড়ান্ত অসহায়ত্ব, সার্বিক অক্ষমতা ও সর্বাত্মক পংগুত্ব বা নিষ্ক্রিয়তা। এর অর্থ হচ্ছে প্রতিটি মানুষ নিজেকে নিয়ে চিন্তিত ও অস্থির থাকবে, অন্যের কথা ভাববার ফুরসতই তার হবে না।

'সেদিন সকল ক্ষমতা হবে শুধু আল্লাহর।' আল্লাহর এরূপ সর্বাত্মক ক্ষমতা তো দুনিয়া ও আখেরাতে সব সময়ই বিরাজমান। তবে এই কেয়ামতের দিন এ সত্যটি আরো বেশী করে প্রকটিত হবে। কেননা এ দিনটি সম্পর্কে অনেকেই গাফেল ও উদাসীন থাকে। তাই এ ব্যাপারে যাতে কোনো বিভ্রান্তি ও সংশয় না থাকে কোনো মতিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত মানুষ যাতে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত না থাকে, সে জন্য এভাবে নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র ওই দিনটি সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে।

সূরার শেষে এই নীরব, থমথমে ও গুরুগম্ভীর ভীতিপ্রদ চিত্র আর সূরার শুরুতে সেই চলন্ত এই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের ঘটনাবলীর চিত্র– এই উভয় চিত্র একই সমান্তরালে বিরাজমান। এই দুই ধরনের ভীতির মাঝখানে মানুষের চেতনা অবরুদ্ধ। উভয় ভীতিই মানুষকে হতবুদ্ধি করে দিতে সক্ষম। আর মাঝখানে রয়েছে মহান আল্লাহর সেই তিরস্কার ও ভর্ৎসনা, যা নির্লজ্জকেও লজ্জিত করে আর পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করে!

সূরা আল মোতাফফেফীন

আয়াত ৩৬ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ

مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾ كَلَّآ

اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ﴿٧﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٨﴾ كِتٰبٌ

مَّرْقُوْمٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١١﴾

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ

اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়, ২. যারা অন্য মানুষদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন (তাদের কাছ থেকে) পুরোপুরি আদায় করে নেয়, ৩. (আবার) নিজেরা যখন (অন্যের জন্যে) কিছু ওযন কিংবা পরিমাপ করে তখন কম দেয়; ৪. এরা কি ভাবে না (বিচারের জন্যে) তাদের (সবাইকে একদিন কবর থেকে) তুলে আনা হবে? ৫. (তুলে আনা হবে) এক কঠিন দিবসের জন্যে, ৬. সেদিন (সমগ্র) মানব সমাজ সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে; ৭. জেনে রেখো, গুনাহগারদের আমলনামা রয়েছে 'সিজ্জীনে'; ৮. তুমি কি জানো (সে) সিজ্জীনটা কি? ৯. (এটা হচ্ছে) সীল করা (একটি) খাতা; ১০. (সেদিন) মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস অবধারিত, ১১. যারা শেষ বিচারের (এ) দিনটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে; ১২. (আসলে) সব সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউই এ বিচার দিনটিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে না, ১৩. যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো হচ্ছে নিছক আগের কালের গল্পগাথা; ১৪. কখনো নয় (কিন্তু), এদের মনের ওপর এদের কৃতকর্ম ঝং ধরিয়ে রেখেছে।

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿১৫﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا
الْجَحِيمِ ﴿১৬﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿১৭﴾ كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ
الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿১৮﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿১৯﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿২০﴾
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿২১﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿২২﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ
يَنظُرُونَ ﴿২৩﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿২৪﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ
مَّخْتُومٍ ﴿২৫﴾ خِتَٰمُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿২৬﴾ وَمِزَاجُهُ
مِن تَسْنِيمٍ ﴿২৭﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿২৮﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿২৯﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿৩০﴾ وَإِذَا
انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿৩১﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ

১৫. অবশ্যই এসব পাপী ব্যক্তিদের সেদিন (তাদের) মালিক থেকে আড়াল করে রাখা হবে; ১৬. অতপর তারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে; ১৭. তারপর (তাদের) বলা হবে, এ হচ্ছে (সেই জাহান্নাম) যা তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে; ১৮. হ্যাঁ, নেককার লোকদের আমলনামা রক্ষিত আছে ইল্লিয়্যীনে; ১৯. তুমি কি জানো এ 'ইল্লিয়্যীন' (-এ রক্ষিত আমলনামা) কি? ২০. (এটাও হচ্ছে) একটি সীল করা খাতা, ২১. (আল্লাহ তায়ালার) নিকটতম ফেরেশতারাই তা তদারক করেন; ২২. নিসন্দেহে নেককার লোকেরা মহা নেয়ামতে থাকবে, ২৩. এরা সুসজ্জিত আসনে বসে (সব) অবলোকন করবে, ২৪. এদের চেহারায় নেয়ামতের (তৃপ্তি ও) সজীবতা তুমি (সহজেই) চিনতে পারবে, ২৫. ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে এদের সেদিন বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে, ২৬. (পাত্রজাত করার সময়ই) কস্তুরীর সুগন্ধ দিয়ে যার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে; এতে (বিজয়ী হবার জন্যে) প্রতিটি প্রতিযোগীই প্রতিযোগিতা করুক; ২৭. (তাতে) তাসনীমের (ফল্গুধারার) মিশ্রণ থাকবে, ২৮. (তাসনীম) এমন এক ঝর্ণাধারা, (আল্লাহ তায়ালার) নৈকট্যলাভকারীরাই সেদিন এ (পানীয়) থেকে পান করবে; ২৯. অবশ্যই তারা (ভীষণ) অপরাধ করেছে যারা (দুনিয়ায়) ঈমানদারদের সাথে বিদ্রূপ করতো, ৩০. তারা যখন এদের পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করতো, তখন এরা নিজেদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে চোখ টেপাটেপি করতো, ৩১. যখন এরা নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যেতো, তখন খুব উৎফুল্ল হয়েই সেখানে ফিরতো, ৩২. (এরা) যখন তাদের দেখতো তখন একে অপরকে বলতো (দেখো), এরা

لَضَآلُّوْنَ ۝٣٢ وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝٣٣ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ

الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝٣٤ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝٣٥ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا

كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝٣٦

হচ্ছে কতিপয় পথভ্রষ্ট (ব্যক্তি), ৩৩. এদের ঈমানদারদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি; ৩৪. (বিচারের পর) আজ ঈমানদার ব্যক্তিরাই কাফেরদের ওপর (নেমে আসা আযাব দেখে) হাসবে, ৩৫. উঁচু আসনে বসে তারা (এসব) দেখতে থাকবে; ৩৬. প্রতিটি কাফেরকে কি তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় দেয়া হবে না?

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটির মূল লক্ষ্য মানুষের হৃদয়ে জাগরণ ও চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি করা। ওহীর মাধ্যমে আকাশ থেকে নাযিল হওয়া ইসলামী দাওয়াত বিশ্ববাসী ও আরববাসীদের জীবনে যে অভিনব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলো সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ সূরায় সাধারণভাবে সর্বাত্মক, পূর্ণাংগ ও নতুন জীবন দর্শন আলোচিত হয়। তবে এর পাশাপাশি এতে ইসলামী আন্দোলনের সামনে আবির্ভূত মক্কার জনজীবনের একটা বাস্তব সমস্যাও আলোচিত হয়েছে।

সূরার শুরুতেই মক্কার সমাজ জীবনের এই বাস্তব সমস্যাটির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে মাপে কমবেশী করা লোকদেরকে কেয়ামতের দিনে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেয়া হয়েছে। সূরার শেষেও এধরনের অন্য একটি সামাজিক আচরণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।'

এটি হচ্ছে অপরাধপ্রবণ কাফেরদের পক্ষ থেকে মোমেনদের সাথে বেয়াদবী, অসদাচরণ, চোখ টিপে খারাপ ইংগিত করা বা কটাক্ষ করা, হাসিঠাট্টা ও বিদ্রূপ করা এবং তাদেরকে 'গোমরাহ' বা বিপথগামী বলে আখ্যায়িত করা। পুণ্যবান ও পাপিষ্ঠ এই দুই শ্রেণীর মানুষের অবস্থা বর্ণনা ও কেয়ামতের দিন উভয় শ্রেণীর পরিণতি বিশ্লেষণ করাও এ সূরার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।

সূরাটি মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে মাপে কম দেয়া লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। বলা হয়েছে, 'যারা কমবেশী করে তাদের জন্যে অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি! যারা কারো কাছ থেকে কিছু মেপে আনলে ঠিকমতো আনে আর মেপে বা ওযন করে কাউকে কিছু দিলে কম দেয়। তারা কি মনে করে না যে, এক ভয়াবহ দিনে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে, যেদিন মানব জাতি বিশ্বপ্রভুর সামনে দাঁড়াবে।'

সূরার দ্বিতীয় অংশটিতে পাপীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদেরকে কঠোর হুমকি ও শাসানি দেয়া হয়েছে চরম খারাপ পরিণতি ও ধ্বংসের জন্যে। তাদের অপরাধ ও পাপ কাজকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে এই অন্ধত্বের কারণ, আর কেয়ামতের দিন তাদের কি প্রতিদান দেয়া হবে।

আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে ঠিক সেই ভাবে লুকিয়ে রাখা হবে, যেভাবে পৃথিবীতে তার পাপ তার হৃদয়কে আবদ্ধ করে রেখেছিল– এ কথাও এতে আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে

কাফেরদের জন্য 'জাহীম' বা জাহান্নামকে চিহ্নিত করা হয়েছে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রতীক হিসাবে।

বলা হয়েছে, 'কখনো নয়, পাপীদের পুস্তক থাকবে সিজ্জীনে। সিজ্জীন কি তুমি তা জানো? (তা এক) লিখিত গ্রন্থ। সেদিন অস্বীকারকারীদের জন্যে থাকবে...........তারপর তারা জাহান্নামে ঢুকবে। তারপর তাকে বলা হবে যে, তোমরা যে জিনিসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে, এই তো সে জিনিস।' (আয়াত ৭-১৭)

সূরার তৃতীয় অংশে তুলে ধরা হয়েছে ঠিক এর বিপরীত পুণ্যবান ও সৎকর্মশীলদের অবস্থা। এখানে আছে তাদের উচ্চতর মর্যাদা ও সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ পরকালীন জীবনের বর্ণনা। বলা হয়েছে, তাদের চেহারা থাকবে সতেজ, উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল। বালিশে হেলান দিয়ে তারা পরম সুখে 'রাহীক' তথা সুস্বাদু পানীয় পান করবে। এ অংশটি এক উজ্জ্বল ও প্রাচুর্যময় অংশ। 'শুনে রাখো, পুণ্যবান লোকেরা থাকবে ইল্লিয়্যীনে'। ইল্লিয়্যীন কি তা কি তুমি জানো? তা এক......বস্তুত এই জিনিসের জন্যই বুদ্ধিমানদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।' (আয়াত ১৮-২৬)

আর শেষাংশে বর্ণনা করা হয়েছে সৎকর্মশীলরা মিথ্যা অহংকারে লিপ্ত পাপীদের পক্ষ থেকে গালাগালি, উপহাস ও বেয়াদবীর আকারে যে সকল পরিস্থিতির সম্মুখিন হতো সে সম্পর্কে। অতপর উভয় শ্রেণী বাস্তবে কি পরিণাম ভোগ করেছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই অপাধীরা মোমেনদের প্রতি উপহাস করতো। তাদের কাছে দিয়ে যাবার সময় তাদের প্রতি কটাক্ষ করতো। আর আপন পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তৃপ্তি অনুভব করতো। মোমেনদেরকে দেখে বলতো, এরা বিভ্রান্ত। অথচ তাদেরকে মোমেনদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠানো হয়নি। আজ মোমেনরা কাফেরদের প্রতি উপহাস করবে এবং বালিশে হেলান দিয়ে তাকাবে। কাফেররা কি তাদের কৃতকর্মের ফল ছাড়া আর কিছু ভোগ করবে?'

সামগ্রিকভাবে এ সূরা মক্কার দাওয়াতী পরিবেশের একটি দিক তুলে ধরে। অপরদিকে সেই পরিবেশে বিরাজমান অবস্থার মোকাবেলায় দাওয়াতের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিলো তারও একটা দিক এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মানবীয় মন ও মনস্তত্ত্বেরও একটা দিক এখানে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সূরার বিস্তারিত আলোচনার সময় আমি তা তুলে ধরবো।

তাফসীর

'যারা মাপে কমবেশী করে তাদের জন্য শোচনীয় পরিণাম, যারা কারো কাছ থেকে কিছু মেপে আনলে তা ঠিকমতো আনে এবং মেপে বা ওযন করে কাউকে কিছু দিলে কম দেয়, তারা কি মনে করে না এক ভয়াবহ দিনে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে, যেদিন মানবজাতি বিশ্বপ্রভুর সামনে দাঁড়াবে?' এ আয়াতের মাধ্যমে সূরাটি মাপে কমবেশী কাজে নিয়োজিত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শোচনীয় পরিণাম-এর অর্থ ধ্বংস।

এই অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ধ্বংস সাধিত হয়েছে অথবা ধ্বংস সাধিত হোক এ দুই অর্থের যেটিই বুঝানো হোক না কেন, উভয় অবস্থায় যে তার ধ্বংস অবধারিত এ কথাই ব্যক্ত হচ্ছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা যখন বলেন অমুক জিনিস হোক, তখন ধরে নিতে হবে যে, তা হওয়া অবধারিত।

পরবর্তী দুটো আয়াতে 'মোতাফফেফীন' তথা যারা মাপে কমবেশী করে তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। তারা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, 'যারা মেপে আনার সময় পুরোপুরি আনে, আর মেপে দেয়ার সময় কম দেয়।' এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, তারা যখন ক্রেতা হয়, তখন পণ্যদ্রব্য মেপে পুরোপুরি আনে। আর যখন বিক্রেতা হয়, তখন মানুষকে মেপে দেয়ার সময় কম দেয়।

পরবর্তী তিনটি আয়াতে মাপে কম দেয়ার অপকর্মে লিপ্ত ব্যবসায়ীবৃন্দ তথা 'মোতাফফেফীন'দের কার্যকলাপে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। তারা এমনভাবে আচরণ করে যেন পার্থিব জীবনে তাদের উপার্জিত সম্পদ সম্পর্কে কোনো জবাবদিহি বা হিসাব নিকাশ হবেই না, যেন এত বড় কোনো স্থান নেই, যেখানে কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে সকলে আল্লাহর সামনে একত্রিত হবে এবং তাঁরই সামনে হিসাব নিকাশ ও শাস্তি প্রদান করা হবে। বলা হচ্ছে! 'তারা কি বিশ্বাস করে না যে, একটি বিরাট দিনে যখন সমগ্র মানব জাতি বিশ্বপ্রভুর সামনে দাঁড়াবে সেদিন তারা পুনরুজ্জীবিত হবে?'

দূর্নীতি দমনে কোরআন

কোন মক্কী সূরায় ব্যবসায়িক দূর্নীতি ও বিকৃতির শিকার লোকদেরকে এত কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার বটে। কেননা মক্কী সূরা সাধারণত মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের ওপরই বেশী জোর দিয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহর একত্ব, তাঁর ইচ্ছার অপ্রতিরোধ্যতা, মানুষ ও বিশ্বজগতের ওপর তার সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ আধিপত্য, ওহী ও নবুওতের তাৎপর্য, আখেরাত, হিসাব-নিকাশ ও কর্মফল প্রভৃতি বিষয় তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে। তবে সেই সাথে সাধারণভাবে নৈতিক অনুভূতি ও চেতনা জাগ্রত করার দিকেও মনোযোগ দেয়া হয় এবং মূল আকীদা-বিশ্বাসের সাথে তার সংযোগ স্থাপন করা হয়।

পক্ষান্তরে কোনো নৈতিক বিষয়, তথা মাপে কম দেয়ার এবং সাধারণ লেনদেনের বিষয় কিছুকাল পরে মাদানী সূরায় আলোচিত হয়। সে সময় মদীনার সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা অনুসারে সমাজ জীবনকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তুতি চলছিলো। বস্তুত এই বিষয়টি এ সূরায় আলোচিত হওয়া মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো ব্যাপার। এই তিনটি ক্ষুদ্র আয়াতের ভেতরে কয়েকটা সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে।

প্রথমত ইসলাম মক্কার পরিবেশে মারাত্মক ধরনের ব্যবসায়িক দূর্নীতির দেখতে পেয়েছিলো এবং এ দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল তৎকালীন সমাজের নেতৃস্থানীয় বক্তিরা। এসব লোকের হাতে প্রচুর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানাদি ছিলো এবং সেই সুবাদে তারা বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলো। এ সব সম্পদ দ্বারা তারা বাণিজ্যিক কাফেলার মাধ্যমে সিরিয়া ও ইয়েমেনে গ্রীষ্ম ও শীতে ব্যবসা করতো। এছাড়া তারা বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে মেলা গড়ে তুলতো। যেমন হজ্জের সময় ওই ওকাজের মেলা বসতো। এ সব মেলায় তারা ব্যবসায়িক লেনদেন ও চুক্তি সম্পাদনের পাশাপাশি কবিতা পাঠের আসরও বসাতো।

এখানে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ব্যবসায়িক দুর্নীতিতে লিপ্ত যে সব লোককে আল্লাহ তায়ালা শোচনীয় পরিণতির হুমকি দিয়েছেন এবং যাদের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তারা সমাজের উঁচু স্তরের প্রভাবশালী লোক ছিলো। তারা এতটা ক্ষমতাশালী ছিলো যে, গোটা সমাজকে তাদের ইচ্ছামতো চলতে বাধ্য করতো। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, তারা যখন ক্রেতার ভূমিকায় নামতো, তখন ক্রীত সামগ্রী পুরোপুরিভাবে আদায় করে নিতো।

এ থেকে বুঝা যায়, জনগণের ওপর যেন তাদের এক ধরনের আধিপত্য ছিলো, তা সে যে কারণেই হোক না কেন। সেই ক্ষমতা ও আধিপত্যের জোরে নিজেদের বেলায় তারা পুরোপুরি আদায় করে নিতো। অর্থাৎ এক ধরনের বল প্রয়োগের রীতি চালু ছিল, ন্যায়সংগতভাবে আদান প্রদান হতো না। নচেৎ এতে এমন যুদ্ধ ঘোষণার কোনো ব্যাপার ছিলো না।

এখানে বুঝানো হচ্ছে যে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশী আদায় করতো, যতোটা বেশী চাইতো জোর করে নিয়ে নিতো। পক্ষান্তরে যখন তারা বিক্রেতার ভূমিকায় থাকতো এবং কাউকে কিছু মেপে দিতো, তখন তাদের সেই আধিপত্যের জোরে তারা ক্রেতাদেরকে ঠকাতো এবং কম দিতো। অথচ ক্রেতারা কোথাও ইনসাফ পেতো না এবং তাদের প্রাপ্য আদায় করার কোনো সুযোগ পেতো না।

এই বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বলেই হোক, বা গোত্রীয় ক্ষমতার বলেই হোক, অর্থবলের জোরেই হোক, কিংবা তাদের কাছে যে সব অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী থাকতো, তার ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার থাকার কারণে জনগণ তাদের যুলুম ও বল প্রয়োগ মেনে নিতে বাধ্য হতো বলেই হোক–সবই সমান।

আজকের ব্যবসার জগতেও এ ধরনের কর্মকান্ড বিদ্যমান। বস্তুত ব্যবসায়িক দুর্নীতি এমন এক অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যার ফলে মক্কী জীবনেই তার দিকে আগাম দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো।

মক্কার পরিবেশে ব্যবসায়িক দুর্নীতি ও যুলুমের প্রতি এই আগাম দৃষ্টিদান দ্বারা অপর যে আনুষংগিক ফায়দা অর্জিত হয়েছে তা হলো এই যে, ইসলামী জীবন বিধানের প্রকৃতি এবং তার গুণগত ও স্বভাবগত রূপটি কেমন, তা জানা গেলো। লেনদেনের ক্ষেত্রে এত বড় অসহনীয় যুলুম এবং এত বড় নৈতিক বিকৃতিকে ইসলাম আদৌ পছন্দ করেনি, বরং ইসলামের বিধান মানুষের গোটা জীবন ও যাবতীয় কর্মকান্ডকে আল্লাহর মনোনীত ও অবিকৃত নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর।

ইসলাম তখনো জাতীয় জীবনকে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও আইনের বল প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহর শরীয়তের অধীনে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে হস্তগত করেনি। তথাপি সে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের এই দুর্নীতিবাজ ও যুলুমবাজ মোতাফফেফীনদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে এবং ধ্বংস ও খারাপ পরিণামের ভীতি প্রদর্শন করেছে।

অথচ সেদিনকার এই যুলুমবায, এ লোকেরা ছিলো স্বয়ং মক্কার সর্দাররা। তাদের হাতেই ছিলো ক্ষমতা ও আধিপত্যের চাবিকাঠি। তাদের ক্ষমতা ও প্রতাপের দাপট শুধু অংশীবাদী আকীদা-বিশ্বাসের বদৌলতে জনগণের জীবন ও ভাবাবেগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও জীবিকার উৎসের ওপরও বিস্তৃত ছিলো।

মানুষের ওপর পরিচালিত এই নিকৃষ্ট অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইসলাম গগণবিদারী আওয়ায তুললো। একদিকে ছিলো এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ। অপরদিকে তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে ব্যবসায় রত তাদের নেতৃবৃন্দ, যারা ছিলো একাধারে মুনাফাখোর পুঁজিপতি। মানুষের ধর্মীয় কুসংস্কার ও ধ্যান-ধারণাকে পুঁজি করে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী।

উঁচু শ্রেণীর লোকদের ইসলাম বিদ্বেষ

ইসলাম তার এই গগনবিদারী আওয়ায তুলে মহাকাশের ওপর থেকে আগত আদর্শের বলে এবং নিজস্ব শক্তির বলে শোষিত জনগণকে জাগ্রত ও উচ্চকিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলো। মক্কার সেই অবরোধের ভেতরে নিষ্পেষিত হতে থাকা অবস্থায়ও এই আওয়াযকে সে গোপন ও অবদমন করেনি। বলদর্পী-স্বৈরাচারী কোরায়শ নেতারা যখন অর্থবল, জনবল, পদবল ও ধর্মের দোহাই দিয়ে মক্কার মানুষের ওপর আপন ক্ষমতার গদা ঘুরাচ্ছিলো, ইসলাম তখন সেই অবরুদ্ধ মানবতার উপর এই যুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়ায তুলতে বিলম্ব করেনি।

এখান থেকেই আমরা কিছুটা বুঝতে পারি কি কি কারণে কোরায়শ নেতারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এত মারমুখো হয়ে এমন প্রচন্ড বিদ্বেষ সহকারে রুখে দাঁড়িয়েছিলো। তারা নিসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলো যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত এই নতুন বিধান শুধু মনমগজে লুকিয়ে থাকা কোনো আকীদা বিশ্বাস নয়, তাদের কাছ থেকে শুধু এই মর্মে মৌখিক উচ্চারিত একটা সাক্ষ্য নিয়েও তা সন্তুষ্ট থাকবে না যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল।

এ নতুন আদর্শ শুধু মূর্তিপূজা মুক্ত নামায পেয়েও সন্তুষ্ট থাকবে না। বরঞ্চ এ এমন একটা জীবন বিধান, যা তাদের যাবতীয় রীতিনীতি, স্বার্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সকল জাহেলী ভিত্তি ভেংগে গুঁড়িয়ে দেবে। তারা এও অনুধাবন করেছিলো যে, ইসলাম কখনো কোনো বিকল্প বা কোনো আপোস ফর্মুলা গ্রহণ করবে না এবং এমন কোনো পার্থিব জিনিসের সাথে তার সমন্বয় ঘটাবে না, যা ইসলামের সমধর্মী নয়। যে সমস্ত পার্থিব ধ্যান-ধারণা ও কর্মকান্ডের ওপর জাহেলিয়াতের ভিত্তি স্থাপিত, ইসলাম তার সবগুলোর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন করে। এ কারণেই কোরায়শ নেতারা ইসলামের সাথে এমন এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যার অবসান হিজরতের আগেও ঘটেনি, পরেও ঘটেনি। এ যুদ্ধ ছিলো ইসলামের সকল রীতিনীতি ও কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় রীতিনীতি ও কর্মকান্ড রক্ষা করার যুদ্ধ। এটা নিছক আকীদা ও বিশ্বাস রক্ষার যুদ্ধ ছিলো না।

মানব জীবনের ওপর ইসলামী আদর্শের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যকে প্রতিরোধ করতে যারা যুগে যুগে ও দেশে দেশে তৎপর, তারা এ সত্যটাকে খুব ভালো করেই উপলব্ধি করে থাকে। তারা খুব ভালো করেই জানে যে, তাদের কৃত্রিম জীবন-রীতি, গায়ের জোরে ছিনতাই করা সুযোগ সুবিধা, ঘুণে খাওয়া সমাজ ও রাষ্ট্র এবং বিকৃত চরিত্র ও চালচলন, এর কোনোটাই ইসলামের চির অটুট ও সুমহান আদর্শের সামনে টিকে থাকতে সক্ষম নয়।

যুলুমবায, স্বৈরাচারী, আল্লাহদ্রোহী ও ধোকাবায লোকেরা তাই তাদের ধোকাবাযী ও শোষণ যে পর্যায়েরই হোক না কেন, শুধু আর্থিক শোষণে সীমাবদ্ধ থাকুক অথবা সকল অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হোক ইসলামের শাশ্বত ও পরিচ্ছন্ন নীতির আধিপত্য ও কর্তৃত্ব মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তার করাকে তারাই সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। কারণ এ আদর্শ মোটেই আপোস, দর কষাকষি অথবা স্বার্থের ভাগাভাগিকে প্রশ্রয় দেয় না।

আওস ও খাযরাজের যে সব প্রতিনিধি হিজরতের পূর্বে দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তারাও ইসলামের এই আপোসহীন চরিত্রকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। আসেম ইবনে ওমার ইবনে কাতাদাহর বরাত দিয়ে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মদীনা থেকে আগত দলটি যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াতের জন্যে সমবেত হলো, তখন আব্বাস ইবনে ওবাদাহ ইবনে নায্‌লা আনসারী যিনি বনু সালেম বিন আওফের লোক ছিলেন। বললেন, 'ওহে খাযরাজীরা! তোমরা কি জানো, এই ব্যক্তির (মোহাম্মদ স.) সাথে কি ব্যাপারে বাইয়াত করছো? তারা বললো হাঁ, জানি। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর সাথে এই মর্মে বাইয়াত করছো যে, (প্রয়োজনে) সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। যদি তোমরা মনে করো যে, কোনো বিপদে পড়ে তোমাদের ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে এবং তোমাদের নেতারা নিহত হলে তোমরা তাকে (মোহাম্মদকে) শত্রুর হাতে ফিরিয়ে দেবে, তাহলে এখনই সেটা করো। কেননা অমন কাজ যদি তোমরা করো, তবে খোদার কসম, তা হবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়

জায়গায় লাঞ্ছনার শামিল। আর যদি তোমরা মনে করো যে, তোমাদের জানমালের যতো ক্ষয়ক্ষতিই হোক না কেন, তোমরা যে উদ্দেশ্যে ও যে ওয়াদা দিয়ে তাকে আহ্বান জানিয়েছো, তা পূরণ করতে পারবে, তাহলে তোমরা তার বাইয়াত গ্রহণ করো। কেননা সেটা হবে দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণকর কাজ।'

তারা সবাই বললো আমরা আমাদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ও আমাদের নেতাদের প্রাণনাশের বিনিময়েও এ বাইয়াত গ্রহণ করবো। হে আল্লাহর রসূল, এতে আমরা কী পাবো? রসূল (স.) বললেন, বেহেশ্‌ত পাবে। তখন সবাই বললো, আপনার হাত বাড়ান। তিনি তার হাত বাড়ালেন এবং তাঁরা সকলে তাঁর সাথে বাইয়াত করলেন।

ইসলামের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে বাইয়াত গ্রহণকারী মোমেনরা যেমন ওয়াকেফহাল ছিলেন, তেমনি ওয়াকেফহাল ছিলো কোরায়শ নেতারাও। তারা জানতো যে, ইসলাম একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই, প্রয়োজনে তরবারি প্রয়োগ করেও সমাজে ইনসাফ কায়েম করবে এবং মানুষের জীবনকে সে অনুযায়ী পুণর্গঠন করবে। তারা এও বুঝেছিলো যে, ইসলাম কোনো আগ্রাসন, কোনো যালেমের যুলুম এবং কোনো অহংকারীর দর্প বরদাশত করবে না। মানুষের ওপর শোষণ নিপীড়নও সে হতে দেবে না। তাই প্রত্যেক আগ্রাসী শক্তি ও প্রত্যেক বলদর্পী শোষক তার প্রতিরোধ করে এবং তার দাওয়াত ও তার আহ্বায়কদের বিরুদ্ধে পদে পদে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

'তারা কি মনে করে না যে, তাদেরকে এক ভয়ংকর দিনে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, যেদিন মানবজাতি বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে?'

অর্থাৎ তাদের ভাবগতিক বড়ই আশ্চর্যজনক। আসলে সেই ভয়াবহ দিনে যে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে, সেদিন যে একেবারেই অসহায় অবস্থায় তারা বিশ্বপ্রভুর সামনে দাঁড়াবে, সেদিন যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো সহায় থাকবে না, তিনি তাদের ব্যাপারে যে বিচার ফয়সালা করবেন, তার অপেক্ষা করা ছাড়া যে তাদের গত্যন্তর থাকবে না এবং তিনি ছাড়া যে তাদের কোনোই অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না, শুধুমাত্র এই ধারণাটুকুই তাদেরকে অবৈধ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসা বাণিজ্য থেকে, অবৈধ উপায়ে মানুষের ধনসম্পদ ও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা এ সব অপকর্মে, তথা লেনদেন ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে নিজে জেতা ও অপরকে ঠকানোর কূটকৌশল এমন ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলো যেন কোনো কালেও তাদের পুনরুজ্জীবিত হয়ে এ সবের জন্য জবাবদিহি করতে হবে বলে তারা ভাবতেই পারে না। বস্তুত এটা একটা আশ্চর্য আচরণ এবং একটা বিস্ময়কর কর্মকান্ড।

দুর্নীতিবাজদের পরিনতি

সূরার প্রথমাংশে এই নিজে জেতা ও অপরকে ঠকানো ধোকাবাজ ব্যবসায়ীদেরকে 'মোতাফ্‌ফেফীন' তথা ঠগবাজ ফড়িয়া আখ্যায়িত করে দ্বিতীয় অংশে তাদেরকে 'ফুজজার' তথা পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এদেরকে পাপীদের দলে অন্তর্ভূক্ত করে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর মতামত কি, তাদের বর্তমান অবস্থা কি এবং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য কি পরিণাম অপেক্ষা করছে এ সকল প্রশ্নের জবাব রয়েছে এই দ্বিতীয় অংশে।

'সাবধান! পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে রয়েছে। সিজ্জীন কী তা কি তুমি জানো? তা হচ্ছে একটা লিখিত পুস্তক। কর্মফল দিবসকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের জন্যে সেদিন ধ্বংস

অবধারিত। সেদিনটিকে সীমা অতিক্রমকারী মহাপাপী ছাড়া আর কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না। যখন তার সামনে আমার আয়াতগুলো পড়া হয়, অমনি সে বলে ওঠে, 'এতো প্রাচীন লোকদের কাহিনী।' কখনো নয়! আসলে তাদের অর্জিত পাপকাজসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। মনে রেখো, তাদেরকে সেদিন তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হবে। তারপর তারা জাহান্নামে ঢুকবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যে সব জিনিসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এই যে তা উপস্থিত।'

কেয়ামতের দিনে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে এ কথা তারা বিশ্বাস করতো না বলেই কোরআন তাদেরকে এভাবে ধমক দিচ্ছে এবং ভর্ৎসনা করছে। কোরআন তাদেরকে নিশ্চিত করছে যে, তাদের সমস্ত তৎপরতার হিসাব রাখার জন্য একটি রেজিস্টার রয়েছে। তাদের সেই লেখা রেজিস্টার যেদিন খোলা হবে, সেদিন তাদের শোচনীয় পরিণতি ও ধ্বংস সংঘটিত হবে বলে ভীতি প্রদর্শন করছে।

'সাবধান! পাপীদের আমলনামা রয়েছে সিজ্জীনে। ফুজ্জার' (পাপীরা) শব্দ দ্বারা এমন পাপীদেরকে বুঝানো হয় যারা পাপ কাজ করতে গিয়ে কোনো সীমা-সরহদ্দ মানে না। আর তাদের 'কেতাব' হচ্ছে তাদের আমলনামা। এই রেজিস্টার বা আমলনামাটি কিরূপ তা আমরা জানি না, জানবার দায়িত্বও আমাদের নেই। এটা একটা অদৃশ্য বা গায়বী বিষয় যার সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যতোটুকু জানিয়েছেন তার চেয়ে বেশী আমরা জানি না।

পাপীদের কর্মকান্ডের রেজিস্টার সম্পর্কে কোরআন বলছে, তা সিজ্জীনে আছে। তারপর কোরআনের ভাষায় তাকে ভয়াবহ ও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরা হয়েছে এই বলে যে, 'সিজ্জীন কী তা কি তুমি জানো?' এ প্রশ্ন দ্বারা, তার একটা নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করা দ্বারা এই আমলনামার সত্যতা সম্পর্কে শ্রোতার বিশ্বাস দৃঢ়তর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়টিকে এই সীমিত তথ্য সহকারে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটাই।

এরপর পাপীদের আমলনামার আরো বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা একটা লিখিত বই। অর্থাৎ চূড়ান্ত রেজিস্টার। তা থেকে আর কিছু কমানোও যাবে না, বাড়ানোও যাবে না। কেয়ামতের দিন রেজিস্টার খোলার আগ পর্যন্ত তা এ অবস্থাতেই বহাল থাকবে।

এই রেজিস্টার যেদিন খোলা হবে, 'সেদিন অস্বীকারকারীদের জন্য মহাদুর্যোগ সংঘটিত হবে।'

কি জিনিসকে অস্বীকার করে এবং কেমন স্বভাব চরিত্রের লোকেরা অস্বীকার করে তার বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে! 'যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে, আর সীমা অতিক্রমকারী মহাপাপী ছাড়া কেউ সেই দিনকে অস্বীকার করে না। যখন আমার আয়াতগুলো তার সামনে তেলাওয়াত করা হয় তখন বলে, এতো হচ্ছে প্রাচীন কালের মানুষের গল্পগুজব।'

এ থেকে বুঝা যায় যে, পাপাসক্তি ও সীমালংঘনের প্রবণতা মানুষকে কেয়ামত অস্বীকৃতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ওটা তাকে কোরআনের সাথেও বেয়াদবী করতে প্ররোচিত করে। তাই সে কোরআনের আয়াতগুলো যখন পড়া হয়, তখন তাকে প্রাচীনকালের গল্পগুজব বলে আখ্যায়িত করে। কোরআনে প্রাচীনকালের লোকদের কিছু ঘটনা শিক্ষা ও উপদেশ প্রদানের লক্ষ্যে বর্ণিত হয়েছে বলেই তারা এ কথা বলে। এসব শিক্ষামূলক কেসসা কাহিনী মানুষকে আল্লাহর শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করে।

সে সব কেসসা কাহিনী মানুষকে এক অলংঘনীয় ও শাশ্বত বিধানের সন্ধান দেয়। এই অস্বীকৃতি ও উদাসীনতা এবং অস্বীকারকারীদের মনের বৈকল্যের কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, 'কখনো নয়।' অর্থাৎ তারা যা বলে তা নয়; বরং তাদের কৃত অপকর্মের দরুন তাদের অন্তরে মরিচা ধরে গেছে।'

অর্থাৎ তাদের কৃত পাপ কাজ তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পাপ কাজের দরুন অন্তর বিকল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এর কারণে অন্তরের ওপর মোটা পর্দা পড়ে যায়, যার দরুন হেদায়াতের আলো তার ওপর প্রতিফলিত হয় না। ফলে তার অনুভূতি শক্তি ক্ষীণ হতে হতে এক সময় তা একেবারেই মৃত হয়ে যায়।'

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রসূল (স.) বলেন, 'বান্দা যখন একটি গুনাহর কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে। এরপর যদি সে তওবা করে, তবে তৎক্ষণাৎ তা তার মন থেকে মুছে যায়।' আর যদি আরো পাপ কাজ করে, তবে তা আরো বেড়ে যায়।' (ইবনে জারীর, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

নাসায়ীর বর্ণনাটি এ রকম, 'বান্দা যখন একটি গুনাহর কাজ করে, তখন তার মনে একটা কালো বিন্দু পড়ে যায়। এরপর সে যদি ওই কাজ পরিত্যাগ করে, তাওবা করে ও মাফ চায়, তার মনকে পরিষ্কার করে দেয়া হয়। আর যদি সে গুনাহর কাজের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে কালো বিন্দু বেড়ে যেতে থাকে। অবশেষে তা গোটা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এটাই হচ্ছে আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত মরিচা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কখনো নয়! বরং তাদের মনে তাদের কৃতকর্মের দরুন মরিচা ধরে গেছে।' হাসান বসরী বলেন, 'গুনাহর পর গুনাহ করতে করতে অন্তর অন্ধ হয়ে যায় এবং অবশেষে মরে যায়।'

ওপরে অস্বীকারকারী পাপীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর এখানে পাপ ও অস্বীকৃতির কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর সেই ভয়ংকর দিনে পাপীদের পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, যা পাপাচার ও আখেরাত অস্বীকৃতির কারণের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ 'কখনো নয়, নিশ্চয়ই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আড়ালে থাকবে, তারপর জাহান্নামে ঢুকবে, তারপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যে দিনকে অস্বীকার করতে, তা এখন উপস্থিত।'

নেককারদের সফলতা

এরপরে অবতারণা করা হয়েছে পুণ্যবানদের সম্পর্কে আলোচনা। পরস্পর বিরোধী দুই শ্রেণীর ব্যাপারে তুলনামূলক আলোচনা করা কোরআনের একটি রীতি। এতে করে দু'টি বাস্তবতা, দুটি পরিস্থিতি ও দুটি পরিণতি সম্পর্কে পেশ করা তুলনা পূর্ণাংগ হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কখনো নয়, সৎ ও পুণ্যবান লোকদের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়্যীনে। তুমি কি জানো ইল্লিয়্যীন কী জিনিস? সেটি তো হচ্ছে লিখিত পুস্তক। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তা প্রত্যক্ষ করবে। নিশ্চয়ই পুণ্যবানরা প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে। বালিশে হেলান দিয়ে তাকাতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে প্রত্যক্ষ করবে প্রাচুর্যজনিত প্রফুল্লতা। ....।'

আলোচনার শুরু হয়েছে (কাল্লা) শব্দ দিয়ে, যার অর্থ 'কখনো নয়।' এটা পূর্ববর্তী বাক্যে যে অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে, সেটিকে খন্ডন করার অর্থ প্রকাশ করে। এরপর পুণ্যবানদের সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা সহকারে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। পাপীদের আমলনামা থাকবে সিজ্জীনে, আর পুণ্যবানদের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়্যীনে। 'আবরার' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে যারা যাবতীয় সৎকাজ ও পুণ্যের কাজে নিয়োজিত থাকে। এরা সেই সব ফুজ্জারের ঠিক বিপরীত, যারা পাপাচারের সকল সীমা অতিক্রম করে।

'ইল্লিয়্যীন' শব্দটি উচ্চতা অর্থবোধক। এ দ্বারা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সিজ্জীন নিম্নতা নির্দেশক। এরপর বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে, 'তুমি কি জানো ইল্লিয়্যীন কী?' এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, এটা মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধির উর্ধের ব্যাপার। পরবর্তী আয়াতে পুণ্যবাদের আমলনামার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে 'একখানা লিপিবদ্ধ পুস্তক, যা ঘনিষ্ঠজনেরা প্রত্যক্ষ করবে।' 'মারকুম' অর্থ যে লিপিবদ্ধ তা আগেই বলা হয়েছে। আর এখানে এ তথ্যও সংযোজন করা হচ্ছে যে, ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারা এই আমলনামা দেখবে। এ বর্ণনাটি পুণ্যবানদের আমলনামা সম্পর্কে একটা উচ্চ স্তরের, মহৎ ও পবিত্র ধারণার সৃষ্টি করে। বস্তুত এই আমলনামা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের দেখার মতো জিনিস এবং পরম আদর ও শ্রদ্ধার বিষয়। কারণ তাতে তো কেবল মহৎ ও পুণ্যকর্ম এবং সদগুণাবলীর বিবরণ থাকে। বস্তুত এটি একটি মহৎ ও স্বচ্ছ রূপ। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এর উল্লেখ করা হচ্ছে।

পরবর্তী আয়াতে কেয়ামতের দিন পুণ্যবানদের অবস্থা কী হবে, কিরূপ প্রাচুর্য ও সুখ শান্তিতে তারা থাকবে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই পুণ্যবানরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে।' অর্থাৎ তারা সম্মানজনক অবস্থানে থাকবে। যেদিক খুশি তাকাবে, কোনো কষ্ট বা বিব্রতকর বোধের কারণে তাদের চোখ বুঁজে থাকতে বা দৃষ্টি সংযত করতে হবে না।

'আরায়েক' শব্দটির অর্থ হচ্ছে গদি সজ্জিত খাট বা পালংক। পার্থিব জৌলুসের দিক দিয়ে এটি তৎকালীন নীরস আরব্য জীবনে সবচেয়ে উঁচুমানের প্রাচুর্য ও বিলাসিতার দ্রব্য বলে পরিগণিত ছিলো। তবে পরকালীন জৌলুসের দিক দিয়ে এটি কি ধরনের, সেটা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, পার্থিব অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার আলোকে মানুষ যতো উঁচু স্তরের বিলাসদ্রব্য কল্পনা করতে পারে, এটা তার চেয়েও উঁচু স্তরের জিনিস।

এই প্রাচুর্য ও সুখ সমৃদ্ধির ভেতরে থেকে তারা দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে পরম আনন্দ, তৃপ্তি ও প্রফুল্লতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে, তাদের মুখমন্ডল ও বাহ্যিক অবয়ব থেকে উৎফুল্লতা ঠিকরে পড়বে। ফলে তাদেরকে যে-ই দেখবে, বলবে, তাদের মুখমন্ডলে প্রাচুর্যজনিত আনন্দ ও উৎফুল্লতা দেখা যায়।

রাহীকুল মাখতুম

'তাদেরকে পান করানো হবে সিল করা 'রাহীক' থেকে, যাতে মেশ্ক মিশ্রিত ছিপি আঁটা থাকবে।'

'রহীক' হচ্ছে নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ পানীয়, যাতে কোনো মলীনতা ও মিশ্রণ নেই। এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তাতে মেশ্ক দিয়ে সিল মারা বা ছিপি আঁটা থাকবে। এ দ্বারা পানীয় সংরক্ষণের পাত্রও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে এবং এই সব পাত্র হয়তো সিল মারা ও বন্ধ থাকবে, যা কেবল পান করার সময় খোলা হবে। এ বর্ণনা দ্বারা এই ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, জিনিসটি অত্যন্ত সংরক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে, মেশ্কের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত জিনিস কর্তৃক সিল মারা দ্বারা বুঝা যায় জিনিসটি হবে অত্যন্ত মূল্যবান ও উপকারী। এ বিষয়টিকে মানুষের পক্ষে পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র পার্থিব ধারণা ও কল্পনার সীমানার মধ্যে যতোটুকু আয়ত্তে আসে, ততোটুকুই বুঝা সম্ভব। মানুষ যখন সেই স্থানে পৌঁছে যবে, তখন তাদের সেখানকার উপযোগী রুচি ও বোধশক্তি জন্মাবে। সেই রুচি ও বোধশক্তি হবে সীমিত ইহকালীন পরিবেশের তুলনায় বিশাল, প্রশস্ত ও সীমাহীন।

এই পানীয়ের বিবরণ শেষ হবার আগে পরবর্তী দুটি আয়াতে আরো একটি তথ্য সংযোজন করা হচ্ছে যে, 'তাসনীম' থেকে তার মিশ্রণ ঘটবে। 'তাসনীম' হচ্ছে ঘনিষ্ঠজনদের পান করার ঝর্ণা।' অর্থাৎ উক্ত সিলমারা পানীয় খোলা হবে। অতপর তাসনীম নামক ঝর্ণা থেকে তাতে কিছু মেশানো হবে, যা ঘনিষ্ঠজনেরা পান করে থাকে। আর এর অব্যবহিত পরেই ইংগিত ও নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, 'এই জিনিস নিয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।' বস্তুত এটি একটি সংক্ষিপ্ত ইংগিত হলেও তা প্রচুর তাৎপর্যবহ।

একদিকে রয়েছে অন্যকে মাপে কম দেয়া ও নিজে পুরোপুরি মেপে আনা ঠগবাজ ও দুর্নীতিবাজ হারামখোর ব্যবসায়ীর দল, যারা মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করে, আখেরাতের জবাবদিহী ও হিসাব-নিকাশের পরোয়া করে না, কর্মফল দিবসের অস্তিত্ব মানে না এবং পাপের আধিক্য দ্বারা নিজেদের অন্তরকে কালিমাচ্ছন্ন করে ফেলে। এরা প্রতিযোগিতা করে সমাজ তুচ্ছ পার্থিব সম্পদের জন্য। প্রত্যেকেই চেষ্টা করে যাতে অন্যকে পেছনে ফেলে নিজে সে জিনিস অথবা তার বৃহত্তর অংশ অর্জন করতে পারে। সে জন্য সে যুলুম করে, পাপ কাজ করে এবং নশ্বর পার্থিব সম্পদের জন্য যা কিছু করা সম্ভব তা করে।

অথচ এ সব তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতা করা সমীচীন নয়। প্রতিযোগিতা করা উচিত আখেরাতের সেই অঢেল ও অমূল্য সম্পদ, দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদা লাভের জন্য। কেননা ওটাই প্রতিযোগিতা করার উপযুক্ত জিনিস। পার্থিব সম্পদ– তা সে যত বড় দামী ও সম্মানজনক হোক না কেন অর্জনের জন্য যারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় তারা একটা ক্ষণস্থায়ী, তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতা করে।

আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্য একটা মাছির ডানার সমানও নয়, কিন্তু আখেরাত তাঁর পাল্লায় খুবই ভারী। তাই প্রতিযোগিতা করার যোগ্য জিনিস যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা আখেরাত ছাড়া আর কিছু নয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আখেরাতের ব্যাপারে যারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তাদের সকলেরই মর্যাদা বাড়ে আর পার্থিব ব্যাপারে প্রতিযোগিতাকারীদের সকলেরই মর্যাদা কমে। আখেরাতের সুখ-সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের জন্যে কৃত চেষ্টা-ষাধনা দুনিয়ার জীবনকেও বিশুদ্ধ করে, উন্নত করে এবং সকল দুনিয়াবাসীর জন্য তাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে। পক্ষান্তরে পার্থিব সম্পদের জন্য কৃত চেষ্টা-সাধনা পৃথিবীকে একটা নোংরা পুঁতিগন্ধময় আস্তাকুঁড়ে পরিণত করে, যেখানে কেবল পোকামাকড় কিলবিল করে এবং পরস্পরকে খাওয়ার চেষ্টা করে অথবা বিভিন্ন রকমের সরীসৃপ ও কীটপতংগ পূতপবিত্র পুণ্যবান লোকদের গায়ে নিরন্তর দংশন করে।

আখেরাতের সম্পদ ও সুখ লাভের জন্যে প্রতিযোগিতা করলে তাতে দুনিয়া বিধ্বস্ত ও জীর্ণ হয় না। যদিও কোনো কোনো বিপথগামী লোক তাই মনে করে। ইসলাম তো দুনিয়াকে আখেরাতের শস্যক্ষেত্রে পরিণত করে। ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় যোগ্যতা ও সততা সহকারে গঠনমূলক কাজ করার মাধ্যমে খেলাফতের দায়িত্ব পালন সত্যিকার মোমেনের কর্তব্য। এই খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার সময় তাকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অনুগত থাকতে হবে। এটিকে পুরোপুরি আল্লাহর এবাদাতে পরিণত করতে হবে এবং একেই নিজের জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা নিজে এ কাজকেই মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণনা

করেছেন। সূরা 'আয যারিয়াতে' আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে আমার এবাদাত করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।'(১)

বস্তুত আল্লাহর এই উক্তি 'এই বিষয় নিয়েই প্রতিযোগিতাকারীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' আসলে দুনিয়াবাসীকে দুনিয়ার খেলাফত ও উন্নয়নকাজ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাদের চক্ষু ও মনকে দুনিয়ার তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র স্বার্থের অপর পারে প্রসারিত করতে উদ্বুদ্ধ করছে। এ উক্তি মানব জাতিকে পৃথিবীর নোংরা আস্তাকুঁড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে এই আস্তাকুঁড়ের উর্ধে পূতপবিত্র জগতের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহ্বান জানায়।

মনে রাখতে হবে, মানুষের ইহকালীন জীবনের আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে পরকালে তার আয়ুষ্কাল কতো দীর্ঘ, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এই পৃথিবীর সহায় সম্পদ সীমাবদ্ধ, কিন্তু বেহেশতের সহায় সম্পদের প্রাচুর্য ও বিস্তৃতি মানুষের কল্পনারও অতীত। এই পৃথিবীর সম্পদ ও প্রাচুর্যের স্থায়িত্ব কতোটুকু, তা সর্বজনবিদিত। অথচ আখেরাতের সম্পদ ও প্রাচুর্য চিরস্থায়ী, সুতরাং এই দুই ধরনের কর্মক্ষেত্রে ও এই দুই ধরনের জীবন লক্ষ্যের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান।

মোমেনদের যারা ঠাট্টা করবে

মানুষ যেভাবে লাভ ক্ষতির হিসাব করে সে হিসাবেও উভয়ের মধ্যে কোনো মিল নেই। তবে সেটা যাই হোক, প্রতিযোগিতা আখেরাতকে নিয়েই করা উচিত। পুণ্যবান ও সৎ লোকদের জন্যে আখেরাতে অপেক্ষমান সুখ ও প্রাচুর্যের বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য কাফের ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে যে গালিগালাজ, ঠাট্টাবিদ্রূপ, আস্ফালন ও তিরস্কার অচিরেই বর্ষিত হতে যাচ্ছে, তার জন্য মোমেনদেরকে প্রস্তুত করা।

তাছাড়া জাহান্নামে বসে কাফেররা যখন পুণ্যবান মোমেনদের সুখ ঐশ্বর্য দেখবে, তখন মোমেনদের পক্ষ থেকে তারা যে পাল্টা বিদ্রূপ শুনবে, তার বিবরণ দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা ও এই বিবরণ দীর্ঘায়িত করার অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই অপরাধীরা মোমেনদেরকে দেখে ঠাট্টা করতো। তারা তাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় টিপ্পনী ও ভেংচি কাটতো। .... আজ মোমেনরা কাফেরদেরকে ঠাট্টা করবে। বালিশে হেলান দিয়ে তাকিয়ে থাকবে। কাফেররা যা করেছে, তারই ফল তারা ভোগ করছে তো?'

এখানে কোরআন মোমেনদের প্রতি কাফেরদের ঠাট্টা বিদ্রূপ, বেয়াদবী, অহংকার ও আস্ফালন এবং তাদেরকে বিপথগামী বলে মন্তব্য করার যে সব দৃশ্য তুলে ধরেছে, তা মক্কার বাস্তব অবস্থারই চিত্র। তবে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন প্রজন্মে এগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। এমনকি আমাদের সমকালীন অনেকেই এসব ঘটনার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। যেন এ সব আয়াত তাদের জীবনে সংঘটিত সেই সব ঘটনারই চিত্র ও বিবরণ তুলে ধরেছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোমেন ও পুণ্যবান লোকদের সাথে আচরণে পাপিষ্ঠ অপরাধী লোকদের ভূমিকা সর্বকালে ও সকল পরিবেশে এক ও অভিন্ন প্রকৃতির।

'অপরাধীরা মোমেনদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো।' হাঁ, দুনিয়ার জীবনে তারা এটা করতো বটে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সে পাট চুকে গেছে। এখন সহসাই তারা আখেরাতে উপস্থিত। পুণ্যবান লোকদের সুখ শান্তি স্বচক্ষে দেখছে। দুনিয়াতে তাদের কি অবস্থা ছিলো তা তাদের বেশ

(১) ২৭শ পারায় সূরা 'আয যারিয়াতের' তাফসীর দেখুন।

মনে পড়ে! তারা মোমেনদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। এর কারণ ছিলো তাদের দারিদ্র ও দুঃখ-দৈন্য, অথবা আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষমতা, অথবা অসভ্য মূর্খ লোকদের অশিষ্টাচারের সামনে নিজেদের ভদ্রতা বজায় রাখতে ধৈর্য অবলম্বন। এ সবই অপরাধী লোকদের হাসির উদ্রেক করে থাকে। এ কারণে মোমেনদেরকে তারা হাসি-ঠাট্টার পাত্র মনে করে।

তারা তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যায়, আর তাদের কষ্ট দেখে উপহাসের হাসি হাসে। অথচ মোমেনরা ধৈর্য ও ভদ্র আচরণ অব্যাহত রাখে। 'তারা মোমেনদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় টিপ্পনী কাটে ও ভেংচি দেয়।' অর্থাৎ চোখ দিয়ে কিংবা হাত দিয়ে ইশারার মাধ্যমে টিপ্পনী ও ভেংচি দেয়। অথচ নিজেদের পরিচিত অন্য কোনো পন্থায় মোমেনদেরকে উপহাস করে। এগুলো অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর বেয়াদবী ও অসভ্যপনা। এগুলোর উদ্দেশ্য মোমেনদেরকে দাবিয়ে রাখা, তাদের মনে হীনতা ও বিব্রতবোধ জাগিয়ে রাখা। আর এসব ষন্ডাপান্ডারা তাদের সাথে উপহাস ছলে ভেংচি দেয় ও টিপ্পনী কাটে।

'আর যখন তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়, তখন পূর্ণ তৃপ্তি ও উল্লাস সহকারে ফিরে যায়।' অর্থাৎ মোমেনদেরকে বিদ্রূপ, গালাগাল ও উত্যক্ত করে যখন তাদের ইতর ও অভদ্র মন তৃপ্ত হয়, তখন উল্লসিত হয়ে ফিরে যায়। এতে কোনো অনুতাপ ও অনুশোচনা বোধ করে না। তারা কতো হীন ও জঘন্য আচরণ করলো তা অনুভবই করে না। এটি ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের এমন শোচনীয় ও মর্মান্তিক শূন্যাবস্থা যে, এ পর্যায়ে এসে বিবেক ও মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অপমৃত্যু ঘটে।

'আর যখন তারা মোমেনদেরকে দেখে অমনি বলে যে, এরা বিপথগামী!' এটা সত্যিই আরো বেশী বিস্ময়কর। যাদের আপাদমস্তক পাপ ও অপরাধের নোংরামিতে কলুষিত, তারা কে সুপথগামী কে বিপথগামী এ নিয়ে আলোচনা করবে, মোমেনদেরকে দেখামাত্রই তাদেরকে বিপথগামী বলে মন্তব্য ঝাড়বে এবং তাচ্ছিল্যবশত ও অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে জোর দিয়ে এ কথা বলবে, এর চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কিছু থাকতে পারে না।

বস্তুত পাপাসক্ত মানুষের কুকর্ম ও কুকথার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। কোনো কথা বলতে তারা লজ্জাবোধ এবং কোনো কাজ করতে তারা সংকোচ বোধ করে না। মোমেনদের সাথে দেখা হতেই অপরাধীরা একথা বলা যে, ওরা বিপথগামী, এটা এ কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, অপরাধ প্রবণতা, পাপাসক্তি ও অসততার প্রকৃতিই এমন যে, তা কোনো সীমা-সরহদ মানে না।

এখানে কোরআন মোমেনদের পক্ষ নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে না। অপরাধীদের এ উক্তিটা যে কতো বড়ো নির্জলা মিথ্যা ও কতো নিম্নস্তরের মিথ্যা, সে ব্যাপারেও সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় না। কেননা ওটা একটা চরম উদ্ভট উক্তি, যা নিয়ে আলোচনা করাই সাজে না। তবে সে তাদের দিকে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের একটা বিদ্রূপ বান ছুঁড়ে দেয়, যারা কোনো বিষয়ে অনধিকার চর্চা করে এবং অনাহূতভাবে অজানা বিষয়ে নাক গলায়। সে বলে, 'তাদেরকে মোমেনদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।' অর্থাৎ তাদেরকে মোমেনদের অভিভাবক নিয়োগ করা হয়নি, তাদের রক্ষক ও প্রহরী করে পাঠানো হয়নি, তাদের অবস্থার মূল্যায়ন ও মর্যাদা নিরূপণের দায়িত্বও তাদেরকে দেয়া হয়নি। সুতরাং মোমেনরা বিপথগামী কি সুপথগামী, সে বিষয়ে রায় দেয়ার তারা কে?

দুনিয়াতে অপরাধীরা কি আচরণ করতো তার উল্লেখ করেই এই উচ্চমার্গের বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের সমাপ্তি টানা হয়েছে। এ দৃশ্য এখানেই গুটিয়ে নেয়া হয়েছে যাতে মোমেনদের বেহেশতের অফুরন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ করার বর্তমান দৃশ্যটি তুলে ধরা যায়। সে দৃশ্যটি হলো, 'আজ মোমেনরা কাফেরদের প্রতি বিদ্রূপ করবে, বালিশে হেলান দিয়ে দেখবে..........।'

অর্থাৎ আজ যখন কাফেররা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আড়ালে লুকানো থাকবে, যখন এই আড়ালে থাকার কষ্ট তাদের মানব জন্মকে ব্যর্থ করে দেবে, যখন চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে, আর সেখানে তাদেরকে বলা হবে, 'এই তো সেই জিনিস যা তোমরা অস্বীকার করতে।'

বস্তুত আজ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সেই দিন, যখন মোমেনরা বালিশে হেলান দিয়ে স্থায়ী সুখ ও শান্তির পরিবেশে কাফেরদের অসহায় অবস্থার দিকে চেয়ে থাকবে, তাসনীমে মিশ্রিত মেশক দ্বারা আবদ্ধ পাত্রের পানীয় পান করবে, আর এই অবস্থায় মোমেনরা কাফেরদের প্রতি বিদ্রূপ করবে।

এ পর্যায়ে এসে কোরআন স্বীয় উচ্চমার্গের বিদ্রূপ ও কটাক্ষের পুনরাবৃত্তি করে বলে, 'কাফেররা যা করেছে, তার প্রতিদান পেয়েছে তো?' হাঁ, তারা কি কৃতকর্মের প্রতিফল পেয়েছে?

মূল আরবীতে 'সওয়াব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ প্রতিফল বা প্রতিদান। তবে প্রচলিত অর্থে এটি ভালো অর্থে অর্থাৎ শুভ প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু তারা প্রচলিত অর্থে 'সওয়াব' অর্থাৎ শুভ প্রতিদান পায়নি। এ মুহূর্তে আমরা তাদেরকে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছি। তারা নিসন্দেহে তাদের কর্মফল ভোগ করছে। সেটাই তাদের 'সওয়াব' বটে! বস্তুত সওয়াব শব্দটিতে এখানে রয়েছে সূক্ষ্ম কটাক্ষ!

এক মুহূর্ত আমরা এই দৃশ্যটির সামনে থামবো, যার আলোচনা কোরআন কিছুটা দীর্ঘায়িত করেছে। এটি হচ্ছে দুনিয়াতে অপরাধী ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে মোমেনদের সাথে বিদ্রূপ। ইতিপূর্বে সৎ লোকদের পুরস্কার ও পরকালীন সুখ সমৃদ্ধির বিবরণও কোরআন বিশদভাবে দিয়েছে। এর প্রভাব নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, এটা একটা উচ্চাংগের বাককৌশল ও নিপুণ বাচনভংগী।

মোমেনদের প্রতি আল্লাহর সান্ত্বনা

অনুরূপভাবে এটা একটা উচ্চাংগের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাও বটে। কেননা মক্কার সেই অতি ক্ষুদ্র মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী মোশরেকদের পক্ষ থেকে এত নিষ্ঠুর নির্যাতন ভোগ করে আসছিলো যে, তা তাদের মনে গভীর ও প্রচন্ড ক্ষতের সৃষ্টি করে ফেলেছিলো। অপর দিকে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কোনো সহায়তা, বা কোনো প্রবোধ ও সান্ত্বনা না দিয়ে ওইভাবে ফেলে রাখতে চাইছিলেন না।

এই প্রেক্ষাপট দেখলে বুঝা যায় যে, মোশরেকদের পক্ষ থেকে মোমেনদের ওপর পরিচালিত নির্যাতন ও নিপীড়নের এই বিশদ বিবরণ (পবিত্র কোরআনের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাযিল হওয়া) তাদের মনোবেদনার কিছুটা উপশমের কারণ হতে পারে। এতে দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রভু পরওয়ারদেগার নিজেই তাদের এই কষ্টের বিবরণ দিচ্ছেন। কেননা তিনি তা দেখতে পান এবং তাদের এই কষ্টকে তিনি অবহেলা করেন না।

তিনি কাফেরদের সাময়িকভাবে অবকাশ দিয়েছেন, শুধুমাত্র এতটুকু উপলদ্ধিই মোমেনের মনকে প্রবোধ দান ও তার দুঃখ-বেদনা ও আঘাতকে নিরাময় করার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা দেখতে পান বিদ্রূপকারীরা কিভাবে তাদের সাথে বিদ্রূপ করে। অপরাধীরা কি নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে নির্যাতন করে। আর তাদের দুঃখ ও কষ্ট দ্বারা তারা কিভাবে উল্লসিত হয় এবং কিছুমাত্র অনুতাপ ও অনুশোচনা বোধ করে না। এর কোনো কিছুই তাদের প্রভুর নযর এড়ায় না এবং তিনি তার ওহীতে তার বিবরণ দেন। তাহলে এটা তাঁর কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার! এতটুকুও কম কিসের? মোমেন হৃদয় যতই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত, আহত ও ব্যথিত হোক না কেন, এই বিবরণই তার প্রবোধ দানের জন্য যথেষ্ট।

এরপর তাদের প্রভু অপরাধীদের সাথে ভদ্র ভাষায় হলেও সূক্ষ্ম বিদ্রূপ করে তাদের মনেও পাল্টা আঘাত হানেন। হয়তো তাদের পাপের কালিমায় আচ্ছন্ন মরিচা ধরা হৃদয়ে এটা অনুভূত নাও হতে পারে। কিন্তু মোমেনের সংবেদনশীল ও স্বচ্ছ মন তা অনুভব ও হৃদয়ংগম করে এবং সান্ত্বনা ও স্বস্তি লাভ করে।

এরপর মোমেনদের মানসচক্ষুতে এটাও দেখানো হয় যে, তাদের প্রভুর কাছে তাদের কেমন আদর-যত্ন হবে। তাঁর বেহেশতে তাদের কিরূপ সুখ-শান্তির ব্যবস্থা থাকবে। ফেরেশতাদের উচ্চতর মহলে তাদের সম্মান ও মর্যাদা কতো। অপরদিকে সেই উচ্চ মহলে তাদের দুশমনদের কি দুর্গতি ও অপমান এবং জাহান্নামে তাদের কি লাঞ্ছনাকর শাস্তি হবে তাও দেখানো হয়।

একজন মোমেন পাশাপাশি এই দুটি দৃশ্যকেই সবিস্তারে দেখতে পায়। সে এ উভয় পরিণতি শুধু অনুভবই করে না বরং নিশ্চিত বিশ্বাস দ্বারা এর স্বাদ উপভোগও করে। আর এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই উভয় দৃশ্যের স্বাদ উপভোগ তার অন্তরের সেই তীব্র জ্বালা যন্ত্রনা ও তিক্ততা দূর করে দেয়, যা গালিগালাজ, কটূক্তি, কটাক্ষ, ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং সংখ্যা-স্বল্পতা ও দুর্বলতা হেতু সৃষ্টি হয়েছিলো। এমনকি এটাও বিচিত্র নয় যে, স্বয়ং মহান আল্লাহর বর্ণনায় এ দৃশ্যাবলী উপভোগ করার পর কোনো কোনো মোমেনের হৃদয়ে নির্যাতন-নিপীড়নজনিত এই তিক্ততা মিষ্টতায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। সেটি এই যে, কাফের ও মোশরেকদের পক্ষ থেকে মুসলমানরা যে পাশবিক নির্যাতন ও মানসিক নিপীড়ন ভোগ করতো, যে নিষ্ঠুর কটূক্তি ও বর্বরোচিত উপহাসে জর্জরিত হতো, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার একমাত্র সান্ত্বনা এটাই দেয়া হয়েছিলো যে, মোমেনদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, আর কাফেরদের জন্যে জাহান্নাম। অন্য কথায়, দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে তাদের উভয় গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে উপনীত হওয়া। রসূল (স.)-এর হাতে হাত দিয়ে যারা জান ও মাল আল্লাহর হাতে ব্যয় করার প্রতিজ্ঞা করে বাইয়াত করছিলেন, তাদের থেকে তিনি কেবল এই একটি মাত্র ওয়াদাই নিয়েছিলেন।

পার্থিব জীবনের সাফল্য ও বিজয়ের কথা কোরআনের মক্কী অংশে মোমেনদের সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়ার জন্যে ঘুর্ণাক্ষরেও উল্লেখ করা হয়নি।

বস্তুত কোরআন একদল মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের এই আমানত বহন করার যোগ্য করে গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত ছিলো। এই মানুষগুলোর মন এত মযবুত, এত দৃঢ় ও এত নিস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন ছিলো, যেন তারা সব কিছু হারিয়েও এবং সকল দুর্ভোগ মাথা পেতে নিয়েও এই পার্থিব জীবনে কোনো প্রতিদান পাওয়ার আশা না করে।

তারা যেন কোন অবস্থাতেই আখেরাতের শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুর প্রত্যাশা না করে। তাদের মন-মানস যেন দুনিয়ার জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও এবং সকল দুঃখ কষ্ট, নির্যাতন, বঞ্চনা ও ত্যাগ তিতিক্ষার পরও এই দুনিয়াতে অচিরেই কোনো পুরস্কার পেতে অভিলাষী না হয়, এমনকি সেই ত্যাগ ও সংগ্রামের ফলে আন্দোলনের সাফল্য, ইসলামের বিজয় এবং মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা যদি অবধারিত হয়েও দেখা দেয়, তবু সেটাই যেন তাদের লক্ষ্য না হয়।

দুনিয়ার জীবনে কোনো বিনিময় বা প্রতিদান ছাড়াই কেবল যে ত্যাগ স্বীকার করে যেতে হবে, শুধুমাত্র আখেরাতেই যে পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং সত্য ও মিথ্যার ফায়সালা হবে সে কথা জেনেও এই সত্য সংগ্রামী দলটি যখন সংগ্রামের দায়িত্ব পালন করবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাইয়াত ও ওয়াদার যথার্থতা ও নিয়তের একনিষ্ঠতায় সন্তুষ্ট হবেন, তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা একদিন দেখবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতেই সাহায্য এসে পড়েছে। তখন তারা এ সাহায্য ও বিজয়কেও নিজেদের ভোগের সামগ্রী হিসাবে নয় বরং আল্লাহর দেয়া আমানত হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়িত করা।

বস্তুত এ কাজটিই হবে আমানতের প্রতি যথার্থ সুবিচার। কেননা তাকে এর বিনিময়ে কখনো দুনিয়ার কোনো স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ দেয়া হবে বলে ওয়াদা করা হয়নি। তাই তারা তার প্রত্যাশাও করে না। তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই কাজ করেছে। তাই তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু তারা চায় না।

দুনিয়ায় বিজয় ও সাফল্যের উল্লেখ করে যে সব আয়াত নাযিল হয়েছে, তার সবই নাযিল হয়েছে মদীনায়। তার পরে এবং মোমেনের মন থেকে এই পার্থিব বিজয় ও সাফল্যের সকল আশা ও প্রতীক্ষা পরিত্যক্ত হবার পর বিজয় এসেছে স্বতস্ফূর্তভাবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং চেয়েছেন যে, তাঁর এই সুমহান আদর্শ মানব জীবনে বাস্তবায়িত হোক, যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এটা ত্যাগ, কোরবানী ও দুঃখ যাতনা ভোগের পুরস্কার ছিলো না, বরং আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা ছিলো। যার পেছনে বহু সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী কল্যাণ কামনা সক্রিয় ছিলো। সেই সূক্ষ্ম কল্যাণ কামনা কি ছিলো, সেটা এখন আমরা বুঝবার চেষ্টা করতে পারি।

সূরা আল এনশেক্বাক্ব

আয়াত ২৫ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ
مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَآأَيُّهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُ
بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾
وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِيٓ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَّنْ
يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. যখন আসমান ফেটে যাবে, ২. সে তো তার মালিকের আদেশটুকুই পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে, ৩. যখন এ ভূমন্ডল সম্প্রসারিত করা হবে, ৪. (মুহূর্তের মধ্যেই) সে তার ভেতরে যা আছে তা ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে, ৫. সেও তার সৃষ্টিকর্তার আদেশটুকুই পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে; ৬. হে মানুষ, কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, অতপর তুমি তাঁর সামনা সামনি হবে, ৭. (তোমাদের মধ্যে) যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, ৮. তার হিসাব একান্ত সহজভাবেই গ্রহণ করা হবে, ৯. সে খুশীতে নিজ পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাবে: ১০. আর যার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, ১১. সে তখন মৃত্যুকেই ডাকতে থাকবে, ১২. এভাবেই সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে; ১৩. (অথচ দুনিয়ায়) সে নিজ পরিবার পরিজনের মাঝে আনন্দে আত্মহারা ছিলো; ১৪. সে নিশ্চিত ভেবেছিলো, তাকে কখনো (তার মালিকের কাছে) ফিরতে হবে না, ১৫. হ্যাঁ, (আজ) তাই (হলো), তার মালিক (কিন্তু) তার সব কার্যকলাপ (পুংখানুপুংখভাবে) দেখছিলেন; ১৬. শপথ সান্ধ্যকালীন রক্তিম আভার,

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا
لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ
الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

১৭. শপথ রাতের ও এর ভেতর যতো কিছুর সমাবেশ ঘটে তার, ১৮. এবং শপথ (ওই) চাঁদটির, যখন তা (ধীরে ধীরে) পূর্ণাংগ চাঁদে পরিণত হয়ে যায়, ১৯. তোমাদের অবশ্যই (দুনিয়ার) একটি স্তর অতিক্রম করে (মৃত্যুর) আরেকটি স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে; ২০. এদের হয়েছে কি? এরা কেন মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, ২১. আর এ কোরআন যখন এদের সামনে পড়া হয়, তখন (কেন মালিকের সামনে) এরা সাজদাবনত হয় না? ২২. এ অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ২৩. আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন এরা (এদের আমলনামায়) কি কি জিনিস জমা করে চলেছে, ২৪. (হে নবী,) তাদের সবাইকে তুমি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও, ২৫. তবে হ্যাঁ, যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সূরা তাকওয়ীর ও সূরা এনফেতারে এবং তারও পূর্বে সূরা নাবায় যে প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক বিপর্যয়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে, এই সূরাও সেই ধরনের কিছু বিপর্যয়ের বিবরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। তবে এখানে এই সূরার বিবরণের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে আল্লাহর সামনে আকাশ ও পৃথিবীর পরিপূর্ণ বিনয়, আনুগত্য ও বশ্যতা সহকারে আত্মসমর্পণ। যেমন বলা হচ্ছে, 'আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, নিজ প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হবে এবং এটিই তার কর্তব্য, আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও সে শূন্যগর্ভা হয়ে যাবে। সে তার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হবে এবং এটিই তার করণীয়।'

উপরোক্ত বিনয় বিধৃত ও গুরুগম্ভীর প্রাথমিক অংশটি 'মানুষ'কে সম্বোধন করা, তার মনে তার প্রভুর প্রতি বিনয় ও আনুগত্য জাগ্রত করা, প্রতিপালকের নির্দেশ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর কাছে তার প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে অনুভূতিতে যখন পরম আনুগত্য, বিনয় ও আত্মসমর্পণের প্রেরণা সৃষ্টি করে, তখন তার মনে একই সাথে আল্লাহর কাছে তার অনিবার্য প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

অতপর শুরু হয় মানুষকে নিম্নরূপ সম্বোধন, 'হে মানুষ, তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে পৌছানো পর্যন্ত ...... কারণ তার প্রতিপালক তার ওপর সবিশেষে দৃষ্টি রাখেন।' (আয়াত-৬-১৫)

আর তৃতীয় অংশটিতে এমন কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, যা মানুষের অবচেতন মনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সে সব দৃশ্যের কিছু আভাস-ইংগিত মানুষ পেয়ে থাকে এবং তার এমন কিছু আলামত বা লক্ষণও থাকে যা সুপরিকল্পিত ও অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে। সেই সাথে এমন কিছু শপথবাক্যও উচ্চারিত হয়েছে, যা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, কিছু অদৃশ্য নিয়ন্ত্রিত ও খোদায়ী পরিকল্পনাসিদ্ধ পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মানুষের বিবর্তন ঘটে। সেইসব পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা বা তা থেকে অব্যাহতি লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। 'শপথ করি প্রভাতকালের, শপথ করি রাতের এবং রাত যেসব জিনিসকে আচ্ছন্ন করে তার, আর শপথ করি চাঁদের যখন তা পূর্ণচাঁদে পরিণত হয়, নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে।' (আয়াত-১৬-১৯)

এরপর আসছে সূরার শেষাংশ। এতে যারা ঈমান আনে না তাদের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দুই অংশে তাদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। আর প্রথমাংশে দেখানো হয়েছে তাদের পরিণতি ও বিশ্বনিখিলের পরিসমাপ্তির দৃশ্য। আর এই বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'তাদের কী হয়েছে যে, ঈমান আনে না এবং তাদের সামনে কোরআন পড়া হলে তারা সেজদা করে না?' সর্বশেষে তাদের সেই সব অনিবার্য আপদ মুসিবতের কথা বলা হয়েছে, যা কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তাদের অবধারিত পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যথা, 'বরঞ্চ কাফেররা অবিশ্বাস করছে অথচ ....সৎকর্মশীলরা এর ব্যতিক্রম। তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত শুভ প্রতিদান।' (আয়াত-২২-২৫)

সূরা আল এনশেকাক এমন একটি শান্ত ও নিরুত্তাপ সূরা, যার প্রভাব হৃদয়ে খুব সুক্ষভাবে বদ্ধমূল হয়, যার ইংগিত ও নির্দেশনা গুরুগম্ভীর এবং তার এ বৈশিষ্ট্য এমনকি সেই সর্বব্যাপী মহাজাগতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্যাবলীতেও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, যা সূরা আত তাকওয়ীরে একটা উত্তাল পরিবেশে পরিবেশিত হয়েছে। দরদমাখা ও স্নেহময় ভংগিতে মানুষকে তত্ত্বজ্ঞান দান করাই এ সূরার মূল সুর। ধীর পদক্ষেপে পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় ও গভীর বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ংগম করানোই এ সূরার বাচনভংগির বৈশিষ্ট্য। আর 'হে মানুষ' বলে যে সম্বোধনটি এখানে করা হয়েছে, তাতে স্মরণ করানো ও বিবেককে জাগানোর সুর ধ্বনিত।

সূরাটি তার অংশগুলোকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানসিক বিষয় আলোচনা করে এবং এভাবেই তা মানুষের হৃদয়কে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। সুপরিকল্পিতভাবে সে এই আবর্তন প্রক্রিয়ার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে। তা বিশ্বজগতের আত্মসমর্পণের দৃশ্য থেকে শুরু করে মানুষের মনের অনুভূতি হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলের দৃশ্য, প্রকৃতির চলমান অবস্থা ও তার বিভিন্ন দিক পর্যন্ত পরিবেষ্টিত। অতপর এক সময় তা মানুষের মানসিক অনুভূতি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এ সব কিছুর পর যারা ঈমান আনে না তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক আযাবের হুমকি ও শাসানী দান করা হয়েছে এবং মোমেনদেরকে অপরিমেয় প্রতিদান সহকারে আযাব থেকে অব্যাহতি দানের সুসংবাদ দান পর্যন্ত এই আবর্তন চলতে থাকে।

এতোসব আবর্তন, দৃশ্যাবলীর পট পরিবর্তন, চেতনার মর্মমূলে সম্বিত তোলা ও সাড়া জাগানোসহ এসব কিছুই এমন একটি ক্ষুদ্র সূরায় চলতে থাকে, যা মাত্র কতিপয় ছত্রেই সমাপ্ত। এটা একমাত্র এই বিস্ময়কর গ্রন্থ ছাড়া আর কোথাও কল্পনা করা যায় না। বস্তুত অনেক বড় ও বিস্তৃত আলোচনায় এতোগুলো কথা, এতোগুলো লক্ষ্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় এবং তাতে এতো বলিষ্ঠতা ও প্রভাব সৃষ্টি হয় না। তবে কোরআনের কথাই আলাদা। এ কেতাব যে কোনো প্রসংগকেই সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করে এবং মানুষের মনকে প্রত্যক্ষভাবেও খুবই কাছ থেকে সম্বোধন করে। এটা মহাজ্ঞানী ও সবজান্তা আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য।

তাফসীর

'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং সে স্বীয় প্রভুর নির্দেশ পালন করবে। বস্তুত এটাই তার করণীয়। আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার গর্ভস্থ সব কিছু বের করে দিয়ে সে শূন্যগর্ভা হয়ে যাবে, আর সে স্বীয় প্রভুর অনুগত হবে এবং এটাই তার জন্যে যথোচিত।' আকাশের বিদীর্ণ হওয়া সংক্রান্ত আলোচনা পরবর্তী সূরায়ও রয়েছে। এখানে যে বিষয়টি নতুন এসেছে, তা হলো স্বীয় মনিবের প্রতি আকাশের অনুগত হওয়া, সেটাই তার কর্তব্য বলে ঘোষিত হওয়া, তার বশ্যতা স্বীকার ও নিজ কর্তব্য পালনের জন্যে তার বিনয়াবনত হওয়া।

আকাশের স্বীয় প্রতিপালকের অনুগত হওয়ার অর্থ এখানে আল্লাহর কাছে তার আত্মসমর্পণ এবং তার আদেশক্রমে বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া। 'হুক্কাত' শব্দের অর্থ হলো, এটাই তার যথার্থ কর্তব্য ও দায়িত্ব। এটাকে নিজের কর্তব্য হিসাবে তার স্বীকৃতি দান তার বিনয় ও আনুগত্যেরই অংশ। কেননা এটা তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব।

কেয়ামতের কিছু খন্ড চিত্র

'পৃথিবীকে প্রসারিত করার' ব্যাপারটা একটু অভিনব ও নতুন। এ দ্বারা পৃথিবীর আকৃতির হ্রাসবৃদ্ধিও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহর যে সব ফেরেশতা পৃথিবীকে পরিচালনা ও শাসন করতো এবং তাকে তার বর্তমান ও সর্বশেষ আকৃতিতে সংরক্ষণ করতো, তাদের পরিবর্তনের কারণে এটা ঘটে থাকতে পারে। অনেকে বলে, এর আকৃতি বল বা ডিমের ন্যায়। বাক্যটির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি থেকে প্রতিভাত হয় যে, পৃথিবীর এই পরিবর্তনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নয়, বরং কোনো মহান শক্তিধরের আদেশের ভিত্তিতে সংঘটিত হবে। আর এ কারণেই হয়তো এটি কর্মকারক 'মাজহুল' ক্রিয়াপদ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, 'মুদ্দাত' অর্থাৎ যা প্রসারিত হবে।

'এবং সে নিজের ভেতরে যা কিছু আছে নিক্ষেপ করবে .....' এ বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যেন পৃথিবীটা একটা জীবন্ত প্রাণী, যা নিজের ভেতরকার সবকিছু ছুঁড়ে ফেলতে ও খালি হয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর ভেতরে অনেক কিছুই থাকে। আল্লাহর অগণিত সৃষ্টি সেখানে রয়েছে, যা কতো প্রজন্ম ভূপৃষ্ঠের স্তরে স্তরে জমা রয়েছে এবং ছিলো, তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। ভূগর্ভে সঞ্চিত বহু রকমের ধাতু পানি ও অজানা সৃষ্টি রয়েছে, যার হদিস স্বয়ং স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ জানে না। জীব ও জড় নির্বিশেষে এসব জিনিসকে পৃথিবী হাজার হাজার বছর ধরে ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আপন উদরে ধারণ করে রেখেছে। অবশেষে সেই দিনটি সমাগত হলে এগুলোকে সে ছুঁড়ে ফেলবে।

'সে নিজের মনিবের অনুগত হয়েছে ...' অর্থাৎ আকাশের ন্যায় পৃথিবীও আপন প্রতিপালকের আনুগত্য মেনে নিয়েছে এবং সেটা তার কর্তব্যও বটে। সে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে সবিনয়ে কার্যকরীও করেছে এবং স্বীকারও করেছে যে, এটা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সে আল্লাহর অনুগত। এ আয়াতগুলোর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, যেন আকাশ ও পৃথিবী কোনো জীবন্ত প্রাণী, যারা আদেশ শোনে, তাৎক্ষণিকভাবে তা বাস্তবায়নও করে।

যদিও এ দৃশ্যটি কেয়ামতের দিনের সর্বগ্রাসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্যেরই অন্তর্ভুক্ত, তথাপি এ সূরায় তা অত্যন্ত শান্ত, স্থির, অচঞ্চল ও গুরুগম্ভীর। আর এ ব্যাপারে যে অনুভূতি জন্মে, তাহলো এই যে, আকাশ ও পৃথিবী উভয়ে যে আনুগত্য প্রকাশ করবে, তা হবে একেবারেই শর্তহীন, অত্যন্ত বিনয়াবনত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। কোনোরূপ দ্বিধা, সংকোচ বা অবাধ্যতার লেশমাত্র পরিদৃষ্ট হবে না। এহেন বিনয়াবনত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যের পরিবেশে ঊর্ধজগত থেকে যখন মানুষকে সম্বোধন করা হলো যে, 'হে মানুষ তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছো আর অচিরেই তুমি তার সাক্ষাৎ পাবে।' তখনও আকাশ ও পৃথিবী আপন প্রতিপালকের কাছে মাথা নুইয়ে রয়েছে।

'হে মানুষ'........যাকে তার প্রভু পরম অনুগ্রহ ও মহানুভবতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন, তাকে মানুষ বানিয়ে সম্মানিত করেছেন, সমগ্র বিশ্বে শুধু এই মানুষেরই এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে তার আপন স্রষ্টাকে সবচেয়ে ভালো জানার কথা, আকাশ ও পৃথিবীর চেয়েও তাঁর আদেশে তারই বেশী অনুগত থাকার কথা। কেননা তিনি তাকে ভালোমন্দ যাচাইয়ের যোগ্যতা ও তার যে কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল্লাহর সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন। এক কথায় জীবজগতের ভেতরে তাকেই একমাত্র পূর্ণাংগ সৃষ্টিতে পরিণত করেছেন। আর এই পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, সুদূর প্রসারী ও এর উচ্চতা গগনচুম্বী।

'হে মানুষ, পরিশ্রম করে পরিক্রম করে তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছো, অতপর অচিরেই তুমি তার সাক্ষাৎ পাবে।' অর্থাৎ হে মানুষ তুমি পৃথিবীতে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজের আয়ুষ্কাল কাটিয়ে দিচ্ছ। তুমিই তোমার জীবন যাপনের পথ তৈরী করে নিচ্ছ, যাতে করে শেষ পর্যন্ত তুমি তাঁর কাছে পৌছতে পারো। বস্তুত যাবতীয় চেষ্টা সাধনা কেবল তাঁর কাছে পৌছার লক্ষ্যেই চালাতে হবে।

হে মানুষ! তুমি নিজের জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য। এই পৃথিবীতে পরিশ্রম ছাড়া জীবিকা উপার্জন করা সম্ভব নয়। দৈহিক না হোক মানসিক বা চিন্তাগত বা চেতনাগত বা আদর্শগত শ্রম এখানে দিতেই হবে। এই শ্রমে যে লাভবান ও সফল হবে এবং যে বঞ্চিত হবে তারা উভয়ে সমান। পার্থক্য শুধু শ্রমের গুণগত মানে। মূল শ্রমের বিষয়টি মানব জীবনে চিরদিনই আছে ও থাকবে। সবশেষে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রেও সবাই সমান।

হে মানুষ! তুমি পৃথিবীতে কখনো বিশ্রাম ও অবসর পাবে না। বিশ্রামের স্থান তো এটা নয় আখেরাত। আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যদি কেউ সেখানে অগ্রিম কিছু নেক আমল পাঠিয়ে দেয়, তবে সে সেখানে গিয়ে বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করবে। পৃথিবীর জীবনে শ্রম ও চেষ্টা-সাধনা একই। তবে তার গুণ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আল্লাহর কাছে পৌছার পর তাঁর ফলাফল বিভিন্ন রকমের হবে। কেউ কেউ সেখানে এমন জীবন লাভ করবে, যাতে শ্রম থাকবে, তবে পার্থিব শ্রমের চেয়ে কম। আবার কেউ এমন সুখ লাভ করবে যে, তার সমস্ত শ্রমের কষ্ট ও গ্লানি ধুয়ে মুছে দেবে এবং তার মনে হবে যেন কোনোদিন সে কোনো কষ্টই পায়নি।

হে মানুষ! যাকে 'মানবীয়' গুণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করা হয়েছে তোমাকে আল্লাহ তায়ালা যে বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তার সাথে সামঞ্জস্যশীল নীতি অবলম্বন করো। আল্লাহর সাথে যখন তোমার সাক্ষাত হবে, তখন যাতে তোমার শ্রান্তি ও ক্লান্তি নিরেট সুখ শান্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেই পথ অবলম্বন করো।

আমলনামা দেয়ার দু'টি পন্থা

উপরোক্ত সম্বোধনে এই বক্তব্য সুপ্ত রয়েছে, তাই চেষ্টা সাধনাকারীরা যখন তাদের পথের শেষ প্রান্তে পৌছবে, তখন তারা তার যথাযথ প্রতিদান লাভ করবে এবং শ্রম ও সাধনার পর প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে, তাই প্রত্যেকেরই উচিৎ এমন কাজ করা যাতে তার মালিক তার আমলনামা দেখে খুশি হন, তাইতো বলা হয়েছে– যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব একান্ত সহজভাবেই গ্রহণ করা হবে।'

'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তিকে তার আমলনামা পেছন দিক থেকে দেয়া হবে' যাকে আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে সৌভাগ্যশালী এবং তার ওপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট। সে ব্যক্তি হচ্ছে ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীল। আল্লাহ তায়ালা তার ওপর খুশী এবং তার জন্যে মুক্তির সিদ্ধান্ত লিখে দিয়েছেন তার হিসাব নিকাশ হাল্কা ও সহজ হবে, খুঁটিনাটির হিসাব নেয়া হবে না এবং তার কাছ

থেকে কড়া হিসাব নেয়া হবে না। বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, যার পুংখানুপুংখ হিসাব নেয়া হবে সে আযাবে ভুগবে। আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা কি এ কথা বলেননি যে, তার হিসাব সহজ করা হবে? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ওটা কোনো হিসাব নয়। ওটা কেবল উপস্থাপন করা। কেয়ামতের দিন যার হিসাব নিরীক্ষণ করা হবে, সে আযাব এড়াতে পারবে না।' (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণীত আছে যে, রসূল (স.)-কে কোনো কোনো নামাযে বলতে শুনেছি যে, 'হে আল্লাহ তায়ালা, আমার কাছ থেকে সহজ হিসাব নিও।' নামায শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! সহজ হিসাব বলতে কী বুঝায়? রসূল (স.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা কারো আমলনামার ওপর কেবল একটু নযর বুলালেন, তারপর ভুলত্রুটি উপেক্ষা করলেন- এটাই সহজ হিসাব। ওহে আয়েশা! যার হিসাব কড়াকড়িভাবে নেয়া হবে, তার সর্বনাশ হয়ে যাবে।' (আহমদ)

এই হলো ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের সহজ হিসাব। এরপর সে মুক্তি পাবে এবং 'আপন পরিজনের কাছে আনন্দিত চিত্তে ফিরে যাবে।' অর্থাৎ তার যেসব আপনজন মুক্তি পেয়ে আগেই বেহেশতে প্রবেশ করেছে তাদের কাছে ফিরে যাবে। এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমান ও সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে যারা একই গোষ্ঠীভুক্ত, তারা বেহেশতে মিলিত হবে। আত্মীয় স্বজন ও প্রিয়জনদের ব্যাপারটাও তদ্রূপ। এখানে যে দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো, হিসাব নিকাশের পর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এমন প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হবে, যারা কড়া হিসাবের সমস্যা সংকুল স্তর পার হয়ে জান্নাতে যাবে। এ সময় সে কি আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করবে, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

মুক্তিপ্রাপ্ত এই ব্যক্তির অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার ঠিক বিপরীত হবে, যাকে তার কুকর্মের জন্যে গ্রেফতার ও শাস্তি দিয়ে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া হবে। তাকে তার অনিচ্ছা সত্তেও তার আমলনামা দেয়া হবে।

'যাকে পেছন দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকবে এবং (ডাকতে ডাকতে) গিয়ে জলন্ত আগুনে পড়বে।' এ আয়াতটিতে সে কথাই বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আমরা সচরাচর দুটো পরিভাষার ব্যবহার দেখতে পাই, ডান হাতের আমলনামা ও বাম হাতের আমলনামা। কিন্তু এ আয়াতে একটা নতুন জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, পেছন দিক থেকে প্রাপ্ত আমলনামা।

সম্ভবত বাম হাতের আমলনামাটিই এভাবে কাউকে পেছন দিক থেকে দেয়া হবে। কেননা সে লজ্জায় আমলনামার মুখোমুখি হতে চাইবে না এবং তা নিতেও চাইবে না কিন্তু তাকে জোরপূর্বক তা পেছন দিক থেকে দেয়া হবে।

আমরা অবশ্য জানিনা এই আমলনামাটি কি রকম আর কিভাবেই বা তা ডান হাত দিয়ে, বাম হাত দিয়ে বা পেছন দিক দিয়ে দেয়া হবে। তবে সোজা কথায় বুঝি যে, ডান হাত দিয়ে আমলনামা দেয়ার অর্থ মুক্তি আর বাম হাত দিয়ে আমলনামা দেয়ার অর্থ ধ্বংস ও বিনাশ। এই দুটো তত্ত্বই বুঝে নেয়া ও বিশ্বাস করা আমাদের দায়িত্ব। এছাড়া আর যে সব কথা বলা হয়েছে, তা শুধু আমাদের মনে কেয়ামতের ময়দানের দৃশ্য জাগরূক করা এবং চেতনায় তার সুদৃঢ় ছাপ অংকিত করার লক্ষ্যেই বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কি ঘটবে এবং কিভাবে ঘটবে, সেটা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

বস্তুত যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আয়ুষ্কাল কাটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গুনাহ ও নাফরমানীর মধ্যে দিন কাটিয়েছে, সেই দুকূলহারা দেউলে ব্যক্তি নিজের পরিণতি কি হবে তা জানে। সে জানে যে, তার সকল শ্রম-সাধনা বৃথা গেছে এবং তার কষ্টের কোনো বিরতি ও শেষ সীমা নেই। তাই সে মৃত্যুকে ডাকবে। সে নিজের ধ্বংস কামনা করবে, যাতে তাকে তার অবধারিত দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হতে না হয়। আর মানুষ যখন মুক্তি লাভের জন্যে নিজের ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করে, তখন সে এমন একটা স্তরে উপনীত হয়, যেখানে তার আর কোনো কিছু থেকে সংযম অবলম্বন করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। তাই নিজের ধ্বংসই হয়ে দাঁড়ায় তার চূড়ান্ত বাসনা। কবি মুতানাব্বী তার একটি কবিতায় এ কথাটাই বলেছেন– 'মৃত্যুকে যখন তুমি নিরাময়কারী হিসাবে বিবেচনা করো, তখন ব্যাধি হিসাবে সেটাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। আর মৃত্যু যখন মানুষের কাম্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন মৃত্যুই তার জন্যে যথেষ্ট।'

বস্তুত এটা এমন দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয় যে, এর চেয়ে বড় আর কোনো দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয় নেই। 'সে আগুনে প্রবেশ করবে।' এটাই তার অবধারিত পরিণতি। এটা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যেই সে মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু সে আশা সুদূর পরাহত।

এই বিপর্যয়কর ও মর্মান্তিক দৃশ্যের বর্ণনা দেয়ার পরই এই দুর্ভাগা ব্যক্তির অতীতের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সেই অতীতই তাকে এই মর্মন্তুদ ও শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন করেছে।

'সে তার পরিবার পরিজনদের মধ্যে আনন্দে মেতে থাকতো, সে ভাবতো যে তাকে আর কখনো ফিরে যেতে হবে না।' সেটি ছিলো দুনিয়ার ব্যাপার। সত্যিই তার অবস্থা সেই রকম ছিলো। কিন্তু এখন আমরা এই কোরআনের বর্ণনা অনুসারে হিসাব-নিকাশ ও কর্মফল দিবসের মধ্যে আছি। দুনিয়ার জীবনকে আমরা স্থান ও কাল উভয়ের বিচারে অনেক দূরে ফেলে এসেছি।

'সে তার পরিবার পরিজনদের মধ্যে আনন্দে মেতে থাকতো।' অর্থাৎ বর্তমান মুহূর্তটি বাদে আর সব কিছু সম্পর্কে উদাসীন থাকতো। আখেরাতে তার জন্যে কি পরিণতি অপেক্ষা করছে তা নিয়ে সে ভাবতো না। আর তাই সে জন্যে কোনো জবাবদিহীরও প্রয়োজন অনুভব করতো না। আর তার জন্যে সে কোনো প্রস্তুতিও নিতো না। সে ভাবতো যে, সে কখনো আপন স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে না। শেষ মুহূর্তেও সে যদি চিন্তা করতো, তাহলে জবাবদিহীর জন্যে কিছুটা হলেও প্রস্তুতি নিতো।

'হাঁ, তার প্রভু তার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন।' অর্থাৎ সে যদিও ভেবেছিলো যে, তার প্রতিপালকের কাছে তার ফিরে যেতে হবে না, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তার মনিব তার ব্যাপারে ওয়াকেফহাল ছিলেন এবং তার চালচলন সবকিছুই পর্যবেক্ষন করছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাকে তাঁর কাছে ফিরে আসতে হবেই এবং তাকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবেই।

আর এই হতভাগা যখন পার্থিব জীবনে আপন পরিবার পরিজনের মধ্যে আনন্দে গা ভাসিয়ে চলে, তখন তার ঠিক সেই সৌভাগ্যশালী বেহেশতবাসীর বিপরীত অবস্থা হয়ে থাকে, যে আখেরাতের দীর্ঘস্থায়ী জীবনে আপন পরিবারের কাছে আনন্দিত চিত্তে ফিরে যায়। লক্ষণীয় যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির পার্থিব জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি তা কঠোর পরিশ্রমে পরিপূর্ণ–তা যে ধরনের পরিশ্রমই হোক না কেন। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ব্যক্তির পরকালীন জীবন অনন্তকালব্যাপী স্থায়ী, সর্বাত্মক ও অবাধ স্বাধীনতায় অলংকৃত, চিত্তাকর্ষক ও মনোরম, নির্মল সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ এবং সর্বপ্রকারের শ্রম ও ক্লেশ থেকে মুক্ত।

বিস্ময়কর কিছু শপথের ব্যাখ্যা

সুগভীর প্রভাব বিস্তারকারী দৃশ্যাবলীতে পরিপূর্ণ এই পরকালীন জগত সংক্রান্ত আলোচনার পর পার্থিব জীবনের কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই মুহূর্তগুলো যে ধরনের খোদায়ী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার স্বাক্ষর বহন করে মানুষ সে সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয়। মানুষ নিজেও এই খোদায়ী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার আওতাধীন। এই আয়াত কয়টিতে মানুষ পর্যায়ক্রমে যে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে, 'সান্ধকালীন রক্তিম আভার শপথ রাত ও রাত্রিকালীন সকল জিনিসের শপথ।'

পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত আবর্তনশীল এইসব মুহূর্ত নিয়ে শপথ করা হয়েছে এগুলোর দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এবং এই মুহূর্তগুলোর তাৎপর্য ও শিক্ষার প্রতি বিশেষ ইংগিত দেয়ার জন্যে। মুহূর্তগুলো নিস্তব্ধতা, বিনয় ও গুরুগম্ভীর মাহাত্মের মিলিত বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ। সূরার প্রথম দিকে সাধারণভাবে যে ধরনের দৃশ্যাবলী ও ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়েছে, এখানেও অনেকটা তাই পরিলক্ষিত হয়। 'শাফাক' সূর্যাস্তের পর মনে এক ধরনের নিশব্দ ও গভীর আতংকের ভাব দেখা দেয়। মানব হৃদয়ে বিদায়ের অনুভূতি জাগে। একটা নীরব বেদনাবোধ ও গভীর হতাশায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এর পাশাপাশি আসন্ন রাতের ভীতি ও চারদিকে ছড়িয়ে পড়া ঘন অন্ধকারজনিত শংকা মানুষকে উদ্বেগাকুল করে তোলে। এভাবে অজানা ভীতি, অসহায়ত্ববোধ ও নিস্তব্ধতার মিলিত অনুভূতি মানুষকে আনমনা করে তোলে।

'রাত ও রাতের মধ্যে নিহিত যাবতীয় জিনিসের শপথ।' অর্থাৎ রাত্রিকালে যা কিছু ঘটে, যা কিছু সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত হয়। এখানে এই 'যা কিছু' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর সীমা-সংখ্যা বা রকমফের অজানা। এতে এক ধরনের শংকাবোধও বিদ্যমান। রাত্রিকালে অনেক কিছুই পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। নীরব নিস্তব্ধতার মাঝে কল্পনার জগতে ডানা মেলে অনেক দূর চলে যাওয়া যায়। রাতের আঁধারে পুঞ্জীভূত অনেক জিনিস, অনেক প্রাণী, অনেক ঘটনা এবং অনেক আবেগ-অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যায়। এ সময় অনেক গোপন ও প্রকাশ্য জগতের, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অনেক জিনিসের এবং হৃদয়ের গভীরে লুকানো অনেক ধ্যান ধারণার সন্ধান মেলে।

চিন্তা কল্পনা দ্বারা এভাবে অনেক কিছু খুঁজে পাওয়া গেলেও পবিত্র কোরআনের এই ক্ষুদ্র বাক্যটিতে যে ব্যাপক ও বিপুলায়তন জগতের ধারণা পাওয়া যায়, তাতে তার ধারে কাছেও পৌঁছা সম্ভব হয় না। বাক্যটি হলো 'রাত ও রাতের ভেতরে যা কিছু নিহিত তার শপথ।' এই সুগভীর ও বিস্ময়কর বাক্যটির মধ্যে যে ভীতি ও শংকা এবং যে অসহায়ত্ব ও নিস্তব্ধতা ফুটে উঠেছে, একমাত্র তাই-ই নৈশকালীন জগতের পূর্ণ ধারণা দিতে সক্ষম। আর নিস্তব্ধতা ও শংকাবোধ সান্ধকালীন রক্তিম আভার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

'চাঁদের শপথ যখন তা পুর্ণাঙ্গ হয়।' এখানেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একটা শান্ত স্নিগ্ধ চমকপ্রদ ও মায়াবী দৃশ্য। সে দৃশ্যটি হলো শুক্ল পক্ষের রাতগুলোর ক্রমবিকাশমান চাঁদ। এ সময় সে পৃথিবীতে বিকিরণ করে তার শান্ত স্নিগ্ধ আলো, যা মানুষকে গাম্ভীর্যপূর্ণ নীরবতা এবং বাস্তব জগতে ও সুপ্ত চেতনার জগতে দীর্ঘ ভ্রমণে উদ্দীপিত করে। এটি এমন একটি পরিবেশ, যার সাথে গোপন যোগাযোগ রয়েছে অস্তরাগের, রজনীর এবং রজনীর ভেতরে নিহিত সব কিছুর। মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্যে, বিনয়ে এবং নীরবতায় জ্যোৎস্নাস্নাত এই পরিবেশ, রাত ও রাতের যাবতীয় বস্তুর সাথে একত্রিত হয়।

এই চমকপ্রদ, স্নিগ্ধ সুন্দর, গাম্ভীর্যপূর্ণ, ভীতিপ্রদ ও চেতনা সঞ্চারী প্রাকৃতিক মুহূর্তগুলোকে কোরআন ক্ষিপ্রতার সাথে আত্মগত করে এবং এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মনকে আবেদন জানায়।

কেননা মানুষের মন এই প্রাকৃতিক আবেদনকে ভুলে যায়। এই মুহূর্তগুলোর নাম নিয়ে কোরআন শপথ করে, যাতে তা তার বিবেক ও আবেগে উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। যাতে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সুষমা, জীবনীশক্তি, প্রভাব ও প্রেরণা উজ্জীবিত হয় এবং যাতে তা গোটা বিশ্বের ওপর কর্তৃত্বশীল হয়, সর্বোপরি তার প্রতিটি তৎপরতার পরিকল্পনাকারী এবং তার প্রতিটি অবস্থা এবং অচেতন ও উদাসীন মানবজাতির সকল অবস্থার পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণকারী মহান সত্ত্বার নিদর্শনগুলোও যাতে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও লক্ষণীয় হয়।

'তোমরা অবশ্যই দুনিয়ার একটি স্তর অতিক্রম করে মির্ত্যুর আর একটি স্তরের দিকে এগিয়ে যাবে।' অর্থাৎ নানা রকমের অবস্থার পরিবর্তনজনিত কষ্ট তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও পরিকল্পিত সব রকমের অবস্থা ও ভাগ্য মেনে নিতে হবে। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা পরিস্থিতির আবর্তন ও বিবর্তনজনিত সুবিধা-অসুবিধা ভোগ করাকে বুঝানো হয়েছে।

আরবীতে এ ধরনের পরিভাষার প্রচলন রয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, 'উপায়হীন মানুষ খুব কঠিন পরিস্থিতির ওপরও চড়াও হয়।' অর্থাৎ পরিস্থিতির প্রতিটি চড়াই উৎরাই ও আবর্তন-বিবর্তন যেন এক একটা যানবাহন, যার ওপর মানুষ ক্রমাগত আরোহণ করতে থাকে। আর এসব অবস্থা তাকে অদৃষ্টের ফয়সালা ও নির্দেশ অনুসারে জীবনের রাজপথ ধরে গন্তব্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এভাবে তাকে প্রতিটি স্তরের মোড়ে নিয়ে পৌঁছে দেয়। এ ধরনের প্রতিটি চড়াই-উৎরাই, প্রতিটি মোড় পরিবর্তন আল্লাহর নির্ধারিত ও পরিকল্পিত। যেমন অস্তরাগ, রাত, চাঁদ প্রভৃতি পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক অবস্থা ও বস্তু আল্লাহর নির্ধারিত বিধি অনুসারে চলতে থাকে এবং মানুষকে তা তার জীবনের শেষ প্রান্তে নিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

পূর্ববর্তী প্যারায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত এই সূরাটির বিভিন্ন প্যারায় যে সুষমামন্ডিত আবর্তন ও বিবর্তন, এক তত্ত্ব থেকে আর এক তত্ত্বে এবং এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় নিশব্দে ও স্থানান্তরের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তা আসলেই কোরআনের নযীরবিহীন বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম।

উপরোল্লেখিত দৃশ্যাবলী, পরিবর্তনসমূহ ও বিশেষ মুহূর্তগুলোর আলোকেই এক শ্রেণীর লোকের ঈমান না আনার ওপর বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে। কেননা তাদের সামনে, তাদের দেহ ও মনের অভ্যন্তরে ও বিশ্ব-প্রকৃতিতে এতো বিপুল সংখ্যক ঈমাননোদ্দীপক নিদর্শনা বিদ্যমান যে, সে সবের উপস্থিতিতে কোনো মানুষের ঈমান না আনার কোনো কারণই থাকতে পারে না। 'অতএব তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনে না? তাদের সামনে কোরআন পড়া হলে কেন তারা সেজদা করে না?'

তাই তো! তাদের ঈমান না আনার মতো এমন কী ঘটলো?

বস্তুত মানুষের মনে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি কোণে এমন ঈমানোদ্দীপক নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রয়েছে যা মানুষের মনকে আলোড়িত ও উদ্বুদ্ধ করে। এসব নিদর্শন এতো বিপুল সংখ্যক, এতো গম্ভীর, এতো শক্তিশালী এবং বাস্তবতার দাঁড়িপাল্লায় এতো ভারী যে, মানুষের মন যদি এগুলোকে উপেক্ষা করতেও চায়, তথাপি তা তাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। এ সব নিদর্শন মানুষের হৃদয় ও কানকে ক্রমাগত আহ্বান জানাতে ও নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে।

'তাদের কী হলো যে তারা ঈমান আনে না? তাদের সামনে কোরআন পড়া হলে কেন তারা সেজদা করে না?' বস্তুত কোরআন প্রকৃতির ভাষায় মানুষকে আহ্বান জানায়, প্রকৃতিতে ও প্রাণী

সত্ত্বায় ঈমানোদ্দীপক যে সব আলামত ও নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোকে তার মনমগযের সামনে উন্মুক্ত করে দেয় এবং সেজদার আকারে খোদাভীতি, বিনয়, একাগ্রতা, মহান স্রষ্টার আনুগত্য এই হৃদয়ে জাগ্রত ও উদ্বেলিত করে।

এ বিশ্বজগত শুধু যে অপরূপ সৌন্দর্যে মন্ডিত, তা-ই নয়, বরং তা দিকনির্দেশনামূলক সংকেতও দেয়। এতে এমন ঈমানোদ্দীপক জিনিসও রয়েছে, যা মানুষের মনকে এই সুন্দর বিশ্বনিখিল ও তার মহান স্রষ্টার সাথে সম্মিলিত করতে পারে এবং তার হৃদয়ে সৃষ্টির সেই মহাসত্য প্রবিষ্ট করে যা মহান স্রষ্টার সত্ত্বাকে বিরাট বাস্তবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ জন্যেই এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, 'তাদের কী হলো যে ঈমান আনে না, আর তাদের সামনে কোরআন পড়া হলে কেন তারা সেজদা করে না?'

বস্তুত এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। এখান থেকে কাফেরদের অবস্থা ও তাদের অনিবার্য পরিণতির বিবরণ দেয়া শুরু হয়েছে, 'বরং কাফেররা মিথ্যা সাব্যস্ত করে অথচ তারা যা আমলনামায় জমা করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানেন। অতএব তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।'

অর্থাৎ সব কিছুকে সর্বতোভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও অস্বীকার করে। সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ও অস্বীকার করাই তাদের স্বভাব, অভ্যাস ও জন্মগত রীতি। অথচ তাদের মনে কী লুকানো আছে তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। কোন কোন কূধারণা, কূমতলব ও কূপ্ররোচনার কারণে তারা এভাবে অস্বীকৃতিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, তাও আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

এখানে তাদের প্রসংগ বাদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলের সাথে কথা বলেছেন, 'অতএব, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।' এমন সুসংবাদ তাদের জন্যে রয়েছে, যা শুনে কেউ খুশী হয় না। আর কোনো সংবাদদাতার কাছ থেকে তা শুনতে কেউ পথ চেয়েও থাকে না! এখানে 'সুসংবাদ' বলে মুলত তাদেরকে ব্যংগ করা হয়েছে উপহাস করা হয়েছে সেসব অপরিনামদর্শী পাপিষ্ঠদের।

একই সাথে মোমেনদের জন্যে কি প্রতিদান অপেক্ষা করছে তাও তুলে ধরা হয়েছে। তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না এবং অস্বীকার করে না। তারা যে ঈমানের দাওয়াত লাভ করেন, সৎকর্ম দ্বারা তাকে স্বাগত জানান। আলোচনার ধারায় এটি 'এসতেস্না' বা ব্যতিক্রম বোধক বাক্য হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের পরিণতি থেকে এটা আলাদা এবং তার বিপরীত।

'তবে মোমেন ও সৎকর্মশীলদের কথা স্বতন্ত্র, তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।'

আরবী ভাষায় একে 'এসতেসনা মুনকাতে' বলা হয়। অর্থাৎ সৎকর্মশীল মোমেনরা প্রথমেও সে 'কালো সুসংবাদ'-এর আওতাধীন ছিলেন না এবং এখনো নেই। পরে তাদেরকে ব্যতিক্রমী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের বাকরীতিতে যে জিনিসটিকে ব্যতিক্রমী বলে চিহ্নিত করা হয়, তার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সতর্ক করা হয়ে থাকে।

'অফুরন্ত পুরস্কার' অর্থ হচ্ছে আখরাতের অন্তহীন ও অনন্তকালব্যাপী পুরস্কার।

এই সংক্ষিপ্ত ও চূড়ান্ত বক্তব্য দিয়ে আলোচ্য ক্ষুদ্র সূরাটি সমাপ্ত হলো, যা প্রাকৃতিক জগতে ও মানবীয় বিবেকবুদ্ধিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করে থাকতে পারে।

সূরা আল বুরুজ

আয়াত ২২ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ﴿٣﴾
قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ﴿٥﴾ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ﴿٦﴾
وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ
يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٨﴾ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ
عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿١٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. শপথ (বিশালকায়) গম্বুজবিশিষ্ট আকাশের, ২. (শপথ) সেই দিনের যার আগমনের ওয়াদা করা হয়েছে, ৩. শপথ (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষীর, (শপথ সেই ভয়াবহ দৃশ্যের) এবং যা কিছু (তখন) পরিদৃষ্ট হয়েছে তার: ৪. (মোমেনদের জন্যে খোঁড়া) গর্তের মালিকদের ওপর অভিসম্পাত, ৫. আগুনের কুন্ডলী– যা জ্বালানি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো, ৬. (অভিসম্পাত, তখন) যারা তার পাশে বসা ছিলো, ৭. এ লোকেরা মোমেনদের সাথে যা করছিলো এরা তা প্রত্যক্ষ করছিলো; ৮. তারা এ (ঈমানদার)–দের কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি যে, তারা এক পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো, ৯. (ঈমান এনেছিলো) এমন এক সত্তার ওপর: যার জন্যে (নিবেদিত) আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব; আর আল্লাহ তায়ালা (তাদের) সব কয়টি কাজের ওপরই সাক্ষী; ১০. যারা মোমেন নর-নারীদের ওপর অত্যাচার করেছে এবং (জঘন্য পাপ করেও) কখনো তারা তাওবা করেনি, অতএব তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠোর) আযাব এবং তাদের জন্যে আরো রয়েছে (আগুনে) জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার শাস্তি; ১১. (অপরদিকে) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ﴿١١﴾ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ
لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ
الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٦﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ
وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾
بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

(ঈমানের দাবী অনুযায়ী) ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে এমন জান্নাত যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে; সেটাই হবে (সেদিনের) সবচেয়ে বড় সাফল্য: ১২. নিসন্দেহে তোমার মালিকের পাকড়াও হবে ভীষণ শক্ত; ১৩. নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন, ১৪. তিনি পরম ক্ষমাশীল, (সৃষ্টিকে) তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন, ১৫. তিনি সম্মানিত আরশের একচ্ছত্র অধিপতি, ১৬. তিনি যা চান (নিজ ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে) তাই করেন; ১৭. তোমার কাছে কি কতিপয় (বিদ্রোহী) সেনাদলের কথা পৌঁছেছে? ১৮. ফেরাউন ও সামুদ (-এর বাহিনী); ১৯. এরা কোনোদিনই (সত্য) বিশ্বাস করেনি, বরং (তারা) মিথ্যা সাব্যস্তকরণে লেগেই ছিলো, ২০. (অথচ) আল্লাহ তায়ালা এদের সবদিক থেকে ঘিরে রেখেছেন; ২১. কোরআন (উন্নত ও) মহামর্যাদাসম্পন্ন (একটি গ্রন্থ); ২২. একটা (মহা) ফলকে (এটা) সংরক্ষিত আছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই ক্ষুদ্র সূরাটি ইসলামী আকীদার তত্ত্ব ও ঈমানী চিন্তাধারার ভিত্তিসমূহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে তুলে ধরেছে। এগুলোর চারদিকে সুদূরপ্রসারী প্রখর জ্যোতি বিকীর্ণ হয়। সে জ্যোতি ঠিকরে পড়ে আয়াতের প্রত্যক্ষ মর্ম ও তত্ত্বের ওপরে, যাতে প্রতিটি আয়াত, এমন কি কখনো কখনো প্রতিটি শব্দ বিশাল বিশ্বজগতের তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধানের জন্যে জানালা খুলে দিতে সক্ষম হয়।

যে বিষয়টি এই সূরায় প্রত্যক্ষভাবে আলোচিত হয়েছে, তা হচ্ছে 'আসহাবুল উখদুদের' ঘটনা। ঘটনাটি এই যে, প্রাচীনকালে ইসলাম গ্রহণকারী একদল মোমেন তাদের শত্রু, একটি খোদাদ্রোহী দুর্বৃত্তের হাতে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। কথিত আছে যে মোমেনদের এই দলটি হযরত ইসা আলাইহেস সালামের অনুসারীদের মধ্যে যারা খালেস তাওহীদপন্থী ছিলেন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নির্যাতনকারী খোদাদ্রোহী গোষ্ঠীটি যুলুম নিপীড়নের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের আকীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ ও ইসলাম বর্জন করে সাবেক শেরেকী আকীদা বিশ্বাসের দিকে

ফিরে আসার জন্যে চাপ দিচ্ছিলো। কিন্তু তারা সব কিছু উপেক্ষা করেও তাদের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের আকীদা বিশ্বাসে অটল থাকেন। খোদাদ্রোহী গোষ্ঠীটি তখন তাদের জন্যে মাটিতে একটা গর্ত খোঁড়ে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে মোমেনদেরকে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মেরে ফেলে।

এহেন পাশবিক পন্থায় মোমেনদেরকে হত্যা করার ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করার জন্যে ইসলামের শত্রুরা বিপুল সংখ্যক জনতাকে সমবেত করে। সেই জনতার চোখের সামনেই এই লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে! খোদাদ্রোহী গোষ্ঠীটি মোমেনদেরকে পুড়িয়ে মারার এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠতে চেয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'চির প্রশংসিত মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর ওপর তারা কেন ঈমান আনলো মোমেনদের কাছ থেকে তারা শুধুমাত্র তারই প্রতিশোধ নিয়েছিলো।'

সূরাটি শুরু হয়েছে কয়েকটি শপথ বাক্যের মাধ্যমে। 'বুরুজ সম্বলিত আকাশের শপথ, প্রতিশ্রুতি দিবসের শপথ, দর্শকের শপথ এবং যা কিছু পরিদৃষ্ট হয় তার শপথ, গর্তের মালিকরা ধ্বংস হয়েছে।' এখানে আকাশ ও তার বিস্ময়কর বুরুজসমূহের মধ্যে, প্রতিশ্রুতি দিবস ও তার অসাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে এই ঘটনা প্রত্যক্ষকারী সমবেত জনতা ও পরিদৃষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। আবার এই সবগুলোকে আলোচ্য ঘটনার সাথে এবং অগ্নিকুন্ড সৃষ্টিকারী খোদাদ্রোহী চক্রের ওপর আকাশের প্রতিশোধ গ্রহণের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

এরপর এমন আকস্মিকভাবে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে, যাতে কোনো দীর্ঘ ও বিশদ বিবরণ ছাড়াই আবেগ অনুভূতিতে ঘটনার পৈশাচিক ও বীভৎস রূপ প্রতিভাত হয়। এখানে আনুষংগিকভাবে এই ধারণাও দেয়া হয়েছে যে, মানুষের যুলুম-নিপীড়ন যতো কঠিন ও লোমহর্ষকই হোক না কেন, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের স্থান তার চেয়ে অনেক উর্ধে। এ আকীদা ও আদর্শ আগুনের ওপর বিজয়ী এমনকি স্বয়ং মানুষের জীবনের ওপরও তার প্রাধান্য রয়েছে।

এ আদর্শ সেই সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত, যা সর্বকালে ও সকল প্রজন্মের মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের উৎস। এখানে এই মর্মেও ইংগিত রয়েছে যে, এই হত্যাকান্ডটি কতো মর্মান্তিক ও পৈশাচিক আর এর পেছনে কতো নীচতা, হীনতা, শঠতা এবং আগ্রাসী ও বিদ্রোহাত্মক মানসিকতা কার্যকর রয়েছে। আর এর পাশাপাশি মোমেনদের মধ্যে কত নিষ্পাপত্ব, কতো পবিত্রতা এবং কতো মহৎ ও উচ্চ মানসিকতা বিরাজমান ছিলো। অভিশাপ তাদের ওপর যারা অগ্নিকুন্ডের পাশে বসে ছিলো, আর তারা মোমেনদের সাথে কি আচরণ করছিলো, তা দেখছিলো।'

এরপরই এক এক করে আসছে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ও পর্যালোচনা, ইসলামী দাওয়াত, ইসলামী আকীদা ও মৌলিক ঈমানী চিন্তাধারার সাথে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলোতে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে এই মর্মে ইংগিত করা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর ওপর আল্লাহর সার্বভৌম ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব বিরাজমান। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তাতে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি উপস্থিত থাকেন ও তা প্রত্যক্ষ করেন। 'যার রাজত্ব বিরাজিত আকাশ ও পৃথিবীতে এবং আল্লাহ তায়ালা সব কিছুরই প্রত্যক্ষদর্শী।'

পরবর্তী আয়াতে জাহান্নামের সেই আযাব এবং সেই দহনযন্ত্রনার উল্লেখ করা হয়েছে, যা সীমা অতিক্রমকারী পাপিষ্ঠ বর্বর লোকদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আর তার পাশাপাশি বেহেশতের নেয়ামতের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং তা পাওয়াকে বিরাট সাফল্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

আপন আদর্শকে জীবনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে আগুন ও আগুনে দগ্ধীভূত হওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মোমেনদের জন্যে সেই নেয়ামত নির্দিষ্ট রয়েছে।

'নিশ্চয়ই যারা মোমেন নারী ও পুরুষদের ওপর অত্যাচার করেছে এবং তারপর তাওবা করেনি, তাদের জন্যে জাহান্নামের আযাব ও দহন-যন্ত্রণা নির্দিষ্ট রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে বেহেশত যার– তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। আর তাই বিরাট সাফল্য।'

সূরাটিতে আল্লাহর কঠোর পাকড়াও সম্পর্কেও হুশিয়ার করা হয়েছে, 'যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পুনসৃষ্টি করেন।'

বস্তুত এটি এমন এক সত্য, যা আলোচ্য ঘটনায় বিনষ্ট প্রাণগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং এই ঘটনার ওপর সুদূর প্রসারী আলোকপাত করে। এরপর আল্লাহর বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর প্রত্যেকটি গুণই সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য বহন করে।

'তিনি ক্ষমাশীল ও স্নেহময়' কেউ যতো বড় ও যতো নৃশংস অপরাধই করুক না কেন, তাওবা করলে তিনি তার জন্যে ক্ষমাশীল, আর তাঁর যে বান্দারা তাঁকে অন্য সব কিছুর উর্ধে স্থান দেয় তাদের জন্যে তিনি স্নেহময়। 'স্নেহ' এখানে আল্লাহর নির্যাতিত বান্দাদের মনের ক্ষত সারানোর ওষুধ তথা প্রবোধ বাক্য।

'তিনি মহান আরশের অধিপতি, যা ইচ্ছা করেন তা করেই ছাড়েন।'

এ গুণগুলো আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্ব, নিরংকুশ ক্ষমতা ও সর্বাত্মক ইচ্ছাশক্তির প্রতীক। এগুলো সবই ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত। এগুলোও ঘটনার ওপর সুদূরপ্রসারী আলোকপাত করে।

এরপর অতি দ্রুতগতিতে খোদাদ্রোহী শক্তিসমূহের অতীত কর্মকান্ডের প্রসংগ এসেছে। এই সব খোদাদ্রোহী শক্তি যাবতীয় অস্ত্র ও সরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিলো।

'তোমার কাছে কি ফেরাউন ও সামুদ-এই দুটি বাহিনীর খবর এসেছে?'

বস্তুত উল্লেখিত দুটি শক্তির পতন ও ধ্বংসের ঘটনা আপন আপন প্রকৃতি ও ফলাফলের দিক থেকে বিভিন্নতার দাবী রাখে। 'উখদুদ' বা পরিখার ঘটনার পাশাপাশি এই ঘটনাও তাৎপর্যমন্ডিত। সর্বশেষে কাফেরদের বর্তমান অবস্থা ও পরিণতি এবং তাদের অজ্ঞাতসারেই যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ঘেরাও করেন, সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'বরঞ্চ কাফেররা অস্বীকার করার নীতিতেই অবিচল রয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের আড়াল থেকে ঘেরাও করে ফেলবেন।'

আল কোরআনের সত্যতা, তার মূল ভাষ্য ও তার শাখাপ্রশাখার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। 'বরঞ্চ এটি মহান কোরআন, মহান ফলকে সুরক্ষিত।' এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, কোরআন যে সিদ্ধান্ত দেয় সেটাই সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। এ পর্যন্ত সংক্ষেপে আলোচিত হলো সূরা বুরুজের ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী আলোচনার বিষয়বস্তু ও বক্তব্য। এর মাধ্যমে ওই বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়ের বিশদ আলোচনার পটভূমি প্রস্তুত করা হচ্ছে।

তাফসীর

'বুরুজ সমন্বিত আকাশের শপথ, প্রতিশ্রুত দিবসের শপথ এবং দর্শক ও যা কিছু পরিদৃষ্ট হয় তার শপথ।' পরিখার ঘটনার আভাস দেয়ার আগেই সূরাটি এভাবে বুরুজ সমন্বিত আকাশের শপথের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। 'বুরুজ' অর্থ প্রাসাদ। এ দ্বারা বড় বড় নক্ষত্রকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এগুলো যেন মহাকাশের বড় বড় প্রাসাদ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আকাশকে আমিই নিজ হাতে নির্মাণ করেছি এবং আমি তাকে আরো প্রশস্ত বানাবো।' তিনি আরো বলেছেন, 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন না আকাশ সৃষ্টি করা?'

এর অর্থ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির মনযিলসমূহও হতে পারে। আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে তারা সেসব মনযিলে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। আকাশে চলার সময় এসব গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথের সীমা অতিক্রম করে না। এ সব মনযিলের উল্লেখ করে এগুলোর বিশালতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে মানবমনে যে নিগূঢ় শিক্ষা ঢুকানোর ইচ্ছা ছিলো, সে শিক্ষা এখানেই নিহিত।

'শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের' এটি হলো পার্থিব ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পৃথিবীর যাবতীয় হিসাব-নিকাশ মেটানোর দিন। এ দিনটা যে নির্ঘাত আসবেই এবং এ দিনেই যে হিসাব-নিকাশের পর কর্মফল দেয়া হবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা আল্লাহর বিচারের প্রত্যাশী তাদেরকে তিনি এই দিন পর্যন্ত সময় দিয়েছেন। এটাই সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন সেই দিন যার অপেক্ষায় কোটি কোটি সৃষ্টি অপেক্ষমান রয়েছে, বিশেষ করে কিভাবে বিবাদ মেটানো হয় তা দেখার জন্যে।

রক্তরঞ্জিত ইতিহাস

'শপথ সাক্ষীর এবং যা কিছু পরিদৃষ্ট হয়েছে তার।' যেদিন সকল সৃষ্টিকে এবং সকল কর্মতৎপরতাকে তুলে ধরা হবে, সেদিন সব কিছুই প্রকাশিত হবে এবং সকলেই তা প্রত্যক্ষ করবে, সব কিছুই জানবে এবং চর্মচক্ষু ও মানসচক্ষু উভয়ের সামনেই সবকিছু প্রকাশিত হবে, কেউ কোনো কিছু লুকাতে পারবে না।

বুরুজ সম্বলিত আকাশ, প্রতিশ্রুতি দিবস এবং সাক্ষী ও সাক্ষ্য দেয়া জিনিস, এই সব কয়টি শপথ একত্রিত হয়েছে এ জন্যে যে, যে পরিবেশে অচিরেই আসহাবুল উখদুদের ঘটনা বর্ণনা করা হবে, সেখানে এর গুরুত্ব, বিরাটত্ব ও বিশালত্বের ধারণা যেন দেয়া যায়। তাছাড়া সেই ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের প্রতিও ইংগিত এসেছে যেখানে এ ঘটনা পেশ করা হয়েছে, তার যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং তার হিসাব স্পষ্ট করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে স্বয়ং পৃথিবীর চেয়েও বড় এবং পার্থিব জীবন ও তার সীমিত আয়ুষ্কালের চেয়ে প্রশস্ততর।

পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট অংকনের কাজটি সমাপ্ত হবার পর অতিদ্রুত মূল ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। 'ধ্বংস হোক গর্তের অধিপতিরা, যে গর্তে কুন্ডলি পাকানো আগুন ছিলো। তারা সেই কুন্ডের পাশে উপবিষ্ট ছিলো আর মোমেনদের সাথে তারা যে আচরণ করেছিলো তা স্বচক্ষে দেখছিলো। এই মোমেনদের সাথে তাদের শত্রুতা ছিলো শুধু এ কারণে যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলো যিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রশংসিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং আল্লাহ তায়ালা সকল (ঘটনা ও সকল) জিনিসেরই দ্রষ্টা।' ঘটনাটির বর্ণনা শুরু হয়েছে উখদুদ তথা কুন্ডের অধিপতিদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষণার মাধ্যমে। 'কুতেলা'-'ধ্বংস হয়েছে' শব্দটি ক্রোধ ও আক্রোশের অর্থ বহন করে। আল্লাহর এই ক্রোধ ও আক্রোশ অগ্নিকুন্ড

প্রজ্বলনকারী গোষ্ঠীর ওপর নিপতিত। এ দ্বারা এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, অপরাধটি এতই নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য যে, তা মহা ধৈর্যশীল আল্লাহরও ক্রোধের উদ্রেক করেছে এবং তাঁকে প্রতিশোধ গ্রহণ, তাদেরকে হত্যা ও ধ্বংসের হুমকি প্রদান পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ করেছে।

এরপর 'উখদুদ' শব্দটির তাফসীর করা হয়েছে যে কথাটি দ্বারা, তা হচ্ছে 'ইন্ধনপূর্ণ যে কুন্ডে ছিলো আগুন।' 'উখদুদ' হচ্ছে পরিখা। পরিখা খননকারীরা তা খনন করার পর তাকে আগুন দিয়ে ভরে দেয়। এভাবে তা এক ভয়াবহ লেলিহান অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়।

'অগ্নিকুন্ডের অধিবাসীরা ধ্বংস হোক।' বাস্তবিক পক্ষে তারা এই আক্রোশ ও প্রতিশোধ গ্রহণের যোগ্য। বিশেষত যে পরিস্থিতিতে তারা ওই অপরাধটি সংঘটিত করেছিলো। 'যখন তারা তার পাশে উপবিষ্ট ছিলো এবং মোমেনদের সাথে কৃত আচরণ প্রত্যক্ষ করছিলো।' এ কথাটা দ্বারা তাদের নীতি ও অবস্থান নির্দেশ করা হচ্ছে, তারা অগ্নিকুন্ডের পাশে বসে আগুন জ্বালাচ্ছিলো এবং মোমেন নারী ও পুরুষদেরকে ধরে ধরে তাতে নিক্ষেপ করছিলো। তারা এই পৈশাচিক ও মর্মন্তুদ ঘটনার অতি কাছে অবস্থান করছিলো। তারা নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ ও স্তর এবং দেহে আগুনের দহন-ক্রিয়া উল্লাস সহকারে উপভোগ করছিলো। অন্য কথায় বলা যায়, তারা নিজ নিজ চেতনা ও অনুভূতিতে এই পৈশাচিক ও বর্বরোচিত দৃশ্য ধরে রাখছিলো।

মোমেনরা কোনো অপরাধ করেনি এবং সে জন্যে তাদের ওপর কোনো প্রতিশোধ গ্রহণেরও প্রশ্ন ওঠেনি। 'তাদের বিরুদ্ধে অগ্নিকুন্ডের অধিবাসীদের এছাড়া আর কোনো অভিযোগ ছিলো না যে, তারা..... আল্লাহ তায়ালা সকল জিনিসের প্রত্যক্ষকারী।' বস্তুত তাদের এটাই ছিলো একমাত্র অপরাধ যে, তারা একমাত্র আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো।

'আযীয' অর্থ যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতাসম্পন্ন। 'হামীদ' অর্থ সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয় এবং আপন অধিকার বলে প্রশংসিত, চাই অজ্ঞ লোকেরা তার প্রশংসা করুক বা না করুক। তিনিই ঈমান আনার ও এবাদাত করার উপযুক্ত। তিনি এককভাবে আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তিনি সকল জিনিস প্রত্যক্ষ করেন ও সকল জিনিসে উপস্থিত থাকেন। তার ইচ্ছা প্রতিটি কর্মকান্ডের সাথে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রাখে যেমন তিনি সেখানে উপস্থিত।

মোমেনদের এবং অগ্নিকুন্ডের অধিপতিদের অবস্থা তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ উক্তিটি দ্বারা এমন একটি স্নেহের পরশ বুলানো হয় যা মোমেনদের মনকে আশ্বস্ত করে, আর স্বেচ্ছাচারী খোদাদ্রোহীদের প্রতি উচ্চারণ করে কঠোর হুশিয়ারী। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ওই ঘটনার চাক্ষুষ দর্শক ছিলেন, আর চাক্ষুষ দর্শক হিসাবে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

মাত্র এই কয়টি ক্ষুদ্র আয়াতেই ঘটনার বিবরণ দেয়া শেষ হয়েছে। আর তা এমন ভাষায় দেয়া হয়েছে যে, মানুষের মন এই নারকীয় হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ও এর হোতাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ধিক্কারে ভরে ওঠে, আর ঘটনার নেপথ্যে এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবতেও অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহর কাছে এ ঘটনার মূল্যায়ন কী হতে পারে এবং এর হোতারা তাঁর পক্ষ থেকে কিরূপ ক্রোধ ও প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে পারে, সে সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত এ অপরাধের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেনি, বরং আল্লাহর হিসাবে এর আরো অনেক কিছু ঘটতে বাকী রয়েছে, যা ঘটবে পরকালীন জীবনে।

অনুরূপভাবে ঘটনাটির বিবরণ এমনভাবে সমাপ্ত হয়েছে যে, ঈমানকে এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে, আকীদা বিশ্বাসকে জীবনের ব্যাপারে এমন বেপরোয়া হতে দেখে এবং দৈহিক নির্যাতন ও পার্থিব স্বার্থকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যেতে দেখে পাঠকমাত্রেই অভিভূত হয়ে

যায়। ঈমানের পরাজয় মেনে নিয়ে জীবনটাকে বাঁচানো হয়তো মোমেনদের পক্ষে সম্ভবপর ছিলো। কিন্তু এভাবে জীবন বাঁচালে আখেরাতের পূর্বে এই দুনিয়াতে তারা ব্যক্তিগতভাবেই বা কতোখানি ক্ষতিগ্রস্ত হতেন, আর গোটা মানবজাতিই বা তাতে কতোখানি ক্ষতিগ্রস্ত হতো, সেটা ভেবে দেখা দরকার।

নিহত হওয়ায় জীবনের সার্থকতা কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? জীবনের সার্থকতা বলতে বুঝা যায় আদর্শবান জীবন। কেননা আদর্শ ছাড়া জীবন অর্থহীন। আর স্বাধীনতা ছাড়া জীবন মর্যাদাহীন। খোদাদ্রোহীরা যদি মানুষের দেহকে কবযা করার পর তার আত্মার ওপরও আধিপত্য বিস্তার করে, তাহলে সে জীবনকে মানবেতর জীবন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বস্তুত এটা হচ্ছে অত্যন্ত মহান তাৎপর্য ও বিরাট সার্থকতা। 'আসহাবুল উখদুদের' ঘটনায় যে মোমেনরা অগ্নিকুন্ডে জীবন্ত দগ্ধ হন তাদের জীবন এই তাৎপর্যের দিক দিয়ে সফল ও সার্থক।

যখন তারা আগুনের স্পর্শ অনুভব করছিলো এবং তাদের দেহ দগ্ধ হচ্ছিলো, তখন তারা এ সার্থকতা অর্জন ও অনুভব করেছে। এ মহান সার্থকতা ও তাৎপর্য আগুনের দহনক্রিয়ার মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়ে তাদের জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করেছে। এরপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্যে সংরক্ষিত রয়েছে এক পরিণাম। আর তাদের শত্রু খোদাদ্রোহীদের জন্যে রয়েছে ভিন্ন পরিণাম। পরবর্তী আয়াতগুলোতে বিবরণ আসছে।

'যারা মোমেন নারী ও পুরুষদেরকে নির্যাতন করেছে এবং তারপর তাওবা করেনি, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব ও দহন-যন্ত্রণা। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে বাগিচাসমূহ, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হবে। বস্তুত ওটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য।'

পৃথিবীতে ও পার্থিব জীবনে যা কিছু ঘটে, তা শেষ ঘটনা নয় এবং যাত্রাপথের শেষ প্রান্তও নয়। বাকী অংশ পরকালীন জীবনে আসবে। যে পরিণাম মোমেন ও খোদাদ্রোহীদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে, তা যথাসময়ে অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে।

'যারা মোমেন নারী ও পুরুষদেরকে নির্যাতনের শিকার করেছে' ....তাদের সেই ভ্রান্ত নীতিতে অবিচল থেকেছে এবং নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়নি এবং তাওবা করেনি, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং দহনের আযাব।'

এখানে 'দহন' শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও 'জাহান্নামের আযাব' কথাটা দ্বারাই তা বুঝা যায় এবং আলাদাভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। এভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, 'উখদুদ' বা পরিখায় যে দহন যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে, তার বিপরীতে এই শব্দ দ্বারা আর একটি দহন যন্ত্রণার বর্ণনা দেয়া। কিন্তু কোথায় সেই দহন আর কোথায় এই দহন? কি তীব্রতায় এবং কি দীর্ঘস্থায়ীত্বে– এ দুই দহন যন্ত্রণার কোনো তুলনাই হয় না। দুনিয়ার দহন-যন্ত্রণা যে আগুন দিয়ে দেয়া হয়, সে আগুন জ্বালায় মানুষ আর আখেরাতের দহন-যন্ত্রণা যে আগুন দিয়ে দেয়া হয়, তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা জ্বালান। দুনিয়ার দহনক্রিয়া কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হয় এবং শেষ হয়ে যায়। আর আখেরাতের দহন এতো দীর্ঘস্থায়ী হবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ তার পরিমাপ জানে না। পার্থিব জীবনে যে মোমেনরা দহন-যন্ত্রণায় ভোগেন, তারা আল্লাহর সন্তোষও লাভ করেন। এবং মানব জীবনের সুমহান সার্থকতা ও তাৎপর্য অর্জন করে সফল হন।

পক্ষান্তরে আখেরাতের দহন যন্ত্রণার সাথে আল্লাহর ক্রোধও সংযুক্ত রয়েছে এবং সেই সাথে রয়েছে লাঞ্ছনা, অপমান ও ধিক্কার। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, বেহেশতে তাদের

ওপর বর্ষিত হবে আল্লাহর সন্তোষ ও অনুগ্রহ। বস্তুত এটাই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি এবং 'এটাই বিরাট সাফল্য।' 'আলফাওযু' বলতে মুক্তি ও সাফল্য দুটোই বুঝায়। আখেরাতের আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভই যেখানে সাফল্য, সেখানে নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে এমন বেহেশত লাভ করা যে আরো কতো বড় সাফল্য তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

এই পরিণতি ও কর্মফল প্রদানের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি স্বীয় নির্দিষ্ট রূপে স্থিতি লাভ করে। বস্তুত এটাই ঘটনার প্রকৃত পরিণতি। পৃথিবীতে যেটুকু ঘটেছে, সেটি ঘটনার একটি প্রান্ত বা অংশ মাত্র। এখানে তা শেষ হয়নি। ঘটনার এই প্রথম পর্যালোচনাটিতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে, যাতে সে সময় মক্কায় অবস্থিত মুষ্টিমেয় সংখ্যক মোমেনের মনে এবং সর্বযুগের সকল নির্যাতিত মোমেন দলের মনে প্রবোধ দেয়া যায়।

আল্লাহর কিছু ছেফাত

এরপর ক্রমাগত পর্যালোচনা আসছে। 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।' এখানে পাকড়াওকে কঠিন বলে মন্তব্য করা ইতিপূর্বে বর্ণীত ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেখানে একটি ক্ষুদ্র ও নগণ্য পাকড়াও এর দৃশ্য দেখানো হয়েছে। সেটিকে ওই পাকড়াও-এর হোতারা এবং সাধারণ মানুষরা বিরাট বড়ো ও নিদারুণ কঠিন ব্যাপার মনে করে। আসলে কঠিন পাকড়াও হচ্ছে সেই মহাপরাক্রমশালী ও দোর্দন্ডপ্রতাপশালী খোদার পাকড়াও, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের মালিক। ইতিহাসের একটি সীমিত সময়ে একটি সীমিত ভূখন্ডের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী দুর্বল ও নগণ্য লোকদের পাকড়াও সে তুলনায় তেমন কঠিন জিনিস নয়।

বাক্যটির বাচনভংগি শ্রোতা অর্থাৎ রসূল (স.) ও বক্তা অর্থাৎ আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও ..... অর্থাৎ তোমার সেই প্রতিপালক, যার প্রতিপালনের সাথে তুমি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এবং তাঁর সহায়তার ওপর তুমি নির্ভরশীল.......... আর এই সম্পর্ক এ ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান। কেননা এখানে মোমেনদের নির্যাতনের দায়ে পাপিষ্ঠদের পাকড়াও হবার বর্ণনা রয়েছে।

'নিশ্চয়ই তিনি প্রথম সৃষ্টি ও পুনসৃষ্টিকারী।' প্রথম সৃষ্টি ও পুনসৃষ্টি শব্দ দুটি দ্বারা যদিও মূলত ইহকালের জন্ম ও পরকালের পুনর্জন্মকে বুঝানো হয়ে থাকে, তথাপি এ দুটি সৃজন প্রক্রিয়া দিনরাত্রের প্রতি মুহূর্তে কার্যকর রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে নতুন সৃজন চলছে এবং প্রতি মুহূর্তে যা পুরাতন হয়ে ধ্বংস ও মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে তার পুনসৃজন চলছে। গোটা বিশ্ব প্রকৃতিতে চলছে ক্রমাগত নব নব সৃজন এবং অব্যাহত প্রাচীনত্ব প্রাপ্তি ও বিলুপ্তি। আর এই চিরন্তন ও সর্বাত্মক সৃজন ও পুনসৃজন প্রক্রিয়ারই এ পর্যায়ে 'উখদুদ' বা পরিখার ঘটনা ঘটে। এর প্রকাশিত ফলাফলও ছিলো বাস্তব ও অদৃষ্ট তত্ত্বে একটা চলন্ত ও পালাক্রমিক ব্যাপার।

সুতরাং বলা চলে, পরিখার এ ঘটনা ছিলো এক পুনসৃজন পালার সূচনা অথবা একটা প্রথম সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি। আর এটা ছিলো শাশ্বত সৃজন প্রক্রিয়ারই একটি পালা মাত্র।

'আর তিনি ক্ষমাশীল মমতাময়।' ইতিপূর্বে 'অতপর তাওবা করেনি' উক্তিটির সাথে ক্ষমাশীলতার সম্পর্ক রয়েছে। এই ক্ষমাশীলতা আল্লাহর প্রবহমান দয়া ও অনুগ্রহের এক সীমাহীন ও অফুরন্ত প্রকাশ। এটি এমন এক চির উন্মুক্ত দুয়ার, যা কখনো কোনো তাওবাকারী বা প্রত্যাবর্তনকারীর মুখের ওপর বন্ধ করা হয় না, তা তার পাপ যতো বড় ও জঘন্য হোক না কেন। 'মমতাময়তা' গুণটি মোমেনদের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।

মোমেনরা তাদের দয়ালু স্নেহমমতাময় প্রভুকে সব কিছুর উর্ধে স্থান দিয়ে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেই বান্দাদের অবস্থান উন্নীত করেন, যারা তাকে ভালোবাসে এবং তাঁকে অন্য সব কিছুর ওপর স্থান দেয়। তিনি তাদের অবস্থান এতো উন্নত করেন যে, আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে লেখনী দিয়ে তা বর্ণনা করা যায় না। সেই অবস্থান হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দার মধ্যকার বন্ধুত্বের অবস্থান।

আর 'মমতাময়তা'র অবস্থান হলো আল্লাহর প্রিয়তম ও ঘনিষ্ঠতমদের অবস্থান। যে বান্দারা নিজেদের নশ্বর জীবনকে তাঁর জন্যে বিসর্জন দেয়, তাদের জীবনের মর্যাদা কতো উন্নীত হতে পারে ভেবে দেখার দাবী রাখে। পার্থিব জীবনের যে ক্ষণস্থায়ী যুলুম নির্যাতনকে তাঁর প্রিয় বান্দারা হাসিমুখে বরদাশত করে, আল্লাহর এক ফোটা মিষ্টি স্নেহ, মমতা ও প্রীতির সামনে তা যে কতো তুচ্ছ ও নগণ্য, বলে বুঝানো কঠিন।

দুনিয়ার কোনো মানুষের গোলাম বা চাকর-নফররা মনিবের মুখ থেকে একটি অতি ক্ষুদ্র উৎসাহবর্ধক বাক্য শুনলে কিংবা তার মুখে বিন্দুমাত্র সন্তোষের লক্ষণ ফুটে উঠলে তাঁর জন্যে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অথচ সে আল্লাহর একজন বান্দা এবং তারাও তারই বান্দা। তাহলে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যকার অবস্থাটা কি রকম হওয়া উচিত? যিনি মহান আরশের অধিপতি, যার অবস্থান সর্বোচ্চে, যিনি মহীয়ান গরীয়ান, পরাক্রান্ত, তিনি যখন প্রীতি, স্নেহ ও মমতা মাখা স্বরে কথা বলেন ও নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন, তখন তার প্রতি কিরূপ মনোভাব দেখানো উচিত? বস্তুত সেই মহান আরশের অধিপতি, স্নেহময় মালিকের মুখ থেকে যখন সামান্যতম সন্তোষের আভাস ফুটে উঠবে, তখন তার সামনে জীবন যন্ত্রণা, দুঃখ মুসিবত এবং যে কোনো মুল্যবান বা প্রিয় জিনিসকে তুচ্ছ মনে করা উচিত।

'তিনি যা ইচ্ছা করেন তা করে ছাড়েন।' এটি তাঁর এমন একটি গুণ, যা প্রতিনিয়ত ও সর্বক্ষণ কার্যকর থাকে। তিনি যা ইচ্ছা করেন করে ছাড়েন। সুতরাং তিনি ব্যাপকতম স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, যা ইচ্ছা করেন মনোনীত করেন, আর যা মনোনীত করেন তা বাস্তবায়িত করেন। এটা তাঁর চিরস্থায়ী গুণ বৈশিষ্ট্য। কখনো তিনি ইচ্ছা করেন যে, মোমেনরা এই দুনিয়াতেই সফল ও বিজয়ী হোক। নিজের কোনো প্রজ্ঞা, সূক্ষ্মদর্শিতা দূরদর্শিতা বা কৌশল জ্ঞানের খাতিরেই তিনি এরূপ ইচ্ছা করে থাকেন।

আবার কখনো ইচ্ছা করেন যে, নির্যাতন নিপীড়নের ওপর ঈমান জয়ী হোক এবং নশ্বর দেহ বিলীন হয়ে যাক। এ রকম সিদ্ধান্তও তিনি নিয়ে থাকেন কোনো বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে। কখনো খোদাদ্রোহী যালেমদেরকে পৃথিবীতেই পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নেন, আবার কখনো তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিতে চান। এ সবই করেন তার নিজের কৌশল হিসাবে, যা কখনো ইহকালে কখনো পরকালে বাস্তবায়িত হয়। আর এসবই আল্লাহর পরিকল্পনার অধীনে হয়ে থাকে।

এ হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছাধীন কাজের একটা দিক যা আলোচ্য ঘটনার সাথে এবং পরবর্তীতে আলোচিত ফেরাউন ও সামুদের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এছাড়া পৃথিবীতে প্রতিদিন যে ঘটনাসমূহ ঘটে থাকে তার পশ্চাতে এবং জীবন ও জগতের পেছনে আল্লাহর যে স্বাধীন, সার্বভৌম ও শর্তহীন ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান, তা সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে ও প্রকৃতিতে সর্বক্ষণ কার্যকর রয়েছে।

তিনি যা ইচ্ছা করেন তা যে করে ছাড়েন তার একটা নমুনা দেখুন, 'তোমার কাছে কি ফেরাউন ও সামুদের বাহিনীর খবর পৌঁছেছে?'

এখানে দুটো লম্বা ঘটনার দিকে ইংগিত দেয়া হয়েছে। কেননা কোরআনে তাদের ঘটনা বহু জায়গায় বর্ণীত হয়েছে। তাই শ্রোতাদের এ ব্যাপারে কিছু জানা আছে ধরে নিয়েই এ কথা বলা হয়েছে। তাদের শক্তি ও যোগ্যতার প্রতি ইংগিত স্বরূপ তাদেরকে 'বাহিনী' বলা হয়েছে। এই দুই বাহিনীর ঘটনাবলী এবং তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেছেন তোমরা তা জানো কি?

এই দুটো ঘটনাই নিজ নিজ ফলাফল ও প্রকৃতির দিক থেকে ভিন্ন ধরনের। ফেরাউনের ক্ষেত্রে তো আল্লাহ তায়ালা তাকে ও তার বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে তার হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। তারপর বনী ইসরাঈলকে কিছুকাল পৃথিবীতে ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দান করেন, যাতে তাদের দিয়ে তিনি নিজের কিছু ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। আর সামুদ জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দেন এবং হযরত সালেহ (আ.)-কে ও তার মুষ্টিমেয় সংখ্যক মোমেন সংগীকে মুক্তি দেন। পরবর্তী সময় তারা কোনো রাজত্ব বা রাষ্ট্র হাতে পাননি। নিছক একটা ফাসেক জাতির আধিপত্য ও গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

এ দুটি ঘটনায় আল্লাহর ইচ্ছার দুটি নমুনা এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান ও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার দুটি ধরন দেখতে পাওয়া যায়। এরই তৃতীয় ধরন হলো 'উখদুদের' ঘটনা। মক্কার সংখ্যালঘু মোমেন দল এবং প্রত্যেক প্রজন্মের মোমেনদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই সব কয়টি নমুনা পেশ করেছেন।

পরিশেষে দুটি জোরদার ও বলিষ্ঠ মন্তব্য করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটিতে রয়েছে একটি প্রতিবেদন এবং একটি চূড়ান্ত রায় ও সিদ্ধান্ত, 'বরঞ্চ কাফেররা অবিশ্বাসের নীতিতেই অনড় রয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের আড়াল থেকে ঘেরাও করে ফেলবেন।'

কাফেরদের নীতি ও অবস্থা হলো এই যে, তারা রসূল (স.)-কে তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার নীতি অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। 'অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে রেখেছেন।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কি ভয়াবহ ক্রোধ ও গযব দ্বারা তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন তা তারা জানেও না। আসলে সর্বব্যাপী ঝড়-বন্যায় আটকে পড়া ইঁদুরের চেয়েও তারা দুর্বল।

'বরঞ্চ তা হচ্ছে মহান কোরআন, যা মহান ফলকে সংরক্ষিত রয়েছে।' 'মজীদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে উন্নত, মহান, গৌরবময়। সুতরাং আল্লাহর কথার চেয়ে উন্নত, মহৎ ও গৌরবময় কথা আর কারো নেই। এটি রয়েছে সংরক্ষিত স্থানে। 'লাওহে মাহফুয' কি বা কেমন আমরা জানতে পারি না। কেননা এটি অদৃশ্য জ্ঞানের আওতাভুক্ত, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারোই জানা নেই। আমরা কেবল ওহীকৃত বচনের কিছু ভাব ও ইংগিতটুকুই বুঝতে পারি। এ বচনটুকু থেকে আমরা শুধু এতটুকু বুঝেছি যে, এই কোরআন সংরক্ষিত ও চিরস্থায়ী। এর প্রতিটি উক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অকাট্য ও চূড়ান্ত বক্তব্য। দুনিয়ার সব বাণীই অরক্ষিত, একমাত্র কোরআনের বাণী সংরক্ষিত।

কাজেই উখদুদের ঘটনা ও তার নেপথ্য রহস্য সম্পর্কে কোরআন যা কিছু বলেছে, তাও অকাট্য, চূড়ান্ত ও শেষ কথা।

সূরা আত্ তারেক্ব

আয়াত ১৭ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِن
كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ
مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَىٰ
رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ
الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. শপথ আসমানের, শপথ রাতের বেলায় আত্মপ্রকাশকারী (তারকা)-র, ২. তুমি কি জানো সে আত্মপ্রকাশকারী কি? ৩. তা হচ্ছে (একটি) উজ্জ্বল তারকা, ৪. (যমীনের) এমন একটি প্রাণীও নেই যার ওপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত নেই; ৫. মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কোন্ জিনিস দিয়ে বানানো হয়েছে; ৬. বানানো হয়েছে সবেগে স্খলিত (এক ফোঁটা) পানি থেকে, ৭. যা বের হয়ে আসে (পুরুষদের) পিঠের মেরুদন্ড ও (নারীর) বুকের (পাঁজরের) মাঝখান থেকে, ৮. (এভাবে যাকে তিনি একদিন বের করে এনেছেন,) তিনি অবশ্যই তাকে পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন; ৯. সেদিন (তার) যাবতীয় গোপন বিষয় পরীক্ষা করা হবে, ১০. (যে এ দিনকে অস্বীকার করেছে সেদিন) তার কোনো শক্তিই থাকবে না, থাকবে না তার কোনো সাহায্যকারীও; ১১. বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ, ১২. (সেই বৃষ্টিধারায়) ফেটে যাওয়া যমীনের শপথ, ১৩. অবশ্যই এ (কোরআন) হচ্ছে (হক বাতিলের) পার্থক্যকারী (চূড়ান্ত) কথা, ১৪. তা অর্থহীন (কোনো কথাবার্তা) নয়; ১৫. এরা (আমার বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করছে; ১৬. আমিও (এদের ব্যাপারে) একটি কৌশল অবলম্বন করছি, ১৭. অতএব তুমি (আমার সে কৌশল দেখার জন্যে) কিছুদিন এ কাফেরদের অবকাশ দিয়ে রাখো।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আমপারার ভূমিকায় আমি বলেছি যে, এ পারার সূরাগুলো মানুষের অনুভূতিতে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। খুবই জোরদার আঘাত করে এবং সংজ্ঞালুপ্ত ঘুমন্তদের কানে বিকট আওয়ায তোলে। এভাবে একই ধরনের চেতনা ও একই ধরনের সম্বিত ফেরানোর উদ্দেশ্যে ক্রমাগত আঘাত ও বিকট আওয়ায করতে থাকে। সে বলে, 'জাগো, ওঠো, দেখো, নযর বুলাও, চিন্তা-ভাবনা করো, বিচার-বিবেচনা করো। একজন ইলাহ রয়েছেন, তাঁর একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন রয়েছে, একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রয়েছে, এক ধরনের পরীক্ষা রয়েছে, সব কিছুরই হিসাব নিকাশ ও জবাবদিহীর ব্যবস্থা রয়েছে। কঠিন শাস্তি ও পরম শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে।'

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি সুস্পষ্ট নমুনা এই সূরায় লক্ষণীয়। এর ছন্দায়িত বাচনভংগিতে যে বলিষ্ঠতা ও তেজস্বিতা বিদ্যমান, তাতে এ সূরার দৃশ্যসমূহ, এর বিশেষ ধরনের সুরেলা ছন্দ, এর শব্দের ঝংকার এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রেরণাদায়ী সংকেত সব কিছুরই অবদান রয়েছে।

সূরার অংকিত দৃশ্যপটে রয়েছে 'তারেক' (রাতে আত্মপ্রকাশকারী জ্যোতিষ্ক), 'সাকেব' (উজ্জ্বল), দাফেক (সবেগে স্খলিত), 'রাজ্য়ে', (বারবার সংঘটিত বৃষ্টি), সাদয়ে (বিদারণ)।

আর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক প্রাণীর ওপর প্রহরা নিযুক্ত রয়েছে এই আশ্বাসবাণী। যথা, 'প্রত্যেক প্রাণীর ওপর রয়েছে প্রহরী।'

কোনো শক্তি ও সাহায্যকারী নেই এই মর্মে হুঁশিয়ারী যথা, 'যেদিন গুপ্ত তত্ত্ব প্রকাশ হবে সেদিন মানুষের কোনো শক্তিও থাকবে না, সাহায্যকারীও থাকবে না।'

কঠোর ও গুরুগম্ভীর বক্তব্য, যথা, 'নিশ্চয়ই এ কেতাব চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী বাণী এবং তা নিরর্থক বাণী নয়।' এর বাণীর ভেতরে রয়েছে সম চরিত্রের হুমকি ও শাসানি। যেমন, তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আমিও ষড়যন্ত্র করি। অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দাও, কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও।

সূরাটির বিষয়বস্তু আমপারার অন্যান্য সূরার বিষয়বস্তুর মতোই, যা পারার শুরুতে আমি উল্লেখ করেছি। পারাটির মূল বক্তব্য এই যে, 'একজন ইলাহ রয়েছেন, একটি অদৃশ্য প্রশাসন সার্বক্ষনিকভাবে চালু রয়েছে, পরিকল্পনা রয়েছে, পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, পরিণাম রয়েছে, জবাবদিহী ও কর্মফল রয়েছে ইত্যাদি।'

সূরার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও বাস্তব তথ্যসমূহের চমকপ্রদ ভাষ্যের সাথে এ সূরা মিলিয়ে পড়লে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাফসীর

'আকাশের শপথ এবং রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার শপথ, ...প্রত্যেক প্রাণের প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে।' এই শপথের ভেতরে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা এবং একটি ঈমানী তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে আকাশ ও নৈশকালীন জ্যোতিষ্কের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর কোরআনী বাকরীতি অনুসারে প্রশ্নের মাধ্যমে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এভাবে, 'তুমি কি জানো, রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কী?' যেন বস্তুটি মানুষের জানা ও চেনার বহির্ভূত।

এরপর তার আকৃতির বিবরণ সহকারে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, 'উজ্জ্বল নক্ষত্র' সাকেব' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিদীর্ণকারী বা ছেদনকারী, অর্থাৎ যে জ্যোতিষ্ক স্বীয় চলমান আলো দিয়ে অন্ধকারকে ছিন্ন করে।'

এই গুণটি নক্ষত্র মাত্রের মধ্যেই পাওয়া যায়। এ উক্তি দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট নক্ষত্র বুঝানোর অবকাশ নেই, আর তার কোনো প্রয়োজনও নেই। বিষয়টি অনির্দিষ্ট থাকুক এটাই ভালো। এতে কথাটার অর্থ দাঁড়াবে, 'শপথ আকাশের এবং শপথ তার উজ্জ্বল নক্ষত্রমন্ডলীর, যাদের তীব্র আলোকরশ্মি অন্ধকারের বুক চিরে ও সকল জিনিসকে আচ্ছন্নকারী রাতের পর্দাকে ছিন্ন করে পার হয়ে যায়।'

সূরাটিতে বর্ণীত অন্যান্য নিগূঢ় তত্ত্ব, তথ্য ও দৃশ্যাবলীর ব্যাপারে এই ইংগিতের তাৎপর্যময় নির্দেশনা রয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতেই এর সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

আল্লাহর শপথ বাক্য

আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও তার দেদীপ্যমান নক্ষত্রমন্ডলীর শপথ করে যে কথাটি বলেছেন তাহলো এই যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে প্রতিটি প্রাণীর ওপর প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। কোরআনের বক্তব্যটির হুবহু শাব্দিক রূপ হলো! 'এমন কোনো প্রাণী নেই যার ওপর রক্ষী বা প্রহরী নিযুক্ত নেই।'

এ বাচনভংগিতে এক ধরনের অতিরিক্ত দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার ভাব নিহিত রয়েছে। এই প্রহরী প্রাণীর তত্ত্বাবধান করে থাকে। তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, তার সংখ্যা নিরূপণ করে এবং সে আল্লাহর নির্দেশক্রমে তার দায়িত্ব বহন করে এবং সাহায্য করে। কেননা সে সকল গোপন তথ্য ও চিন্তা-ভাবনার ভান্ডার, আর কর্ম ও কর্মফল এরই সাথে সম্পৃক্ত।

এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাজ্যে কোনো বিশৃংখলা ও অরাজকতা নেই। পৃথিবীতে মানুষকে রক্ষীবিহীন অসহায় ছেড়ে দেয়া হয়নি; বরং প্রত্যক্ষ ও নিখুতভাবে তাকে প্রহরাধীন রাখা হয়েছে।

এ আয়াতটিতে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ যে ধারণাটি দেয়া হয়েছে তাহলো এই যে, মানুষ কখনো নিসংগ থাকলেও একেবারে একাকী থাকে না। কোনো প্রহরী না থাকলেও একজন প্রহরী অবশ্যই থাকে। সেই নিযুক্ত প্রহরী সকল পর্দা ছিন্ন করে যে কোনো গুপ্ত জিনিসের কাছে পৌঁছে যায়, ঠিক যেমন নক্ষত্রের আলো অন্ধকারের বুক চিরে রাতের পর্দা ছিন্ন করে সকল জিনিসের ওপর ঠিকরে পড়ে। বস্তুত প্রাণী দেহ থেকে শুরু করে বিশ্ব-চরাচরের সর্বত্র আল্লাহর যতো সৃষ্টি আছে তা সব একই নিয়মে বাঁধা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় বিরাজিত।

এখানে যেমন প্রাণীকে প্রকৃতির সাথে সমন্বিত করা হয়েছে, তেমনি অপর একটি উক্তিতে তাকদীর তথা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ দ্বারা এই সত্যের ওপরই আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষের ইহকালীন জন্ম দ্বারা এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে দায়িত্বহীন করেও ছাড়া হয়নি এবং নিরর্থক করেও রাখা হয়নি।

সৃষ্টি রহস্য

অতএব মানুষ ভেবে দেখুক কোন জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের উপলব্ধি করা দরকার যে, সে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং এখন তার অবস্থা কি। 'মেরুদন্ড ও পাঞ্জরাস্থির মাঝখান থেকে প্রবল বেগে নির্গত পানি থেকে তার সৃষ্টি হয়েছে।' অর্থাৎ পুরুষের পিঠের মেরুদন্ডের হাড়ের ভেতর থেকে এবং নারীর উচ্চ বক্ষদেশের হাড়ের ভেতর থেকে নির্গত পানির সমন্বয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ তত্ত্বটি গুপ্ত ছিলো। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানতো না। মাত্র বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান নিজস্ব প্রক্রিয়ায় এ তথ্য উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয় যে, পুরুষের বীর্য তার মেরুদন্ডে এবং নারীর বীর্য তার বক্ষের ঊর্ধাংশের হাড়ের ভেতরে তৈরী হয়। অতপর তা একটি নিভৃত ও সুরক্ষিত স্থানে মিলিত হয় এবং তা থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়।

একজন পুরুষের পিঠ ও নারীর বক্ষ থেকে নির্গত পানি আর পরিণত বুদ্ধিমান সচেতন এবং জটিল আংগিক, স্নায়বিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোধারী মানুষের মাঝে যে বিরাট ব্যবধান, যা পেরিয়ে প্রবল বেগে স্খলিত পানি পরিণত মানুষের আকৃতি লাভ করে। এ থেকে বুঝা যায় যে, খোদ মানব সত্ত্বার বাইরে এমন এক শক্তি রয়েছে, যা এই শক্তিহীন, ইচ্ছাহীন এমনকি আকৃতিহীন তরল পদার্থকে উক্ত বিস্ময়কর সুদীর্ঘ পথে পরিচালিত করে, যাতে তা এই চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। এ দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, আল্লাহর আদেশে নিয়োজিত একজন প্রহরী এই বুদ্ধিহীন, আকৃতিহীন বীর্যকে পাহারা দেয় ও সংরক্ষণ করে। একজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সব বিস্ময়কর জিনিসের সম্মুখীন হয়, এই বীর্য ফোঁটা তার চেয়েও বহুগুণ বেশী বিস্ময়কর জিনিস ও অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

বীর্যের মধ্যে বিরাজমান শুক্রকীট এতো ক্ষুদ্র হয়ে থাকে যে, তা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা কষ্টকর। আর একবার যে পরিমাণ বীর্য নির্গত হয় তাতে থাকে কোটি কোটি শুক্রকীট। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টি, যার কোন আকৃতি, বুদ্ধি, শক্তি বা ইচ্ছা নেই, জরায়ুতে অবস্থান নেয়ার পর তাৎক্ষনিকভাবে যে কাজটি শুরু করে তা হচ্ছে খাদ্য অন্বেষণ। আল্লাহর নিয়োজিত প্রহরী এই শুক্রকীটকে এমন পেটুক স্বভাবের বানিয়ে দেয় যে, তার চার পাশের জরায়ূর প্রাচীরকে সে তরল রক্তের পুকুরে পরিণত করে। সেই পুকুর তরতাজা খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে।

অতপর খাদ্য লাভের ব্যাপারে একটু নিশ্চিত হওয়া মাত্রই তারা নতুন কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করে। এভাবে ক্রমাগত বিভক্তির প্রক্রিয়া চলতে থাকে, যা থেকে নতুন সেল বা জীবকোষ জন্ম নেয়। এই সরল সোজা আকৃতিহীন, বুদ্ধিহীন, ইচ্ছাহীন, শক্তিহীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টি জানে তাকে কী করতে হবে এবং সে কী চায়। কেননা আল্লাহর নিয়োজিত সেই প্রহরী তাকে এতটা জ্ঞান, পথনির্দেশ,শক্তি ও ইচ্ছা দান করে যা দ্বারা সে নিজের কাজের পথ চিনতে পারে। সেই প্রহরীর ওপর দায়িত্ব রয়েছে যেন সে এই সকল কোষের প্রতিটি গ্রুপকে এই বিশাল ভবনের এক একটা অংশ নির্মাণে নিয়োজিত করে। সেই ভবনটি আর কিছু নয়–মানব দেহ।

শুক্রকীট থেকে নির্গত এই জীবকোষ বা সেলের একটি গ্রুপ মানব দেহের সার্বিক কাঠামো নির্মাণে এবং আর একটি গ্রুপ পেশী নির্মাণে এবং আর একটি গ্রুপ স্নায়ুতন্ত্রী নির্মাণে নিয়োজিত হয়। এভাবে গোটা মানব দেহ নির্মিত হয়।

তবে কাজটি এতো সহজে সম্পন্ন হয় না। আরো সূক্ষ্ম বিশেষজ্ঞীয় পদ্ধতি রয়েছে। কোনো একটি হাড় অপর হাড়ের সাথে, একটি পেশী অপর পেশীর সাথে এবং একটি স্নায়ুতন্ত্রী অপর স্নায়ুতন্ত্রীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কেননা এই ভবন নির্মাণ অত্যন্ত জটিল কাজ। এর গঠন প্রণালী অভিনব এবং এর দ্বারা যে সব কাজ নেয়া হবে তা বহুবিধ। জীবকোষ বা সেলগুলোর প্রতিটি গ্রুপ থেকে আবার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দল বিভক্ত হয়ে উক্ত ভবনের প্রতিটি স্তম্ভের জন্যে নির্দিষ্ট ধরনের কাজে নিয়োজিত হয়। প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সেল নিজের জানা পথে চলতে থাকে। সে কোথায় যাবে এবং কী তার করণীয়, তা সে ভালোভাবেই জানে। এদের কোনো একটি সেলও তার কর্মস্থল ও পথ ভুল করে না। উদাহরণ স্বরূপ, চোখ নির্মাণের দায়িত্বসম্পন্ন সেলগুলো জানে যে, এটা মুখমন্ডলেই নির্মাণ করতে হবে, কখনো পেটে, হাতে বা পায়ে নয়। অথচ এসব জায়গার প্রত্যেকটিতেই চোখ হতে পারে। আর যদি চোখ তৈরীর কাজে নিযুক্ত সেলগুলোকে ধরে নিয়ে

পেটে, হাতে বা পায়ে রেখে দেয়া হতো, তাহলে তারা ওখানেই চোখ বানিয়ে ফেলতো। কিন্তু এ সেলগুলো স্বয়ং যখন মানবদেহের ভেতরে চলাচল করে, তখন চোখের জন্যে যে জায়গা নির্ধারিত, সে দিকেই চলে। কে নির্ধারণ করেন এই দেহটির ঠিক এই জায়গায় একটি চোখের দরকার, অন্য কোথাও নয়? ইনি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনিই তার সর্বোচ্চ রক্ষক, তার তত্ত্বাবধায়ক এবং তাকে সেই দিক-দিশাহীন জায়গায় পথের দিশা দেখান, যেখানে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো পথ প্রদর্শক নেই।

আর ওই সমস্ত কোষ এককভাবে ও সম্মিলিতভাবে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করে। তাদেরই অভ্যন্তরে লুকানো একটি গ্রুপ সমষ্টি তাদের কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করে। সেই গ্রুপগুলো হচ্ছে উত্তরাধিকারের গ্রুপসমূহ, যা গোটা প্রজন্মের বিবরণী ও পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ করে। যে কোষ বা সেল চোখ তৈরীর জন্য নির্দিষ্ট, তা চোখ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। চোখ নির্মাণের এই কাজ করার সময় যাতে চোখের নির্দিষ্ট রূপ বা আকৃতি বিনষ্ট ও বিকৃত না হয় এবং তা মানুষের চোখের বৈশিষ্ট হারিয়ে অন্য কোন প্রাণীর চোখে পরিণত না হয়, সে জন্য তাকে তার সুনির্দিষ্ট আকৃতিতে সংরক্ষণ করা এই কোষের দায়িত্ব। মানুষের বাপদাদার চোখের একটা নির্দিষ্ট রূপ ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট থাকতে পারে। তাও সংরক্ষণ করা এই কোষের দায়িত্ব। এই চোখের আকৃতিগত ও বৈশিষ্ট্যগত নকশায় যাতে এমন সামান্যতম বিচ্যুতিও না ঘটে, যাতে মূল পরিকল্পিত নকশা থেকে তা ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে, তা নিশ্চিত করাও ওই কোষের দায়িত্ব।

কে এই কোষকে এতো শক্তি এবং এতো জ্ঞান দান করলো? এতো সেই সরল ও অবোধ কোষ, যার কোনো বুদ্ধি ও উপলব্ধি ক্ষমতা নেই, নেই কোনো ইচ্ছা শক্তি। একে এত শক্তি ও এতো জ্ঞান দানকারী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়। একে তিনি চোখের নকশা তৈরীর জ্ঞান দান করেছেন এবং এদেরই একটি বা কয়েকটি সরল ও অবোধ কোষ এই বিশাল কাজটি সম্পন্ন করে। অথচ সমগ্র মানব জাতিকে যদি একটি চোখ বা তার একটি অংশেরও নকশা তৈরী করতে বলা হতো, তবে তা তারা করতে পারতো না।

প্রবল বেগে প্রক্ষিপ্ত সেই শুক্রবিন্দু ও একজন সবাক মানুষের মাঝে যে দীর্ঘ ও বিস্ময়কর পথ পরিক্রমা রয়েছে, তার দৃশ্য সম্বলিত এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের নেপথ্যেও রয়েছে অগণিত বিস্ময়। দেহের বিভিন্ন যন্ত্র ও অংগপ্রত্যংগের বৈশিষ্টের ভেতরে এই বিস্ময় নিহিত। এই তাফসীরে তার পুরো বিবরণ দেয়া আমাদের সাধ্যাতীত। আল্লাহর সুনিপুণ পরিকল্পনা ও সুদক্ষ সাক্ষ্যই বিধৃত হয়েছে সেই সব আজব ও অদ্ভুত অংগ বৈশিষ্ট্যে। আর তাতে রয়েছে মহান আল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক, পথ-প্রদর্শক ও সহায়ক হাতের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের ছাপ। যে সত্যের জন্য আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করা হয়েছে, এ বিবরণটিতে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আর সেই সাথে এতে রয়েছে পরবর্তী অংশে বর্ণীত তত্ত্বেরও পটভূমি।

পুনর্জন্ম

'নিশ্চয়ই তিনি তার পুনসৃষ্টিতেও সমর্থ। যেদিন সকল গুপ্ত তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে, তখন তার কোনো শক্তিও থাকবে না, সাহায্যকারীও থাকবে না।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান করেছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম এবং প্রাচীন জিনিসকে নতুন করে সৃষ্টি করতে সক্ষম। প্রথম সৃষ্টি তার সীমাহীন ক্ষমতা, নিজস্ব পরিকল্পনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বাক্ষর। এই বিচক্ষণ ও সুনিপুণ সৃষ্টি একেবারেই বৃথা যাবে যদি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করে সকল গোপন কার্যকলাপের অনুসন্ধান ও নিরীক্ষণ না করা হয় এবং যথাযথ ও ন্যায্য প্রতিফল না দেয়া হয়।

'যেদিন গোপন বিষয়গুলো ফাঁস হয়ে যাবে।' অর্থাৎ সকল অজানা তথ্য যেদিন প্রকাশিত হবে, যেমন প্রকাশিত হয় রাতের নক্ষত্র অন্ধকারের পর্দা ছিন্ন করে, যেমন বহু আবরণে আবৃত প্রাণীকে সংরক্ষণ করার জন্য প্রহরী ফেরেশতা তার কাছে গমন করে। যেদিন মানুষ সকল শক্তি ও সাহায্যকারীকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়বে, সেদিন সকল গুপ্তভেদ প্রকাশিত হবে।

'সেদিন তার কোনো শক্তিও থাকবে না, কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।' অর্থাৎ নিজেকে নিজে সামাল দেয়ার জন্য নিজের ক্ষমতাও থাকবে না, আর বাইরে এমন কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না যার সাহায্য নেয়া যায়। সকল শক্তি হারানোর পর সকল গুপ্ত তথ্য প্রকাশিত হওয়া একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি নির্দেশ করে। এতে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের পরিস্থিতি স্নায়ুমন্ডলীতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় তার চেতনা ও অনুভূতি নিজের ও পারিপার্শ্বিক জগতের বাইরে গিয়ে মানুষের জন্ম ও তার বিস্ময়কর পরিভ্রমণ এবং তার শেষ গন্তব্য স্থলে উপনীত হয়। সেখানে তার সকল আবরণ খসে পড়ে, সকল গুপ্তভেদ ফাঁস হয়ে যায়। সেখানে সে সকল সহায় ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। এসব কথা বলার পরও হয়তো অন্তরে এ ব্যাপারে সামান্য কিছু সন্দেহ-সংশয় অবশিষ্ট থাকতে পারে যে, এ সব ঘটনা সত্যিই ঘটবে কিনা। এ কারণে দৃঢ়তার সাথে পুনরুক্তি করা হয়েছে যে, এ উক্তির সাথে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সংযোগ সাধন করা হয়েছে এভাবে, 'বৃষ্টি সম্বলিত আকাশের শপথ, ফেটে যাওয়া যমীনের শপথ, নিশ্চয়ই এটা চূড়ান্ত ও অকাট্য বাণী, এটা মোটেই রসিকতা নয়।'

আয়াতে ব্যবহৃত 'রাজ্য়ে' শব্দটির আভিধানিক অর্থ পুনরাবৃত্তি। এ দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। আকাশ বারংবার বৃষ্টি বর্ষণ করে। আর 'সাদয়ে' অর্থ বিদারণ বা ফেটে যাওয়া। এখানে উদ্ভিদকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তা মাটি বিদীর্ণ করে উদ্গত হয়। এই দুটো জিনিসই জীবনের একটি দৃশ্যের ছবি তুলে ধরেছে। উদ্ভিদের জীবন ও প্রথম সৃষ্টির নমুনা হচ্ছে যথাক্রমে আকাশ থেকে উৎক্ষিপ্ত পানি এবং পৃথিবীর মাটি বিদীর্ণ করে উদ্গত উদ্ভিদ। পুরুষের পাজড়ের হাড় ও স্ত্রীর বক্ষদেশ থেকে প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত পানি এবং জরায়ুর অন্ধকার জগত থেকে বেরিয়ে আসা সন্তানের সাথে এর নিকটতম সাদৃশ্য বিদ্যমান। জীবন জীবনই। দৃশ্য দৃশ্যই। আন্দোলন আন্দোলনই। কিন্তু এ সবই একটা স্থায়ী ও শাশ্বত বিধি ব্যবস্থা এবং একটা সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত শিল্পকর্মের নমুনা। এ সবই মহান স্রষ্টার উপস্থিতি ও বিদ্যমানতা নির্দেশ করে। কেউই তার সমকক্ষ ও সমতুল্য নয় সৃষ্টিকর্মের শৈল্পিক নৈপুণ্যেও নয়, বাহ্যিক আকৃতিতেও নয়। উপরোক্ত দৃশ্যটি রাতের উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই নক্ষত্র সকল পর্দা ও আবরণ ছিন্ন করে। অনুরূপভাবে এটি গুপ্তভেদ প্রকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে তুলনীয়। একই নিপুণ সৃষ্টি, যা স্রষ্টার অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

যুদ্ধের নেতৃত্ব স্বয়ং আল্লাহর হাতে

আল্লাহ তায়ালা এই দুটি সৃষ্টি ও দুটি ঘটনার নামে শপথ করেছেন, বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশ এবং উদ্ভিদ উদ্গামনকারী পৃথিবী। এ দুটি জিনিসেরই বাহ্যিক দৃশ্য ও অন্তর্নিহিত মর্ম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। খোদ্ বাক্যের বাচনভংগিও অত্যন্ত কঠোর ও দৃঢ় বক্তব্য প্রকাশ করে। শপথ করে বলা হচ্ছে যে, এই অকাট্য বাণী, যা পুণর্জন্ম ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ঘোষণা করে, অন্য কথায় সার্বিকভাবে এই কোরআন, অকাট্য ও অবিসংবাদিত। এতে কোনো তামাশা বা রসিকতার মিশ্রণ নেই। এ বাণী সকল বিতর্ক, সকল সন্দেহ, সকল সংশয় ও সকল বাকবিতন্ডার অবসান ঘটায়। এটি চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বাণী। বারংবার বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশ এবং উদ্ভিদ উদ্গামনকারী পৃথিবী এ ব্যাপারে সাক্ষী।

আর এই চূড়ান্ত ও অকাট্য বাণী প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.) এবং তাঁর সাথী, মক্কার মোশরেকদের হাতে নিপীড়িত ও নির্যাতিত মুষ্টিমেয় মোমেনের দলটিকে সম্বোধন করেছেন। রসূল (স.)-এর পরিচালিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা সব সময় ষড়যন্ত্র ও ফন্দি-ফিকিরে লিপ্ত ছিলো। তারা নিত্যনতুন চক্রান্ত এঁটে যাচ্ছিলো অব্যাহতভাবে। এ সম্বোধনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে প্রবোধ ও সান্ত্বনা দিয়ে নিজ কাজে নিয়োজিত থাকার এবং মোশরেকদের চক্রান্তে ভীত না হওয়ার উপদেশ দিয়ে তিনি বলছেন যে, সাময়িকভাবে এটাকে বরদাশত করে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধের নেতৃত্ব স্বয়ং আল্লাহর হাতে। কাজেই রসূল (স.) ও মোমেনদের আশ্বস্ত এবং নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।

'ওরা ভীষণ চক্রান্ত করে, আমিও কৌশল অবলম্বন করি।' অর্থাৎ এই সব নগণ্য সৃষ্টি, যাদেরকে পুরুষের পিঠ ও নারীর বুক থেকে বেগে ধাবিত পানি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের কোনো শক্তি, জ্ঞান, ইচ্ছা ও পথের দিশা ছিলো না, যারা তাদের দীর্ঘ পরিক্রমায় সর্বশক্তিমানের নাগালের মধ্যে ও মুঠোর মধ্যে রয়েছে, যারা একদিন তার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য যখন তাদের সকল জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে, যখন তাদের কোনো ক্ষমতা এবং কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না, তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত.........।

আর আমি .... স্রষ্টা, পথ প্রদর্শক, রক্ষক, নির্দেশক, পুনর্জন্ম দানকারী, পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী, সর্ব শক্তিমান, পরাক্রমশালী, আকাশ ও নক্ষত্রের স্রষ্টা, বেগে নির্গত পানি তথা বীর্যের স্রষ্টা, সবাক মানুষের স্রষ্টা, বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশ ও উদ্ভিদ উদগাতা পৃথিবীর স্রষ্টা, আমি আল্লাহ ..... আমিও ষড়যন্ত্র করি।

একদিকে তাদের ষড়যন্ত্র, একদিকে আমার ষড়যন্ত্র, এটাই হলো যুদ্ধ। আসলে এটা একতরফা যুদ্ধই যদিও নিছক তামাশাচ্ছলে দো'তরফা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

'অতএব কাফেরদেরকে অবকাশ দাও' 'কিছুটা অবকাশ দাও' অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করো না। যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য দ্রুততা কামনা করো না। এ যুদ্ধের প্রকৃতি ও চরিত্র তো দেখেছো। সামান্য একটু সময় দেয়াতেই কল্যাণ। অবশ্য পার্থিব জীবনের পুরোটা কেটে গেলেও তা সামান্যই। আখেরাতের অনন্ত জীবনের সামনে এ আয়ুষ্কাল আর কতোই বা?

এ আয়াতে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-এর সাথে একান্ত আপন ভংগিতে কথা বলছেন। 'কাফেরদেরকে সময় দাও, কিছু সময় তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও।' যেন রসূল (স.)-ই সব কিছুর হর্তাকর্তা। তিনিই যেন অনুমতি দেয়ার মালিক, তিনিই যেন অবকাশ দেয়া বা সময় দেয়ার অনুমতি দিতে পারেন। অথবা অবকাশ দেয়ার মঞ্জুরী দেন। আসলে এ সবের কিছুই রসূল (স.)-এর হাতে নেই। এটা শুধু রসূল (স.)-কে একান্ত আপন করে নেয়া ও তাঁর প্রতি মমত্ব প্রকাশের ভাষা। রসূল (স.)-এর মনে দয়া ও মমত্বের সুবাতাস বইয়ে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। তাঁর মনের আকাংখা ও আল্লাহর ইচ্ছাকে একীভূত করণের লক্ষ্যেই এ কথা বলা হয়েছে। নিজ ক্ষমতাবলে ও ইচ্ছায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর একান্ত নিজস্ব কাজে তাঁকে এমনভাবে নিয়োজিত করেছেন যেন তার কোনো ক্ষমতা আছে। এভাবে তিনি তাঁর মধ্যে ও আল্লাহর মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে সাময়িকভাবে তা যেন ঘুচাতে চাইছেন। তিনি যেন বলছেন, তাদের ব্যাপারে তোমাকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। তবে এদেরকে একটু অবকাশ দাও। বস্তুত এ হচ্ছে তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্বের প্রকাশ। এ দ্বারা তাঁর সকল মনোকষ্ট মুছে দিচ্ছেন। সকল গ্লানি দূর করে দিচ্ছেন। শুধু মাত্র অবশিষ্ট থাকছে তাঁর গভীর প্রীতি ও ভালোবাসা।

সূরা আল আ'লা

আয়াত ১৯ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢ وَالَّذِىْ قَدَّرَ
فَهَدٰى ۝٣ وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤ فَجَعَلَهٗ غُثَاۤءً اَحْوٰى ۝٥ سَنُقْرِئُكَ
فَلَا تَنْسٰى ۝٦ اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠
وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ
فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝١٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝١٥

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (হে নবী,) তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো, ২. যিনি (সৃষ্টিকুলকে) তৈরী করেছেন, (তাকে) সুবিন্যস্ত করেছেন, ৩. তিনি (সবকিছুর) পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অতপর তিনি (সবাইকে তাদের) পথ বাতলে দিয়েছেন, ৪. তিনি (ভূচরের জন্যে) তৃণাদি বের করে এনেছেন, ৫. অতপর তিনিই (তাকে এক সময়) খড়কুটায় পরিণত করেছেন; ৬. আমি (যে ওহী পাঠাবো) তা আমিই তোমাকে পড়িয়ে (অন্তরে গেঁথে) দেবো, অতপর তুমি আর (তা) ভুলবে না, ৭. অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি চান (তা ভিন্ন কথা); তিনি প্রকাশ্য বিষয় জানেন, (জানেন) গোপন বিষয়ও; ৮. আমি তোমার জন্যে সহজ পদ্ধতিগুলোর সুযোগ করে দেবো, ৯. কাজেই তুমি (তাদের আল্লাহ তায়ালার কথা) স্মরণ করাতে থাকো, যদি স্মরণ করানো তাদের জন্যে উপকারী হয়; ১০. যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে সে (অবশ্যই এর থেকে) উপদেশ গ্রহণ করবে, ১১. আর যে পাপী ব্যক্তি সে তা এড়িয়ে যাবে, ১২. অচিরেই সে বিশালকায় আগুনে গিয়ে পড়বে, ১৩. সেখানে সে মরবে না, (আবার) সে বাঁচবেও না; ১৪. যে ব্যক্তি (হেদায়াতের আলোকে নিজের জীবন) পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, ১৫. সে নিজের মালিকের নাম স্মরণ করলো অতপর নামায আদায় করলো;

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِى

الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

১৬. কিন্তু তোমরা তো (হামেশাই) দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকো, ১৭. অথচ আখেরাতের জীবনই হচ্ছে স্থায়ী ও উৎকৃষ্ট; ১৮. নিশ্চয়ই এসব কথা আগের (নবীদের) কেতাবসমূহে (মজুদ) রয়েছে, ১৯. (উল্লেখ আছে তা) ইবরাহীম এবং মূসার কেতাবসমূহেও।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হযরত আলী (রা.) থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন যে, এই সূরাটি ছিলো রসূল (স.)-এর খুব প্রিয়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দুই ঈদ ও জুময়ার নামায সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া দিয়ে পড়তেন। কখনো কখনো ঈদ ও জুময়া একই দিনে অনুষ্ঠিত হতো এবং তিনি সে ক্ষেত্রে উভয় নামায এই দুই সূরা দিয়ে পড়তেন।

যেহেতু এই সূরাটি সমগ্র বিশ্ব জগতকে এবাদাতের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করে, তার সর্বত্র বিশ্বপ্রভুর তাসবীহ ও গুণগান ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয় এবং তাকে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণার একটা স্থান হিসাবে তুলে ধরে, তাই রসূল (স.)-এর কাছে এটি প্রিয় হওয়ারই কথা।

'তোমার সর্বোচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করো, যিনি ....' সূরার এই সুললিত সুদীর্ঘ ছন্দময় ভাষণ সুদূর প্রসারী গুণগানের আবহ ছড়িয়ে দেয়।

সূরাটিতে রসূল (স.)-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর মানুষকে ইসলামের বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়া ও তা প্রচার করার দায়িত্ব অর্পণের পর তাঁকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, 'আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তখন আর তুমি ভুলবে না ....তোমার জন্য তোমার কাজকে সহজ করে দেবো.........।' এভাবে আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনের জন্য রসূল (স.)-এর মনকে সুরক্ষিত করা এবং তার ঘাড় থেকে এই বিরাট দায়িত্ব সরিয়ে নেয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন, আর তাঁর সকল কাজকে এবং এই দাওয়াত প্রচারের কাজকে সহজ করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। এ কারণেও এ সূরা তাঁর কাছে প্রিয় হওয়া স্বাভাবিক।

এই সূরা ঈমানী চিন্তাধারার সুদৃঢ় স্তম্ভসমূহের বিবরণ বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। মহান স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহর একত্ব, তাঁর ওহীর সত্যায়ন এবং আখেরাতের কর্মফল প্রাপ্তির সত্যতা প্রমাণ এ সূরার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এগুলো ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের প্রাথমিক উপাদান। তারপর এই আকীদা তার সুদূর প্রসারী শেকড়ের সাথে ও সুপ্রাচীনকাল থেকে বিরাজমান মূলের সাথে সংযুক্ত হয়। যেমন বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই এ বক্তব্য পূর্ববর্তী কেতাবসমূহেও রয়েছে, ইবরাহীম ও মূসার কেতাবে।' এই আকীদা-বিশ্বাসের যে স্বভাব প্রকৃতি এবং এই আকীদা বিশ্বাস প্রচারকারী রসূল ও বহনকারী উম্মতের যে স্বভাব প্রকৃতির চিত্র সূরাটিতে তুলে ধরা হয়েছে, তা হচ্ছে উদারতা ও সরলতা।

এই সব কিছুই সূরার মূল আলোচ্য বিষয় থেকে বিচ্ছুরিত ও তার আওতাধীন। এর বাইরে রয়েছে আরো বহু সুদূর প্রসারী বিষয়বস্তু।

তাফসীর

'তোমার সর্বোচ্চ প্রভুর নামে পবিত্রতা ঘোষণা করো ....মৃদু উচ্চারিত সুললিত এই প্রারম্ভিক বক্তব্য দ্বারা সূরার সূচনা গোটা পরিবেশকে আল্লাহর গুণগান ও পবিত্রতা ঘোষণার ধ্বনিতে মুখরিত করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও গুণগানের তত্ত্ব। পবিত্রতা ঘোষণার আদেশের পরপরই যে বিশেষণগুলো একের পর এক উল্লেখ হয়েছে, তা হচ্ছে, 'সর্বোচ্চ (প্রভু) যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতপর সৃষ্টিকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন, যিনি পরিকল্পনা করেছেন অতপর পথ দেখিয়েছেন, যিনি বিচরণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন, অতপর তাকে বানিয়েছেন শস্যহীন বিরাণ।' এ সকল বিশেষণ দ্বারা গোটা সৃষ্টিজগতকে এমন একটা এবাদাতখানা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যার প্রতিটি কোণ এই সব প্রশংসা কীর্তনে মুখরিত। এ দ্বারা মহাবিশ্বকে এমন একটা প্রদর্শনী ক্ষেত্র রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, যাতে মহান ও সুনিপূণ স্রষ্টার নিদর্শনসমূহ প্রতিভাত। ইনি সেই স্রষ্টা, যিনি কোনো নমুনা ও মডেল ছাড়াই সৃষ্টি করেন, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টিকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং যিনি পরিকল্পনা করেছেন ও পথ দেখিয়েছেন।'

তাসবীহ পাঠ কি ও কেন?

তাসবীহ হচ্ছে মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করা, আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম গুণাবলীর মর্ম স্মৃতিপটে জাগরূক করা, সেই গুণাবলী থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি, তা থেকে নির্গত প্রেরণা ও উদ্দীপনা, তা থেকে আধ্যাত্মিক স্বাদ হৃদয় ও চেতনা দিয়ে উপভোগ করা। তাসবীহ শুধু মুখে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ জপ করাই নয়। 'তোমার সর্বোচ্চ প্রভুর নামে তাসবীহ করো' এ কথাটি মানুষের মনমস্তিষ্কে ও চেতনায় এমন একটি অবস্থা ও ভাবের সৃষ্টি করে, যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। চেতনা দিয়ে অনুভব করা, উপলব্ধি করা ও আস্বাদন করা যায়। এই গুণাবলীর মর্মোপলব্ধি থেকে বিচ্ছুরিত আলো দ্বারা জীবনকে উদ্ভাসিত করার প্রেরণা পাওয়া যায়।

এ সূরায় সর্বপ্রথম যে গুণবাচক শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো 'রব্' ও 'আ'লা'। 'রব' শব্দ দ্বারা বুঝায় লালন-পালনকারী ও তত্ত্বাবধানকারী। এই গুণবাচক শব্দের মর্ম ও তার সৃষ্টি করা আবহ সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট, তার সুসংবাদ ও সুললিত ছন্দময় শব্দ বিন্যাসের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর 'আ'লা' শব্দটি সীমাহীন দিগন্ত অভিমুখে অভিযাত্রার পথ উন্মোচন করে এবং আল্লাহর গুণকীর্তন ও তাসবীহ করতে করতে অনির্দিষ্ট সীমানার দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য আত্মাকে উৎসাহিত করে। এটি মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণার ভাবধারার সাথে সংগতিপূর্ণ। গুণবাচক এই 'আ'লা' শব্দটিকে গভীরভাবে হৃদয়ংগম করা উক্ত পবিত্রতা ঘোষণার ভাবধারার সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এখানে প্রাথমিক সম্বোধন রসূল (স.)-কে করা হয়েছে। 'পবিত্রতা ঘোষণা করো' এ আদেশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দেয়া হয়েছে। এ বাক্যটিতে যে প্রগাঢ় মমত্ত্ব সৌহার্দ প্রকাশ করা হয়েছে, তার স্থান ভাষাগত অভিব্যক্তি থেকে অনেক উর্ধে। এ আদেশটি রসূল (স.) যখনই পড়তেন, সূরার অন্যান্য আয়াত পড়ার আগে এর প্রতি তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়ে বলতেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' অর্থাৎ আমার সর্বোচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা ও গুণকীর্তন করছি। সুতরাং এটি একাধারে আল্লাহর ডাক ও রসূলের সাড়া, আল্লাহর আদেশ ও রসূলের আনুগত্য এবং আল্লাহর মমত্ত্ব প্রকাশ ও রসূলের জবাব। তিনি তাঁর প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত। প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কথা শোনেন ও জবাব দেন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও মমত্বপূর্ণ পরিবেশে এই আলাপ বিনিময় হয়।

যখন এ আয়াত অর্থাৎ সূরা আ'লার প্রথম আয়াত নাযিল হলো, রসূল (স.) বললেন, এটিকে তোমরা তোমাদের সেজদার অন্তর্ভুক্ত করো (অর্থাৎ 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' এর আকারে) এভাবে এই তাসবীহ রুকু ও সেজদার চিরস্থায়ী অংশ হয়ে নামাযের সাথে যুক্ত হয়েছে। এ তাসবীহ প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। এটিকে নামাযে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য এই যে, এটি একটি প্রত্যক্ষ আদেশের প্রত্যক্ষ ইতিবাচক সাড়া হয়ে টিকে থাকুক, অথবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, একটি প্রত্যক্ষ অনুমতির প্রত্যক্ষ জবাব। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁর বান্দাদেরকে নিজের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার অনুমতি দান তাদের ওপর তাঁর একটি অন্যতম নেয়ামত ও অনুগ্রহ বিশেষ। অর্থাৎ এটা হচ্ছে তাঁর সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি। মানুষের সীমিত বুদ্ধিতে নৈকট্য লাভের যতো উত্তম উপায় কল্পনা করা যেতে পারে, নামায তার মধ্যে সর্বোত্তম নৈকট্য লাভের উপায়। এই উপায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সুযোগ দেন যেন তারা তাঁর গুণাবলী প্রকাশ ও গুনকীর্তনের মাধ্যমে তাঁর সত্ত্বাকে তাদের সাধ্য ও সামর্থ অনুসারে জানতে ও বুঝতে পারে। আর এ কথা বলারই অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির যে কোনো অনুমতি, চাই তা সম্পর্ক সৃষ্টির যে কোনো উপায় অনুসরণের মাধ্যমেই হোক না কেন, বান্দাদের ওপর তার এক অসাধারণ অনুগ্রহ ও দান।

সৃষ্টিজগত ও স্রষ্টা

'তোমার সর্বোচ্চ প্রভুর প্রশংসা করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন অতপর ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং যিনি পরিকল্পনা করেছেন অতপর পথ প্রদর্শন করেছেন।'

অর্থাৎ যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে সৃষ্টি করে তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন, অতপর তার সৃষ্টিকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং তাকে তার সমুচিত পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন.......... আর প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য তার কাজ, তার পথ ও গন্তব্য পরিকল্পনা করেছেন, অতপর যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করেছেন তার দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন, তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি সেটা তাকে জানিয়েছেন এবং যতোদিন সে বেঁচে থাকবে, ততোদিন তার জন্যে যা উপযুক্ত, তা নির্ধারণ করেছেন ও তার দিকে পথ প্রদর্শনও করেছেন।

এই সর্ববৃহৎ সত্যটি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিসে প্রতিফলিত। বিশ্বজগতে বিরাজমান প্রতিটি বস্তু এ সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে, চাই সে বস্তু যতোই ছোট বা বড় এবং যতোই মর্যাদাবান বা নগণ্য হোক না কেন। প্রতিটি জিনিস ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রতিটি জিনিস নিজের কর্তব্য পালনের যোগ্যাতাসম্পন্ন, প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নির্ধারিত, সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে সহজতম পন্থা তার হস্তগত করে দেয়া হয়েছে এবং সকল বস্তুর মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিদ্যমান, যাতে তারা তাদের সামষ্টিক ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে, আবার ব্যক্তিগত ভূমিকা পালন করার জন্য এককভাবেও ক্ষমতাবান।

একটি পরমাণু এককভাবে তার সকল ইলেকট্রোন ও প্রোটোনের সাথে সুসমন্বিত, যেমন সৌরজগতের সূর্য, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় বিরাজমান। এই সৌরজগত ও তার সকল জ্যোতিষ্ক আলাদা আলাদাভাবে ও সম্মিলিতভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এবং তা সে পালনও করে।

শরীরের প্রতিটি একক সজীব কোষ, আপন কাঠামোতে ও নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন, পৃথিবীর সর্বাধিক উন্নত, সজীব ও সংযুক্ত সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত একা একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

একটি একক পরমাণু সৌরজগতের মধ্যে যেমন মজুত রয়েছে তেমনি একটি একক দেহকোষ ও উন্নততম প্রাণীদের মধ্যেও রয়েছে এর সংগঠন ও সংযোগের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়। এই ধরনের কাঠামোগত পূর্ণতায়, এই ধরনের সামষ্টিক সমন্বয়ে এবং এই ধরনের ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনায় তিনিই রয়েছেন যিনি এগুলোকে শাসন ও পরিচালনা করেন। আর সমগ্র সৃষ্টিজগত সেখানে উপস্থিত থেকে এই সুগভীর সত্যকে প্রত্যক্ষ করছে।

মানুষের মন এই মহাসত্যকে তখনই সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে যখন এই মহাবিশ্বের দৃশ্যগুলোকে সে পর্যবেক্ষণ করে এবং উন্মুক্ত অনুভূতি দ্বারা সকল জিনিসকে উপলব্ধি করে। এই ঐশী উপলব্ধি তথা এলহাম যে কোনো মানুষ যে কোনো পরিবেশে, জন্মগতভাবে অর্জিত জ্ঞানের ন্যায় যে কোনো সময়েই অর্জন করতে পারে। যখন তার হৃদয়ের জানালাগুলো খুলে যায় এবং মহাবিশ্বের দৃশ্যগুলো পর্যবেক্ষণের জন্যে তার অনুভূতির তন্ত্রীগুলো সজাগ হয়ে ওঠে তখন বিবেকের কাছে প্রশ্ন করেই এর উত্তর খুজে পাওয়া যায়।

এরপর পর্যবেক্ষণ ও অর্জিত জ্ঞান পৃথক পৃথক দৃষ্টান্ত দিয়ে এলহাম বা ঐশী উপলব্ধির প্রথম দৃষ্টিতে অর্জিত তত্ত্ব ও তথ্যের বিশ্লেষণ করে। উক্ত পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমে সঞ্চিত জ্ঞানের কিছু তথ্য মহাবিশ্বে বিরাজমান মহাসত্যের অংশ বিশেষের কিঞ্চিত আভাস দেয়।

নিউইয়র্কস্থ বিজ্ঞান একাডেমীর চেয়ারম্যান বিজ্ঞানী ক্রেসী মোরিসন রচিত 'মানুষ একাকী বাস করে না' গ্রন্থে বলেন।(১) 'আপন জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনে পাখিকূলর প্রচন্ড সহজাত ঝোঁক থাকে। আপনার ঘরের দরজার পাশেই যে চড়ুইর বাসা, সে শরৎকালে দক্ষিণের অজানা গন্তব্যে চলে যায়, কিন্তু পরবর্তী বসন্তে সে ঠিক মতোই তার বাসায় ফিরে আসে। সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের (অর্থাৎ আমেরিকার) অধিকাংশ পাখি দক্ষিণ দিকে চলে যায়। অধিকাংশ সময় তারা সমুদ্রের ওপর দিয়ে হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে, কিন্তু তারা তাদের পথ হারায় না বা ঠিকানা ভোলে না। আর পত্রবাহক পায়রা যখন কোনো খাঁচার ভেতরে দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণকালে অনেক নতুন শব্দ শুনতে শুনতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, তখন ক্ষণিকের জন্য আশপাশে চক্কর কাটে এবং তারপরেই নিজের গন্তব্য স্থানের দিকে নির্ভুলভাবে পাড়ি জমায়।

গাছপালার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ঝঞ্ঝা যখন মৌমাছির পথ চিনে চলার পরিচিত সকল আলামত নষ্ট করে দেয়, তখনও মৌমাছি নিজের চাক চিনতে কিন্তু ভুল করে না। ঘরে ফেরার এই অনুভূতি ও চেতনা মানুষের ভেতরে দুর্বল। তাই তারা এর স্বল্প পরিমাণ পুঁজিকে সে সফরে জ্ঞানের সরঞ্জামাদি দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। এই তীব্র জন্মগত ঝোঁক ও তাড়না আমাদের প্রয়োজন বটে। তবে আমাদেরও বোধশক্তি সেই প্রয়োজন অনেকটা মিটিয়ে দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতংগের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো শক্তিশালী চোখ রয়েছে। সেসব চোখের শক্তির মাত্রা আমাদের জানা নেই বটে। শকুনের রয়েছে টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ জাতীয় চোখ। এখানেও মানুষ স্বীয় যান্ত্রিক সরঞ্জামাদির জোরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। মানুষ টেলিস্কোপ দিয়ে এত দূরের নীহারিকাকে দেখতে পায়, যা দেখতে তার খালি চোখের আরো ২০ লক্ষ গুণ বেশী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া দরকার। খালি চোখে একেবারেই দেখা যায় না এমন জীবাণুকেও বৈদ্যুতিক মাইক্রোস্কোপ (অনুবীক্ষণ যন্ত্র) দিয়ে দেখতে পায়। এমনকি যে ক্ষুদ্র কীটপতংগ বিভিন্ন বস্তুকে কামড়ে পড়ে থাকে তাও দেখা যায়। আপনি আপনার বৃদ্ধ ঘোড়াকে যখন একাকী রাস্তায় ছেড়ে দেবেন, তখন তা রাস্তা ধরেই

(১) অধ্যাপক মাহমুদ সালেহ আল্ফালাকী গ্রন্থটির যে অনুবাদ করেছেন তার নাম দিয়েছেন 'বিজ্ঞান ঈমানেরই উদ্দীপক'।

চলতে থাকবে, রাতের অন্ধকার যতোই গাঢ় হোক না কেন। অস্পষ্ট ভাবে হলেও সে রাস্তা দেখতে পায়। রাস্তায় ও রাস্তার দু'পাশে তাপমাত্রার যে তারতম্য ঘটে, তাও সে টের পায়। রাস্তার ধুলোময়লার ভেতর দিয়ে আসা আলোর প্রভাবে তার চোখ দুটো সামান্যই ধাঁধায়। পেঁচা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতেও বরফাচ্ছাদিত ঘাসের ওপর দিয়ে চলাচলরত ইঁদুরকে দেখতে পায় আর যে প্রক্রিয়াকে আমরা আলো বলি, তাতে বিকিরণ ঘটিয়েই আমরা রাতকে দিনে রূপান্তরিত করি।

'শ্রমিক মৌমাছিরা মৌমাছি পালনে ব্যবহৃত কাঠামোতে বিভিন্ন আকারের বহু সংখ্যক কক্ষ বানায়। এগুলোর মধ্য থেকে ছোট ছোট কক্ষগুলো দক্ষ শ্রমিকদের জন্যে এবং সবচেয়ে বড়টি হয় পুরুষ মৌমাছির জন্য। তারা একটা বিশেষ কক্ষ বানায় গর্ভবতী রাণীদের জন্য। রাণী মৌমাছি পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট কুঠরিগুলোতে অনুৎপাদনশীল ডিম পাড়ে, অথচ স্ত্রীজাতীয় শ্রমিক মৌমাছিও অপেক্ষমান রাণী মৌমাছিদের জন্য নির্ধারিত কক্ষগুলোতে উৎপাদনশীল ডিম পাড়ে। যে সব স্ত্রীজাতীয় মৌমাছি নতুন প্রজন্মের আগমনের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন কাটানোর পর স্ত্রীর ভূমিকায় পরিবর্তিত দায়িত্ব গ্রহণ করে, তারা শিশু মৌমাছির জন্য খাদ্য তৈরী করার জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায়। মধু ও রেণু চিবানো ও অগ্রিম পরিপাকের মাধ্যমে তারা এ কাজ সম্পন্ন করে। এরপর পুরুষ ও স্ত্রী মৌমাছিদের বয়স বাড়ার পর এক পর্যায়ে গিয়ে তারা চিবানো ও অগ্রিম পরিপাকের কাজ থেকে অবসর নেয়। তারা তখন মধু ও রেণু ছাড়া আর কিছুই খাওয়ায় না। যে সকল স্ত্রীজাতীয় মৌমাছি এভাবে কাজ করে তারা শ্রমিকে পরিণত হয়।

রাণী মৌমাছির কক্ষগুলোতে যে সব স্ত্রী মৌমাছি থাকে, তাদের জন্য চিবানো ও অগ্রিম পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকে। আর এ কাজ যারা করে তারাই একদিন মৌমাছিদের রাণী হয়ে যায়। আর শুধু এরাই উৎপাদনশীল ডিম পাড়ে। এই পৌনপুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য অনেকগুলো বিশেষ কক্ষ ও বিশেষ বিশেষ ডিমের প্রয়োজন হয়। অনুরূপ খাদ্য পরিবর্তনের বিস্ময়কর প্রভাবেরও প্রয়োজন হয়। আর এই সমগ্র প্রক্রিয়াটার জন্য যা অত্যাশ্যক তা হলো ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা, বাছবিচার করা ও খাদ্যের কার্যকারিতা সংক্রান্ত তথ্য বাস্তবায়ন। এই পরিবর্তনগুলো বিশেষভাবে একটি সামষ্টিক জীবনে কার্যকর এবং এগুলো তাদের অস্তিত্বের জন্যই অপরিহার্য। এ জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা অত্যাবশ্যক, তা এই সামষ্টিক জীবন শুরু করার পর অনিবার্যভাবেই অর্জিত হয়ে যায়। অথচ এই জ্ঞান ও দক্ষতা জন্মগতভাবে মৌমাছির সত্ত্বা ও তার টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য নয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় খাদ্যের কার্যকারিতা সংক্রান্ত জ্ঞান মানুষের চেয়েও মৌমাছির বেশী।

'কুকুরকে যে অনুসন্ধানী নাক দেয়া হয়েছে, তার কল্যাণে তার কাছ দিয়ে যে প্রাণীটাই যাক না কেন, সে টের পায়। অথচ মানুষ আজ পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি, যা তার নিজের দুর্বল ঘ্রাণ শক্তিকে তীব্রতর করতে পারে। এতদসত্তেও আমাদের ঘ্রাণশক্তি যতো দুর্বলই হোক না কেন-অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না এত সূক্ষ্ম কণিকাকেও ঘ্রাণ নিয়ে চিনতে পারি।

সকল প্রাণীই এমন অনেক শব্দ শুনতে পায়, যা আমাদের শ্রবণশক্তির নাগালের বাইরে, আমাদের সীমিত শ্রবণশক্তির তুলনায় তাদের শ্রবণশক্তি অনেক বেশী তীব্র। এদিকে মানুষের শ্রবণশক্তির অবস্থা এই যে, সে তার আবিষ্কৃত বিভিন্ন সাজসরঞ্জামের সাহায্যে একটা মাছির আওয়ায বহু মাইল দূর থেকে এরূপ শুনতে পায় যেন মাছিটি তার কানের কাছেই ভন্‌ভন করছে। এ ধরনের সরঞ্জামাদির সাহায্যে মানুষ মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব পর্যন্ত এখন রেকর্ড করতে সক্ষম।

একটা জলজ মাকড়সা নিজস্ব জাল দিয়ে নিজের জন্য বেলুন আকৃতির বাসা তৈরী করে। সেই বাসাকে সে পানির নিচে যে কোনো জিনিসের সাথে বেঁধে রাখে। তারপর সে দক্ষতার সাথে তার শরীরের ভেতরের পশমের সাথে একটি বাতাসের বুদ্বুদ লটকিয়ে দেয়, সেটিকে পানির ভেতরে বহন করে অতপর তাকে নিজের বাসার নিচে ছেড়ে দেয়। যতক্ষণ মাকড়সার বাসা ফুলে ফেঁপে না ওঠে, ততক্ষণ এই কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। এরপরই সে নিজের সন্তান প্রসব করে ও তাকে লালন করে। এভাবে সে পূর্বাহ্নেই সন্তানকে বাতাসের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নেয়। এখানে আমরা দেখতে পাই একটা সুসমন্বিত বংশানুক্রম পদ্ধতি- যাতে একাধারে প্রকৌশল, নির্মাণ এবং বৈমানিক বিদ্যার সমাবেশ ঘটেছে।

'স্যামন' মাছ বছরের পর বছর সমুদ্রে কাটানোর পর তার নিজস্ব নদীতে ফিরে আসে।(২) আরো বড় কথা এই যে, সে যে উপনদীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলো, সেই উপনদীর উৎস বৃহৎ নদীর দিকে উজিয়ে যায়। এভাবে সুনির্দিষ্টভাবে নিজের জন্মস্থানের দিকে ফিরে যেতে এ মাছকে কিসে উদ্বুদ্ধ করে? স্যামন মাছ যখন আপন নদী অভিমুখে উজিয়ে চলে, তখন যদি তাকে অন্য কোনো উপনদীতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে সে তৎক্ষণাত বুঝতে পারে যে, ওটা তার জন্মদাত্রী জলাধার নয়। এ জন্যে সে নদীর ভেতর দিয়ে নিজের আলাদা চলার পথ বের করে নেয় এবং স্রোতের বিপরীতমুখী পথে চলতে চলতে নিজের জন্মস্থানের দিকে এগিয়ে যায়।

এখানে এর চেয়েও জটিল একটা রহস্য রয়েছে, যার জট খোলা এখনো বাকী। রহস্যটা এক ধরনের জলজ সাপের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সাপের স্বভাব ঠিক স্যামন মাছের বিপরীত। এই বিস্ময়কর প্রাণী পরিণত বয়সে পৌঁছামাত্রই নিজ নিজ পুকুর ও নদী-খাল থেকে হিজরত করতে থাকে। সে যদি ইউরোপে থাকে, তবে মহাসাগরের ভেতর দিয়ে হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে বারমুডার দক্ষিণে বহু দূর চলে যায়। তারপর সেখানেই ডিম পাড়ে ও মারা যায়। এই সাপের বাচ্চারা যখন নিজেদেরকে একটা বিচ্ছিন্ন ও অচেনা জলাশয়ে দেখতে পায়, তখন পেছনের দিকে ফিরে যায় এবং তাদের মায়েরা যে কিনারা থেকে এসেছিলো সেদিকে চলে যায়। সেখান থেকে প্রত্যেক নদীতে, হ্রদে ও পুকুরে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য জলজ সাপ যে কোনো জলাশয়ে বাস করতে সক্ষম। এরা তীব্র স্রোতের মোকাবেলা করে, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও জলোচ্ছ্বাসের সাথে পাঞ্জা লড়ে এবং প্রচন্ড ঢেউয়ের বুক চিরে এক তীর থেকে আরেক তীরে গিয়ে ওঠে। এর পরেই তারা শারীরিক পরিপক্কতা লাভ করে। এই পরিক্কতা লাভের পর এবং এই সমগ্র ভ্রমণটি সম্পন্ন হওয়ার পর এক গোপন আইন তাকে পুনরায় তার আদি বাসস্থানে পাঠিয়ে দেয়। কোথা থেকে সে এই প্রেরণা লাভ করে, যা তাকে এরূপ নির্দেশনা দেয়? এমন কখনো ঘটেনি যে, আমেরিকার জলজ সাপ ইউরোপের জলাধারে বা ইউরোপের জলজ সাপ আমেরিকার জলাধারে ধরা পড়েছে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে ইউরোপীয় জলজ সাপের পরিণত বয়সে পৌঁছতে এক বছর বা কিছু বেশী বিলম্ব ঘটে, যাতে সে যে অতিরিক্ত দূরত্ব অতিক্রম করে, তা পুষিয়ে নিতে পারে। কেননা তার সফরের দূরত্ব তার সহযাত্রী মার্কিন সাপের দূরত্বের চেয়ে বেশী। আপনার কি মনে হয় যে, একটা জলজ সাপের ভেতরে যখন ধূলিকণা ও অণু পরমাণুগুলোর মিশ্রণ ঘটে, তখন সেই জিনিসটাই তার ভেতরে অপ্রতিরোধ্য ও দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তি ও নির্দেশনা গ্রহণের ক্ষমতার জন্ম দেয়?'

---

(২) ইংল্যান্ডের লোকেরা স্কটল্যান্ডের এই মাছটিকে 'স্যামন' ফিস বলে উচ্চারণ করে।

আর যখন প্রবল বাতাসের ঝাপটায় কোনো নারী জাতীয় পতংগ জানালার মধ্য দিয়ে ঘরের চিলেকোঠায় আশ্রয় নেয়, তখন সে একটা গোপন সংকেত না পাঠিয়ে সেখান থেকে সরে না। তার স্বজন পুরুষ পতংগটি যতো দূরেই থাক এবং আপনি তাদের উভয়কে বিপথগামী করার জন্য নিজের কোনো তৎপরতা দ্বারা যতোই বাধা সৃষ্টি করুন, পুরুষ পতংগ ওই সংকেত পাবেই এবং তার প্রতি সাড়াও দেবে। তাহলে আপনি কি মনে করেন, ওই নগণ্য সৃষ্টির হাতে কোনো বেতারকেন্দ্র এবং পুরুষ পতংগের হাতে কোনো শব্দবাহী তারের পরিবর্তে কোনো মনস্তাত্ত্বিক বেতারযন্ত্র রয়েছে?' আপনি কি মনে করেন, ওই নারী পতংগ বায়ু তরঙ্গে কম্পন সৃষ্টি করে এবং পুরুষ পতংগের যন্ত্রে সেই কম্পন ধরা পড়ে?

টেলিফোন ও রেডিও দুটো বিস্ময়কর যন্ত্র। এ দুটি দ্বারা আমরা ত্বরিত যোগাযোগের সুযোগ পাই। তবে এই দুটির ক্ষেত্রেও আমরা একটা তার ও স্থানের মুখাপেক্ষী। এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে, পতংগের এ সবের প্রয়োজন নেই। এই বিদ্যায় সে আমাদের চেয়েও সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

উদ্ভিদ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে সুকৌশলে বিভিন্ন সৃষ্টিকে কাজে লাগায় যদিও ওইসব সৃষ্টির এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ থাকে না। যেমন কিছু কীটপতংগ এক ফুল থেকে রেণু নিয়ে আরেক ফুলে পৌঁছে দেয়। বাতাস এবং অন্যান্য চলমান প্রাণী ও বস্তু উদ্ভিদের বীজ স্থানান্তরের কাজ করে। সর্বশেষে এই উদ্ভিদ দোর্দন্ড প্রতাপশালী মানুষকে পর্যন্ত ফাঁদে আটকায়। উদ্ভিদ প্রকৃতিকে সুন্দর করে এবং অঢেল চারা জন্মিয়ে দাতাগিরিতে মানুষকে পেছনে ফেলে দেয়। তবে চারা জন্মাতে সে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি করে ফেলে। আর সে কারণে মানুষকে নিয়মিত লাংগল ও নিড়ানি ব্যবহারের ঝামেলা পোহাতে হয়। বীজ বপন, ফসল কাটা, বীজ সংরক্ষণ, আগাছা নির্মূল করা, শস্যকে কাটছাঁট করা ও তাদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা এ সবের দায়িত্ব মানুষেরই ঘাড়ে ন্যস্ত হয়। মানুষ এ দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করলে তার ভাগ্যে জোটে ক্ষুধা, সভ্যতার ঘটে অধপতন এবং পৃথিবী ফিরে যায় আদিম প্রাকৃতিক অবস্থায়।

কাঁকড়া ও চিংড়ি ধরনের কিছু প্রাণী আছে, যাদের একটা দাঁড়া বা নখর খোয়া গেলে ধরে নিতে হয় যে তার শরীরের পুরো একটা অংশই বিনষ্ট হয়েছে। এমন দুর্ঘটনা ঘটলে সংগে সংগেই সে তার দেহকোষ ও প্রজননকারী উপাদানগুলোকে পুনরায় সক্রিয় করার মাধ্যমে নতুন নখর জন্মাতে আরম্ভ করে। এ কাজ সম্পন্ন হওয়া মাত্রই পেশীগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তারা তখন কোনো না কোনো উপায়ে জানতে পারে যে, তাদের বিশ্রামের সময় এসে গেছে।

বহু সংখ্যক জলজ কীটপতংগ এমনও রয়েছে, যাদের দেহ দু'ভাগ হয়ে গেলেও সে এই দুই অর্ধেকের একটির সাহায্যে নিজেকে আবার জোড়া দিতে পারে। শিকার ধরার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের পোকা আছে, যার মাথা কেটে ফেললেও মারা যায় না বরং তৎক্ষণাত নতুন একটা মাথা তৈরী করতে শুরু করে দেয়। আমরা অনেক সময় ক্ষত স্থানকে সারিয়ে তুলতে সক্ষম হই। তবে জানি না, শল্য চিকিৎসকরা কবে জানবার সুযোগ পাবে যে, তারা ক্ষতস্থানে নতুন হাড়, মাংস, নখ, স্নায়ু ও হাত সংযোজন করতে দেহকোষগুলোকে কিভাবে সক্রিয় হতে পারবে? অবশ্য যদি কখনো তা সম্ভব হয়।

আরো একটা বিস্ময়কর তথ্য আছে, যা বর্তমান সৃষ্টিকে পুনরায় সৃষ্টি করার রহস্যের ওপর কিছুটা আলোকপাত করে। কোষগুলো যখন ক্রমবিকাশের প্রাথমিক স্তরে থাকে, তখন যদি তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদাভাবে একটা করে পূর্ণাংগ

প্রাণী সৃষ্টির ক্ষমতা জন্মে। এখান থেকে এ তথ্যও পাওয়া যায় যে, প্রথম কোষটি যখন দু'ভাগ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তা থেকে দুটো আলাদা সত্ত্বা জন্ম লাভ করে। জমজ সন্তানেরা কেন এত সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তার ব্যাখ্যাও এখানে থাকতে পারে। তবে এর তাৎপর্য আরো বেশী। সেটি এই যে, প্রতিটি কোষ শুরুতে একটা পূর্ণাংগ সত্ত্বায় রূপান্তরিত হতে পারে। অতএব এ ব্যাপারে আর কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রত্যেক কোষে এবং প্রত্যেক পেশীতে তুমি আছো, অর্থাৎ তোমার মতো একটা পূর্ণাংগ সত্ত্বা বা ব্যক্তি রয়েছে।(৩)

লেখক অপর এক জায়গায় বলেন, 'ওক বৃক্ষের ফল যখন মাটিতে পড়ে, তখন তার তামাটে রংয়ের খোসা তাকে সংরক্ষণ করে এবং এই অবস্থায় পৃথিবীর যে কোনো স্থানের মাটিতে গড়িয়ে পড়ুক না কেন। বসন্ত কালে তার ভেতরকার অংকুর জেগে ওঠে, ফলে খোসা ফেটে চৌচির হয়ে যায় এবং ফলের শ্বাস থেকে তা খাদ্য গ্রহণ করে। এই শ্বাস দেখতে ডিমের মতো এবং এর ভেতরেই লুকিয়ে থাকে পরবর্তী প্রজন্মসমূহের সূক্ষ্মতম জীবাণু। এই ফলের শাস মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দেয়। সহসা একদিন একটা ক্ষুদ্র চারাগাছের আবির্ভাব ঘটে। তারপর আরো কয়েক বছর পর পুরোদস্তুর একটা বৃক্ষে পরিণত হয়। অসংখ্য জীবাণু ধারণকারী এই অংকুর অতপর লক্ষ কোটি গুণ গাছ জন্মায়। উৎপন্ন করে গাছের কান্ড, খোসা, পাতা ও ফল। এসব অবিকল সেই ওক বৃক্ষেরই সদৃশ্য, যা থেকে এই ফলের উৎপত্তি ঘটেছে। এরপর শত শত বছর কেটে গেলেও ওক বৃক্ষের অগণিত ফলের মধ্য দিয়ে অণু পরমাণুর সেই আদিমতম বিন্যাস পরিপূর্ণ ভাবে অব্যাহত থাকে, যা লক্ষ কোটি বছর আগে প্রথম ওক বৃক্ষটির জন্ম দিয়েছিলো।' (৪)

গ্রন্থকার স্বীয় পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে বলেন, 'যে কোনো জীবন্ত প্রাণীর দেহে উৎপন্ন প্রতিটি কোষকে এমনভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, যাতে তা গোশতের অংশে পরিণত হয়, নচেৎ তাকে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে হয়। যেমন চামড়ার একাংশ পুরানো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আপন অবস্থায় বহাল থাকে। দাঁতের ওপরের মসৃণ ও কঠিন আচ্ছাদন নির্মাণ, চোখের ভেতরের স্বচ্ছ তরল পদার্থ উৎপাদন এবং কান ও নাক তৈরীতে অবদান রাখাও এই কোষের দায়িত্ব। শুধু এখানেই শেষ নয়, প্রত্যেক কোষের কর্তব্য আকৃতির দিক দিয়েও নিজেকে সংগতিপূর্ণ ও মানানসই করে নেয়া এবং এমন প্রতিটি গুণ বৈশিষ্টের দিক দিয়েও নিজেকে যুৎসই বানানো, যা তার জন্যে নির্দিষ্ট হবে, এটা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। অথচ একটা কোষ ডান কানের এবং অপর একটা কোষ বাম কানের অংশে পরিণত হয়। হাজার হাজার কোষ এমনভাবে সৃষ্ট যেন তারা সঠিক সময় সঠিক জায়গায় সঠিক কাজটি করতে বাধ্য।'

চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক বলেন, 'সৃষ্টির মন্ড বা প্রাথমিক উপাদানের ভেতরেই অনেক সৃষ্ট জীবের অত্যন্ত উঁচু মানের সুনির্দিষ্ট আকৃতির গুণ বৈশিষ্ট, মেধা এবং আমাদের অজানা আরো অনেক কিছু লুকিয়ে রাখা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ভিমরুল বা বোলতা উড়ন্ত ফড়িং শিকার করে মাটিতে গর্ত খোঁড়ে এবং ফড়িংকে যথাস্থানে দংশন করে তার বোধশক্তিকে বিকল করে দেয়, এর ফলে সে

(৩) কে জানে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার 'ক্লোনিং' তথা একই জীবসত্তার 'ডিএনএ' দিয়ে ঠিক তারই মতো আরেক সত্ত্বার উৎপাদন–এ থেকে এসেছে কিনা। স্কটল্যান্ডে কিছু দিন আগে 'ডলি শিপ ক্লোনিং' বিষয়টি দারূণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শহীদ কুতুব যখন এই তাফসীর রচনা করেছিলেন তখন এ বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি। মনে রাখতে হবে ক্লোনিং কিন্তু নতুন সৃষ্টির নাম নয়, তাই এব্যাপারে আমাদের মনে কোনো ভুল বুঝাবুঝি থাকা উচিত নয়।–সম্পাদক

(৪) (সূরা তারেকে বর্ণিত শুক্রকীটের ভ্রমণ বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)

বেঁচে থাকে এক ধরনের সংরক্ষিত মাংস পিন্ড হিসাবে। স্ত্রী ভিমরুল যথোপযুক্ত স্থানে ডিম পাড়ে। সম্ভবত সে জানে না যে, তার বাচ্চারা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই খাদ্য গ্রহণে সক্ষম হবে। কেননা তা করলে সেটা হতো তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি। এটা অনিবার্যভাবে সত্য যে, ভিমরুল শুরু থেকেই এ কাজ করে এসেছে এবং সর্বদা এর পুনরাবৃত্তি করেছে। নচেৎ পৃথিবীতে একটা ভিমরুলও থাকতো না। এই রহস্যময় ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের জানা নেই। তাই বলে একে নিরেট ঘটনাক্রম বলে চালিয়ে দেয়ার অবকাশও নেই।

'পিঁপড়ের কোনো কোনো শ্রেণীতে এরূপ নিয়ম চালু আছে যে, শ্রমিক পিঁপড়েরা ছোট ছোট দানা নিয়ে আসে অন্য পিঁপড়েকে শীতকালে খাওয়ানোরে জন্য। পিঁপড়ের 'খাদ্য গুদাম' তৈরী করার কথা সুপ্রসিদ্ধ। খাদ্য তৈরীর জন্য যে পিঁপড়ের বড় বড় চোয়াল রয়েছে, সেই পিঁপড়েকে গোটা পিঁপড়ে পল্লীর জন্য খাবার তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়। এটাই হয় তার একমাত্র কাজ। শরৎকাল এলে যখন খাদ্যের দানাগুলো সবই চূর্ণ করা হয়ে যায়, তখন পিঁপড়ের বৃহত্তর অংশের জন্য 'সর্বোচ্চ পরিমাণ কল্যাণ সাধন' এই নীতির অনুসরণে সেই গোটা খাদ্য সম্ভারের সংরক্ষণ সবচেয়ে জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় পিঁপড়ের নতুন প্রজন্ম বিপুল সংখ্যক চূর্ণকারী পিঁপড়ে সংগ্রহ করতে থাকে আর সেই অবসরে পিঁপড়ের সৈন্যরা কর্মরত চূর্ণকারী পিঁপড়েদেরকে হত্যা করতে থাকে। সম্ভবত হত্যাকারীরা এই বলে নিজেদের কীটোচিত বিবেককে প্রবোধ দেয় যে, সে পিঁপড়েরা খাদ্য দানা চূর্ণ করার সময় তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার অর্থাৎ আহার করার প্রথম সুযোগ পেয়েছে। কাজেই তারা পর্যাপ্ত প্রতিদান বা মজুরী পেয়ে গেছে।

আরো এক ধরনের পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায়। সহজাত আবেগ অথবা চিন্তা ভাবনার বশবর্তী হয়ে তারা কিছু 'খাদ্য গুদাম' তৈরী করে। তাদের এই সব খাদ্য গুদামের সমষ্টিকে একত্রে 'খাদ্য গুদামের পাড়া' নামে অভিহিত করা হয়। তারা বিভিন্ন রকমের ক্ষুদ্র পোকা ও ছত্রাক খেয়ে জীবন ধারণ করে। এ সব প্রাণী হচ্ছে পিঁপড়ের গরু, ছাগল অর্থাৎ তাদের গৃহপালিত জন্তু। পিঁপড়েরা এগুলো থেকে মধুসদৃশ এক ধরনের তরল পদার্থ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

পিঁপড়ের আর একটা স্বভাব হলো, সে বিভিন্ন শ্রেণীর পিঁপড়েকে বন্দী করে ও দাসে পরিণত করে। কোনো কোনো পিঁপড়ে নিজের ঘর বানানোর সময় হুবহু ঘরের ইপ্সিত আকৃতি অনুসারে পাতা কাটে। যখন কতিপয় শ্রমিক পিঁপড়ে ওই ঘরের পাশ ধরে যথাস্থানে রাখে, তখন একই স্থানে ঘরটিকে সুতো দিয়ে বুনে দেয়ার জন্য এমন সব শিশু পিঁপড়েদেরকে নিযুক্ত করে, যারা ছত্রাকের ভূমিকায় কাজ করে এবং রেশমী সুতো কাটতে পারে বলে মনে করা হয়। অনেক সময় কোনো শিশু পিঁপড়ে রেশমের সুতো বানানোর কাজ থেকে বিরত থাকে কিন্তু সে পিঁপড়ে সমাজের জন্য কোনো না কোনো পর্যায়ে কাজ করে থাকে।

বস্তুর যে সব অণুপরমাণু থেকে পিপঁড়ের সৃষ্টি হয়, তারা এ সব জটিল কাজ কিভাবে করতে সক্ষম হয়? সন্দেহ নেই যে, একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি তাদেরকে এ সব কাজের পথ দেখিয়েছেন।'

জি, হ্যাঁ, পিঁপড়ে বা তার উৎস অণুপরমাণুকে এবং অন্যান্য সৃষ্টিকে– তা সে ছোট বড় যাই হোক না কেন, সকলকে পথ দেখানোর জন্য এক মহান স্রষ্টা অবশ্যই রয়েছেন। তিনিই সেই 'সর্বোচ্চ সত্ত্বা, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সংহত ও ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন, যিনি পরিকল্পনা করেছেন অতপর পথ প্রদর্শন করেছেন।'

উপরোক্ত বিজ্ঞানীর বক্তব্য থেকে এখানে যে উদ্ধৃতি আমি তুলে ধরলাম, এটা উদ্ভিদ, কীট-পতংগ, পশু ও পাখি সম্পর্কে মানুষের যা কিছু পর্যবেক্ষণ এ যাবত সংরক্ষিত হয়েছে, তার অতি সামান্য একটি অংশ মাত্র। এ ধরনের আরো বহু বক্তব্য রয়েছে।(৫) সুরা আল আ'লার প্রাথমিক আয়াত কয়টিতে বর্ণীত আল্লাহর 'সৃষ্টি করা, ভারসাম্যপূর্ণ করা, পরিকল্পনা করা ও পথ প্রদর্শন করা'র মধ্যে যে বিপুল সংখ্যক জড় ও জীব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এই দৃশ্যগোচর সৃষ্টি জগতে যার খুব কম সংখ্যকই আমাদের জ্ঞানের আওতায় এসেছে। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে এবং এ যাবত লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত অন্যান্য বিজ্ঞানীর সকল পর্যবেক্ষণ ও উদ্ভাবনে তার প্রতি সামান্য কিছু আভাস ইংগিতই শুধু দেয়া সম্ভব হয়েছে। উপরন্তু এর বাইরে রয়েছে বিশাল অদৃশ্য জগত যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সামান্য কিছুই অবহিত করেছেন। আমাদের দুর্বল মানবীয় সত্ত্বায় যতোটা ধারণা ও উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব, ততোটুকুই আমাদেরকে অবগত করেছেন।

উদ্ভিদ জগত

এ পর্যন্ত এই বিরাট ও বিশাল সৃষ্টি জগতের দৃশ্য তুলে ধরার পর এবং তার সর্বদিকে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের কথা এবং বহু দুরব্যাপী বিশ্বনিখিলে সেই প্রশংসা ও গুণকীর্তন প্রতিধ্বনিত হওয়ার বর্ণনা দেয়ার পর, আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী দুটি আয়াতে বৃহত্তম তাসবীহ বা গুণকীর্তনের পূর্ণতা সাধন করছেন সমগ্র উদ্ভিদের জীবনে সেই তাসবীহের ইংগিতপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ছাপ তুলে ধরার মাধ্যমেঃ

'আর যিনি উদ্ভিদ উদগত করেছেন, অতপর তাকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।'

এখানে উদ্ভিদ বলতে সকল উদ্ভিদই বুঝানো হয়েছে। আর প্রত্যেক উদ্ভিদই আল্লাহর কোনো না কোনো সৃষ্টির জন্য উপযোগী ও উপকারী। আমরা সচরাচর যেমন ধারণা করে থাকি যে উদ্ভিদ আমাদের গবাদি পশুর জন্য সৃষ্ট, ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয় বরং তার চেয়েও ব্যাপক। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করার পর গোটা সৃষ্টির জন্য খাদ্যপুষ্টি ও শক্তির যাবতীয় উৎস এর ভেতরেই সৃষ্টি করেছেন। ভূপৃষ্ঠের ওপরে, ভূগর্ভে বা মহাশূন্যে যতো প্রাণী বিচরণ করে থাকে, তাদের সকলের খাদ্য সঞ্চিত রেখেছেন এই পৃথিবীতেই।

উদ্ভিদ প্রথম যখন চারাগাছ হিসাবে আবির্ভূত হয়, তখন সবুজ থাকে, তারপর ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে কালো বর্ণ ধারণ করে, যখন সে সবুজ থাকে, তখন খাদ্য হবার যোগ্য থাকে আবার যখন কালো আবর্জনায় পরিণত হয় তখনো খাদ্য হবার যোগ্য থাকে। আর এ দুই অবস্থার মাঝে যখন যে অবস্থায়ই থাকুক, মহান সৃষ্টিকর্তা, ভারসাম্য রক্ষণকারী, পরিকল্পনাকারী ও পথনির্দেশক আল্লাহর সার্বিক পরিকল্পনা ও বিচার-বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তা এই সৃষ্টির জীবনের কোনো না কোনো কাজের উপযোগী হয়ে থাকে, কোনো না কোনো উপায়ে কারো না কারো উপকার ও কল্যাণ সাধন করে।

এখানে উদ্ভিদ জীবনের প্রতি যে ইংগিত করা হয়েছে, তা একটা সুক্ষ্ম তাৎপর্য বহন করছে। সেটি এই যে, প্রতিটি উদ্ভিদ যেমন ধ্বংসশীল, তেমনি প্রতিটি প্রাণী মরণশীল। পরবর্তীতে দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে যে আলোচনা আসছে, তার সাথে এই বক্তব্যের মর্মগত মিল

(৫) আধুনিক বিজ্ঞান এমন বহু বিষয়কে আমাদের সামনে হাযির করছে, যার ফলে দিনে দিনে আল্লাহ তায়ালার বাণীগুলোই সত্যে পরিণত হচ্ছে। এ পর্যায়ে সম্প্রতি অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকরা সেগুলো পড়লে একথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারবেন।—সম্পাদক।

রয়েছে 'বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো। অথচ আখেরাতই উত্তম ও চিরস্থায়ী।' বস্তুত দুনিয়ার জীবন এই উদ্ভিদের মতোই, যা একদিন কালো আবর্জনায় পরিণত হয়ে খতম হয়ে যায়, আসলে আখেরাতই স্থায়ী জীবন।

কোরআনের হেফাযত

সৃষ্টি জগতের এই বিশাল ও বিরাট প্রান্তরকে উন্মোচনকারী এই বিস্তৃত পটভূমি বর্ণনার পর সূরার পরবর্তী আলোচনা আসছে। তা এই বিশ্বনিখিলের সাথে সম্পৃক্ত এবং এই মনোরম প্রেক্ষিতের সাথে সংযুক্ত। আরো লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এই পারার অধিকাংশ সূরার বিষয়বস্তু এগুলোর সমকালীন পরিবেশ ও অন্তর্নিহিত প্রভাবের সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত ও পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।(৬) এর অব্যবহিত পরই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাতের জন্য সেই মহান সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, 'আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, ফলে তুমি আর ভুলবে না, অতএব স্মরণ করিয়ে দাও, যদি তাতে উপকার হয়।'

সুসংবাদটির সূচনা হচ্ছে এই বলে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে এই কোরআন স্মরণ রাখার কষ্ট থেকে অব্যহতি দেবেন। 'আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, কাজেই তুমি আর ভুলে যাবে না।' অর্থাৎ তাঁর কাজ হলো আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাবলে তিনি পড়বেন, আর প্রতিপালক স্বয়ং যা তাঁকে পড়াবেন; তা তিনি ভুলবেন না।

এটি এমন একটি সুসংবাদ, যা রসূল (স.)-কে তাঁর একান্ত প্রিয় এই সুন্দর মহিমান্বিত কোরআনের ব্যাপারে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে। কোরআনের প্রতি ভক্তি, আসক্তি ও আগ্রহের আতিশয্যে এবং তার সর্বাত্মক অনুকরণ ও অনুসরণের তাগিদে ও প্রেরণায় তিনি এত ব্যাকুল হয়ে পড়তেন যে, যখনই জিবরাঈল তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন, তখন তিনি বিড়বিড় করে এক একটি আয়াত বারবার উচ্চারণ করতেন এবং জিহবা নাড়াতে থাকতেন। কারণ তা না হলে ভুলে যাওয়ার আশংকা বোধ করতেন। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে এই আশ্বাস দেয়া হয় যে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, যাতে তিনি এর একটি অক্ষরও ভুলে না যান।

রসুল (স.)-এর অনুগামী ও অনুসারী উম্মাহর জন্যও এটি একটি আশ্বাসবাণী। এ সংক্রান্ত মূল আকীদার ব্যাপারে এ আয়াতে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। বস্তুত কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীর অন্তরে এ কোরআনকে সুরক্ষিত করেছেন। এটা স্বয়ং আল্লাহর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অধীন। এ নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহর দৃষ্টিতে এ দ্বীনের উচ্চ মর্যাদারও প্রতীক এবং তাঁর দাড়িপাল্লায় ইসলামের গুরুত্বের নিদর্শন।

প্রসংগত এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, যেখানেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সুদৃঢ় ও অকাট্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় কিংবা কোনো শাশ্বত নীতি ঘোষণা করা হয়, সেখানে সংগে সংগে এমন কিছু বক্তব্যও দেয়া হয়, যা দ্বারা বুঝানো হয় যে, আল্লাহ তায়ালা স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতার মালিক, তিনি কোনো বাধ্যবাধকতার অধীন নন, এমনকি নিজের ওয়াদা এবং শাশ্বত নীতি ও ঘোষণা দ্বারাও তার স্বাধীন ইচ্ছা শৃংখলিত হয় না। তাঁর ইচ্ছা সকল ওয়াদা ও চুক্তির উর্ধে। কোরআন এ সত্যটি সর্ব ক্ষেত্রেই বর্ণনা করে থাকে। এই গ্রন্থে আগেও আমরা এর উদাহরণ লক্ষ্য করেছি। এখানেও তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যথা 'তবে আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা করেন।' রসূল (স.) যাতে ভুলে না

(৬) আমার প্রণীত 'আত্তাসওয়ীরুল ফান্নী কোরআন' এ 'কোরআনের শৈল্পিক রূপ' (গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

যান, তার ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করবেন এই মর্মে অলংঘনীয় প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর এই বাক্যে আল্লাহর ইচ্ছার স্বাধীনতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ দ্বারা আসলে গোটা বিষয়কে আল্লাহর বৃহত্তম ও সর্বোচ্চ ইচ্ছার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অতীতে যে ওয়াদাই করুন না কেন, বান্দাকে সব সময় আল্লাহর ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে তাঁর ওপরই নির্ভরশীল ও তাঁর জন্য প্রস্তুত ও প্রতীক্ষারত থাকতে হবে। মনকে চিরদিনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছার সাথে বেঁধে দিতে হবে।

'নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবই জানেন।' ধরে নেয়া যায় যে, ওপরে যে কোরআন সংরক্ষণের ওয়াদা ও আল্লাহর ইচ্ছাকে তার ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এ বাক্যটিতে তার সবটারই কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে আল্লাহ তায়ালা সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের সকল দিক সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা, বিচক্ষণতা, বিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার ওপরই সব কিছুর চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ভরশীল। তিনি সর্বদিক বিবেচনা করে যেমন ভালো মনে করবেন তেমন সিদ্ধান্ত নেবেন।

দ্বিতীয় সর্বব্যাপী আশ্বাসবাণী ও সুসংবাদটি হলো, 'তোমাকে আমি সহজ পন্থার সুযোগ দেবো' এটিও স্বয়ং রসূল (স.)-এর জন্যে ব্যক্তিগতভাবে এবং তাঁর উম্মাতের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি সুসংবাদ। সেই সাথে এই বাক্যটিতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার স্বভাব-প্রকৃতি ও মেযাজ, এই খোদায়ী আহ্বানের তাৎপর্য ও মানুষের জীবনে তার ভূমিকা এবং এই বিশ্ব ব্যবস্থায় তার স্থান কি, তা তুলে ধরা হয়েছে। বাক্যটি ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের ও মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তুলে ধরছে। এই রসূল, এই দ্বীন এবং এই বিশ্বপ্রকৃতি এই তিনটিরই স্বভাব প্রকৃতি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত। মানুষের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিশ্বজগত সামগ্রিকভাবে সহজ সরল প্রকৃতির, আপন নির্দিষ্ট কক্ষপথে তার বিচরণ ও গতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ। আপন লক্ষ্য ও গন্তব্যের দিকে তার যাত্রা সহজ ও স্বাভাবিক। বস্তুত এ আয়াত আল্লাহর নূরের একটি বিস্ফোরণ। এ বিস্ফোরণে সত্যের সীমাহীন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

নবীজির সহজ সরল জীবনযাপন

আল্লাহ তায়ালা যাকে সহজ ও সরল পথে চলার সুযোগ করে দেন, তার গোটা জীবনই সহজ ও সরলভাবে অতিবাহিত হয়। বিশ্বজগতের সাথে তার পূর্ণ সমন্বয়, সহযোগিতা ও সদ্ভাব বজায় থাকে। আর বিশ্বজগতের প্রতিটি গতিবিধিতে, সংযোগ ও সংগঠনে এবং আল্লাহর দিকে যাত্রায় ও আবর্তনে এখানে পূর্ণ সমন্বয় ও একাত্মতা রয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি সহজ সরল জীবন ও চালচলনের অধিকারী, বিশ্বজগতের সহজ সরল ও সুশৃংখল যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিদের সাথে ছাড়া আর কারো সাথেই তার সংঘর্ষ ঘটে না। আর এই সরল পথ বিচ্যুত বিকৃত স্বভাবের লোকদেরকে যখন মহাবিশ্বের সাথে তুলনা ও পরিমাপ করা হয় তখন তাদের কোনোই গুরুত্ব ও ভারত্ব থাকে না। সহজ সরল জীবন যাপনকারী ব্যক্তি চালচলনে ও আচরণে সরল, বিনয়ী, কোমল ও অমায়িক হয়ে থাকে। বিশ্বজগতের সব কিছুর সাথে, সকল বস্তু, প্রাণী ও ব্যক্তির সাথে এবং সকল ঘটনায় ও সকল পরিবেশ পরিস্থিতিতে সে তার এই অমায়িক ও বিনয়ী চালচলন ও আচরণ অব্যাহত রাখে। এমন কি ভাগ্যবিধি বেলায়ও সে সহজ সরল ও বিনম্র আচরণ করে এবং ভাগ্যকে নির্বিবাদে মেনে নেয়। তার হাতে, তার জিহ্বায়, তার পদচারণায়, তার কাজে, তার কল্পনায়, তার চিন্তায়, তার কর্মোদ্যোগে, তার ব্যবস্থাপনায় এবং তার নিজের সাথে ও অন্যের সাথে সমভাবে বিনয়, কোমলতা ও অমায়িকতার ছাপ থাকে।

রসূল (স.)ও তার সকল আচরণে এ রকমই ছিলেন। বোখারী মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণীত হয়েছে যে, রসূল (স.) যখনই কোনো দু'টি ব্যাপারে ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করতেন, তখন ওই দুটির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত সহজ, সেটিকেই গ্রহণ করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেছেন যে, 'বাড়ীতে ব্যক্তিগত পরিবেশে রসূল (স.) ছিলেন সবচেয়ে কোমল ও অমায়িক এবং সদা হাসিমুখ।' সহীহ বোখারীতে আরো রয়েছে যে, (রসূল (স.) এতো সহজ সরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে,) 'একটি দাসী রসূল (স.)-এর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারতো। পোশাক, খাদ্য ও বিছানা ইত্যাদির ব্যাপারেও রসূল (স.)-এর অনুসৃত নীতি এটাই ছিলো যে, তিনি সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনই অবলম্বন করতেন।

রসূল (স.)-এর পোশাক পরিধানের রীতি সম্পর্কে ঈমাম শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে কাইয়েম আল জাওযী স্বীয় গ্রন্থ 'যাদুল মায়াদে' বলেন, 'তাঁর সাহাব নামের একটা পাগড়ী ছিলো, বেশ উঁচু করে তা পরতেন এবং তার নিচে টুপি পরতেন। কখনো পাগড়ী ছাড়া টুপি আবার কখনো টুপি ছাড়া পাগড়ী পরতেন। যখনই পাগড়ী পরতেন, তখন পাগড়ীর একপাশ দুই কাঁধের মাঝখান দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন।' এটি সহীহ মুসলিমের বর্ণনা। ওমর ইবনে হুরাইস (রা.) থেকে বর্ণীত যে, তিনি বলেন, 'আমি রসূল (স.)-কে মেম্বারে এভাবে বসা দেখেছি যে, তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী পরা ছিলো এবং পাগড়ীর এক পাশ দুই ঘাড়ের মাঝখানে দিয়ে ঝুলানো ছিলো। মুসলিম শরীফে হযরত জাবেরের বর্ণনায় আছে যে, একটা পাকানো দড়ি বা গুচ্ছ ঝুলানো ছিলো।' এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রসূল (স.) গুচ্ছটিকে সব সময় দুই ঘাড়ের মাঝখানে ঝুলাতেন না। এরূপ বর্ণনাও আছে যে, তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি সামরিক বেশভূষায় সজ্জিত ছিলেন এবং তাঁর মাথায় ছিলো লৌহ শিরস্ত্রাণ। সুতরাং এটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে তিনি সেখানকার উপযোগী পোশাক পরতেন।'

'যাদুল মায়াদ' গ্রন্থের অপর এক অধ্যায়ে ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, 'সত্য কথা এই যে, যে পদ্ধতি ও পন্থা রসূল (স.) গ্রহণ করেছেন, চালু করেছেন, অন্যদেরকে গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এবং সব সময় পালন করেছেন-সেই পদ্ধতি ও পন্থাই হচ্ছে সর্বোত্তম। পোশাকের ব্যাপারে তার অনুসৃত নীতি ছিলো এই যে, যে পোশাক সহজে ও অনায়াসে পাওয়া যায়, সেটাই তিনি পরতেন। কখনো পশমী, কখনো সুতী, কখনো কাতান, কখনো ইয়েমেনী চাঁদর, কখনো সবুজ চাদর, কখনো জুব্বা, কখনো কুবা, কখনো জামা, চাদর, জুতা ও মোজা পরতেন। পাকানো দড়ি বা গুচ্ছ (যুয়াবা) কখনো পেছন দিক থেকে ঝুলিয়ে দিতেন, আবার কখনো ঝুলাতেন না।......'

খাদ্য সম্পর্কে তাঁর অনুসৃত রীতি সম্পর্কে 'যাদুল মায়াদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'খাদ্য সম্পর্কেও রসূল (স.)-এর রীতি এরকমই ছিলো। যে খাদ্য উপস্থিত, তাঁর কোনোটা প্রত্যাখ্যান করতেন না, যা অনুপস্থিত, তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন না, যে কোনো হালাল জিনিস তাঁর সামনে হাযির করা হতো, তা তিনি খেতেন। কোনো খাদ্য নিজের কাছে অরুচিকর মনে হলে খেতেন না, কিন্তু অন্যদেরকে খেতে নিষেধ করতেন না। গিরগিটী খেতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না বিধায় খাননি; কিন্তু উম্মতের জন্য তা খাওয়া নিষিদ্ধ করেননি। বরং তাঁর সাথে একই মজলিসে বসে অন্যরা

খেয়েছে আর তিনি দেখেছেন। হালুয়া ও মধু তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিলো। খেজুর ও খোরমা খেতেন, খাঁটি দুধও খেতেন, পানিতে মেশানো দুধও খেতেন। ছাতু ও মধু পানি মিশিয়ে খেতেন। খোরমার রস খেতেন। আটা ও দুধের তৈরী 'খাযীরা' খেতেন। খেজুরের সাথে শসা খেতেন, পনির খেতেন, রুটির সাথে কোরমা এবং সির্কা দিয়ে রুটি খেতেন। শুকনো গোশ্‌ত্‌ খেতেন, সিদ্ধ ও রান্না করা উভয় প্রকারের তরিতরকারি খেতেন। তবে, রান্না করাটাই বেশী পছন্দ করতেন। মাখনের সাথে রুটি, তেলের সাথে রুটি এবং খেজুরের সাথে তরমুজ খেতেন। তিনি ননীর সাথে খোরমা খেতেন এবং এটা ছিলো তার প্রিয় খাবার। কোনো হালাল জিনিস ফেরতও দিতেন না, তার প্রতি কৃত্রিম অনাগ্রহও দেখাতেন না। তাঁর নীতি ছিলো, সহজে যা জোটে তা খাওয়া। যা জোটে না তার জন্য হা-হুতাশ না করা......।'

আল্লামা ইবনে কাইয়েম একই গ্রন্থে রসূল (স.)-এর ঘুম ও ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস সম্পর্কে বলেন, কখনো নিজের বিছানায় শুতেন আবার কখনো শুতেন শক্ত পাটিতে বা নরম মাদুরে। কখনো মাটির ওপর, কখনো খাটের ওপর কালো কম্বল পেতে। সহজ সরল ও সাদাসিধে জীবন যাপন এবং উদার ও বিনীত আচরণ সম্পর্কে উৎসাহিত করে রসূল (স.)-এর এমন বাণীর সংখ্যা এতো বেশী যে, তার ইয়ত্তা করা কঠিন। তাঁর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি, 'এই দ্বীন সহজ, যে ব্যক্তি এই দ্বীনকে কঠিন করার চেষ্টা করবে, সে তাকে পরাভূত করবে।' (বোখারী)। 'তোমরা নিজেদের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করো না, তাহলে তোমাদের ওপর কড়াকড়ি আরোপকরা হবে। একটি জাতি নিজেদের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করেছিলো, ফলে তাদের ওপর কঠোর ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো।' (আবু দাউদ)। 'অতিমাত্রায় কড়াকড়ি আরোপকারী ব্যক্তি হেঁটেও পথ অতিক্রম করতে পারে না, কোনো জন্তুর পিঠকেও অক্ষত রাখে না।' (বোখারী)। 'তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না।' (বোখারী ও মুসলিম)। লেনদেন ও আচার ব্যবহারে রসূল (স.)-এর বাণী 'ক্রয় বিক্রয় ও দাবী আদায়ের বেলায় উদারনীতি অবলম্বনকারীর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। (বোখারী)। 'মোমেন অমায়িক ও বিনয়ী।' (বায়হাকী)। 'মোমেন অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং অন্যের সহানুভূতি অর্জন করে' (দারাকুতনী)। 'বিদ্বেষপরায়ণ ও ঝগড়াটে লোক আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী ধিকৃত ও ঘৃণিত।' (বোখারী ও মুসলিম)।

রসূল (স.) সব রকমের কঠোরতা ও জটিলতাকে অপছন্দ করতেন, এমন কি নামকরণে ও মুখমন্ডলের আলামতেও তা অপছন্দ করতেন। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জন্মগতভাবে এবং স্বভাবগতভাবেই এরূপ সরলমতি বানিয়েছিলেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়ব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূল (স.)-এর কাছে উপস্থিত হলে রসূল (স.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি? তিনি বললেন, হাযান (অর্থাৎ কঠিন), রসূল (স.) বললেন, তুমি তো হচ্ছো সরল। তিনি বললেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি পাল্টাবো না। সাঈদ ইবনুল মোসায়ব বলেন, এরপর থেকে আমাদের পরিবারে দুঃখ কষ্ট লেগেই ছিলো (বোখারী)। হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণীত যে, রসূল (স.) আসিয়া (শব্দার্থ পাপিষ্ঠা) নাম্নী জনৈক মহিলার নাম পাল্টে জামীলা (শব্দার্থ সুন্দরী) রাখেন। (মুসলিম)। রসূল (স.) বলেছেন, 'তোমার ভাই এর সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করাও একটা পুণ্যের কাজ।' (তিরমিযী)।

বস্তুত এটা অত্যন্ত নাযুক ও স্পর্শকাতর এক অনুভূতি, যা কঠোরতা, রুক্ষতা ও নিষ্ঠুরতাকে উপলব্ধি করে ও ঘৃণা করে, এমনকি তা যদি মানুষের নামে বা তার আচার আচরণে এবং হাবভাবেও প্রকাশ পায়, তবু তার অগোচরে থাকে না। একজন আদর্শ মানুষের অনুভূতি এরকমই হয়ে থাকে এবং সে সরলতা, বিনয় ও অমায়িকতার প্রতিই আকৃষ্ট হয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোটা জীবনই উদারতা, সরলতা, অমায়িকতা ও বিনয়েরই সমষ্টি, আর সকল কাজে এই সরলতা ও কোমলতার প্রতি সকলকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিলো তাঁর নীতি।

রসূল (স.) কিভাবে মানুষের মনের চিকিৎসা করতেন তার একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এ উদাহরণ থেকে এটাও জানা যায় যে, রসূল (স.)-এর স্বভাব ও কর্মপদ্ধতি কতো কোমল ও উদার ছিলো,

'একদিন তাঁর কাছে এক বেদুঈন এলো এবং সে যা চাইলো তিনি তা তাকে দিলেন। তারপর রসূল (স.) তাকে বললেন, আমি তোমার উপকার করলাম তো? সে বললো, না, কোনো সুন্দর আচরণই করেননি। উপস্থিত মুসলমানরা এ কথা শুনে তার ওপর ভীষণভাবে চটে গেলেন এবং তার দিকে রুখে গেলেন। রসূল (স.) ইংগিতে তাদেরকে থামার আদেশ দিলেন। অতপর তিনি নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। তারপর বেদুঈন তাঁর কাছে আসতে খবর পাঠালেন এবং তাকে আরো কিছু দিলেন। এবার তাকে বললেন, আমি কি তোমার উপকার করেছি? সে বললো, হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা এ জন্য আপনাকে নিজের আত্মীয় স্বজন ও পরিবার পরিজনের কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তখন রসূল (স.) তাকে বললেন, শোনো, তুমি যা বলেছো, তাতে আমার সাহাবীদের মনে আঘাত লেগেছে। কাজেই তুমি যদি পছন্দ করো, তবে যে কথা এখন আমার সামনে বললে, তা তাদের সামনে একটু বলো। তাহলে তাদের মনে তোমার প্রতি যে ক্ষোভ জন্মেছিলো তা দূর হয়ে যাবে। সে বললো, ঠিক আছে তাই হবে। পরদিন সকালে বেদুঈনটি এলো। রসূল (স.) সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এই বেদুঈন যা বলেছে, তা তো তোমরা জানো। পরে আমি তাকে আরো কিছু দিয়েছি এবং এতে সে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। কি হে তাই তো? বেদুঈন বললো জি হাঁ, এজন্যে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আত্মীয় স্বজন ও পরিবার পরিজনের দিক থেকে উত্তম প্রতিদান দিন। তখন রসূল (স.) বললেন, আমার এবং এই বেদুঈনের ব্যাপারটি সেই ব্যক্তির মতো, যার একটা (দুষ্ট ও অবাধ্য) উটনী ছিলো। উটনীটি ছুটে পালালো। লোকেরা তার পেছনে যতোই ছুটতে লাগলো, উটনীটিও ততোই উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে উটনীর মালিক তাদেরকে ডেকে বললো, তোমরা আমাকে ও আমার উটনীকে একা ছেড়ে দাও। কেননা, আমি তার প্রতি অধিকতর বিনম্র ও সদয় এবং তার সম্পর্কে আমিই অধিকতর ওয়াকেফহাল। অতপর উটনীর মালিক সোজা উটনীর মুখোমুখি হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো। সে উটনীর জন্য মাটিতে পড়ে থাকা কিছু আবর্জনা হাতে নিয়ে তাকে আস্তে আস্তে নাড়াতে ও ঘুরাতে লাগলো। এটা দেখে উটনীটি তার কাছে এলো এবং ধরা দিলো। আর মালিক তৎক্ষণাত তাকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো এবং তার ওপর আরোহণ করলো। এই বেদুঈনটি কাল যে কথা বলেছিলো, সেই কথার ওপর আমি যদি তোমাদেরকে রেখে চলে যেতাম, তারপর তোমরা যদি তাকে মেরে ফেলতে, তবে সে জাহান্নামবাসী হতো।'

বস্তুত বিদ্রোহী ও উদ্ধত স্বভাবের মানুষকে রসূল (স.) এভাবেই পাকড়াও করতেন। এহেন উদারতা, সরলতা ও নম্রতা দ্বারা এবং এরূপ উদ্বুদ্ধকারী আচরণ দ্বারা তার চিকিৎসা করতেন। তাঁর সমগ্র জীবন জুড়ে এ ধরনের ভূরিভূরি উদাহরণ বিদ্যমান। এটাই সেই 'সহজতম পথের যাত্রাকে সহজ করে দেয়ার' খোদায়ী ওয়াদা ও শুভ সংবাদের বাস্তব উদাহরণ। আল্লাহ তায়ালা শুধু ওয়াদা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, কার্যত রসূল (স.)-এর জীবনে তাঁর দাওয়াতে ও সকল কাজে এর প্রতিফলন ঘটানোর ক্ষমতা দিয়েছেন।

এই সর্বজনপ্রিয়, উদার ও মহানুভব ব্যক্তিত্বের জন্য সহজতম পথে চলাকে সহজ করে দেয়া হয়েছিলো শুধু এ জন্য যে, তিনি যেন সমগ্র মানব জাতির কাছে এই দাওয়াত পেশ করতে পারেন। এতে করে মানবজাতির স্বভাব-চরিত্র এই দাওয়াতের স্বভাব-প্রকৃতির নমুনা অনুসারে এবং মানব জাতির বাস্তবতা এই দাওয়াত তথা এই দ্বীনের বাস্তব নমুনা অনুসারে তৈরি হবে। এভাবে তাঁর সেই সুমহান ব্যক্তিত্ব, তার বহন করা এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্যে যথেষ্ঠ সহায়ক, আর এই ব্যক্তিত্ব যে কোনো মানুষকে মুগ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট, চাই সে যতোই কঠিন হৃদয়ের মানুষ হোক না কেন। আল্লাহর তাওফীক দান ও সহজকরণের ফলেই এরূপ হওয়া সম্ভব। কেননা, রেসালাতের দায়িত্ব এই সহজীকরনের ফলে কঠিন বোঝা থেকে একটা প্রিয় কাজে, একটা চমৎকার সুন্দর শারীরিক ও মানসিক কসরত এবং একটা আনন্দময় অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়।

রসূল (স.)-এর গুণ বৈশিষ্ট এবং তিনি যে দায়িত্ব সম্পন্ন করতে এসেছেন তার গুণ বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসংগে কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের জন্য করুণাস্বরূপ বানিয়ে পাঠিয়েছি।' (সূরা আম্বিয়া ১০৭)

আরো বলা হচ্ছে- 'যারা অনুসরণ করে সেই নিরক্ষর নবীর, যাঁর বিবরণ তারা তাওরাতে ও ইনজীলে লিখিতভাবে পায় যে, তিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেন, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখেন, পবিত্র জিনিসগুলোকে তাদের জন্য হালাল করেন, অপবিত্র জিনিসগুলোকে নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের ওপর আরোপিত কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধ রহিত করেন।' (সূরা আ'রাফ ১০৭)

রসূল (স.) মানব জাতির জন্য করুণা তথা ত্রাণকর্তা স্বরূপ এসেছেন, নিজেরা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করার কারণে তাদের ওপর যে সব কড়াকড়ি আরোপিত হয়েছিলো, তা তাদের ওপর থেকে অপসারণ করে তাদের জন্য সব কিছু সহজ করে দিতে এসেছেন।

যে বার্তা রসূল (স.) বহন করে এনেছেন, তার গুণ বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসংগে কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি কোরআনকে স্মরণ ও আবৃত্তি করার সুবিধার্থে সহজ করে দিয়েছি। কেউ কি আছে শিক্ষা গ্রহণকারী?' (সূরা ক্বামার-২২) 'তিনি এই দ্বীনে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।' (সূরা হজ্জ ৭৮) 'আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রাণীকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব দেন না।' (সূরা বাকারা ২৮৬)। 'আল্লাহ তায়ালা চান না যে তোমাদের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করেন, তবে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ইচ্ছুক।' (সূরা আহযাব)। বস্তুত রেসালাতের এই দায়িত্ব মানুষের ক্ষমতার আওতাধীনে এমন সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষকে কোনো সংকীর্ণতা ও কষ্টের শিকার করা হয়নি। এই সরলতার ছাপ যেমন রেসালাতের মৌল বৈশিষ্টে বিরাজমান, তেমনি তার দায়িত্বসমূহেও বিদ্যমান। 'এটা আল্লাহর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা রুম ৩০)

আর যখনি মানুষ এই মহান আকীদা অনুসরণ করে চলতে থাকে, তখন প্রতিটি পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে সে দেখতে পায় সহজ সরল ও সুবিধাজনক নীতি, দেখতে পায় সব কিছুকে মানবীয় শক্তি সামর্থ ও রকমারি পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার ব্যবস্থা।

খোদ ইসলামী আদর্শ একেবারেই সহজবোধ্য। একজন ইলাহ আছেন, যার সমতুল্য ও সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাকে নির্দেশনা দিয়েছেন। তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য নবী ও রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। তারা মানুষকে তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকে মনোযোগী করেন এবং পরবর্তী সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য এই আকীদা থেকেই সুসমন্বিতভাবে উৎসারিত হয়ে থাকে। তাতে কোনো বক্রতা ও বিচ্যুতি নেই। মানুষের সাধ্যমতো এগুলো পালন করা কর্তব্য। রসূল (স.) বলেন, 'আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ দেই, তখন তোমরা যতোটা পারো তা কার্যকরী করো আর যা নিষেধ করি, তা বর্জন করো' (বোখারী ও মুসলিম)

যখন কোনো উপয়ান্তর না থাকে, তখন নিষিদ্ধ কাজও করা যায়। সূরা আনয়ামের ১১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'কেবলমাত্র সেই নিষিদ্ধ কাজটি করতে পারো, যা না করে তোমাদের উপায় থাকে না।' এই প্রশস্ত সীমানার মধ্যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমিত থাকে।

এ জন্য রসূল (স.)-এর মেযাজ ও স্বভাব রেসালাতের স্বভাব প্রকৃতির সাথে এবং প্রত্যেক দাওয়াতকারীর স্বভাব ও মেযাজ দাওয়াতের স্বভাব প্রকৃতির সাথে এই মৌলিক বৈশিষ্টে একীভূত থাকে। অর্থাৎ রসূল (স.) যেমন সরলতা ও উদারতা পছন্দ করেন, রেসালাতও তেমনি উদারতা ও সরলতায় পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে যে উম্মাতের কাছে এই উদারপন্থী ও সরলমতি রসূল স্বীয় উদার ও সরল সহজ রেসালাত নিয়ে এসেছিলেন, তারা মধ্যমপন্থী উম্মত। চরমপন্থী বা উগ্রপন্থী নয়। এ উম্মত আল্লাহর অনুগ্রহভাজন ও উদারপন্থী উম্মত। এ উম্মাতের জন্মগত স্বভাব গোটা সৃষ্টি জগতের প্রকৃতি ও স্বভাবের অনুরূপ ও অনুকূল।

আর এই বিশ্বজগত নিজের সুসমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ তৎপরতার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতার ঔদার্য ও সমন্বয়কে প্রতিফলিত করে। এই ঔদার্য ও সমন্বয়ে কোনো সংঘাত বা প্রতিকূলতার মিশ্রণ নেই। কোটি কোটি জড়পিন্ড আল্লাহর অথৈ মহাশূন্যে সাঁতার কেটে চলেছে এবং নিজেদের কক্ষপথে স্বাধীনভাবে ঘুরে চলেছে। এদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সাযুজ্য, সহযোগিতাই শুধু বিরাজ করে না, বরং একে অপরকে আকৃষ্ট করেও রাখে। এদের ভেতরে কখনো সংঘর্ষ বাঁধে না এবং বিশৃংখলা বা নৈরাজ্য দেখা দেয় না। কোটি কোটি প্রাণী এর ভেতর সুশৃংখল ও স্থিতিশীল ব্যবস্থাধীনে নিজ নিজ নিকটবর্তী বা দূরবর্তী লক্ষ্যের দিকে ধাবমান থেকে জীবন অতিবাহিত করছে। এদের সকলকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য যাতে সহজে ও স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলে নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে ধাবমান। এই মহাবিশ্বে কোটি কোটি ঘটনা, অবস্থা ও তৎপরতা একত্রে মিলিত হয় আবার পৃথক হয়। অথচ তা রকমারি বাদ্যযন্ত্রে সজ্জিত বাদকদলের বাজনার সুরের মতো আপন নিয়মে নানা বৈচিত্র নিয়ে বাজতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা একটিমাত্র ঐকতানে বিলীন হয়ে যায়।

বস্তুত সৃষ্টির স্বভাব প্রকৃতি, রেসালাতের স্বভাব প্রকৃতি, রসূলের স্বভাব প্রকৃতি এবং মুসলিম উম্মাতের স্বভাব প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে একই সূত্রে গাঁথা, পরিপূর্ণ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। কেননা এগুলো তো একই প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞানী স্রষ্টা আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং এই ঐক্য ও সমন্বয় নিতান্তই স্বাভাবিক।

দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব

অতএব, 'আমি তোমাদের পড়িয়ে দেবো অতপর তুমি তা ভুলে যাবে না, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, যা আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করেন। অতপর তার জন্য সহজ সরল পথে চলাকে সহজ করে দিয়েছেন, যাতে তিনি এত বড় আমানতকে বহন করতে ও তা নিয়ে দাঁড়াতে পারেন। যাতে তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন যে, এ জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ জন্যই তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। 'অতএব, যখনই স্মরণ করানোর সুযোগ পাও, স্মরণ করাও'। যখনই মানুষের মনে কথা প্রবেশের সুযোগ ও ফাঁক সৃষ্টি হয়, অমনি তাকে উপদেশ দাও। যখনই প্রচারের কোনো মাধ্যম পাও, অমনি প্রচার করো 'যদি তাতে উপকার হয়।' বস্তুত স্মরণ করানো দ্বারা সব সময়ই মানুষের উপকার হয়। এ দ্বারা উপকৃত মানুষের সংখ্যা কমই হোক বা বেশীই হোক, কখনো শূন্যের কোঠায় নামে না। মানুষের কোনো প্রজন্ম এবং পৃথিবীর কোনো ভূখন্ড আল্লাহর বাণীকে শ্রবণ করা ও তা থেকে উপকৃত হওয়া মানুষ থেকে একেবারে বঞ্চিত কখনো হবে না-তা মানুষ যতোই বিনষ্ট ও বিভ্রান্ত হোক, যতোই পাষাণ হৃদয় হোক এবং তার হৃদয়ে যতোই মরিচা ধরে আচ্ছন্ন হয়ে যাক।

কোরআনের আয়াতের এই ধারাবাহিকতা নিয়ে যখন চিন্তা করি, তখন বুঝতে পারি আল্লাহর এই আমানত এবং নবুওতের এই দায়িত্ব কতো গুরুত্বপূর্ণ ও কতো বড়ো। কারণ, এ দায়িত্ব বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বলেই তাকে সহজ করে দেয়ার এতো ব্যবস্থা করা ও আশ্বাস দেয়া হয়েছে। রসূলকে তা পড়িয়ে দেয়া ও মুখস্থ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং গ্রহণ করে তাঁর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, যাতে রসূল (স.) স্মরণ করানোর দায়িত্ব বহন করতে পারেন। এ কারণেই তাকে এতো বিপুল ও বিরাট সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে।

অতপর যখন রসূল (স.) এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন, তখন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন হবে এবং তারপর দুনিয়ার মানুষ নিজেদের কাজ-কারবারের জন্য নিজেরাই দায়ী হবে। মানুষ বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী হবে, বিভিন্ন রকমের পরিণাম ও ফলাফল ভোগ করবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে যেমন আচরণ করতে চান করবেন তবে সেটা এই স্মরণিকা তথা কোরআনের দাওয়াতকে তারা গ্রহণ করে কিনা, তার ওপর নির্ভরশীল হবে। এ কথাই পরবর্তী আয়াত কয়টিতে বলা হয়েছে যে, 'এই স্মরণিকা থেকে সেই উপদেশ গ্রহণ করবে যে খোদাভীরু, আর এ স্মরণিকাকে সে-ই এড়িয়ে চলবে যে হবে সবচেয়ে হতভাগা, যে আগুনে প্রবেশ করবে, অতপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে পবিত্র হবে এবং আপন প্রতিপালকের নাম উচ্চারণ করবে ও নামায পড়বে।'

অর্থাৎ তোমার কাজ স্মরণ করানো সে কাজ তুমি করে যাও। তবে এ দ্বারা কেবল খোদাভীরু লোকই উপকৃত হবে, উপকৃত হবে সেই ব্যক্তি, যার হৃদয়ে আল্লাহর আযাব ও গযবের ভয় বিদ্যমান। জীবন্ত ও প্রাণবন্ত মন সতর্ক থাকে এবং ভয়ও পায়। কেননা সে জানে যে, এ বিশ্বজগতের একজন ইলাহ রয়েছেন, যিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। যিনি পরিকল্পনা করেছেন ও ভাগ্য নির্ণয় করেছেন, অতপর পথনির্দেশ দিয়েছেন কাজেই তিনি মানুষকে বিনা পথ প্রদর্শনে ছেড়ে দিতে পারেন না। তাদেরকে উদ্দেশ্যহীন ছেড়ে দিতে পারেন না। কেননা, তিনি তো তাদের ভালোমন্দের হিসাব না নিয়ে ছাড়বেন না, ন্যায়বিচার না করে

ছাড়বেন না। এ জন্যই সে ভয় পায়। তাই তাকে যখন স্মরণ করানো হয়, তখন সে স্মরণ করে, যখন তাকে দেখানো হয়, তখন সে দেখে এবং যখন তাকে সদুপদেশ দেয়া হয়, তখন সে তা গ্রহণ করে।

দ্বীন গ্রহণ না করার কারণ

'হতভাগা ব্যক্তি এই স্মরণিকাকে এড়িয়ে চলে' অর্থাৎ উপেক্ষা করে। ফলে তা শ্রবণ করে না এবং উপকৃতও হয় না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় সেই সবচেয়ে বড় হতভাগা প্রমাণিত হয়। এরূপ ব্যক্তি সর্বতোভাবে হতভাগা এবং চরম হতভাগা। পৃথিবীতেও সে হতভাগা। কারণ, তার আত্মা এতো মৃত, এতো নির্জীব এবং এতো মরিচা ধরা যে, প্রাকৃতিক সত্যকে সে অনুভব ও উপলব্ধি করে না। প্রকৃতির অকাট্য সত্য সাক্ষ্যে সে কর্ণপাত করে না এবং এর গভীরে সুপ্ত সংকেতগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয় না। পৃথিবীতে যা আছে তার লোভেই অস্থিরভাবে জীবন কাটায়। এই নগণ্য পার্থিব সম্পদের জন্য খেটে খেটে নাজেহাল হয়। আখেরাতেও সে হয় চরম হতভাগা। কেননা, সেখানে সে সীমাহীন শাস্তি ভোগ করবে। 'সে বৃহত্তম আগুনে প্রবেশ করবে, অতপর সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না।'

বৃহত্তম আগুন হচ্ছে জাহান্নামের আগুন। বৃহত্তম তার তীব্রতায়, বৃহত্তম তার দীর্ঘস্থায়িত্বে এবং বৃহত্তম তার বিশাল আয়তনে। এই হতভাগার জীবনকাল সেখানে অনন্তকাল স্থায়ী হবে। 'সেখানে মরবেও না' যে মরে গিয়ে বিশ্রামের সুযোগ ভোগ করবে, আবার 'সেখানে তারা বাঁচবেও না' অর্থাৎ শান্তিতে বাঁচবে না। সে আযাব হবে চিরস্থায়ী আযাব। এ আযাবে যে ভুগবে সে মৃত্যুর জন্যে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করবে। অনুরূপভাবে সে বৃহত্তম আশা পূরণের জন্যও অপেক্ষা করবে।

পরবর্তী আয়াতে আমরা দেখতে পাই মুক্তি ও সাফল্য পবিত্রতা ও শিক্ষা গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়। 'যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করলো এবং নিজের প্রতিপালকের নাম স্মরণ করলো ও নামায পড়লো সে সফলকাম।'

'পবিত্রতা অর্জন' বলতে সকল ধরনের নাপাকি ও নোংরামি থেকে অব্যাহতি লাভ বুঝায়। আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, এই পবিত্রতা অর্জনকারী এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে হৃদয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ অংকনকারী ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করবে। এখানে 'সালাত' শব্দের অর্থ বিনয় প্রকাশ করাও হতে পারে, আবার পারিভাষিক অর্থে নামাযও হতে পারে। বস্তুত আল্লাহর স্মরণ, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় অন্তরে জাগরূক করা এবং হৃদয়ে তাঁর ভয়াল রূপ অনুধাবন করার মাধ্যমে উক্ত উভয় রকমের 'সালাত'-এর প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এভাবে পবিত্রতা অর্জন, স্মরণ ও সালাত আদায় সুনিশ্চিত মুক্তি অর্জনের সহায়ক। এ মুক্তি দুনিয়াতেও অর্জিত হয় আল্লাহ নৈকট্য লাভের মাধ্যমে, অন্তরের সজীবতা লাভের মাধ্যমে, আল্লাহর স্মরণে স্বাদ পাওয়া ও আল্লাহর স্মরণকে স্বতস্ফূর্তভাবে ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি অন্তরের আকর্ষণ বোধের মাধ্যমে। এ মুক্তি বৃহত্তম ও ভয়ালতম আগুন থেকে অব্যাহতি এবং বেহেশতের নেয়ামত ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের মাধ্যমে আখেরাতেও অর্জিত হবে।

সর্বাধিক হতভাগা ব্যক্তির ভাগ্যে জোটা ভয়াবহতম ও বিশালতম আগুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীর জন্য মুক্তি ও সাফল্যের এই দৃশ্য অংকনের পর আল্লাহ তায়ালা শ্রোতাদেরকে পুনরায়

সম্বোধন করে দুর্ভাগ্যের কারণ, তাদের গাফলতির উৎস, তাদের পবিত্রতা, স্মরণ ও মুক্তির পথ থেকে বিচ্যুতকারী এবং বৃহত্তম আগুনে ও নিকৃষ্টতম দুর্ভাগ্যে নিক্ষেপকারী উপকরণগুলো চিহ্নিত করছেন, 'বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো, অথচ আখেরাতই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।'

বস্তুত দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়াই হলো সকল আপদের মূল। এই অগ্রাধিকার থেকে উৎপত্তি হয় কোরআনকে উপেক্ষা করার মনোভাব। কেননা, এই কোরআন মানুষকে আখেরাতের হিসাব নিকাশকে অগ্রাধিকার দেয়ার দাবী জানায়। অথচ তারা দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয় এবং দুনিয়াকেই কামনা করে। দুনিয়াকে দুনিয়া নামে নামকরণ কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। এর শাব্দিক অর্থ যেমন নিচু ও নিকৃষ্ট, আসলেও তা তাই। দুনিয়ার আর এক অর্থ ত্বরিত সংঘটিত। 'আখেরাত শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।' অর্থাৎ আখেরাতের জীবন মানের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং মেয়াদের দিক দিয়ে চিরস্থায়ী।

বস্তুত এই বাস্তবতার আলোকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দান বোকামি এবং নিকৃষ্ট মূল্যায়ন। কোনো বুদ্ধিমান দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোক এমন কাজ করতে পারে না।

পরিশেষে এ দাওয়াতের প্রাচীনত্ব এর উৎসের আভিজাত্য, এর কালোত্তীর্ণ ও শাশ্বত মৌলিকত্ব এবং স্থান ও কালের ব্যবধান সত্তেও এর মূলের একত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'নিশ্চয়ই এ বক্তব্য পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতেও রয়েছে, ইবরাহীম মূসার গ্রন্থাবলীতে।' অর্থাৎ ইসলামের শাশ্বত ও সুমহান আকীদা সংক্রান্ত যে বক্তব্য এই সূরায় রয়েছে, তা পূর্বতন গ্রন্থাবলীতে এবং ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থাবলীতেও আছে।

সত্য যখন এক, আকীদা আদর্শ ও তত্ত্ব যখন এক, তখন তা স্বতস্ফূর্তভাবেই সাক্ষ্য দেয় যে, তার উৎসও এক এবং মানুষের নিকট রসূল প্রেরণের সিদ্ধান্তও এক। মূলত এ সত্য একই মহাসত্য, অকাট্য সত্য এবং এর উৎসও একই। নতুন নতুন প্রয়োজন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে তার বিস্তারিত রূপ ও খুঁটিনাটি নীতিতে পার্থক্য থাকে। কিন্তু তা সেই একই মূলে গিয়ে মিলিত এবং একই উৎস থেকে নির্গত হয়। সে উৎস হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম প্রভু যিনি সৃষ্টিকর্তা, ভারসাম্যদানকারী, পথনির্দেশদানকারী ও ভাগ্য নিরূপণকারী ও পরিকল্পনাকারী।

সূরা আল গাশিয়া

আয়াত ২৬ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ

ضَرِيْعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨ لِّسَعْيِهَا

رَاضِيَةٌ ۝٩ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝١١ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٣ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٤ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝١٥

وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٦ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧

وَاِلَى السَّمَاۤءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٨ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. তোমার কাছে কি (অপ্রতিরোধ্য ও চতুর্দিক) আচ্ছন্নকারী (বিপদের) কথা পৌঁছেছে? ২. (সে বিপদে) কিছু লোকের চেহারা হবে নিম্নগামী, ৩. (হবে) ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, ৪. তারা (সেদিন) ঝলসে যাওয়া আগুনে প্রবেশ করবে, ৫. ফুটন্ত পানির (কুয়া) থেকে এদের পানি পান করানো হবে; ৬. খাবার হিসেবে কাঁটাবিশিষ্ট গাছ ছাড়া কিছুই তাদের জন্যে থাকবে না, ৭. এ (খাবার)-টি (যেমন) তাদের পুষ্ট করবে না, তেমনি (তা দ্বারা) তাদের ক্ষুধাও মিটবে না; ৮. (এর পাশাপাশি আবার) কিছু চেহারা থাকবে আনন্দোজ্জ্বল, ৯. তারা (সেদিন) তাদের চেষ্টা সাধনার জন্যে ভীষণ খুশী হবে, ১০. (তারা থাকবে) আলীশান জান্নাতে, ১১. সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শোনবে না; ১২. তাতে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা। ১৩. তাতে থাকবে (সুসজ্জিত) উঁচু উঁচু আসন, ১৪. (সাজানো থাকবে) নানান ধরনের পানপাত্র, ১৫. (আরাম-আয়েশের জন্যে থাকবে) সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ, ১৬. (আরো থাকবে) উৎকৃষ্ট কার্পেটের বিছানা; ১৭. এরা কি উটনীর দিকে তাকিয়ে দেখে না- কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে! ১৮. আকাশের দিকে (দেখে না), কিভাবে তাকে উঁচু করে (ধরে) রাখা হয়েছে! ১৯. পাহাড়গুলোর দিকে (দেখে না), কিভাবে (যমীনের বুকে)

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ
عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ
الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে! ২০. যমীনের দিকে (দেখে না), কিভাবে একে সমতল করে পেতে রাখা হয়েছে! ২১. তুমি তাদের (এ কথাগুলো) স্মরণ করাতে থাকো। (কেননা) তুমি তো শুধু উপদেশদানকারী মাত্র; ২২. তুমি তো তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী (দারোগা) নও, ২৩. সে ব্যক্তির কথা আলাদা যে (এ হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং (যে আল্লাহকে) অস্বীকার করবে, ২৪. আল্লাহ তাকে অবশ্যই বড়ো রকমের শাস্তি দেবেন; ২৫. অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আমার দিকে, ২৬. অতপর তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব (থাকবে সম্পূর্ণত) আমার ওপর।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি অত্যন্ত গভীর ও প্রশান্ত ভাবের উদ্দীপক কতিপয় সুললিত ছন্দায়িত বাণীর সমষ্টি, যা মানুষকে চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে, একই সাথে মনে আশা ও শংকার উদ্রেক করে এবং আখেরাতের হিসাব-নিকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ সূরা মানুষের মনকে দুটো ভয়াবহ ময়দানে নিয়ে যায়। একটা হলো আখেরাত, তার বিশাল জগত এবং তার মর্মস্পর্শী দৃশ্যাবলী। অপরটি হলো, দৃশ্যমান সৃষ্টিজগতের সুবিশাল ময়দান, তার বিভিন্ন সৃষ্টির ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনাবলী। এরপর আখেরাতের হিসাব নিকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। সেই সাথে, আল্লাহর নিরংকুশ আধিপত্য এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার অনিবার্য বাধ্যবাধকতাও স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এই সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য অত্যন্ত প্রভাবশালী, ভাবগম্ভীর কিন্তু কার্যকর ভংগিতে ব্যক্ত করা হয়েছে, প্রশান্ত কিন্তু গুরুগম্ভীর ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

'তোমার কাছে সেই আচ্ছন্নকারী মহাদুর্যোগের বার্তা পৌঁছেছে কি?' সূরাটি এরূপ ভাষায় শুরু হয়েছে এ জন্য যে, এ দ্বারা মানুষের মনকে যেন আল্লাহর দিকে ফেরানো যায় এবং বিশ্ব নিখিলে দৃশ্যমান তাঁর নিদর্শনাবলী, আখেরাতে তাঁর হিসাব গ্রহণ ও সুনিশ্চিত প্রতিফল প্রদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যায়। সূরার শুরুতে একটা জিজ্ঞাসাবোধক পদও রয়েছে। এই জিজ্ঞাসা আসলে ইতিবাচক বক্তব্য দেয়া ও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্যই। এ দ্বারা এই মর্মে সূক্ষ্ম ইংগিতও করা হচ্ছে যে, আখেরাতের ব্যাপারে সাদামাঠাভাবে ইতিবাচক বক্তব্য দেয়া ও স্মৃতিচারণ করা ইতিপূর্বে বহুবার হয়েছে। এখানে কেয়ামতের একটা নতুন নামও দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে 'আল্

গাশিয়া'। অর্থাৎ সেই মহাবিপদ, যা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং তার ভয়ংকর মূর্তি ও বিভীষিকাময় দৃশ্য মানুষের হৃদয় মনকে হতবুদ্ধি করে ফেলবে। আমপারায় কেয়ামতের আরো কয়েকটি নাম এসেছে। যথা 'আত্ তা'ম্মা', 'আস্সা'খখাহ', 'আল গাশিয়া' ও 'আল কারিয়াহ'। এগুলো সবই এই পারার বক্তব্যের গতিপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাফসীর

যেহেতু আল্লাহর সম্বোধন সম্পর্কে রসূল (স.)-এর মন অত্যন্ত তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন ছিলো, সম্বোধনের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য তা প্রস্তুতও ছিলো এবং সম্বোধন শোনামাত্র তিনি উপলব্ধি করতেন যে, তা সরাসরি তাকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে, তাই এই সূরা শোনার পর তিনি তৎক্ষণাত বুঝতে পেরেছিলেন যে, 'তোমার কাছে কি পৌঁছেছে?' এ সম্বোধনটাও ব্যক্তিগতভাবে তাকেই করা হয়েছে। ইবনে আবি হাতেম বলেন যে, আমাকে আলী বিন মোহাম্মদ তানাফুসী আবু বকর ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে এবং তিনি আমর ইবনে মাইমুন থেকে জানিয়েছেন যে, রসূল (স.) জনৈকা মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ঐ মহিলা পড়ছিলো 'হাল আতাকা..........' অর্থাৎ তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী মহাদুর্যোগের খবর পৌঁছেছে কি?' রসূল (স.) দাঁড়িয়ে তা শুনলেন এবং বললেন, 'হাঁ, আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে।'

এতদসত্তেও এ সম্বোধন প্রত্যেক শ্রোতার প্রতিই উচ্চারিত। 'গাশিয়া' তথা কেয়ামতের বিবরণ কোরআনের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এ দ্বারা সতর্কীকরণ, ভীতি প্রদর্শন ও স্মরণ করানোর কাজ সমাধা করা হয়। এ দ্বারা মানুষের বিবেক জাগ্রত ও খোদাভীতি উদ্দীপিত করা হয়। এ দ্বারা মানুষের মনে আশা ও অপেক্ষমানতার সৃষ্টি করা হয়। এভাবে বিবেক সজীব হয়, নির্জীব ও উদাসীন হয় না।

জাহান্নামের চিত্র

এরপর কেয়ামতের কিছু বিবরণ দেয়া হচ্ছে। 'সেদিন অনেকের মুখমন্ডল হবে ভীতসন্ত্রস্ত, কঠোর শ্রমে বিব্রত, শ্রান্ত, ক্লান্ত, তীব্র আগুনে দগ্ধ। তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত ঝর্ণার পানি। কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো খাদ্য থাকবে না। সেই কাঁটাযুক্ত ঘাস পুষ্টি সাধনও করবে না, ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না।'

এখানে বেহেশতের নেয়ামতের বিবরণ দেয়ার আগে আযাবের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কেননা 'আচ্ছন্নকারী মহাদুর্যোগ' রূপী কেয়ামতের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে এর ঘনিষ্টতম সাদৃশ্য বিরাজমান। কারণ, কেয়ামতের ময়দানে বহু মুখমন্ডল ভীতসন্ত্রস্ত ও শ্রান্ত ক্লান্ত থাকবে। অনেকে অনেক আমলও থাকবে কিন্তু শেরেক অথবা আমল বিনষ্টকারী কোনো পাপের কারণে তা আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয় হবে না, তার পরিণামও সন্তোষজনক হবে না, ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয় ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু জুটবে না। কেবল তার মনোকষ্ট, ক্লান্তি ও অবসাদই বাড়বে। কেননা, সে যা কিছু শ্রম করেছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নয় বরং অন্যান্য স্বার্থ অর্জনের জন্য করেছে। সে যে কষ্ট করেছে, তা আল্লাহর বরং সমাজ রক্ষা সার্থ উদ্ধার বা অন্য কোনো করেছে। যা কিছু পরিশ্রম করেছে, নিজের জন্য, নিজের সন্তানদের জন্য, দুনিয়ার জন্য এবং দুনিয়ার লোভের খাতিরে করেছে। অতপর এই শ্রমের ফল পেয়েছে। পৃথিবীতে পেয়েছে বঞ্চনা ও হতাশা। আর আখেরাতে পেয়েছে আযাব। চরম লাঞ্ছনা, ব্যর্থতা ও হতাশার সাথে সে তার চূড়ান্ত পরিণতির মুখোমুখি হয়েছে। আর এই লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, আযাব ও কষ্টের সাথে সাথে সাথে 'জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হতে হবে।'

'উত্তপ্ত ঝর্ণার পানি তাকে পান করানো হবে।' অর্থাৎ চরম উত্তপ্ত ও উষ্ণ পানি। 'শুষ্ক কাঁটাযুক্ত ঘাস ছাড়া তাদের আর কোনো খাদ্য থাকবে না।' 'দারী' অর্থ কারো কারো মতে দোযখের

একরকম গাছ। জাহান্নামের গহবরে যাক্কুম' নামক এক প্রকার গাছ জন্মাবে বলে কোরআনে যে কথা বলা হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করেই এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীতে উদগত এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ। এ গাছ কাঁচা অবস্থায় উটের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তখন এর নাম হয় 'শাব্‌বাক'। যখন এর ফল পাকে, তখন এর নাম হয় 'দারী'। এ সময় এ গাছ বিষাক্ত হয়ে যায়। তাই উট তা খেতে পারে না। সুতরাং উল্লেখিত দুটি ব্যাখ্যার যেটিই সঠিক হোক, 'গিসলীন' ও 'গাসসাকের' মতো এটিও দোযখের এক ধরনের খাদ্য। এটি সেই সব রকমারি খাদ্যের একটি, যা পুষ্টও করে না, ক্ষুধাও নিবৃত্ত করে না।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দুনিয়ায় বসে আমরা আখেরাতের এই আযাবের প্রকৃতি কি রকম, তা বুঝতে পারবো না। এসব গুণের বর্ণনা দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের মানবীয় অনুভূতিতে যন্ত্রণার যে সর্বোচ্চ পরিমাণ কল্পনা করার অবকাশ রয়েছে, তা যেন কল্পনা করতে সক্ষম হই। এই যন্ত্রণা অপমান, লাঞ্ছনা, দুর্বলতা, ব্যর্থতা, হতাশা, আগুনের দহন, প্রচন্ড উত্তপ্ত পানি দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি ও আগুনের দহন জ্বালা পোড়ানোর চেষ্টা এবং পুষ্টও করে না ক্ষুধাও নিবৃত্ত করে না এমন খাদ্য খাওয়া এই সব কিছুর সমাবেশ। এই সব কয়টি যন্ত্রণার একত্র সমাবেশে আমাদের চিন্তায় সর্বোচ্চ পরিমাণ যন্ত্রণার ধারণা পাওয়া সম্ভব। কেয়ামতের এই আযাবের পর আখেরাতের আযাব এর চেয়েও কঠিন। সে আযাবের প্রকৃতি একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা তা থেকে আমাদের পানাহ দিন। আমীন!

বেহেশতের বর্ণনা

অপরদিকে 'সেদিন অনেকের মুখমন্ডল হবে উৎফুল্ল ও উজ্জ্বল। নিজের চেষ্টা-সাধনার জন্য তারা সন্তুষ্ট হবে। উন্নত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতে থাকবে, কোনো বাজে কথা সেখানে শুনবে না। সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে, তাতে উচ্চ আসনসমূহ থাকবে, পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত থাকবে, হেলান দেয়ার বালিশসমহূ সারিবদ্ধ থাকবে এবং মুল্যবান সুকোমল বিছানা পাতা থাকবে।'

এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, সেখানে কিছু লোকের মুখমন্ডলে প্রাচুর্য ও আনন্দের লক্ষণ পরিস্ফুট হবে, সন্তোষ ও তৃপ্তির আলামত ফুটে উঠবে। সেই সব মুখমন্ডল আপন প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হবে, আপন কৃতকর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। কেননা তারা তাদের কল্যাণময় ফল ভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে তারা নিজেদের আমলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট দেখে পরম আত্মিক তৃপ্তি উপভোগ করবে। সৎ ও কল্যাণকর কাজের প্রতি নিজে পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আস্থা বোধ করা, তার সুফল ভোগ করা, অতপর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নেয়ামতের মধ্য দিয়ে তার ফলাফল বাস্তবে প্রত্যক্ষ করার মতো মনের তৃপ্তিদায়ক অবস্থা আর কিছু হতে পারে না। এ কারণেই কোরআন সৌভাগ্যের এই দিকটিকে–বেহেশতে যে ভোগের প্রাচুর্য ও পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা রয়েছে–তার আগে উল্লেখ করেছে। এরপর বেহেশত ও তাতে সৌভাগ্যবানদের জন্যে যে নেয়ামতসমূহ নির্ধারিত রয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছে, 'তারা উচ্চ বেহেশতে থাকবে।' অর্থাৎ তা অবস্থানগতভাবেও উচ্চ, মান মর্যাদায়ও উচ্চ ও উৎকৃষ্ট। আর উচ্চতার ধারণা মানুষের অনুভূতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

'সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না।' এ বক্তব্য দ্বারা এক ধরনের শান্ত, নিরিবিলি, নিরাপদ, তৃপ্তিকর, শান্তিদায়ক, প্রীতিময়, সন্তোষে পরিপূর্ণ, ক্লেদমুক্ত, ঝামেলা মুক্ত– ও বন্ধুদের নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট বিনোদনের একান্ত পরিবেশের ছবি ফুটে ওঠে। সব রকমের বাজে কথা, অশুভ কথা থেকে সে পরিবেশ মুক্ত। এটাই একমাত্র নেয়ামত, এটাই একমাত্র সুখ ও সৌভাগ্য। ইহকালীন জীবন ও তার আজে বাজে কথা, ঝগড়াঝাটি, হট্টগোল, ভিড়, সংঘর্ষ, চিৎকার,

শোরগোল গোলযোগ, অরাজকতা ইত্যাদি যখন কল্পনা করা হয়, তখন তার পাশাপাশি এই অনাবিল শান্তির প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়। যে নির্ঝঞ্ঝাট প্রশান্তি, স্থায়ী নিরাপত্তা, সন্তোষে পরিপূর্ণ প্রীতি ভালোবাসা এবং বন্ধু পরিবেষ্টিত ছায়া সুশীতল পরিবেশের একটি চিত্র উল্লেখিত আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে অর্থাৎ 'সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না', তা দুনিয়ার অশান্ত পরিবেশের সাথে তুলনা না করলেও উপলব্ধি করা যায়। স্বয়ং এ আয়াতের শব্দগুলোই আত্মার ও দুনিয়ার নিরানন্দ পরিবেশে শান্তির বাতাস বইয়ে দেয় এবং কোমলতা ও মসৃণতার মধ্য দিয়ে তা প্রবহমান থাকে। প্রবহমান থাকে কোমল সুললিত বাজনার সুরের মতো। এ বাক্যটির মর্ম থেকে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব সংঘাতমুক্ত মোমেনদের জীবন বেহেশতী জীবনেরই একটি অংশ। দুনিয়ায় এরূপ দ্বন্দ্ব সংঘাতমুক্ত জীবন-যাপন করে তারা আসলে বেহেশতের সেই নেয়ামতসমৃদ্ধ জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের গুণাবলী থেকে এই মহৎ, মর্যাদাপূর্ণ ও উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরছেন অর্থাৎ সেখানে কোনো বাজে কথা শুনতে হবে না। এরপর আসছে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে তৃপ্তি দিতে সক্ষম নেয়ামতসমূহের বিবরণ। আর এ বিবরণ আসছে এমন ভাষায়, যা দুনিয়ার মানুষ হৃদয়ংগম করতে সক্ষম। অথচ বেহেশত তো বেহেশতবাসীর উন্নত মনমানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, যার প্রকৃত রূপ ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।

সেই বিবরণের প্রথম কথা হলো, 'সেখানে বহমান ঝর্ণা রয়েছে।' বহমান ঝর্ণা বলতে বুঝানো হয়েছে উত্তাল পানির স্রোতবাহী নদী বা খাল। এতে সেচের সাথে বাড়তি রয়েছে প্রবাহ, উচ্ছলতা ও চলমানতার যোগ। প্রবহমান পানি চেতনা ও অনুভূতিতে প্রাণপ্রবাহ ও উচ্ছল আত্মার জোয়ার আনে। চেতনার অতলান্ত গভীরে প্রবিষ্ট এই গোপন দৃষ্টিকোণ থেকে এটি উপভোগ্য বস্তু বটে। 'সেখানে রয়েছে উচ্চ আসনসমূহ।' এই উচ্চতা দ্বারা পবিত্রতার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতাও বুঝায়। 'পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত হবে।' অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে পানের জন্য প্রস্তুত থাকবে, চাওয়ারও প্রয়োজন হবে না, প্রস্তুত করারও প্রয়োজন হবে না। 'হেলান দেয়ার বালিশসমূহ সারিবদ্ধ থাকবে।' 'নামারেক' শব্দের অর্থ আরামে হেলান দেয়ার মতো বালিশ বা গদি। 'মূল্যবান কোমল বিছানা পাতা থাকবে।' 'যারাবী' অর্থ মখমলের বিছানা। 'কার্পেটসমূহ' এখানে সেখানে পাতা থাকবে, তা যেমন আরামদায়ক হবে, তেমনি হবে নয়নাভিরাম।

উল্লেখিত সবকটি জিনিসই এমন নেয়ামত, যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অনেক কিছুই মানুষ পৃথিবীতে দেখতে পায়। এ সব সাদৃশ্যময় জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে তা মানুষের উপলব্ধি ক্ষমতার আত্তাধীন আসে। তবে সেগুলোর প্রকৃতি এবং বেহেশতের আসবাবপত্রের প্রকৃতি কেমন হবে তা নির্ভর করবে সেখানকার অধিবাসীদের অভিরুচির ওপর। যে সৌভাগ্যশালী বেহেশতবাসীকে আল্লাহ তায়ালা এই অভিরুচি দান করবেন, তাদের ওপর।

আখেরাতের আযাব ও নেয়ামতের প্রকৃতি আসলে কেমন হবে, তা নিয়ে সূক্ষ্ম মূল্যায়ন বা গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া নিরর্থক। কেননা, কোনো জিনিসের প্রকৃতি উপলব্ধি করা নির্ভর করে উপলব্ধির ক্ষমতা ও সামর্থক জিনিসটা কি ধরনের, তা জানা ও বুঝার ওপর। পৃথিবীবাসী যে চেতনা ও অনুভূতি দ্বারা কোনো কিছুকে উপলব্ধি করে, সে অনুভূতি এ পৃথিবীর পরিবেশ পরিস্থিতি এবং এখানকার জীবনের প্রকৃতির সীমাবদ্ধতায় বন্দী। তারা যখন আখেরাতের জগতে পৌঁছে যাবে, তখন সকল আবরণ উঠে যাবে, বাধাবিঘ্ন অপসারিত হয়ে যাবে এবং আত্মা ও বোধশক্তি স্বাধীন হবে এবং শুধুমাত্র অভিরুচির পরিবর্তনের কারণে বহু শব্দের এখানে যে অর্থ ছিলো, ওখানে

তা থেকে ভিন্ন অর্থ হবে। আজ আমরা যা বুঝতেই পারি না কেমন করে সংঘটিত হবে, তা সেখানে বাস্তবিকভাবেই সংঘটিত হবে।

এ সমস্ত বিবরণ দেয়ার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, আমাদের বর্তমান কল্পনাশক্তি যে সর্বোচ্চ পরিমাণের স্বাদ, আনন্দ ও সুবিধা কল্পনা করতে সক্ষম, তা যেন কল্পনা করে। যতোদিন আমরা এ পৃথিবীতে আছি, ততোদিন আমাদের আস্বাদন ও উপলব্ধির ক্ষমতা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। এসব নেয়ামতের প্রকৃতি আখেরাতে কি তা আমরা ততোদিন বুঝবো না, যতদিন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর সন্তোষ ও অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য না করবেন এবং আমরা সেগুলো কার্যত উপভোগ করবো।

আল্লাহর অসীম শক্তিমত্তা

আখেরাতের এই বর্ণনা এখানে সমাপ্ত হচ্ছে। এখান থেকে দৃশ্যমান পার্থিব জীবনে প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে। পৃথিবীতে আল্লাহর কতো অসীম শক্তিমত্তা, অনুপম বিচক্ষণতা, চমকপ্রদ সৃষ্টিনৈপুণ্য এবং অতুলনীয় প্রকৃতি বৈচিত্র বিরাজমান, আর এই দৃশ্যমান জীবনের পরে যে আরো একটা জীবন রয়েছে, এই পৃথিবীর অবস্থা থেকে ভিন্ন যে আরো অবস্থা রয়েছে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে যে বিলুপ্তি ঘটে তা যে চরম বিলুপ্তি নয় বরং এরপর আর একটি জীবন আছে, তার নিদর্শন তুলে ধরা হচ্ছে,

'তারা কি উটনীগুলোকে দেখে না কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আকাশমন্ডলকে দেখে না কিভাবে তাকে উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে, পর্বতমালাকে দেখে না যে, তা কিভাবে তাকে যমীনের বুকে পুতে রাখা হয়েছে এবং পৃথিবীকে দেখে না কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে?'

এই চারটি ক্ষুদ্র আয়াত কোরআনের প্রথম শ্রোতা আরব জাতির সাথে সম্পৃক্ত পরিবেশের কতিপয় দিক এবং সমগ্র বিশ্বজগতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিককে একত্রিত করেছে। এগুলো হচ্ছে আকাশ, পৃথিবী, পাহাড় ও উট (সকল প্রাণীর প্রতিনিধি হিসাবে)। উটের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট রয়েছে, তার দেহ সৌষ্ঠবে আরবদের কাছে তার মুল্য ও মর্যাদায় একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট রয়েছে।

এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলো মানুষের কাছে সর্বত্র উন্মুক্ত তা সে যেখানেই থাক না কেন। আকাশ, পৃথিবী, পাহাড় ও প্রাণী সর্বত্র বিদ্যমান। জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতিতে যতোটুকুই দখল মানুষের থাক না কেন, এ কয়টি উপাদান তার জগত ও চেতনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবেই এবং এ জিনিসগুলোর তাৎপর্য নিয়ে যখন সে চিন্তা ভাবনা করবে, তখন এর অন্তরালে কী আছে, তা সে বুঝতে পারবে।

এর প্রত্যেকটিতে অতি প্রাকৃতিক ও অলৌকিক উপাদান নিহিত রয়েছে। এ জিনিসগুলোতে স্রষ্টার কারিগরি নৈপুণ্যের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। এই একটি বিষয়ই প্রাথমিক আকীদার দিকে ইংগিত করার জন্য যথেষ্ট। এ জন্যে কোরআন সমগ্র মানব জাতির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে।

'তারা কি উটনীর দিকে তাকায় না কিভাবে তা সৃজিত হয়েছে? উট আরব জাতির প্রথম ও প্রধান জন্তু। এর মাধ্যমে তারা চলাচল ও মালপত্র বহন করে। এর গোশত খায় ও দুধ পান করে। এর পশম দিয়ে পোশাক ও চামড়া দিয়ে তাঁবু বানায়। কাজেই এটা জীবনের প্রধান ও প্রাথমিক উপাদান। এর এমন কিছু বৈশিষ্টও রয়েছে, যা অন্য কোনো জন্তুর নেই। এতো শক্তিমান ও এতো বিশালাকৃতির জন্তু হওয়া সত্তেও তা এতো বিনয়ী ও অনুগত যে, একটা শিশুও তার লাগাম ধরে টানলে তার পিছু পিছু চলতে থাকে। এতো বিরাট উপকারী ও সেবাদানকারী জন্তু হওয়া সত্তেও তার পেছনে মানুষের অতি সামান্যই ব্যয় হয়, তার খাদ্য ও বিচরণ ক্ষেত্র সহজলভ্য। ক্ষুধায়, পিপাসায়, পরিশ্রমে ও দুর্যোগে এর মতো ধৈর্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু গৃহপালিত জন্তু আর নেই। বিরাজমান প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলাও তার এক অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতা।

এ সমস্ত কারণে কোরআন শ্রোতাদের দৃষ্টি উটনীর সৃষ্টিবৈচিত্রের দিকে আকৃষ্ট করে। এটি তাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এ নিয়ে তাদের কোনো জ্ঞান আহরনের প্রয়োজন নেই। 'তারা উটনীকে দেখে না কিভাবে তা সৃজিত হয়েছে?' অর্থাৎ এর সৃষ্টি ও গঠন প্রক্রিয়া কি দেখে না এবং ভাবে না যে, কিভাবে তাকে তার কর্মের এতো উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার কারণে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনে পুরোপুরি সফল এবং তার পরিবেশ ও করণীয় কাজের সাথে পুরোপুরি সমন্বিত! তারা তো একে সৃষ্টি করেনি। উটনী নিজেও নিজেকে সৃষ্টি করেনি। সুতরাং এটাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তা এক অতুলনীয় নিপুণ কুশলী স্রষ্টার সৃষ্টি। উটনী সেই স্রষ্টার অস্তিত্বেরই সাক্ষী। মহান আল্লাহর পরিকল্পনা ও পরিচালনা দ্বারা যেমন এটা প্রমাণিত হয়, তেমনি এই জন্তুটির সৃষ্টি দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

যে দিকে তাকই শুধু তুমি

'তারা কি আকাশমন্ডলীকে দেখে না যে, কিভাবে তাকে উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে?' আকাশের দিকে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য কোরআন বারবার আহ্বান জানিয়ে থাকে। মরুভূমির অধিবাসীরাই আকাশকে সবচেয়ে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার যোগ্যতা রাখে। কেননা, মরুভূমিতে বসে আকাশ দেখার একটা আলাদা স্বাদ আছে। এখানে আকাশ দেখার একটা আলাদা প্রভাব ও শিক্ষা রয়েছে। আর রয়েছে স্বতন্ত্র রুচিবোধ। এক হিসাবে বলা যেতে পারে যে, মরুভূমি ছাড়া আর কোথাও মনে হয় আকাশ নেই।

দিনের বেলায় আকাশের যে চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য, অপরাহ্নে তার যে চমকপ্রদ, মনোমুগ্ধকর ও মায়াবী রূপ, সূর্যাস্তকালে তার যে অতুলনীয় শোভা, রাত্রিকালে আকাশের যে গুরুগম্ভীর রূপ, তার তারকারাজির যে ঝিকিমিকি ও তার নিস্তব্ধতার যে আলাপচারিতা এবং সূর্যোদয়কালে তার যে অপূর্ব সুন্দর জীবন্ত ও দেদীপ্যমান দৃশ্য, তা কেবল মরুভূমিতেই উপভোগ করা চলে–অন্য কোথাও নয়। 'তারা কি তা দেখে না? কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে' কোনো স্তম্ভ ছাড়া কে তাকে উঠালো? কে তার সর্বত্র অগণিত নক্ষত্র ছড়িয়ে দিলো। কে তাতে এমন সৌন্দর্য, এমন রূপবৈচিত্র এবং এতো শিক্ষণীয় জিনিস রেখে দিলো। নিশ্চয়ই মানুষ তাকে ওপরে তোলেনি, আকাশ নিজেও নিজেকে তোলেনি। সুতরাং তার জন্য অন্য কোনো সৃষ্টিকারী ও উঁচুতে স্থাপনকারী নিশ্চয়ই রয়েছে। এ কথাটা বুঝতে কোনো জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র সাধারণ কান্ডজ্ঞানই যথেষ্ট।

'তারা কি দেখে না পাহাড়কে কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?' একজন সাধারণ আরবের নিকট পাহাড় একটা আশ্রয়স্থল এবং একটা সাথী ও বন্ধু। এর দৃশ্য মানব মনে সাধারণভাবে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে। পাহাড়ের কাছে মানুষ নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ভাবতে থাকে এবং মনোবল হারিয়ে ফেলে। তার গাম্ভীর্য ও বিশালতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পাহাড়ের সান্নিধ্যে থাকাকালে মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়। সেখানে তার মনে হয় পাহাড় আল্লাহর নিকটতর এবং পৃথিবীর হট্টগোল ও সংকীর্ণতার উর্ধে। বস্তুত এটা কোনো নিরর্থক বা কাকতালীয় ব্যাপার ছিলো না যে, রসূল (স.) হেরা ও সূর পর্বতের গুহায় নির্জন বাস করেছিলেন। ক্ষণিকের জন্য যারা আত্মাকে নিঝুম নিরিবিলি পরিবেশে নিয়ে যেতে চায় তারা পাহাড়ে যাবে এটা মোটেই বিচিত্র কিছু নয়। পাহাড়কে কিভাবে স্থাপন করা হলো? দৃশ্যটির স্বভাব প্রকৃতির সাথে এ প্রশ্নই অধিকতর মানানসই হয়েছে।

'আর যমীনকে কি তারা দেখে না তা কিভাবে বিছানো হয়েছে।'

দৃশ্যত, পৃথিবী বিছানো রয়েছে। বসবাস, চলাচল ও কাজকর্মের জন্য তাকে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এটিকে মানুষ বিছায়নি। কারণ মানুষের আগমনের অনেক আগে থেকেই তা বিছানো

রয়েছে। তাহলে তারা কি তা দেখে না এবং এর উর্ধে কী থাকতে পারে তা ভেবে দেখে না? তাদের মনে কি প্রশ্ন জাগে না যে, এই পৃথিবীকে কে বিছালো? কে তাকে বসবাসের ও জীবন ধারণের উপযুক্ত বানালো?

নিসন্দেহে এ সব দৃশ্য মানুষকে অনেক কিছু ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে দৃষ্টি দিলে এবং একটু সুস্থ মন নিয়ে ভাবলেই তা বিবেক ও প্রজ্ঞাকে জাগানোর জন্য যথেষ্ট হতে পারে। এটা স্রষ্টার দিকে মানবাত্মাকে পরিচালিত করে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি অংকনের যে সুন্দর সমন্বয় এখানে পরিস্ফুট হয়েছে, তার কাছে ক্ষণিকের জন্যে আমরা একটু থামবো। আমরা দেখবো, শৈল্পিক সৌন্দর্যের ভাষা দিয়ে কোরআন কিভাবে ধর্মীয় অনুভূতিকে আবেদন জানায় এবং কিভাবে কোরআন ও ধর্মীয় অনুভূতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধিকারী মোমেনের অন্তরে মিলিত হয়।

সুউচ্চ আকাশ ও বিছানো যমীনের দৃশ্য সামগ্রিক প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এই সুদূরপ্রসারী পটভূমিতে আবির্ভূত হয় 'সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত' পাহাড়। তাতে কেউ নোংগরও দেয়নি বা কেউ ফেলেও দেয়নি। দৃঢ়ভাবে ঘাড়ের হাড় স্থাপিত উটও আবির্ভূত হয় একই প্রেক্ষাপটে। সুপ্রশস্ত প্রকৃতির প্রান্তরে যে ভয়ংকর দৃশ্য বিদ্যমান, তাতে এ দুটো কেন্দ্রীয় রেখা ও সমান্তরাল রেখা। তবে সে প্রান্তর একটা সুসমন্বিত মানানসই আকৃতির একটা পাত বিশেষ, যাতে কোরআনের পথের অনুসরণে দৃশ্যসমূহের ছবি প্রদর্শিত হয় এবং মোটামুটিভাবে ছবির মাধ্যমে বক্তব্য তুলে ধরা হয়। ('আত্ তাসওয়ীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

দাওয়াত পৌঁছে দেয়াই শুধু দায়ীর কর্তব্য

প্রথমে আখেরাতের বিবরণ এবং পরে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ দেয়ার পর এবার রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তাঁকে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং শ্রোতাদের মনে সাড়া জাগানোর সর্বশেষ পরশ বুলানো হয়েছে।

'অতএব তুমি স্মরণ করিয়ে দাও, তুমি তো কেবল স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তুমি তাদের ওপর বলপ্রয়োগকারী নও। তবে যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করবে ও কুফরী করবে, তার কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ তায়ালা তাকে সবচেয়ে বড় শাস্তি দেবেন। আমার দিকেই তাদের ফিরে আসতে হবে। অতপর তাদের হিসাব নেয়া আমারই দায়িত্ব।'

অর্থাৎ তাদেরকে আখেরাত ও তার অন্তর্ভুক্ত সবকিছু স্মরণ করিয়ে দাও এবং বিশ্ব প্রকৃতি ও তার ভেতরে যা যা আছে তাও তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও। তোমার কাজ তো কেবল স্মরণ করানো। এটাই তোমার একমাত্র দায়িত্ব। এই দাওয়াতে ও আন্দোলনে এটাই তোমার ভূমিকা, এর অতিরিক্ত কিছু করা তোমার দায়িত্বও নয়, তোমার পক্ষে সম্ভবও নয়। তোমার কর্তব্য শুধু স্মরণ করানো। একাজই তোমার ওপর অর্পিত এবং শুধু এজন্যই তুমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

'তুমি তাদের ওপর বলপ্রয়োগকারী নও।' কেননা তাদের মনের ওপর তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই যে, তাকে ঈমান আনতে বাধ্য করবে। হৃদয় আল্লাহর মুঠোর মধ্যে। তার ওপর মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই।

অবশ্য পরবর্তীকালে যে জেহাদ ফরয করা হয়েছিলো, তা মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করার জন্য ছিলো না। ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর পথে যে বাধাবিঘ্ন ছিলো, তা দূর করাই ছিলো জেহাদের উদ্দেশ্য। কেউ যেন তাদেরকে এই দাওয়াত শোনা থেকে বিরত রাখতে না পারে এবং যখন শুনবে ও ঈমান আনবে, তখন কেউ যেন তাদেরকে জবরদস্তিমূলক তা থেকে ফেরাতে না পারে। স্মরণ করানোর পথ থেকে বাধা অপসারণের জন্যই জেহাদের আদেশ দেয়া হয়েছিলো। এই স্মরণ করানোই রসূলের পক্ষে সম্ভবপর একমাত্র কাজ।

স্মরণ করানো ও প্রচার করা ছাড়া যে ইসলামের জন্য রসূলের আর কিছুই করার নেই, সে কথা কোরআনে বারবার বলা হয়েছে। এ কথা বারবার বলার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত প্রচারের পর দাওয়াতের ব্যাপারে আর কোনো চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ থেকে রসূলের স্নায়ুকে মুক্তি ও অব্যাহতি দান। এরপর সবকিছু আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করতে হবে, তিনি যা ইচ্ছা করবেন। কল্যাণের আহবান এবং এর সাথে সকল মানুষকে জড়িত করার চেষ্টা সাফল্যের জন্য মানুষের আগ্রহের বাড়াবাড়ি ও ব্যাকুলতা অনেক প্রচারকের মধ্যেই থাকে। এটা একটা মারাত্মক ব্যাকুলতা। এ ব্যাপারে বারবার ওহী নাযিল করে ইসলামের আহ্বায়ককে সতর্ক করার প্রয়োজন ছিলো, যাতে তিনি এই উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা থেকে মুক্ত হয়ে এবং ফলাফলের ব্যাপারে চিন্তিত না হয়ে দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখতে পারেন। কাজেই কে ঈমান আনলো আর কে কুফরী করলো তা নিয়ে তার ভাবার দরকার নেই এবং দাওয়াতের পরিস্থিতি ও পরিবেশ যখন খারাপ হয়, তখন মনকে ভারাক্রান্ত করারও তার প্রয়োজন নেই। দাওয়াতকে গ্রহণের হার যতোই হ্রাস পাক এবং বিরোধিতা ও শত্রুতা যতোই বৃদ্ধি পাক, তাতে কিছুই আসে-যায় না।

রসূল (স.) যে আল্লাহর দ্বীনের বিজয় কামনায় অতিমাত্রায় আগ্রহী ও ব্যাকুল ছিলেন এবং এ দ্বীন অত্যন্ত জনকল্যাণমূলক হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষকে এর কল্যাণের অংশীদার করার জন্য অতিমাত্রায় উদগ্রীব ছিলেন, রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে এসব নির্দেশের পুনরাবৃত্তিই তার প্রমাণ। কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরিভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর সীমা ও শক্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানসম্পন্ন। এ জন্য কোনো কোনো সময় এরূপ বারংবার উপদেশ দিয়ে এই মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ ও উদ্বেগের প্রতিকার করার প্রয়োজন ছিলো।

কিন্তু এটা যদি রসূল (স.)-এর সাধ্যাতীত হয়েও থাকে, তবুও ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে না। দাওয়াতকে অস্বীকারকারীরা অব্যাহতি পেতে পারে না। তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই রয়েছেন এবং সব কিছুই চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর দিকে আবর্তিত হয়ে থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেছেন,

'তবে যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করবে ও কুফরী করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সবচেয়ে বড় আযাব দেবেন।

এই কাফেরদেরকে আল্লাহর কাছে না গিয়ে উপায় নেই এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের কর্মফল না দিয়ে ছাড়বেন না। এটাই এ সুরার সর্বশেষ অকাট্য বক্তব্য।

'নিশ্চয় আমার কাছে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে, অতপর তাদের হিসাব নেয়া আমারই দায়িত্ব।'

এভাবেই রসূলের ভূমিকা ইসলামী দাওয়াত দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। রসূলের পরবর্তী যে কোনো আহবায়কের অবস্থাও তদ্রূপ। তুমি শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়ার কাজে নিয়োজিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরপরে তাদের হিসাব নেয়া আল্লাহর দায়িত্ব। সে হিসাব ও জবাবদিহিতা থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই। আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া থেকে তাদের অব্যাহতি নেই। তবে এ কথা হৃদয়ংগম করা কর্তব্য যে, দাওয়াতকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রতিবন্ধকতা অপসারণও 'স্মরণ করানো'র কাজের আওতাভুক্ত। এই প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা স্মরণ করানোর কাজটিকে পূর্ণতা দানের জন্যই জরুরী। এটাই হচ্ছে জেহাদের কাজ। কোরআন ও রসূল (স.)-এর জীবনী থেকে জেহাদের শিক্ষা আমরা এ রকমই বুঝতে পারি। এতে কোনো উদাসীনতারও অবকাশ নেই, বাড়াবাড়িরও নয়।

সূরা আল ফজর

আয়াত ৩০ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ
فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ اِرَمَ
ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ
جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي
الْبِلَادِ ۝١١ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣
اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ
وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۝١٥ وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে– হা

১. ভোরের শপথ, ২. শপথ দশটি (বিশেষ) রাতের, ৩. শপথ জোড় (সৃষ্টি)-এর ও বিজোড় (স্রষ্টা)-এর, ৪. শপথ রাতের যখন তা সহজে বিদায় নিতে থাকে,৫. এর মধ্যে কি বিবেকবান লোকদের জন্যে শপথ রাখা হয়েছে? ৬. তুমি কি দেখোনি, তোমার মালিক আ'দ (জাতি)-এর লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? ৭. 'এরাম' গোত্র (ছিলো) উঁচু স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী, ৮. (জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে) জনপদে তাদের মতো কাউকেই (এর আগে) সৃষ্টি করা হয়নি, ৯. (উন্নত) ছিলো সামুদ, তারা (পাহাড়ের উপত্যকায়) পাথর কেটে (সুরম্য) অট্টালিকা বানাতো, ১০. (অত্যাচারী) ফেরাউন, যে কীলক গেঁথে (শাস্তি) প্রদানকারী (যালেম) ছিলো, ১১. যারা দেশে দেশে (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ করেছে, ১২. তারা তাতে বেশী মাত্রায় (বিপর্যয় ও) অশান্তি সৃষ্টি করেছে, ১৩. অবশেষে তোমার প্রতিপালক তাদের ওপর আযাবের কোড়ার কষাঘাত হানলেন, ১৪. তোমার মালিক এদের ধরার জন্যে ওঁৎ পেতে রয়েছেন; ১৫. মানুষরা এমন যে, যখন তার মালিক তাকে নেয়ামত (অর্থ সম্পদ) ও সম্মান দিয়ে পরীক্ষা করেন তখন সে বলে, হাঁ, আমার মালিক আমাকে সম্মানিত করেছেন; ১৬. আবার যখন তিনি (ভিন্নভাবে) তাকে

فَيَقُولُ رَبِّىٓ اَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى
طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا
جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾
يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَّلَا
يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِىْٓ اِلٰى
رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ﴿٣٠﴾

পরীক্ষা করেন (এবং এক পর্যায়ে) তার রেযেক সংকুচিত করে দেন, তখন সে (নাখোশ হয়ে) বলে, আমার মালিক আমাকে অপমান করেছেন, ১৭. কখনো নয় (সত্যি কথা হচ্ছে), তোমরা এতীমদের সম্মান করো না, ১৮. মেসকীনদের খাওয়ানোর জন্যে তোমরা একে অপরকে উৎসাহ দাও না, ১৯. তোমরা মৃত ব্যক্তির (রেখে যাওয়া) ধন-সম্পদ নিজেরাই সব কুক্ষিগত করো, ২০. বৈষয়িক ধন-সম্পদ তোমরা গভীরভাবে ভালোবাসো; ২১. কখনো নয়, তেমনটি কখনোই উচিত নয় (স্মরণ করো), যেদিন এ (সাজানো) পৃথিবীটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, ২২. সেদিন তোমার মালিক স্বয়ং আবির্ভূত হবেন, আর ফেরেশতারা সব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, ২৩. সেদিন জাহান্নামকে (সামনে) নিয়ে আসা হবে, যেদিন প্রতিটি মানুষই (তার পরিণাম) বুঝতে পারবে, কিন্তু (তখন) এ বোধোদয় তার কী কাজে লাগবে? ২৪. সেদিন এ (হতভাগ্য) ব্যক্তিরা বলবে, কতো ভালো হতো যদি (আজকের) এ জীবনের জন্যে (কিছুটা ভালো কাজ) আগে ভাগেই পাঠিয়ে দিতাম, ২৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা (এ বিদ্রোহীদের) এমন শাস্তি দেবেন যা অন্য কেউ দিতে পারবে না, ২৬. এবং তাঁর বাঁধনের মতো বাঁধনেও কেউ (পাপীদের) বাঁধতে পারবে না; ২৭. (নেককার বান্দাদের বলা হবে,) হে প্রশান্ত আত্মা, ২৮. তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্টচিত্তে ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে, ২৯. অতপর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও, ৩০. (আর) আমার (অনন্ত) জান্নাতে প্রবেশ করো।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরাটি আমপারার অন্যান্য সুরার মতোই এমন এক হৃদয়স্পর্শী সূরা যা মানুষকে ঈমান, তাকওয়া, জাগ্রত হওয়া ও প্রকৃতির সবকিছু সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার আহ্বান জানায়। শুধু তাই নয় এ সূরার মধ্যে অন্যান্য সূরার তুলনায় বিশেষ আরও একটি দিক রয়েছে এতে অত্যন্ত মনমাতানো ছন্দের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনাবলী তুলে ধরে আলোচ্য বিষয়টাকে এমনভাবে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছে। যে, এ সুরাটি পাঠকের হৃদয়কে সৎকাজের প্রতি দারুণভাবে উৎসাহিত করে।

এখানে এমন কিছু দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে যেগুলোতে একাধারে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এবং মহাশূন্যলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ রহস্যের ইংগিত পাওয়া যায়। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে হয় কিন্তু সেগুলোর মধ্যে যে একই সুরের মুর্ছনা বর্তমান তা সূরাটি একটু খেয়াল করে পড়লেই বুঝা যায়। এরশাদ হচ্ছে– 'কসম প্রথম প্রভাতের, দশটি রাতের কসম, কসম জোড় ও বেজোড়ের, আরও কসম নিশীথ রাতের যখন এ রাত সহজ ও সাবলীল গতিতে অতিক্রান্ত হয়।'

আবার প্রকৃতির মধ্যে এমনও কিছু দৃশ্য ও বিভিন্ন সুরের ঝংকার পাওয়া যায় যেগুলোর পরস্পরের মধ্যে মিল ও বেমিল দুটোই একসাথে আছে বলে মনে হয়। যেমনটি দেখা যায় পরবর্তী আলোচ্য কঠিন ভীতিকর দৃশ্যের মধ্যে। 'কখনো নয়, (এ পৃথিবী যেমন আছে তেমনি থাকবে না, চিন্তা করা দরকার ওই সময়ের কথা) যখন পৃথিবীতে প্রচন্ড আলোড়ন হবে এবং উপর্যপুরী ভীষণ কম্পনে পৃথিবীর সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। সে সময় তোমার রব সবার দৃষ্টির সামনে হাযির হয়ে সবাইকে দেখা দেবেন। আরও আসবে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে।

সেদিন কাছে এগিয়ে আনা হবে জাহান্নামকে। সেই ভয়ংকর জাহান্নামের দৃশ্য দেখে মানুষ অবশ্যই কিছু শিক্ষা নিতে চাইবে। কিন্তু সেদিন কীইবা কাজে লাগবে তার এই ইচ্ছা! বলবে হায়, আফসোস যদি এই দিনের জন্যে আমি জীবদ্দশাতেই কিছু পাথেয় সঞ্চয় করতাম! সে দিন তার আযাব আর কেউ লাঘব করে দেবে না বা দিতে পারবে না এবং যেভাবে অপরাধীদেরকে সেদিন তিনি বেঁধে রাখবেন, সেভাবে আর কেউ কাউবে বাঁধবে না বা বাঁধতে পারবে না। আরও কিছু দৃশ্য থাকবে সেদিন, যা হবে যেমন মনোহর, তেমনি হবে সন্তোষজনক আনন্দদায়ক ও প্রশান্তি আনয়নকারী। এসব দৃশ্যের মধ্যে থাকবে চোখে পড়ার মতো অবিচ্ছেদ্য এক সামঞ্জস্য যা দেখা যায় সূরাটির শেষের আয়াতগুলোতে, 'হে প্রশান্ত অন্তর, ফিরে এসো তোমার রবের কাছে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং খুশিমনে। তারপর দাখিল হয়ে যাও আমার (নেককার) বান্দাদের দলে আর দাখিল হয়ে যাও আমার জান্নাতে।

সূরাটিতে আরও ঐ ভীষণ ধ্বংসলীলার বেশী কিছু ইংগিত পাওয়া যায় যা নেমে এসেছিলো অতীতের অনেক অহংকারী জাতির ওপর। এ ধ্বংসাত্মক অবস্থা কখনও এসেছে মধ্যম ধরনের আবার কখনও এসেছে অতি ভয়ংকর রূপ নিয়ে। এরশাদ হচ্ছে– 'তুমি কি দেখোনি বা শোনোনি কেমন ব্যবহার করেছেন তোমার রব আদ জাতির সাথে? তাদেরই এক গোত্র ছিলো ইরাম, তারা ছিলো বড় বড় স্তম্ভ বিশিষ্ট দালান কোঠার অধিবাসী বিরাটকায় মানুষ। যাদের মতো শক্তিশালী ও সামর্থবান মানুষ দুনিয়ার আর কোথাও কখনও পয়দা করা হয়নি। এবং (দেখোনি কি) সামুদ জাতিকে যারা পাথরের পাহাড় পর্বত কেটে কেটে সেই উপত্যকায় ঘরবাড়ী তৈরি করেছিলো?

আবার তাকাও ফেরাউনের দিকে, যে ছিলো বহু মযবুত খুঁটিওয়ালা তাঁবু নির্মাণকারীদের অধিপতি। ফেরাউনের এই লোকজন সারাদেশের সকল শহর বন্দরে অত্যন্ত সীমালংঘনকারী হিসেবে বিবেচিত হতো। সারা পৃথিবীর মানুষ তাদেরকে চরম অহংকারী ও অত্যাচারী বলে জানতো। সেখানে তারা বহু বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিলো যার ফলে তোমার রব তাদের ওপর আযাবের কশাঘাত (চাবুক) বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার রব সর্বক্ষণ তাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।' এ সূরার মধ্যে এক বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় বেশ কিছু সংখ্যক ওইসব বে-ঈমান লোকের চিন্তা ভাবনা ও তাদের মনগড়া মতবাদের, যারা জীবনের এক বিশেষ মুল্যবোধ গড়ে তুলেছিলো।

এই বিবরণ দিতে গিয়ে এক বিশেষ ভঙ্গিমার অবতারণা করা হয়েছে। দেখুন, বলা হচ্ছে, মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন তার রব তাকে কোনো পরীক্ষায় ফেলেন, তখন তাকে প্রচুর পরিমাণ সম্মান দেন এবং নানা প্রকার সুখ সম্পদও দিয়ে থাকেন। তখন সে বলে ওঠে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তাকে দেয়া সুখ সম্পদ সংকুচিত করে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন, তখন সে বলে ওঠে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন।'

এরপর তাদের ওই ধ্যান-ধারণাকে খন্ডন করে তাদের আসল অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে যা তৎকালীন বিশেষ বিশেষ মনগড়া মতবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিলো। এ প্রসঙ্গে এখানে দু'ধরনের বর্ণনাভংগি ও রং-রসে ভরা আলোচনার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, যা ভেবেছো তা কখনোও নয় বরং তোমরা এতীমকে কোনো মান-মর্যাদা দাও না এবং ছিন্নমূল ব্যক্তিকে খাওয়ানোর ব্যাপারে কোনো চিন্তা ভাবনা নিজেরা করো না এবং অন্য কাউকে করতে উৎসাহ দাও না। আর এতীমদের মীরাসের মাল সম্পদ তোমরা উম্মাদের মতো নির্দয়ভাবে ভক্ষণ করো এবং প্রতিটি সুখ-সম্পদের জিনিসকে গভীরভাবে ভালবাসো।

এখানে দেখা যায়, এই শেষের বর্ণনাভংগিটি এবং তার ছন্দের মধ্যে অবস্থিত চমৎকার সুর ঝংকার তাদের বর্তমান ভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থা ও অনাগত ভবিষ্যতে যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন তাদেরকে হতে হবে এ দুইয়ের মধ্যে যেন এক সেতুবন্ধ নির্মাণ করেছে। এরপর আসছে আর একটি ভয়ংকর দৃশ্যের বর্ণনা। সম্পদের মোহে তারা যতোই ডুবে থাকুক না কেন, কিছুতেই তা চিরদিন থাকবে না। এক সময় উপর্যুপরি আলোড়নে বা ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে সবকিছু। অবশ্য আলোচ্য এ বর্ণনাটি হচ্ছে প্রথমদিকে উল্লেখিত বিবরণ ও শেষোক্ত তিরষ্কারের মধ্যবর্তী এক আলোচনা।

এই উপস্থাপিত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, গোটা সূরাই বিভিন্ন বর্ণাঢ্য বর্ণনায় ভরা এবং এই সূরা এক চমৎকার ভংগিতে অতীতের বিভিন্ন সীমালংঘনকারী জনগোষ্ঠীর শাস্তির অবস্থা তুলে ধরে ভবিষ্যতের মানুষের জন্য এক শিক্ষা উপস্থাপিত করেছে। আর এই প্রয়োজনে একই কথা বারবার বিভিন্ন ভংগিতে তুলে ধরা হয়েছে এবং এ জন্য গভীর অর্থব্যঞ্জক শব্দাবলী প্রয়োগ করা হয়েছে। যার ফলে, পাঠকের মনে আলোচ্য বিষয়ের মর্ম এবং বিভিন্ন দৃশ্যের প্রভাব কার্যকরভাবে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে।

সুতরাং বর্ণনার চাতুর্যের দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে কোরআনে বর্ণীত রূপে রসে ভরা সূরাগুলোর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসাবে গোটা কালামে পাকের মধ্যেও এ সূরাটি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। সর্বোপরি সূরাটির সর্বত্রই এক অতি আকর্ষণীয় সৌন্দর্য বর্তমান রয়েছে, যা যে কোনো পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অবশ্য সূরাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অত্যন্ত সুসামঞ্জস্য এবং এক অনবদ্য ও সুন্দর জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যার আলোচনা বিস্তারিতভাবে নীচে প্রদত্ত হলো।

তাফসীর

'কসম প্রথম প্রভাতের এবং কসম দশটি রাতের, আরো কসম জোড় (সৃষ্টি) ও বে-জোড় (আল্লাহ পাক)-এর আবার রাতেরও কসম যা সহজে অতিবাহিত হয়। বুদ্ধিমান যে কোনো ব্যক্তির জন্য এর মধ্যে কসম খাওয়ার কোনো যুক্তি আছে কি?'

আল্লাহর শপথ বাক্য

এ সূরার শুরুতে প্রাকৃতিক বিভিন্ন দৃশ্য এবং সৃষ্টিলোকের সেই সব জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, মনোরম এবং যার মধ্যে প্রচুর প্রাণ প্রবাহের অস্তিত্ব রয়েছে বলে আমরা অনুভব করি। 'কসম প্রভাতবেলার'। এ এমন একটি মুহূর্ত যখন জীবন যেন শ্বাস ছাড়ে অত্যন্ত কোমল, মধুর এবং ধীর হাসিমাখা গতিতে। এ এমন এক সময় যখন তনুমন সজীব হয়ে যায় এবং আশেপাশের সব কিছু যেন এক মুগ্ধ আবেশে আলিঙ্গন করে। দেহমন পুলকিত হয়ে উঠে যেন অদেখা, অজানা কোনো বন্ধুর মধূর স্পর্শে। যেন মৃদু মন্থর গতিতে সে বলতে থাকে, ওঠো বন্ধু ওঠো, আর কতো ঘুমাবে, এবার উঠে পড়ো।

এই মধুমাখা ডাকে সাড়া দিয়ে জেগে উঠে ধীরে ধীরে প্রকৃতির সবকিছু এবং শ্রদ্ধা জানায় পরম পুলকে মালিকের দরবারে। আর 'দশটি রাতের কসম' কোরআনে পাকে এতটুকু কথা বলেই এ প্রসঙ্গে ইতি টানা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ বলেছেন, এর ইশারা হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের দশটি রাত।

যে যাই-ই বলুন না কেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, এ রাতগুলো অত্যন্ত মোবারক অর্থাৎ রহমত ও বরকতে ভরা। তবে সুনির্দিষ্টভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এগুলো সম্পর্কে ভালো জানেন। একমাত্র তিনিই সেগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে পারেন। নিসন্দেহে এ রাতগুলো তাঁর কাছে বড় মর্যাদাপূর্ণ। এগুলোর বর্ণনাভংগিতে মনে হয় যেন এগুলো ব্যক্তিত্বপূর্ণ কোনো এক জীবন্ত সত্ত্বা। কোরআনের বর্ণনায় আরো যেন মনে হয়, এগুলো আমাদের সাথে নিবিড় এক বন্ধনে আবদ্ধ। আর আমরাও যেন এগুলোর সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আরো কসম (সৃষ্টি সকল) জোড় জিনিসের আর বেজোড় সেই মহান সত্ত্বার যাঁর দ্বিতীয় বলতে আর কেউ নেই।

এ দুটি কথার তাফসীর করতে গিয়ে বলা হয়েছে, বিশ্ব-প্রকৃতির মনোরম বস্তুগুলো ফজরের সময় বিশেষ করে সেই দশটি রাতে আনুগত্য প্রকাশ করে ও ভক্তি প্রদর্শনের মানসে ঝুঁকে পড়ে মহান আল্লাহর সামনে। তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসেও এভাবেই বলা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে এ ব্যাখ্যাটিই সবচে' বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এই দিনক্ষণগুলো এমন সুন্দর যখন এর বিনম্র আত্মাগুলো প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে যায় এবং সে প্রিয় ও পছন্দনীয় রাতগুলো ও শান্ত সমুজ্জ্বল প্রথম প্রভাতের আগমনে নিজেদেরকে করুণাময়ের দরবারে সঁপে দিয়ে কৃতার্থ বোধ করে।

'আবার কসম সেই বিদায়ী রাতের যা (ধীর গতিতে নিজ পথে শান্তভাবে) চলে যায়। এখানে রাত বলতে বুঝানো হয়েছে এমন এক সৃষ্টজীবকে, যা সজীব অবস্থায় বিরাজ করছে এবং যা সৃষ্টিজগতে গতিশীল অবস্থায় বর্তমান এবং তা যেন অন্ধকারের বুকে সদা পরিভ্রমণরত কোনো জীব, অথবা সে যেন দূর দেশের এমন এক মোসাফের যে, বিরামহীন চলতেই ভালবাসে। আহ্ কী চমৎকার এ ব্যাখ্যা! কি সুন্দর মনোরম এ দৃশ্য। কতো মনোমুগ্ধকর এ নেয়ামতগুলো! আর এই বর্ণনা পরম্পরা একটির পর অপরটি, ফজরের সাথে দশটি রাতের কী সুনিবিড় সম্পর্ক এবং জোড় ও বে-জোড়ের সেসব কিছুর কী মধুর যোগসূত্র! সবকিছু মিলে এ যেন এক আনন্দের মেলা।

এগুলো শুধুমাত্র কিছু কথা ও কিছু ব্যাখ্যাই নয়, এগুলো হচ্ছে প্রথম প্রভাতের সুবাসিত নিশ্বাস, যে এমন মধুর সমীরণ যা মনমাতানো অপূর্ব সুরভিতে ভরপুর। এটা কি আন্তরিক বিমুগ্ধকারী এক অতি বড় নেয়ামত, আত্মার প্রশান্তি, মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য বিশ্বব্যাপী আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্যের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী এক যাদুস্পর্শ?

এটা এক মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, প্রভাত বেলার এমন কোমলমধুর প্রাণ মাতানো রূপ যার বর্ণনা কোনো সৌন্দর্যপূজারী বাকপটু কবি আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি বা পারবে না। কারণ এ হচ্ছে প্রকৃতিকে আল্লাহর দেয়া অপরূপ রূপ, যার সাথে অন্য কোনো জিনিসের তুলনা সম্ভব নয় এবং সে সৌন্দর্য নিজেই নিজ বর্ণনায় অনুপম। এই কারণেই এই প্রসঙ্গ শেষ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য এই মনোমুগ্ধকর জিনিসের মধ্যে কসম খাওয়ার কিছু আছে কি? এ দাবী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই আসলে এই জিজ্ঞাসা। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যই আলোচ্য বিষয়ের ওপর কসম খাওয়ার মতো অনেক কারণ আছে—আছে অনেক যুক্তি।

যার তীব্র অনুভূতি শক্তি আছে এবং যার চিন্তা ভাবনা করার মতো অন্তরের যথেষ্ট প্রশস্ততা আছে, তার জন্য এই সুন্দর প্রভাতের কসম খাওয়ার মধ্যে অনেক যুক্তি আছে। তাই জিজ্ঞাসাবোধক কথা বলে দাবীকৃত বিষয়ের যৌক্তিকতাকেই আরো জোরদারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ফিসফিসে এই মধুর বাণী শোনার জন্যে প্রয়োজন অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি, যা বুঝার জন্যে প্রয়োজন বিশেষ মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনা। এভাবে পূর্ববর্তী মধুর আলোচনার সাথে পরবর্তী আলোচনার এক গভীর যোগসূত্র বুঝা যায়।

শপথের মূল বিষয়টি আলোচনা থেকে এখানে বাদ দেয়া হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে অত্যাচার-অনাচার এবং দুর্নীতির যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তাতে মূল আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অহংকারী, সীমালংঘনকারী এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে পাকড়াও করা হবে বলে যেসব কড়া ধমক এসেছে সেই কথাগুলোকেই অতি সুন্দরভাবে বুঝানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা কসম খেয়েছেন বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন জিনিসের।

বলা হচ্ছে, 'তুমি কি দেখোনি তোমার রব আ'দ জাতির মধ্যকার ইরাম গোত্রের কেমন অবস্থা করলেন। ....অবশ্যই তোমার রব তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য ওঁৎপেতে ছিলেন।'

এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য ব্যবহার করে মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্যে এবং সত্যের প্রতি মানুষকে আগ্রহী করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এক কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায়ের প্রথমেই সম্বোধন করা হয়েছে নবী (স.)-কে। তারপর সম্বোধন করা হয়েছে ওই প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে, যারা ওই সকল জাতির কঠিন দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে। ওই সকল লোককেও সম্বোধন করেছেন, যারা নবী (স.)-এর যমানায় বর্তমান ছিলো এবং যারা কোরআনের সম্বোধনের প্রথম লক্ষ্য ছিলো, যারা তাকে সম্যকভাবে জানতো ও চিনতো। এই সম্বোধনের লক্ষ্য ওই সকল অতীতের জনগোষ্ঠীও বটে, যারা কেসসা কাহিনী ও কিংবদন্তীর মাধ্যমে ওই মন্দ লোকদের কঠিন পরিণতির কথা জানতে পেরেছে। নিজ চোখে দেখা বা শোনার যে ক্রিয়াবাচক শব্দটি 'তোমার রব দেখবেন' বলে ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে মোমেন ব্যক্তিও আছে, যার অন্তর নিশ্চিন্ততায় ভরা, মানুষকে ভালোবেসে যারা শান্তি পায় এবং বিশেষভাবে ওই 'তোমার' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে প্রত্যেক ওই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যেও যারা মক্কায় বাস করতো এবং বদমেযাজী অহংকারী লোকদেরকে তাদের সীমালংঘনকর কাজে সাহায্য যোগাতো। উপরন্তু মানুষের ওপর জবরদস্তিকারীদেরকে তাদের যুলুমে সমর্থন দিতো। একদিকে এদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে এদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কড়া দৃষ্টি রেখেছেন।

ইতিহাসের অহংকারী জাতি

আলোচ্য সংক্ষিপ্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে কয়েকটি চরম অহংকারী ও অত্যাচারী জাতির ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। একটি ধ্বংসস্থল হচ্ছে আ'দ জাতির এরাম গোত্রের এলাকা। এরা আ'দ জাতির প্রথম গোত্র। এরা ছিলো প্রাচীন আরবের অধিবাসীদের একটি গোত্র অথবা আরব বেদুইনদের একটি গোত্র। তাদের বাসস্থান ছিলো পবর্তঞ্চলের আঁকাবাঁকা পথের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। যেখানে বালুর স্তুপগুলো বর্তমান–সেই দুর্গম এলাকায়। এ এলাকাটি অবস্থিত হাদরে মওত ও ইয়েমেনের মাঝে দক্ষিণ উপদ্বিপে। এরা ছিলো আরব বেদুঈন এক দুরন্ত যাযাবর। পাহাড় পর্বতের বিস্তীর্ণ এলাকার ফাঁকে ফাঁকে এরা তাঁবু গেড়ে বাস করতো। এগুলোকে স্থির রাখার জন্য এরা খুবই মযবুত খুঁটি ব্যবহার করতো। কোরআনে পাকের মধ্যে এদেরকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও ভীষণ এক দুঃসাহসী জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আ'দ জাতিই তৎকালীন অন্যান্য সকল জাতি থেকে বেশী শক্তিশালী ছিলো। বলা হয়েছে, যাদের মতো শক্তিশালী সারাদেশে (অথবা সকল দেশের মধ্যে) আর কাউকে পয়দা করা হয়নি।

'এবং ঐ সামুদ জাতি যারা উপত্যকার মধ্যে পাথর কেটে কেটে ঘরবাড়ী তৈরী করেছিলো' এই সামুদ জাতি বাস করতো উত্তর উপদ্বীপে অবস্থিত মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায়। এরা পাথর কেটে কেটে বিরাট বিরাট মযবুত অট্টালিকা তৈরী করেছিলো। এমনকি পর্বতের অভ্যন্তরে নিরাপদ এলাকা ও বহু গুহা এরা তৈরী করেছিলো।

'আর ফেরাউন (এর সাথে কি ব্যবহারটাই করেছেন তোমর রব, তাও কি দেখোনি?) সে ছিলো খুঁটি স্থাপন করে তাঁবু প্রতিষ্ঠাকারী! সম্ভবত এ কথা দ্বারা মিসরের ওই সুউচ্চ পিরামিড শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে, যা ওই শক্ত মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে খুঁটির মতো অত্যন্ত মযবুতভাবে আজও প্রতিষ্ঠিত আছে, ফেরাউন নামে প্রাচীন মিশরে যে কোনো বাদশাহকে অভিহিত করা হলেও এখানে ফেরাউন বলতে বুঝানো হয়েছে মুসা (আ.)-এর যামানার মহা অহংকারী ও বিদ্রোহী ফেরাউনকে।

এরাই হচ্ছে সেইসব লোক যারা সারাদেশে বা বিশ্বে সীমালংঘন করেছিলো। যার ফলে তারা ভীষণভাবে সমাজে ও দেশে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিলো। বলা বাহুল্য বিদ্রোহ ও সীমালংঘনকর কাজের পরিণতি অশান্তি ও বিশৃংখলা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিদ্রোহাত্মক কাজ বিদ্রোহীর কবলে পতিত ব্যক্তিদেরকে এবং বিদ্রোহীর সংগী সাথী সবাইকে সমভাবে কষ্ট দেয়। অশান্তিতে ফেলে দেয় গোটা সমাজকে। এমনকি গোটা বিদ্রোহ কবলিত এলাকার মধ্যে চরম বিশৃংখলা ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে।

সে সকল স্থানে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও শান্তিপূর্ণ জীবন সবদিক দিয়ে দুর্বিষহ যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এমনকি সে গঠনমূলক কাজের দাবীদার ও সংস্কারবাদী মনোভাবের ওই মানুষগুলো নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে পৃথিবীতে মানুষ যে আল্লাহর খলীফা তা আর স্বীকৃতি পায় না। এই বিদ্রোহীরা দাবী যাই-ই করুক না কেন, সে তার কুপ্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়। যেহেতু সে কোনো নির্দিষ্ট ও স্থায়ী নীতিতে বিশ্বাসী থাকে না বা কোনো সীমাও মানে না। এর ফলে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়, তার প্রথম শিকার হয় সে নিজেই। সে তখন নিজেকে আর আল্লাহর বান্দা ও প্রতিনিধি মনে করে না। সে কারো অধীনে আছে এবং কারো কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে এ কথাও সে ভুলে যায়। এমনি করেই তো ফেরাউন দাবী করে বসেছিলো. 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ মনিব, প্রতিপালক, শাসনকর্তা।'

এভাবে যখনই মানুষকে তার বিদ্রোহাত্মক মনোভাব বিপথগামী করে, তখন সে নিজেকে আর কারো অসহায় গোলাম বলে ভাবে না এবং সে যে একজন সৃষ্টজীব যার ক্ষয় আছে এবং লয় আছে তা আর মনে করতে পারে না। তার এই মনোবৃত্তি এমন এক অশান্তির বীজ বপন করে, যার বিষফল তাকে এবং তার স্বগোত্রীয় সবাইকে ডুবিয়ে মারে।

এভাবে সাধারণ মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই অহংকারী চান্ডিবব লোকেরা তার দেশের গোটা জনগোষ্ঠীকে দাস বানিয়ে ফেলে এবং এক অবমাননাকর জীবনযাপন করতে বাধ্য করে। সে জাতি তখন এত নির্জীব হয়ে যায় যে, তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও ক্রোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার যে স্বাভাবিক প্রবণতা তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণাবোধও আর সৃষ্টি হয় না। এর ফলে মানুষের আত্মসম্ভ্রমবোধ পর্যন্ত খতম হয়ে যায়। এহেন পরিবেশে সে যে একজন স্বাধীন মানুষ, এ চেতনা এমনভাবে হারিয়ে যায় যে, পুনরায় এ স্বাধীনতা বিকাশের আর কোনো পথ খুঁজে পায় না। এর ফলে সে আত্মপুজারী বা হীন স্বার্থবাদী এবং রোগগ্রস্ত মানসিকতার শিকার হয়। তখন তার দৃষ্টি ও অনুভূতিশক্তি সঠিক গতিপথ হারিয়ে ফেলে এবং সাহস, হিম্মত ও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর কোনো শক্তিই আর তার থাকে না। এই অবলুপ্তিই হচ্ছে চরম অশান্তি যা অন্য সকল অশান্তির ওপরে।

তারপর, সে যে কোনো জিনিসের সুষ্ঠ পরিমাপ করা থেকেও জীবনের মুল্যবোধ ও সঠিক চিন্তাশক্তি প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ এই চিন্তাশক্তিই তো বিদ্রোহী ও বিদ্রোহের জন্য বিপজ্জনক। সুতরাং মেকি ও ভুল পথের নিগড়ে আবদ্ধ থেকে সে জাতির পক্ষে জীবনের মূল্যবোধের সঠিক পরিমাপ করার চেতনা এতদূর মুর্দা হয়ে যায় এবং জগদ্দল পাথরের মতো মিথ্যা ও ভ্রান্ত নীতি এমনভাবে সেই জনগণের বুকের ওপর চেপে বসে যে, তখন সেচ্ছাচারী একনায়কতন্ত্রই তাদের কাছে সহজ, স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্যই শুধু নয়, বরং এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলে তারা মনে করতে শুরুকরে। এটাই হচ্ছে মানবতার চরম গ্লানি এবং চরম অশান্তি। এ অরাজকতা অন্য সকল বিশৃংখলাকে হার মানায়।

এমনিভাবে অহংকারী বিদ্রোহী শ্রেণী যখন গোটা পৃথিবীকে অশান্তিতে ভরে দিলো, তখন পৃথিবীকে ফাসাদ মুক্ত করে মানবতার মুক্তি ঘোষণার প্রয়োজন অবধারিত হয়ে গেলো। ওই সমাজব্যধির একমাত্র চিকিৎসাই ছিলো তখন পূর্ণ সমাজ সংস্কার বা চরম ধোলাই। আর এই কারণেই 'তোমার রব তাদের ওপর বর্ষণ করলেন আযাবের চাবুক, কারণ তোমার রব, তো সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।'

অর্থাৎ তোমার রব তাদের সকল অবস্থার পর্যবেক্ষক হিসেবে সদা সচেতন এবং তাদের সকল কাজই তার নথিতে রেকর্ডভুক্ত বা রেজিষ্ট্রি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তা হারিয়ে বা মুছে যাওয়ার মতো নয়, যেমন করে সরকারী রেজিষ্ট্রি অফিসে কিছু রেজিষ্ট্রি হয়ে গেলে তা আর হারিয়ে যায় না। মানব সরকারের কোনো রেকর্ড খোয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার যে সরকারী দফতর, তার থেকে কোনো কিছু খোয়া যাওয়া সম্ভব নয়, তার কর্মচারীরা অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দিনরাত পূর্ণ আনুগত্য সহকারে কাজ করে যাচ্ছেন। তারপর যখন অশান্তি ও বিশৃংখলা চরমভাবে ছড়িয়ে পড়লো, তখন তাদের ওপর আযাবের চাবুক বর্ষণও বেড়ে গেল। চাবুক শব্দটি ব্যবহার করে আযাবের সর্বগ্রাসী চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেহেতু তরল পদার্থ কারো ওপর দিয়ে ঢেলে দিলে যেমন তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবকিছুতে সে পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি ছিলো ওই চরম অহংকারী জাতির ওপর আসা আযাব। যেহেতু তারা সারাদেশে চরম অশান্তি সৃষ্টি করে রেখে ছিলো। একারণে ওই দুর্নীতিবাজ শাসক ও তাদের তল্পীবাহকদের ওপর ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক আযাব নেমে এলো।

এই ধ্বংসস্তূপের পাশাপাশি আর এক দল লোক মানসিক শান্তি লাভ করে, তারা হচ্ছে মোমেন শ্রেণী। এরা সর্বকালে, সবদেশে বিদ্রোহীদের হাতে নিপীড়িত হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী, 'নিশ্চয়ই তোমার রব ওঁৎ পেতে প্রত্যক্ষ করছেন সবাইকে।' মোমেন ব্যক্তি বিশেষভাবে শান্তি লাভ করে। যেহেতু তোমার রব সেখানে এমনভাবে তার দেখাশুনা করছেন যে, তাঁর নযর থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়ছে না, কোনো কিছু হারিয়েও যাচ্ছে না বা কোনো কিছু গোপনও থাকছে না। এর ফলে মোমেন ব্যক্তি শান্তির নিশ্বাস ছাড়ে, কেননা সে সদা সর্বদা আল্লাহর রহমতের দৃষ্টিতে আছে। অন্যদিকে বিদ্রোহী, অন্যায়কারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের জন্য তিনি গোপন স্থানে থেকে তাদের পাকড়াও করার জন্য ওঁৎ পেতে আছেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই দ্বীনের দাওয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত এক ব্যবস্থা আছে, যার এক ভিন্নধর্মী উদাহরণ এখানে পেশ করা হয়েছে এবং যা সূরা 'বুরূজে' উল্লেখিত আসহাবুল উখদূদ (গর্তবাসীর) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। কোরআন এসব বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ পেশ করে সকল অবস্থা ও পরিবেশে আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার জন্যে মোমেনদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদেরকে এমনভাবে প্রস্তুত করে যেন তারা অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোনো অবস্থায় মনের ভারসাম্য না হারায় এবং প্রশান্ত মনে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে যায়। সর্বোপরি কোরআন মোমেনদেরকে এ প্রেরণা যোগায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভাগ্য লিখন যা রেখেছেন তার বাইরে কোনো কিছু করার মতো কোনো ক্ষমতা বিরোধী কোনো ব্যক্তিরই নেই। অবশ্যই তোমার রব দৃষ্টির অন্তরালে থেকে সবাইকে পর্যবেক্ষণ করছেন, দেখছেন। সময়মতো তিনি সবার হিসাব এমন এক পাল্লায় মেপে নিয়ে সবাইকে পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন যে পাল্লায় কখনও ভুল হয় না।

আল্লাহর পরীক্ষা

কারো ওপর কোনো যুলুম তিনি করবে না। বাহ্যিক রূপ চেহারা দেখে কারো বা কোনো কিছুর বিচার তিনি করবেন না এবং প্রতিটি জিনিসের আসল অবস্থা জেনে সেই অনুযায়ী সবার বিচার করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও পরিমাপ শক্তি তার কাছে না পৌঁছায়, ততক্ষণ মানুষের অবস্থা তো এই থাকে যে, অনেক সময় সে তার ওযনের পাল্লায় ভুল করে এবং প্রায় সময়েই সে বাইরে প্রকাশিত তথ্য ও যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করে। অভ্যন্তরীণ সব কিছুর রহস্য উদ্ঘাটন করে আসল সত্যকে জানা অনেক সময় তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

মানুষের অবস্থা সামনে রাখলে দেখা যায়, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন আর এই পরীক্ষা করতে গিয়ে কখনও তাকে সম্মানিত করেন ও সুখ-সম্পদের প্রাচুর্য দেন, তখন সে খুশীতে বলে ওঠে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যাকে তিনি পরীক্ষা করতে গিয়ে তার আয় রোযগার ও স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি সব কিছুকে সংকীর্ণ ও সংকট পূর্ণ করে দেন, তখন সে বলে ওঠে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন। যখন মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করেন, তখন এটিই হয় মানুষের মানসিক অবস্থা। প্রশস্ততা, সংকীর্ণতা, সচ্ছলতা ও সংকট দ্বারা তিনি পরীক্ষা করেন, আবার কখনও নেয়ামত ও সম্মান দ্বারা, কখনও মাল সম্পদ ও মান মর্যাদা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষা করেন।

কিন্তু সে এগুলো পরীক্ষা বলে মনে করে না বরং সে এগুলোকে পুরস্কারের সূচনা ভেবে মনে করে দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসের জন্যেই তাকে এগুলো দেয়া হয়েছে। আর তাকে দেয়া এই মর্যাদা সম্পর্কে সে ভাবতে শুরু করে যে, আখেরাতেও তাকে যে বিশেষ সুখ-সম্পদ ও মানসম্ভ্রম দেয়া

হবে এগুলো তারই প্রমাণ। সে আরো ভাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে যে পছন্দ করেন এবং অন্যদের মধ্য থেকে তাকেই যে নেয়ামতের অধিকারী বলে বাছাই করেছেন, তা এটাই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়জন হিসাবে বিবেচিত।

এর ফলে বিপদ-আপদ যা আসে সেগুলোকে সে শাস্তি মনে করে এবং ওই পরীক্ষার বিষয়টিকেই পরীক্ষার আসল বলে মনে করে। কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত পার্থিব সুখ-সম্পদকে আল্লাহর নযরে তার সম্মানিত হওয়ার প্রতীক বলে তারা ধরে নেয়। আর যখন আল্লাহ তায়ালা তার জীবনধারণ সামগ্রীকে সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে মনে করে এটা তার কৃতকর্মেরই শাস্তি। সে প্রত্যেকটি পরীক্ষাকে মনে করে তার শাস্তি এবং যেকোনো জীবন সামগ্রীর কমতিকে, অভাবকে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া অপমান মনে করে। কারণ, তার বিবেচনায় আল্লাহ তায়ালা তাকে অপমান বা অবজ্ঞা করতে না চাইলে তার জীবনসামগ্রী সরবরাহের পথকে এমনভাবে সংকুচিত করে দিতেন না। আসলে এই উভয় ক্ষেত্রেই তার চিন্তা ভ্রান্তিপ্রসূত এবং এভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে তার একটি ভুল ধারণা মাত্র। আসলে রেযেকের দরজা প্রশস্ত করা অথবা সংকুচিত করা, উভয়টিই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া এক পরীক্ষা। এই পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পরখ করতে চান, কে তাঁর নেয়ামতের শোকর করে আর কে না-শোকরি করে এবং এই পরীক্ষাকালীন সময় ধৈর্য ও অবিচলতার পরিচয় দেয়, আর কে একটু কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেই অস্থির হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিদান তো তার যে ব্যবহার পরবর্তীতে প্রকাশ পাবে তার ভিত্তিতেই দেয়া হবে। তার সম্পদ সম্পত্তি কি আছে না আছে তার ভিত্তিতে তাকে কোনো প্রতিদান দেয়া হবে না। আল্লাহর কাছে সম্মান পাওয়ার সাথে কারো ধন সম্পদের মালিক হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। আর দুনিয়াতে কাউকে ধন-দৌলত দেয়া হয়েছে বা দেয়া হয়নি এর সাথে আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়া বা অসন্তুষ্ট হওয়ারও কোনো সম্পর্ক নেই। দুনিয়ায় ভালো-মন্দ বিচার না করে সবাইকেই তিনি জীবনধারণ সামগ্রী সম্পদ সরবরাহ করে থাকেন। কাউকে কম দিয়েছেন বা কাউকে একেবারেই দেননি- শুধু এই কারণেই আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে না। এমনও দেখা যায় যে, কোনো সময় ভাল মন্দ বিচার না করে তিনি কাউকে জীবন সামগ্রী দেন এবং কোনো সময় সৎ অসৎ বিচার না করেই দেখা যায় কাউকে খুব কম দেন বা বঞ্চিত করেন। আসলে, যে জিনিসের কারণে তিনি মানুষের বিচার করবেন তা হচ্ছে তাদের কৃতকর্ম। পরীক্ষার খাতিরেই কখনো কাউকে প্রাচুর্য দেন, আবার কাউকে সে ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিতও করেন। আর যে হিসাব গ্রহণ বা ধরপাকড় তাকে করা হবে তা হবে তার পরীক্ষার ফলস্বরূপ।

অপরদিকে মানুষের অন্তর যখন ঈমান থেকে খালি হয়ে যায়, তখন সুখ-সম্পদ দেয়া বা না দেয়ার আসল রহস্য সে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না সে আল্লাহর পাল্লায় ওযনের রহস্য। তারপর যখন তার দিল ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যায়, তখন সে বুঝে আল্লাহর পাল্লা কি এবং কিভাবেই তা পরিমাপ করে মানুষের কর্মকান্ডকে। তখন পার্থিব সুখ সম্পদ ও ভোগ বিলাসের দ্রব্যগুলো তার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়, আর তখনই সে দুনিয়ার এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আখেরাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ পুরস্কার লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। সে সময় রুযি-রোযাগর কম হোক বা বেশী হোক এতে তার কোনো পরোয়া থাকে না। সংকট ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থাই তার কাছে সমান মনে হয়।

উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালার মূল্যায়নকে সে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করে। যখন আল্লাহর পাল্লায় তার কিছু ওযন আছে বলে সে বুঝতে পারে, তখন পার্থিব জীবনের আপাতমধুর মূল্য কম

হলেও সে উদ্বিগ্ন হয় না। দেখুন, প্রথমেই মক্কাবাসীদেরকে কোরআনে পাক সম্বোধন করছে! এরা ছিলো এমন এক জনপদ যাদের মতো জনগোষ্ঠী প্রত্যেক যামানাতেই কিছু না কিছু বর্তমান ছিলো। যারা পৃথিবীর প্রশস্ততার ক্ষেত্রে এবং সময়ের ব্যবধানে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

এই সব জাহেল নাদান মুর্খরা সুখ-সম্পদের বস্তু প্রদানের যে তারতম্য সৃষ্টি জগতে রয়েছে তার তৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয়। যেহেতু তাদের নিকট এই নশ্বর জীবনে মাল সম্পদ এবং এর ভোগ-বিলাসের জিনিসগুলোই সবকিছু। এ দুটির উর্ধের কোনো জিনিস তাদের বুঝে আসে না। এই নশ্বর পৃথিবীর অতি ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য তারা পাগলপ্রায় হয়ে ছুটোছুটি করে। এই জীবনের আরাম-আয়েশকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সে সর্বপ্রকার ধন-দৌলত পুঞ্জীভূত করতে চায় এবং এই ধন সম্পদের মোহব্বতে যে কোনো সীমালংঘনে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না।

সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়

আল্লাহর দৃষ্টিতে কোনো আমলের মুল্য কতোটুকু তা ভুলে যাওয়ার কারণেই মানুষের লোভ-লালসার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না এবং এই একই কারণে তাদের অন্তরের ঔদার্য বিনষ্ট হয়ে যায় ও তারা চরম সংকীর্ণমনা হয়ে উঠে। কোরআন এসব লোভাতুর জাতির স্বরূপ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে এবং পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের প্রতি অন্ধ মোহই যে ধন সম্পদ কম-বেশী দেয়ার তাৎপর্য বুঝতে না পারার আসল কারণ তা ঘোষণা করছে।

(তোমরা যা চিন্তা করছো তা) কিছুতেই নয় বরং তোমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তোমরা এতীম বাচ্চাদেরকে কোনো মর্যাদা দাওনা এবং বাস্তুহারা নিস্ব যারা তাদেরকে খাবার দেয়ার ব্যাপারে কোনো উৎসাহও দাওনা, বরং তোমরা মীরাসী সূত্রে প্রাপ্ত (ওই এতীম বাচ্চাদের) মাল-সম্পদ খেয়ে ফেলো এবং ওই সম্পদকে তোমরা অত্যন্ত গভীরভাবে ভালোবাসো।

কিছুতেই ব্যাপার সেটা নয়, যা একজন ঈমানহারা ব্যক্তি বলে। জীবন সামগ্রী বেশী পাওয়াটাই আল্লাহ তায়ালার নিকট সম্মানিত হওয়ার জন্য কোনো দলীল নয়। আর সংকট-সমস্যার মধ্যে থাকার অর্থ এই নয় যে, সে আল্লাহর দৃষ্টিতে ছোট বা অবহেলার পাত্র। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহর নেয়ামত লাভ করার পর তোমরা শোকর করো না এবং তোমাদেরকে প্রদত্ত মালের হকও আদায় করো না (অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের প্রতি কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে)। ওই ছোট্ট এতীম বাচ্চাদের-যাদের বাপ মারা যাওয়ার পর তাদের অভিভাবক হওয়ার দায়িত্ব তোমরা পেয়েছো, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দাওনা এবং নিজেদের মধ্যে তোমরা পরস্পর মেসকীনদেরকে খাওয়ানোর ব্যাপারে উৎসাহও দাওনা। মেসকীন বলতে ওই ব্যক্তিকে বুঝায় যে, অভাবগ্রস্ত কিন্তু নিজের অভাব জানিয়ে কিছু চায় না।

এ জন্যই মেসকীনকে খাওয়ানোর ব্যাপারে একে অপরকে উৎসাহিত না করা এবং পরস্পরকে উপদেশ না দেয়াকে রীতিমতো অন্যায় ও অপ্রীতিকর বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেহেতু সামাজিক জীবনে অনেক সময়ে অভিভাবক হওয়া এবং সামাজিক শান্তিবিধানের জন্য যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজন হয় এবং এর ওপরই নির্ভর করে একটি সুষ্ঠু সমাজের শান্তি–এটাই ইসলামের বাস্তব দৃষ্টিভংগি, যা জীবনকে সুশৃংখলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

আল্লাহ তায়ালা এখানে মূল যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, পরীক্ষায় ফেলার তাৎপর্য তোমরা বুঝো না, আর এই কারণেই তোমরা পরস্পরকে এতীমদের মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে এবং মেসকীনদেরকে খাওয়ানো সম্পর্কে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত করো না, বরং এর বিপরীত ওরা মীরাসী সূত্রে যে ধন-সম্পদ পায় তা নিকৃষ্ট লোভী ব্যক্তির ন্যায় মেরে খাও। মাল সম্পদকে তোমরা মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসো। এ সময়ে কারো উপকার করা বা অভাবগ্রস্তদেরকে মানসম্মান ও খাদ্য খাবার দিয়ে মর্যাদা দেয়ার কথা তোমাদের অন্তরের মধ্যে কিছুতেই ঠাঁই পায়নি।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, মক্কাতে ইসলাম এসব কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। বৈধ অবৈধ তাদের কাছে কোনো বিবেচ্য বিষয় ছিলোনা যেকোনো ভাবেই হোক তারা ধন-দৌলত ও টাকা পয়সা পুঞ্জীভূত করে রাখার জন্য পাগল ছিলো। এ সম্পদের মোহে তাদের অন্তর কৃপণতা ও সংকীর্ণতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এতীমদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব তাদের মাল সম্পদ দখল করার পথকে খুবই সহজ করে দিয়েছিলো। বিশেষ করে তারা মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতো বেশী। তারা অসহায় সেসব এতীম মেয়েদের ধন সম্পদ তো লুটপাট করে খেতোই, তাছাড়াও তাদেরকে আরো বিভিন্নভাবে তারা নির্যাতন করতো।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেয়েরা এতীম হয়ে যাওয়ার পর যেসব ব্যক্তির অভিভাবকত্বে তারা আশ্রয় পেতো সেই সব অভিভাবকরা যথেচ্ছভাবে তাদের মাল-সম্পদ ব্যবহার করতো। এভাবে আজও ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগের মতো আল্লাহবিমুখ লোকদের মধ্যে ধন-সম্পদের মোহব্বত বিরাজ করছে। তারা সুদী ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আরো বহু কায়দায় সম্পদ জমা করে রাখে। এটাই সকল যামানায় ও সকল দেশে জাহেলিয়াতের লক্ষণ হিসাবে পরিচিত ছিলো–আজও আছে।

এ আয়াত কয়টির মাধ্যমে ওই নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের আসল অবস্থাটা শুধু তুলে ধরাই হয়নি বরং তাদের ওই নির্দয় ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে সে অবস্থা নিরসনের জন্য অত্যন্ত জোর দাবী জানানো হয়েছে। 'কাল্লা' শব্দটির বারংবার প্রয়োগ দ্বারা তাদের প্রতি ঘৃণার বহিপ্রকাশ ঘটেছে যথেষ্টভাবে। বিভিন্ন ছন্দপূর্ণ শব্দ, ব্যাখ্যা ও তুলনা দ্বারা ওই ঘৃণ্য অবস্থার স্বরূপ তুলে ধরে তার অবসান কামনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা চরম লোভের বশবর্তী হয়ে মীরাসের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মাল খেয়ে ফেলো, আর অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পদকে ভালবাসো।'

কেয়ামতের কিছু খন্ড চিত্র

তাদের এই জঘন্য প্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটন করার পাশাপাশি পার্থিব ভোগ সামগ্রীর মঞ্জুরীর মূল রহস্য সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণার আলোচনা শেষ করা হয়েছে, এরপর মহা ভয়ংকর বিচার দিনের অবস্থা তুলে ধরে তাদেরকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

বলা হচ্ছে, 'কিছুতেই নয়, (সে দিনের কথা স্মরণ করো) যে দিন ধ্বংস করে দেয়া হবে পৃথিবীকে প্রচন্ড কম্পনের ওপর কম্পন দ্বারা এবং তোমার রব আসবেন, ফেরেশতারাও আসবেন সারিবদ্ধভাবে। আর যেদিন জাহান্নামকে এগিয়ে এনে সবার সামনে হাযির করা হবে, সেই দিন মানুষ অবশ্যই উপদেশ কবুল করবে (করতে চাইবে), কিন্তু কীইবা কাজে লাগবে তার এই উপদেশ গ্রহণ! সেদিন বলবে, হায় আফসোস! জীবদ্দশাতে আমি যদি (আজকের জন্য) কিছু প্রস্তুতি নিতাম! (কিন্তু সেদিন তার এই আক্ষেপ কোনো কাজেই আসবে না)। সেদিন তাঁর মতো কঠিন আযাব আর কেউ দেবে না, আর তাঁর মতো আর কেউই কাউকে বাঁধবে না'।

পৃথিবীর ধ্বংস বলতে বুঝায়, এর মধ্যে ঘরবাড়ী ও বিভিন্ন এলাকাকে চেনার জন্য যে সকল জিনিস রয়েছে তা জানার ও চেনার জন্য যতো প্রকার চিহ্ন আছে তা সব ধ্বংস হয়ে একাকার হয়ে যাবে। এটাই হবে প্রথম কেয়ামত, যার আগমনে সৃষ্টির সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। কিন্তু 'তোমার রব আসবেন, আরো আসবে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে', এ এমন ব্যাপার যা মোটেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এগুলো সম্পর্কে জানা তো দূরের কথা সম্যক উপলব্ধি করার মতো কোনো চেতনাশক্তিও আমাদের নেই। কোনো ব্যাখ্যার প্রয়াস না পেয়ে শুধু এতোটুকু আমরা অনুভব করি যে, এ হবে এক গুরুগম্ভীর এবং চরম ভয়াবহ অবস্থা। এ ধরনের অপর জিনিস হচ্ছে

জাহান্নাম। এ সম্পর্কে এতোটুকু বুঝা যায় যে, এটা নিকটে এসে যাবে এবং যাদেরকে জাহান্নামে ফেলা হবে তাদেরই কাছে এসে যাবে জাহান্নাম। বাস্তবে কি অবস্থা সংঘটিত হবে এবং কেমনভাবে তা সংঘটিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ আলেমুল গায়বের জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অন্য কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। সে জ্ঞান ও রহস্য অনাগত সেই ভয়ংকর দিনেই প্রকাশিত হবে।

এই আয়াতগুলোতে যে জাদুকরী বর্ণনা পেশ করা হয়েছে তাতে যে কোনো পাঠকের হৃদয়ে ওই কঠিন দিনের এক ভয়াল চিত্র ফুটে ওঠে। তার হৃদয় মন ভয়ে কাঁপতে থাকে। চোখগুলো আতংকে আড়ষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবী সেই মহাপ্রলয়ের দিনে–যেদিন সবকিছু চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং সকল শক্তির মালিক, যিনি বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম, তিনি সরাসরি সেদিন সকল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং সব কিছুর চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেবেন। ফেরেশতারা মূক ও বধিরের মতো নির্ভীকভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছু অবলোকন করবে। তারপর এগিয়ে আনা হবে জাহান্নামকে, যা আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে।

সেদিন মানুষ পেছনের অবস্থাকে স্মরণ করবে, মানুষ স্মরণ করবে, যে ধন সম্পদ দেয়া ও না দেয়ার মধ্যে যে কি নিগূঢ় রহস্য রয়েছে তা সেদিন সে বুঝতে পারেনি। এতীম বালক বালিকাদের মীরাসী সূত্রে প্রাপ্ত ধন সম্পদ পৈশাচিক লোভের বশবর্তী হয়ে এবং অদম্য চাহিদা সামলাতে না পেরে সে খেয়ে ফেলেছে। যে ব্যক্তি ধন সম্পদকে গভীরভাবে ভালবেসেছে, আর যে ব্যক্তি এতীমকে কোনো মর্যাদা দেয়নি এবং ফকীর মেসকীনকে খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে কাউকে উৎসাহিত করেনি।

যে ব্যক্তি অহংকারপূর্ণ হৃদয় নিয়ে নীতি নৈতিকতার সকল সীমা লংঘন করেছে। যে সমাজের বুকে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে এবং সঠিক কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। সে সেদিন পেছনের সকল অপকর্মকে স্মরণ করে উপদেশ গ্রহণ করতে চাইবে এবং সঠিক জিনিসকে মানতে চাইবে। কিন্তু সেদিন এই স্মরণ তার কোনো কাজেই লাগবে না। সে দেখবে উপদেশ গ্রহণ করে সংশোধন হওয়ার সকল সুযোগ ও সময় তখন পার হয়ে গেছে। কাজেই, কী ফায়দা হবে তার স্মরণ করে ও উপদেশ গ্রহণ করে! তখন উপদেশ গ্রহণের সময় তো একেবারেই শেষ।

সেই শেষ বিচার দিনে, কাউকেই কোনো কথা পেশ করার বা কোনো ব্যাপারে কোনো আপত্তি জানানোর কোনো সুযোগ দেয়া হবে না। দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ করার তার যে সুযোগ ছিলো সে কথা স্মরণ করে সেদিন সে শুধু আক্ষেপই করতে থাকবে।

আর সে সময় তার সামনে সকল সত্য উদঘাটিত হয়ে যাবে। তখন সে বলে উঠবে, হায় আফসোস! আমার জীবদ্দশাতে আমি আজকের জন্য যদি কোনো প্রস্তুতি নিয়ে রাখতাম! অর্থাৎ বেঁচে থাকাকালীন সময়ে যদি আজকের জন্য কিছু পাথেয় যোগাড় করে রাখতাম! কারণ আজকের শুরু হওয়া এই জীবনই তো প্রকৃত জীবন– যাকে সঠিক অর্থে জীবন বলা যেতে পারে। এই জীবনের জন্যেই তো প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন ছিলো। এর জন্যেই তো সঞ্চয় করা দরকার এবং এই জীবনের জন্যই তো পুঁজি যোগাড় করা জরুরী ছিলো। 'ইয়া লাইতানী' শব্দটি দ্বারা দুঃখের সাথে এমন একটি জিনিসের জন্য আফসোস প্রকাশ করা হয়, যা মানুষের নাগালের অনেক অনেক দূরে। এ কথাটি সে সেদিন এ জন্য বলবে যে, আখেরাতের সেই দিনে তার হারানো বস্তু থাকবে তার থেকে অনেক অনেক দূরে।

এই দুঃখজনক আক্ষেপ ও ব্যর্থ আকাংখার পর সে তার পরবর্তী বাসস্থানের কথা চিন্তা করতে থাকবে কিন্তু সেদিন আল্লাহ তায়ালা বাঁধবেন তাকে এমন কঠিনভাবে যে, অন্য কেউ এমনভাবে বাঁধে না বা বাঁধতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা জবরদস্ত শক্তিশালী। তিনি যেকোনো কাজ করাতে মানুষকে বাধ্য করতে পারেন। একমাত্র তিনিই সেদিন সেই আযাব দিতে পারবেন, যে আযাব অন্য কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। তিনিই সেদিন তাকে সেই ভীষণভাবে বাঁধবেন, যেভাবে বাঁধা আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কেয়ামতের দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে এই আযাব দেয়া ও বাঁধা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের আরও অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এখানে সংক্ষেপে শুধু এতোটুকু বলেই তিনি শেষ করেছেন যে, ওইভাবে আযাব দেয়া ও বেঁধে রাখা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অথবা এটা বলা যায়, কোনো সৃষ্টির পক্ষেই সেভাবে কষ্ট দেয়া বা বাঁধা সম্ভব নয়। আর এসব কথা আ'দ, সামুদ ও ফেরাউনের জাতিকে পৃথিবীতে তাদের বাড়াবাড়ি, বিশংখলা সৃষ্টি ও চরম সীমালংঘনের কারণে যে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছিলো তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, সে আযাবের মধ্যে তৎকালীন মানুষকে প্রদত্ত নানা প্রকার শাস্তি শেকল দিয়ে বাঁধা এবং দন্ডবেড়ী পরানোর শাস্তিও ছিলো। আজকেও তো তোমার সেই রব বর্তমান রয়েছেন এবং তিনিই ভবিষ্যতে একই শাস্তি দেবেন।

অতএব হে নবী, হে বিশ্বাসী, তিনি আজ এই ভয়ংকর দিনে সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেবেন এবং বাঁধবেন যে মানুষকে নানা প্রকার শাস্তি দিয়েছিলো ও হাত-পা বেঁধে কষ্ট দিয়েছিলো। কিন্তু জেনে রাখা দরকার, মানুষ যে কষ্ট দিয়েছিলো তার মধ্যে এবং আল্লাহ তায়ালা যে কষ্ট দেবেন তার মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। তাদের বাধা এবং আল্লাহ তায়ালার বাধার মধ্যেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য। এই আখেরাতের যেন্দেগীতে তার জন্য এমন অপমান অপেক্ষা করছে যা কোনো সৃষ্টির পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। একমাত্র যিনি সৃষ্টিকর্তা ও সকল কাজের পরিচালনা যিনি করেন তাঁর পক্ষেই ওই ভীষণ পরিণতি দান সম্ভব। অতএব অহংকারী ও সীমালংঘনকারীরা যাকে যেভাবে কষ্ট দিতে চায় দিক, শীঘ্রই তাদেরকে তিনি এমনভাবে শাস্তি দেবেন এবং এমনভাবে বাঁধবেন যে, তা কারো ধ্যান-ধারণার মধ্যে আসতে পারে না।

এই ভয়ভীতি ও ভয়ংকর অবস্থা এবং এই ভীষণ শাস্তি ও কঠিন বাঁধন– যার কল্পনা কেউ করতে পারে না, এর মধ্যেই ঊর্ধাকাশ থেকে আসবে মোমেনদের জন্য এক ঘোষণা– হে প্রশান্ত আত্মা, ফিরে যাও তোমার রবের দিকে প্রশান্ত মনে ও সন্তুষ্ট চিত্তে, তারপর দাখিল হয়ে যাও আমার বান্দাদের মধ্য, আর দাখিল হয়ে যাও আমার জান্নাতে'।

এভাবে আদর মহব্বতের সাথে যেন খুব কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা ডাক দিয়ে বলছেন, 'হে, ওই', আরো আন্তরিকতা ও সম্ভ্রমের শব্দ প্রয়োগ করে বলা হয়েছে, 'হে আত্মা', আরো প্রশংসাসূচক শব্দ ও শান্ত স্বরে বলা হয়েছে, 'হে প্রশান্ত নিশ্চিন্ত আত্মা', আর এইভাবে ডাক দেয়া হয়েছে সেই কঠিন দুঃসময়ে যখন বাঁধা চলছে অপরাধীদেরকে। দেখুন কতো সাবলীল গতিতে এবং কতো নরম সুরের এই ডাক– 'ফিরে যা তোর রবের কাছে', অর্থাৎ ফিরে যাও তোমার মূল জায়গায় যেখান থেকে তুমি বিচ্যুত হয়ে এসেছিলে আর দীর্ঘ দিন ধরে অজানা-অচেনা পৃথিবীতে বাস করেছিলে।

তারপর আপনজনদের থেকে বিচ্যুত হয়ে কবরে শায়িত ছিলে কতোকাল। সেখান থেকেই তুমি তোমার আসল জায়গায় ফিরে যাও। ফিরে যাও তোমার রবের কাছে যার সাথে রয়েছে তোমার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, পরিচয় ও গভীর সম্পর্ক। সন্তুষ্ট চিত্ত ও নিশ্চিন্ততার এ ডাক সঞ্চারিত হয় মহাশূন্যলোকে। বান্দার প্রতি আকর্ষণ ও সন্তোষ মাখা এ ডাক গুঞ্জরিত হয়ে দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়।

সে গুঞ্জরণে ধ্বনিত হয়, এসো, প্রবেশ করো আমার (প্রিয়) বান্দাদের দলে (যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমার প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছে)। এরা আমার অতি আপনজন, আমার অতি কাছাকাছি এদের স্থান। কাছে রাখার জন্য আমি নিজেই ওদেরকে বাছাই করে নিয়েছি। দাখেল হয়ে যাও, আমার বাগ-বাগিচায়, আরামে বসবাস করো যা চিরদিন সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, নির্ঝরিণী ও ফুলফল শোভিত থাকবে। যেথায় আছে মায়াভরা সংগিনীদের মধুমাখা কন্ঠের গান ও পাখিদের প্রাণ মাতানো তান। সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে তোমাদেরকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাই। এসো আমার আলিঙ্গনে, এসো আমার রহমতের বাহুবন্ধনে।

এ হচ্ছে এমন এক মহব্বত, যার সুবাস ছড়িয়ে রয়েছে জান্নাতের পাতায় পাতায়। যার সৌরভে সুরভিত এই ফুলবাগিচার প্রতিটি কলি। চিরস্থায়ী এ আনন্দমেলা হাসিখুশী ভরা প্রাণ মাতানো। এ মেলা প্রথম স্বাগত জানানোর দিন থেকে শুরু হওয়ার পর আর শেষ হবে না কোনো দিন। বলা হবে, সেই জান্নাতেই এসো তোমরা, হে আমার পরম আদরের বান্দারা, এসো প্রশান্ত মনে।

এভাবে যাদেরকে ডাকা হবে তারা নিশ্চিন্ত থাকবে। পাক পরোয়ারদেগারের কাছে আসতে পেরে তারা তাদের পথের মাধুরীতে নিশ্চিন্ত থাকবে। নিশ্চিন্ত থাকবে তারা আল্লাহ তায়ালার আদরে, বেহেশতী বান্দারা আজ নিশ্চিন্ত, এদের মন সন্দিগ্ধ নয়। এই নিশ্চিন্ততায় মোমেন বান্দার মন এমনভাবে ছেয়ে রয়েছে যে, তার মনে কখনও দোদুল্যমান ভাব আসে না। এতো নিশ্চিন্ত সে তার কোনো ভীতিকর দিনের ভয় থাকে না। তারপর গোটা প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় সবকিছু নিরাপদে, শান্তিতে ও পরিতৃপ্তির সাথে আল্লাহপ্রদত্ত ব্যবস্থায় কাজ করে যাচ্ছে। এটা আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার বাস্তব নিদর্শন হিসাবে পরিদৃশ্যমান। এগুলোর পরস্পরের মধ্যে যেন রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা, একতা, মিল ও মহব্বত এবং এক অত্যন্ত নিকটতম একটা সম্পর্ক, যার ফলে সর্বত্র অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান থাকে।

যে জান্নাতের সুসংবাদ এ আয়াতগুলোতে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এক সুবাসিত মনোরম বাগিচা, তার মধ্যেই বিরাজমান রয়েছে মহাসম্মানিত ও পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার রহমত ও বরকত।

সূরা আল বালাদ

আয়াত ২০ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَّمَا
وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ
أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ أَحَدٌ ﴿٧﴾
أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعٰمٌ
فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ
كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আমি শপথ করছি এ (পবিত্র) নগরীর, ২. এ নগরীতে তুমি (সম্পূর্ণ) স্বাধীন, ৩. আমি শপথ করছি (আদি) পিতা ও (তার ঔরস থেকে) যা সে জন্ম দিয়েছে (তাদের), ৪. আমি মানুষকে এক কঠোর পরিশ্রমের মাঝে পয়দা করেছি; ৫. এ মানুষটি কি একথা মনে করে, তার ওপর কারোই কোনো ক্ষমতা চলবে না? ৬. সে বলে, আমি তো প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি; ৭. সে কি ভেবেছে তার এসব (কর্মকান্ড) কেউ দেখেনি? ৮. আমি কি (ভালোমন্দ দেখার জন্যে) তাকে দুটো চোখ দেইনি? ৯. আমি কি তাকে একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দেইনি? ১০. আমি কি তাকে (ন্যায় অন্যায়ের) দুটো পথ বলে দেইনি? ১১. (কিন্তু সে তো দুর্গম পথ) পার হওয়ার হিম্মত দেখায়নি, ১২. তুমি কি জানো সে দুর্গম পথটি কি? ১৩. (তা হচ্ছে) দাসত্বের শেকল খুলে (মুক্ত করে) দেয়া, ১৪. দুর্ভিক্ষের দিনে কাউকে (কিছু) খাবার দেয়া, ১৫. নিকটতম কোনো আত্মীয় এতীমকে আহার পৌঁছানো, ১৬. কিংবা ধুলো লুণ্ঠিত কোনো মেসকীনকে কিছু দান করা; ১৭. অতপর তাদের দলে শামিল হয়ে যারা ঈমান আনবে এবং একে অপরকে ধৈর্যের অনুশীলন করাবে এবং একে অপরকে দয়া দেখানোর উপদেশ দেবে;

أُولَٰئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۝١٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ
ٱلْمَشْـَٔمَةِ ۝١٩ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ ۝٢٠

১৮. (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে ডান দিকের (সৌভাগ্যবান লোক,) ১৯. আর যারা অস্বীকার করেছে তারা হচ্ছে বাম দিকের ব্যর্থ লোক, ২০. যেখানে তাদের ওপরে আগুনের শিখা ছেয়ে থাকবে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ ছোট্ট সূরাটিতে মানব জীবনের বেশ কিছু মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যা সূরাটির বাচনভংগির চাতুর্যে অত্যন্ত জোরালো ও প্রানবন্ত হয়ে উঠেছে। এই ছোট্ট সূরাটিতে সে মৌলিক বিষয়গুলোর এমন চমৎকারভাবে সমাবেশ ঘটেছে যা কোরআনে কারীম ছাড়া অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। এই অসাধারণ বর্ণনাভংগি হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলোতে অত্যন্ত গভীরভাবে সাড়া জাগায়। সূরাটি শুরু হয়েছে কঠিন শপথ বাণীর সাথে। বলা হচ্ছে, 'কসম এই মহানগরীর, যার এক সম্মানিত বাসিন্দা তুমি। কসম জন্মদাতা বাপের এবং কসম সন্তানের। অবশ্যই আমি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ) সৃষ্টি করেছি মানুষকে কষ্টকর কাজের কর্মী হিসাবে।' মহানগরী বলতে এখানে মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে আল্লাহর সম্মানিত ঘর বর্তমান। পৃথিবীতে মানুষের জন্য প্রথম এই ঘরটি তৈরী করা হয়েছে, যা গোটা মানবমন্ডলীর আশ্রয়স্থল এবং নিরাপত্তা বিধানকারী। এখানে এসে তারা তাদের যাবতীয় অস্ত্র সংবরণ করে, ঝগড়া-বিবাদ ভুলে যায়। ভুলে যায় শত্রুতার কথা এবং একে অপরের সাথে শান্তিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে মিলিত হয়। একজন আর এক জনের জন্য সশ্রদ্ধ ও নিবেদিত। এমনি করে এ ঘরটি এবং এর মধ্যে অবস্থিত গাছপালা, পাখী এবং যা কিছু আছে তা সবই নিরাপদ। তারপর আরো রয়েছে এর মধ্যে ইসমাঈল (আ.)-এর পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর ঘর। তিনি গোটা আরব এবং সকল মুসলমানের পিতা।

তাফসীর

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই মহানগরীতে পয়দা করে সম্মানিত করেছেন। তাঁর মান-মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন এবং এখানে তাঁর বাসস্থানে ও বসবাসের কথা উল্লেখ করে এ শহরের মর্যাদাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন, বৃদ্ধি করেছেন এর শ্রেষ্ঠত্বকে। এসব মান-সম্মান বৃদ্ধির উল্লেখ দ্বারা এ স্থানের মর্যাদাকে প্রভুত পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে মোশরেকরা এ ঘরের মর্যাদা বিনষ্ট করাকে বৈধ করে নিয়েছে। এই শহরের মধ্যেই তারা নবী ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে কষ্ট দিয়েছে। অথচ ঘরটি তো চিরস্থায়ী মর্যাদার অধিকারী। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাড়ী এখানে হওয়ায় এ শহরের মর্যাদা আরো বহুগুণে বেড়ে গেছে। এই কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই ঘর এবং এর বাসিন্দার কসম খেয়েছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার কারণেই এ শহরের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এসব কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। যেহেতু তারা নিজেদেরকো এ ঘরের মোতাওয়াল্লী বলে দাবী করতো, আরো দাবী করতো যে, তারা ইসমাঈলের বংশধর এবং ইবরাহীম (আ.)-এর মত ও পথের পথিক। তাদের এ ভূমিকা ছিলো সবদিক দিয়ে অপ্রিয় ও জঘন্য।

বংশানুক্রমিক সৃষ্টিতত্ত্ব

এ প্রসঙ্গে এই ব্যাখ্যাটিই সম্ভবত বেশী উপযোগী। 'পিতা ও সন্তানের কসম' একথা দ্বারা বিশেষভাবে ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে, আর এই শহর, এখানের অধিবাসী, নবী ও এ ঘরের প্রতিষ্ঠাতা এবং যাকে তিনি জন্ম দিয়েছেন এ সবই ইবরাহীম (আ.)-এর সম্পর্কে বলা হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, আর কোনো ব্যাখ্যা এখানে হতে পারে না। পিতা ও পুত্রের কথা বলতে মানব সাধারণ-এর পিতা পুত্রের সম্পর্কও বুঝানো হতে পারে। যাদের মাধ্যমে সৃষ্টি প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এই সূরার ভূমিকা হিসাবে মানব সৃষ্টির রহস্য তুলে ধরা হয়েছে এবং এটাই সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

এ প্রসঙ্গে ওস্তাদ শেখ মোহাম্মদ আব্দুহু তাঁর তাফসীরের 'জুয্য়ে আম্মা'তে এ সূরার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বড় চমৎকার একটি কথা বলেছেন, যা আমি এখানে উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। যেহেতু এই তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর সাথে সে তাফসীর-এর অনেক মিল রয়েছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা পিতা ও পুত্রের কসম খেয়েছেন যাতে করে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে এবং মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং আমরা খেয়াল করে দেখি যে, কিভাবে মানুষ পৃথিবীতে এলো এবং কোন কোন পর্যায় অতিক্রম করে আজ নিজেকে সে উন্নত জীব বলে ভাবতে পারছে এবং কিভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

যখন গাছপালার জন্ম ও বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনি চিন্তা করবেন, তখন দেখবেন কেমন করে বীজ মাটিতে পড়ার পর অংকুরিত হয়। তারপর বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে সে অংকুর বেড়ে উঠে। তাকে প্রাকৃতিক কতো দুর্যোগের মোকাবেলা করতে হয় এবং বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার জন্য আশপাশের সবকিছু থেকে কি কঠিনভাবে তার খাবার সংগ্রহ করা দরকার হয়। এভাবে সে শেষ পর্যন্ত পত্রপল্লব সজ্জিত শাখা-প্রশাখা সম্বলিত সুদৃঢ় গাছে পরিণত হয়। তখন সে আরও একটি বা একাধিক বীজ প্রদানে সক্ষম হয় যা তারই গাছপালার জন্ম ও বিস্তার দান করে এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে নিজেদের সঠিক ভূমিকা পালন করে। এসব বিবর্তনের দিকে যখন আপনি দৃষ্টিপাত করবেন, চিন্তা করবেন সৃষ্টির এই বৈচিত্র সম্পর্কে এবং আরও চিন্তা করবেন এসব গাছপালার উর্ধের জিনিস জীব-জন্তু ও মানব সৃষ্টি সম্পর্কে, তখন আপনার সামনে ভেসে উঠবে সব থেকে বৈচিত্রময় সৃষ্টি, পিতা ও পুত্রের জন্ম রহস্য, যা সৃষ্টিকুলে সংঘটিত করেছে সব থেকে বড় বিপ্লব, যার জন্য প্রয়োজন মহা বিজ্ঞানময় এক দক্ষ পরিকল্পনা, যাতে করে এ মহা সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখা যায় এবং যাতে বিশ্ব প্রকৃতির প্রবৃদ্ধিতে নিত্য নতুন সৌন্দর্যের সংযোজন ও বিকাশ ঘটে।

এখানে শপথ গ্রহণের পদ্ধতিটি মানব জীবনের এক মহা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বলা হয়েছে– 'অবশ্যই আমি (মহান আল্লাহ) সৃষ্টি করেছি মানুষকে দুঃখ কষ্ট ও পরিশ্রম করে চলার প্রকৃতি দিয়ে। অর্থাৎ বিভিন্ন কষ্ট দুর্ভোগ ও চেষ্টা চরিত্র করে চলার ও কঠিন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার জীবন দিয়ে পয়দা করেছি। এমনি করে অন্য আর একটি সূরাতেও বলা হয়েছেঃ 'হে মানবকুল, নিশ্চয়ই তোমাকে বহু দুঃখ কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তোমার রবের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এভাবেই তাঁর সাথে তোমার মোলাকাত হবে।'

জীবন্ত শুক্রকীট মাতৃগর্ভে প্রবেশ করার পর তাকে জীবিত থাকার জন্য, টিকে থাকার জন্য এবং গড়ে ওঠার জন্য অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়, তবেই আল্লাহর হুকুমে সেখানে তার অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভব হয়। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেখানে থাকার পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসার মাধ্যমে তার পথ পরিক্রমার সমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু সেখানে মায়ের কষ্টের সাথে সাথে তাকেও যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হয়। পৃথিবীর আলো দেখা ততোক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হয় না যতোক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীতে পদার্পণ করতে ইচ্ছুক এই ভ্রূণকে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টকর সংকোচন সম্প্রসারণ, এগিয়ে দেয়া ও পেছনে টেনে নিয়ে আসা, চাপ দেয়া ও ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি পদ্ধতিতে এগিয়ে আসতে হয়। এমনকি গর্ভাশয় থেকে বেরিয়ে আসার কোনো কোনো সময় তার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যায়।

জীবন মানেই পরিশ্রম

আর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মুহূর্ত থেকে শুরু হয়ে যায় তার কঠিন জীবন সংগ্রাম, যা প্রতি পদে পদে যন্ত্রণাদায়ক। সর্বপ্রথম শুরু হয় এমন এক পরিবেশে ভ্রূণটির শ্বাস প্রশ্বাস নেয়ার সংগ্রাম, যা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত এবং এ কাজটি তার জন্য একেবারেই নতুন এক অভিজ্ঞতা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সর্বপ্রথম সে চীৎকার দিয়ে মুখ খুলে এবং ফুসফুস যন্ত্রকে সম্প্রসারিত করে দিয়ে সজোরে দম বের করে দিয়ে জানায় যে, দুনিয়ায় তার বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার এবং কোনোভাবেই তা সহজ নয়। আরও জানায়, এখন থেকে শুরু হয়ে গেলো তার বাঁচার জন্য কষ্টকর সংগ্রাম। এ সময় থেকেই শুরু হয়ে যায় তার হজম শক্তিকে কাজে লাগানো এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াজনিত অস্বাভাবিক অজানা এক পদ্ধতি। শুরু হয়ে যায় পাকস্থলীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় খাদ্যাংশ বের করে দেয়ার কষ্টকর সংগ্রামের এক নতুন প্রক্রিয়া। তার পর থেকে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ কষ্টই কষ্ট বহন করে নিয়ে আসে এবং প্রতিটি অংগসঞ্চালন বা নড়াচড়া মাত্রই কষ্ট। বাচ্চা যখন হামাগুড়ি দেয়া শুরু করে এবং যখন দাঁড়াতে শেখে এ অবস্থা যে-ই দেখে, সে বুঝতে পারবে তার তুচ্ছ এবং প্রাথমিক এ কাজগুলো কতো কঠিন।

দাঁত ওঠার সময় কিছু কষ্ট হয়। যখন দাঁড়াতে শেখে তখনও কষ্ট হয়। যখন হাঁটতে শেখে তখনও হয় এরকম কষ্ট। যখন লেখাপড়া শেখে, তখন হয় আর এক ধরনের কষ্ট। যখন বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা লাগে, তখনও হয় অন্য আর এক প্রকারের কষ্ট। এভাবে প্রতিটি নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সময় পৃথক পৃথক ধরনের চিন্তা ও দুর্ভোগ আসে। যেমন হামাগুড়ি দেয়ার সময় এক রকম কষ্ট আবার চলতে শুরু করলেও হয় প্রায় ওই একই রকমের পেরেশানী।

তারপর জীবনের পথ বিভিন্ন হয়ে যায় এবং চেষ্টা সংগ্রামও বিভিন্ন রূপ নেয়। কেউ কেউ সংগ্রাম করে পেশীশক্তি দিয়ে, কেউ সংগ্রাম করে মানসিক শক্তি বা চিন্তাশক্তি দিয়ে, আবার কেউ সংগ্রাম করে আত্মশক্তি দিয়ে। কেউ সংগ্রাম করে ভাত-কাপড়ের জন্য, জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে, আবার কেউ চেষ্টা-সংগ্রাম করে হাজার থেকে লাখ টাকা বৃদ্ধি করে পুঁজির পাহাড় গড়তে। কেউ নিজেকে পেরেশানিতে ফেলে পদমর্যাদা অথবা ক্ষমতার মোহে, আবার কেউ আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করে। কেউ সংগ্রাম করে তার লাগাম ছাড়া চাহিদা মেটানোর জন্য আর কেউ তার আকীদা বিশ্বাস এবং দ্বীনের দাওয়াত দান কল্পে চেষ্টা সাধনা করে জান্নাতের দিকে যাওয়ার জন্য। আর এদের প্রত্যেককেই কিছু দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হয়, বহু পরিশ্রম করে দুর্গম পথে চলতে হয় এবং কষ্ট পরিশ্রম করে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের জন্য শেষ পর্যন্ত তার দরবারে হাযির হতে হয়। হতভাগা ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকের জন্য তখন সব থেকে বড় পেরেশানীর কারণ হবে এই সাক্ষাতকার আর নেককার ও সৌভাগ্যবানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার এই দীদার বড়ই আরামদায়ক।

দুনিয়ার কষ্ট-পরিশ্রম ও পেরেশানী একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। যদিও এর প্রকার ও কারণ বিভিন্ন তবে হেতু যাই হোক না কেন দুনিয়াতে পেরেশানী যে আছেই এটা নিশ্চিত। তবে সবচেয়ে

বড় ক্ষতিগ্রস্ত সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও সুখ-শান্তির জন্য নিজেকে নানা প্রকার পেরেশানীতে ফেলে কিন্তু আখেরাতের জন্য কিছুই না করার কারণে যখন জীবনাবসন হয়, তখন সে বদনসীবী ও চরম দুর্দশার শিকার হয়ে যায়। আর সবচেয়ে সফলকাম ও খোশনসীব সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তায়ালার ছায়াতলে আশ্রয় পেয়ে পরম শান্তি লাভ করে।

পৃথিবীর জীবনে কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ কষ্ট জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে এর রূপ ও প্রকৃতি বিভিন্ন। কষ্ট মানুষকে করতেই হয়, তা সে ভালোর জন্যেই হোক আর মন্দের জন্য হোক। যে ব্যক্তি চেষ্টা-পরিশ্রম করে ভালোর জন্য অবশ্যই সে চেষ্টা পরিশ্রমের প্রকৃতি মন্দের জন্য কষ্টকর পরিশ্রম করা থেকে ভিন্ন। মন্দ কাজের জন্য যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করা হয় তার মধ্যে মানসিক কোনো শান্তি থাকে না, থাকে না কোনো তৃপ্তির অনুভূতি, যা ভালোর জন্য চেষ্টা-সাধনা ও কষ্টের মধ্যে অনুভূত হয়। এ আরাম ও শান্তি আসে অপরের জন্য খরচের মাধ্যমে, আসে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার মাধ্যমে। সুতরাং যে পরিশ্রম করে, তার কাজটাও নরম কাদা ব্যবহারের মতো সহজ হয়ে যায়। তবে এই শক্ত কাদার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা আর নরম কাদার মধ্যে পোকা-মাকড় বা কীট-পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়ে অতিক্রম করা বা মাটির সাথে মিশে যাওয়া সমান নয়। এমনি করে যে ব্যক্তি দাওয়াতী কাজ করতে করতে মারা যায়, সে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মরে যাওয়া ব্যক্তির সমান হতে পারে না। যেহেতু এ ব্যক্তি কঠিন কোনো কাজ করার জন্য কষ্ট-পরিশ্রম করার চিন্তা বা চেষ্টাই করেনি।

ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার

মানব জীবনের এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর মানুষের কিছু স্বাভাবিক দাবী ও সচরাচর যে চিন্তা-ভাবনা সে করে, সে সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করা হয়েছে ঃ 'সে কি মনে করে যে, তার ওপর কেউ ক্ষমতা খাটাতে পারবে না? সে বলে, আমি যথেষ্ট সম্পদ খরচ করেছি। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখে না?'

অবশ্যই এই মানুষ যদিও সে সৃষ্টির সেরা, তবু তাকে পরিশ্রমজনিত কষ্টের মধ্যেই বাস করতে হয়। সে চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের কষ্ট থেকে রেহাই পেতে পারে না এবং এ কষ্ট একবারে শেষ হবারও নয়। তার অস্তিত্বের রহস্য ও বাস্তবতা সে ভুলে যায় এবং তাকে আল্লাহর খলীফা হিসেবে প্রদত্ত শক্তি, ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি ও সম্পদ-সম্পত্তি ব্যবহারের যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার মোহে পড়ে নিজেকে সে এ সকল জিনিসের মালিক বলে মনে করে ধোকা খায়। এই কারণেই তাকে প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করতে বা কোনো অন্যায় কাজ করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। যেহেতু সে মনে করে যে তাকে কোনোদিন পাকড়াও হতে হবে না এবং তার ওপর ক্ষমতা খাটানোরও কেউ নেই। এ ভুল চিন্তার কারণে সে প্রায় সময়েই সীমালংঘন করে, মানুষের ওপর যুলুম করে, মানুষের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, লুটপাট করে এবং এভাবে সম্পদ পুঞ্জীভূত ও বৃদ্ধি করে। আর এই সম্পদের দাপটে সে নানা প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। ঈমান থেকে মানুষের অন্তর যখন খালি হয়ে যায়, তখন তার কোনো ডর ভয় থাকে না এবং কোনো অন্যায়কেই সে পাপ মনে করে না। তারপর যখন তাকে কোনো ভাল কাজের জন্য খরচ করতে বলা হয় (যেমন এ সূরার অন্যত্র বলা হয়েছে), তখন সে বলে আমি প্রচুর এবং যথেষ্ট পরিমাণে খরচ করেছি এবং যা আমি অন্যকে দিয়েছি, আমার জন্য তাই-ই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখছে না? অথচ সে ভুলে যায় যে, তার ওপর (সদাসর্বদা) আল্লাহর নযর রয়েছে এবং তার সকল কাজই আল্লাহর জানা আছে। তিনি তো দেখেছেনই কোন্ কারণে সে কী খরচ করেছে। কিন্তু এই যে (আখেরাত-বিমুখ) 'মানুষ', সে এগুলো সব ভুলে যায় এবং মনে করে যে, সে আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে।

তার এই অহংকারের কারণেই সে নিজেকে শক্তিশালী ও অজেয় মনে করে। যে ধন-সম্পদ সে লাভ করেছে তার কারণে এবং তার হৃদয়ের সংকীর্ণতার কারণে সে মনে করে যে, সে যথেষ্ট খরচ করে ফেলেছে। আল্লাহ তায়ালা এর জবাব দিতে গিয়ে তাকে যেসব বৈশিষ্ট দিয়েছেন এবং তার যোগ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে যে সব নেয়ামত দিয়েছেন তার উল্লেখ করে বলেছেন যে, এসব নেয়ামত যাঁর কাছ থেকে সে পেয়েছে, তাঁর শোকর সে করে না এবং তাঁর হকও সে আদায় করে না। এরশাদ হচ্ছে, 'আমি (আল্লাহ তায়ালা) তার দুটি চোখ, জিহবা ও দুটি ঠোঁট কি বানাইনি এবং তাকে দুটি পথ কি দেখাইনি ?

সাধারণভাবে মানুষ শক্তির বড়াই করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালাই হচ্ছেন সকল শক্তি ও নেয়ামত দানকারী। শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী হওয়া একমাত্র তাঁরই দান। সে ধন, সম্পদের বড়াই করে, অথচ তার বুঝা দরকার যে, এ অর্থ-সম্পদ তিনিই দিয়েছেন। এই অহংকারের কারনেই সে সঠিক পথ গ্রহণ করতে চায় না এবং শোকরও করে না। যুক্তির এই জগতে বিচরণের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন। তাকিয়ে দেখুন এক একটি করে দেয়া আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতগুলোর দিকে। তিনি বানিয়ে দিয়েছেন তার জন্য (কী সুন্দর করে) মহামূল্যবান দুটি চোখ। যার নির্মাণ কৌশল কতো জটিল ও নিপুণ, যার দৃষ্টিশক্তি কত আশ্চর্যজনক! তিনি কথা বলার শক্তি দিয়ে, যার দ্বারা কতো সুন্দরভাবে সে মনের ভাব প্রকাশ করে। তাকে অন্য জীব থেকে পৃথক করেছেন, আর এই কাজের জন্য তাকে দিয়েছেন (বহিরাংগ) জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট। তারপর দিয়েছেন ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার বিশেষ যোগ্যতা ও শক্তি। সঠিক ও বেঠিক পথের মধ্যে পার্থক্য জানা, বুঝা ও বাছাই করার সক্ষমতা ও স্বাধীনতা, যাতে করে এ দুয়ের মধ্যে যেটা খুশী সে গ্রহণ করতে পারে। আরও দিয়েছেন তাকে সত্য ও অসত্য পথের খবর। এরশাদ হচ্ছে,'এবং আমি (আল্লাহ তায়ালা) তাকে দুটি পথ দেখিয়েছি' যাতে দুটির যে কোনো একটা সে খুশীমতো গ্রহণ করতে পারে।

তার প্রকৃতির মধ্যে দুটির যে কোনো একটি গ্রহণ করার ক্ষমতা পুরোপুরিই দেয়া হয়েছে। 'নাজ্দ' বলতে বুঝায় সুউচ্চ গিরিপথ। আল্লাহ তায়ালা তাকে এই দুটি পথের যে কোনোটাতে সে যেন চলতে পারে তার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর বৈবাহিক জীবন পদ্ধতির মাধ্যমে তার সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে চালু রাখা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি-কৌশলের এক বিশেষ নিয়ম। সকল সৃষ্টির জন্যে বিভিন্ন আকৃতি, রূপদান এবং পৃথিবীর বুকে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে তার উপযোগী পেশায় নিয়োজিত করা এ সবই আল্লাহ তায়ালার একান্ত মেহেরবানী।

আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে মানব প্রকৃতির মূল রহস্য উঘাটন করা হয়েছে, যেমন করে আর একটি নিয়ম রয়েছে (যাকে ইসলামের আধ্যাত্মিক মতবাদ বলে) সে সম্পর্কে আলোচনা এসেছে সূরা 'আশ্ শামস' এ। এতে বলা হচ্ছে, 'কসম মানবাত্মার এবং তাঁর, যিনি একে সুসামঞ্জস্য করে তৈরী করেছেন। তারপর এর মধ্যে দান করেছেন পাপ-প্রবণতা ও নেকী করার পবিত্র আবেগ। সেই ব্যক্তি অবশ্যই সাফল্য লাভ করলো, যে একে পবিত্র রাখলো এবং সে ব্যর্থ হলো যে, একে ষড়যন্ত্রের কারখানা বানিয়ে কলুষিত করলো।' ইনশা আল্লাহ্, আমরা এ বিষয়ে সূরা 'আশ্ শামস'-এর বিস্তারিত আলোচনা করবো।

উল্লেখিত এই সকল জিনিস আল্লাহর দেয়া সব নেয়ামত যা শুধুমাত্র মানব জাতিকেই তিনি দিয়েছেন, যাতে করে সে তার মধ্যে নিহিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে, তার উচিত জগতের বুকে ভূমিকা রাখা এবং সঠিক পথে চলার ব্যাপারে সাহায্য করা। যে দুটি চোখ দিয়ে সে আল্লাহ

তায়ালার ক্ষমতার নিদর্শনগুলো দেখে সেগুলো তার ঈমানকেও উজ্জীবিত করে। আসলে আল্লাহ তায়ালার শক্তি ক্ষমতার নিদর্শন বিশ্বের সর্বত্র এতো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে, যে কোনো চিন্তাশীল লোকই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

তার জিহবা ও ঠোঁট দুটি তার মনের ভাব ও অন্য যে কোনো জিনিসের বিবরণ পেশ করার মাধ্যমে। এগুলো দ্বারা মানুষ আরও বহু কাজ করে তা এতো বেশী কার্যকর ও তীক্ষ্ম যে, অনেক সময় সে কথাগুলো তরবারি ও বন্দুকের তীক্ষ্মতাকেও হার মানায়। জিহবার অবদান হচ্ছে কথা, তা একদিকে যেমন জান্নাতের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়, তিমনি জাহান্নামের দিকেও মানুষকে ধাবিত করে, আবার জাহান্নামের আগুন নিভাতেও সাহায্য করে।

হযরত মায়া'য ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি বলেন এক সফরে আমি নবী করীম (স.)-এর সাথে ছিলাম, একদিন আমি তার পাশাপাশি চলছিলাম তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তিনি বললেন, 'তুমি এক বিরাট জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বসেছো। অবশ্য এটা তার জন্যই সহজ, যার জন্য আল্লাহ তায়ালা এটাকে সহজ করে দিয়েছেন। আর সে কাজ হচ্ছে, তুমি আল্লাহ্‌র নিরংকুশ আনুগত্য করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত (নামায) কায়েম করবে, যাকাত দান করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং হজ্জ করবে।

(একটু থেমে) তিনি পুনরায় বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দুয়ারসমূহের দিকে পথ নির্দেশ করবো না? বললাম, অবশ্যই ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, 'রোযা হচ্ছে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য ঢাল, দান খয়রাত ক্রটি বিচ্যুতিকে তেমনি করে মুছে দেয়, যেমন করে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর গভীর রাতে উঠে নামায পড়া নেককার লোকদের জন্য ঈমানের পরিচয়বাহী বিশেষ এক চিহ্ন।

এক পর্যায়ে তিনি কোরআনে উল্লেখিত আল্লাহ পাকের আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'তারা তাদের দেহের পার্শ্বগুলোকে বিছানা থেকে তুলে নেয়'। তারপর বললেন, তোমাকে শীর্ষ স্থানীয় একটি কাজের কথা বলবো কি? আর বলব কি সেই স্তম্ভগুলো সম্পর্কে যা এই কাজকে খাড়া রাখতে সাহায্য করে, সর্বোপরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা সর্বোচ্চ চূড়া সম্পর্কে কি জানাবো? বললাম, অবশ্যই বলুন, ইয়া রসূলাল্লাহ।

তিনি বললেন, শীর্ষস্থানীয় কাজ বা কাজের মাথা হচ্ছে ইসলাম। এর সহায়ক খুঁটিগুলো হচ্ছে নামায, আর সর্বোচ্চ কাজ হচ্ছে সর্বাত্মক সংগ্রাম (জেহাদ)। এরপর রসূল (স.) আবার বললেন, তোমাকে বলবো কি এসব কিছুর পরিচালিকা শক্তি কোন জিনিস? বললাম, অবশ্যই বলুন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, বলোতো তোমার ওপর এর প্রভাব কতোটুকু, এই বলে তিনি তাঁর নিজের জিহবার দিকে ইশারা করলেন। তখন আমি বললাম হে আল্লহর নবী, আমাদের কি পাকড়াও করা হবে সে সকল কথার জন্যে–যা আমরা কথা প্রসংগে বলি? তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুন! তুমি এতোটুকু কথা বুঝলে না?'*

জিহবার আগা যে ফসলগুলো কাটে (অর্থাৎ যে কথাগুলো উচ্চারণ করে) সেগুলো ছাড়া আর কোন্ জিনিসের কারণে মানুষকে মুখের ওপর ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে (অথবা বলেছেন নাকের ডগার ওপর ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে) টেনে নিয়ে উল্টা করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে? (রেওয়ায়াত করেছেন আহমাদ, তিরমিযি, নাসায়ী এবং ইবনে মা'জা)।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালো এবং মন্দের বুঝ দান করেছেন এবং জানিয়েছেন তাকে জান্নাত ও দোযখের পথ। আর এই পথনির্দেশনার মাধ্যমে ভালো পথ গ্রহণের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছেন।

এই সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকার কারণে মানুষ জীবনের দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করতে সাধারণভাবে অনিচ্ছুক হয় আর এই দুর্গম ও দুর্ভেদ্য পথই তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধার বিন্ধাচল হিসাবে দন্ডায়মান। এই দুর্গমগিরি পার হয়েই সকল আশা-আকাঙ্খার কেন্দ্রবিন্দু চির-বাঞ্ছিত অমর জান্নাতে পৌঁছুতে হয় যার বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতগুলোতে পেশ করেছেন।

এরশাদ হচ্ছে, (এতসব নেয়ামত মানুষকে আমি দিয়েছি ......তারাই হবে ডান দিকে যারা থাকবে সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।' (আয়াত ১৩-২০)

জীবন পথে চলতে গিয়ে মানুষকে মাঝে মাঝে দুর্গম গিরি অতিক্রম করতে হয়। তবে ব্যতিক্রম সেই ব্যক্তি যে পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে। আসলে, এটিই হচ্ছে কোরআনে উল্লেখিত সেই কন্টকাকীর্ণ গিরিপথ, যা তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাধাকে অপসারিত করার দৃঢ় মনোবল নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলেই সে তার বাঞ্ছিত মনযিলে পৌঁছে যাবে। সে পথের যে চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে, তা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই বাঁধা অতিক্রম করে মহা সাফল্যের মনযিলের দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে যে এই প্রবল বাধাগুলোকে স্পষ্টভাবে বুঝেছে এবং তা পার হওয়ার দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করতে পেরেছে। 'কিন্তু না, সে সেই দুর্গম গিরিপথ পাড়ি দিলো না' এ কথাটির মধ্যে রয়েছে মানুষকে কঠিন পথে এগিয়ে দেয়ার জন্য এক বলিষ্ঠ অনুপ্রেরণা, রয়েছে বাধা-বিঘ্নকে উপেক্ষা করে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করার এক প্রবল উৎসাহ!

দুস্থ মানবতার পাশে ইসলাম

এরপর, এ লক্ষ্যবস্তুর গুরুত্ব ও মাহাত্ম তুলে ধরা হয়েছে এই আয়াতে, 'তুমি কি জানো, 'দুর্গম পথ' বস্তুটি কি?' আসলে এ কথার দ্বারা ওই পথের জটিলতা তুলে ধরাই শুধু উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহর কাছে আসল গুরুত্ব হচ্ছে কষ্টকর হলেও ওই পথটি পার হতে হবে একথাটি বলা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলতে চান, ঐ পথটি অত্যন্ত কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমাদেরকে এ পথটি পার হতেই হবে। কারণ সে পথটি অতিক্রম করতে পারলেই মনযিলে মকসূদে উপনীত হতে পারবে। এই পর্যায়ে আরও একটি কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, মূল্যবান জিনিস মূল্য দিয়েই গ্রহণ করতে হয়। চাওয়া-পাওয়ার লক্ষ্যবস্তু যতো বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান হবে তা অর্জন করতে ততো বেশী কষ্ট করতে হবে ও অজস্র ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সংগে সংগে একথাটিও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সে কঠিন পথ-পরিক্রমা তথা কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার কখনও বৃথা যেতে পারে না। সর্বশক্তিমান ও সবকিছুর মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এ আশ্বাসবাণী পাঠকের মনকে অবশ্যই উৎসাহিত করবে। আশার আলোকে উদ্ভাসিত করবে তার গোটা দেহ মনকে।

আল্লাহ তায়ালার এই চিত্তাকর্ষক ভাষার মাধ্যমে 'আকাবা'র যে ছবিটি এখানে ফুটে উঠেছে, তা মানুষকে আলোচ্য সত্য-সঠিক লক্ষ্য বস্তুর গুরুত্ব ও মাহাত্ম বুঝতে সাহায্য করেছে এবং সেই দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই আয়াতগুলোতে এক মধুর আবেগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ছিন্নবস্ত্র ও অসহায় মানব সন্তান গোলামীর জিঞ্জীর পরে তোমার দুয়ারে কী করুণ অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। চেয়ে দেখো একবার হে সভ্যতাগর্বী মানুষ! মানবতার এ নিদারুণ ব্যথা দূর করার জন্য তুমি কি এগিয়ে আসবে না? সৃষ্টিকর্তার রহস্য প্রত্যাশী হে মোমেনরা! বস্ত্রহীন সেই অসহায় মানুষকে গোলামী থেকে মুক্ত করা, অন্নকষ্টে জর্জরিত বুভুক্ষু আদম সন্তানকে অন্নদান করা, ব্যাধিগ্রস্ত, রোগক্লিষ্ট, শক্তিসামর্থহীন, পথের কাংগাল, যারা সকল যামানায় বিত্তশালী ও যুলুমবাজদের হিংস্র ব্যবহারে নিস্পিষ্ট, তাদের উদ্ধারকল্পে এবং মানবতার গৌরবাসনে তাদেরকে পুনরায় সমাসীন করতে তোমরা এগিয়ে এসো। হে মোমেন, মুছে দাও অবহেলিত মানবতার এই নিদারুণ গ্লানি, তবেই তো তুমি রহমানুর রহীমের করুনা ধারা পাবে। মানবতার এই মুক্তি ধারায় যারা সঠিক অবদান রাখতে পেরেছে তাদের জন্য পরবর্তী আশ্বাসবাণী 'তারপর তারা ওই সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে, সবর করার জন্য ও যথাযথভাবে দুস্থ মানবতার প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার জন্যও একে অপরকে উপদেশ দিচ্ছে।'

বলা হয়, 'ফাককু রাক্বাবাতিন' শব্দ দুটির অর্থ দাস বা দাসীকে মুক্ত করায় শরীক হওয়া 'এতকুন' অর্থ পুরোপুরি মুক্ত করা। অর্থ যাই হোক না কেন, এক উদ্দেশ্যেই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং মূল লক্ষ্যও দুইয়ের একটিই।

মক্কায় ইসলামের চরম দুর্দিনে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। ইসলামী শরীয়তের বিধি বিধান চালু করার জন্যে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রক্ষমতা, তখনও রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হাতে আসেনি আর সেই সময় সাধারণভাবে আরবের সে সমাজে দাস-প্রথা চালু ছিলো। আরব-উপদ্বীপের বাইরে অনেক জায়গাতেও এ বিশ্রী প্রথা চালু ছিলো। তখনকার দিনে দাসদেরকে অত্যন্ত কঠিনভাবে খাটানো হতো। তারপর এক সময় তাদের মধ্যে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন আম্মার ইবনে ইয়াসের ও তাঁর পরিবার, বেলাল ইবনে রাবাহ, সোহায়ব এবং আরও অনেকে (আল্লাহ তায়ালা এদের সবার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন)। এদের দাম্ভিক মনিবরা তাঁদের ওপর অশেষ নির্যাতন চালাতো। এদের ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদেরকে তাঁদের শক্তির বাইরে কষ্ট দেয়া হতে লাগলো। তাদের এই দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত করার একটিই পথ ছিলো আর তা হলো, তাদের ওই হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মনিবদের থেকে তাদেরকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়া। আবূ বকর (রা.) ছিলেন সেই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ ব্যাপারে সবার আগে এগিয়ে আসেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে পাওয়া আল্লাহর এই ডাকে সাড়া দেন। এই দাস-মুক্তি ও অন্যান্য হুকুম পালনের ব্যাপারে তার সাহসিকতাপূর্ণ কাজ আজও এক নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, বেলাল ছিলেন আবূ বকরের মুক্ত করা ক্রীতদাস, তিনি যদিও ক্রীতদাস ছিলেন, কিন্তু দিলেন সাচ্চা মুসলমান। তার মনিব ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফ। দুপুরে সূর্যের তাপ যখন অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে যেতো, সেই সময়ে সে তাঁকে বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে গরম বালির ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিতো। তারপর বিরাট এক পাথর এনে তার বুকের উপর চাপা দিয়ে রাখার জন্য কাউকে হুকুম দিতো। এরপর বলতো, এই অবস্থায় থেকে থেকে তুই মরে যাবি, তবু তোকে ছাড়বো না–যদি মোহাম্মদকে অস্বীকার করে 'লাত' ও 'ওযযাকে' মাবূদ রূপে গ্রহণ না করিস। এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় তাঁর মুখ থেকে অস্পষ্ট স্বরে বেরুতে থাকতো, 'আহাদ, আহাদ'।

একদিন সেই পথ দিয়ে আবূ বকর (রা.) যাচ্ছিলেন। তখন বেলাল (রা.)-কে এই কঠিন দুরাবস্থায় দেখতে পেলেন। তার বাড়ী ছিলো বনী জামাহ গোত্রের এলাকায়। এই করুণ অবস্থা দেখে তার মন কেঁদে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে তিনি উমাইয়া ইবনে খালফকে বললেন, এই সর্বহারার ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় করো না? একে মরণ পর্যন্ত এই অবস্থায় রাখতে চাও? এর ওপর আর কতো অত্যাচার করতে চাও? সে বলল, 'তুমিই তো একে নষ্ট করেছো, এখন পারলে তুমি এ কষ্ট থেকে ওকে বাঁচাও।' তখন আবূ বকর (রা.) বললেন, ঠিক আছে, যা দরকার হয় আমি করবো, আমার কাছে ওর থেকে ভালো ও শক্তিশালী কালো একজন গোলাম আছে এবং সে তোমার ধর্মের অনুসারীও বটে। এর বদলে তাকেই তোমায় দিতে চাই।' সে বললো, 'বেশ আমি রাযী হলাম।' আবূ বকর (রা.) বললেন, 'বহুত আচ্ছা, এখন থেকে সে তোমার'। সুতরাং আবূ বকর (রা.) তাকে সেই গোলামটি দিয়ে বেলাল (রা.)-কে মুক্ত করেদিলেন।

তারপর, মদীনায় হিজরত করার পূর্বে বেলাল (রা.)-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আবু বকর (রা.) আরও ছয়জন গোলামকে আযাদ করেছিলেন। বেলাল (রা.) ছিলেন সপ্তম ব্যক্তি (যাঁকে ইসলাম গ্রহণের কারণে আযাদ করা হয়েছিলো)। এরা হচ্ছেন ১। আমির ইবনে ফুহায়রাহ্ (তিনি বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং বী'রে মাউনা অর্থাৎ মাউনা নামক কূপের কাছে যে প্রচারক দলকে হত্যা করা হয়েছিলো তাদের সাথে থেকে শহীদ হন) ২। উম্মে উবায়েস। ৩। যান্নীরা (কিংবা যোনায়রা–যাকে আযাদ করার পূর্বেই তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাকে কোরায়শের লোকেরা দেখে বলে উঠেছিলো, 'লাত ও ওযযা দেবীরাই ওর চোখ নষ্ট করে দিয়েছে।' একথা শুনে এ বীরাংগনা মোমেনা বলেছিলেন, বায়তুল্লাহ্র (আল্লাহর ঘরের) কসম, ওরা মিথ্যা বলেছে। লাত ও ওযযা না পারে কোনো ক্ষতি করতে আর না পারে কোনো উপকার করতে। এর পরে আল্লাহ তায়ালা সেই মহীয়সী মহিলার চোখ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নাহ্দিয়াহ্ এবং তার কণ্যাকে আযাদ করেছিলেন। এরা দুজনেই বনী আব্দুদ্দার গোত্রের এক মহিলার দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ ছিলেন। একদিন উক্ত মহিলা এদেরকে আটা তৈরী করতে দিয়ে কথা প্রসংগে বলে, আল্লাহর কসম, তোদের আমি কোনোদিন মুক্তি দেবো না।

কথাটি জানতে পেরে আবূ বকর (রা.) তাকে অনুরোধের সূরে বলেন, দয়া করে তোমার কসম ফিরিয়ে নাও এবং ওদেরকে মুক্তি দিয়ে দাও! অর্থাৎ তোমার দাসত্বের নিগড় থেকে ওদেরকে দয়া করে আযাদ করে দাও। সে বললো, 'তুমিই তো ওদের নষ্ট করেছো, এখন তুমি ওদেরকে আযাদ করো।' আবূ বকর (রা.) বললেন, ঠিক আছে, ওদের দাম কতো বলো।' সে বললো, 'এতো এবং এতো।' আবূ বকর (রা.) বললেন, 'ঠিক আছে। আমি ওদের নিয়ে নিলাম আজ থেকে ওরা মুক্ত স্বাধীন। যাও, সে মহিলাকে তার আটা ফিরিয়ে দিয়ে এসো।' ওরা বললেন, হে আবূ বকর, আমরা ওর আটাটা তৈরী করে দিয়ে আসি।' আবূ বকর (রা.) বললেন, 'এটা তোমাদের খুশী।'

সপ্তম ব্যক্তি হচ্ছেন বনি আদি কাবীলার একজন মহিলা, তিনি ছিলেন বনি মোয়াম্মাল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তাকে ভীষণ কষ্ট দিতেন। এতে করে তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করেন। একদিন ওমর এ মহিলাকে মারধর করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ওই সময় তিনি বললেন, 'আমাকে মাফ করো, তোমাকে মারা আমি এই জন্য শুধু বন্ধ করেছি যে, আমি অত্যন্ত

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' মহিলাটি বললেন, হাঁ আল্লাহ্ তায়ালাই আপনাকে ক্লান্ত করে দিয়েছেন।' এরপর আবু বকর (রা.) তাকেও খরীদ করে মুক্ত করে দেন।

ইবনে ইসহাক মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়রের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি পরিবারের এক ব্যক্তির কাছে শুনেছেন যে, আবূ কোহাফা [আবূ বকর (রা.)-এর পিতা] তাঁকে বলেন, হে আমার ছেলে, আমি দেখছি, তুমি শুধু দুর্বল দাসদেরকে মুক্ত করছো, এমন করলে কি ভালো হতো না যে, কিছু সামর্থবান লোকরেদকেও আযাদ করতে, তাহলে তারা দরকারে তোমার পাশে দাঁড়াতো এবং বিপদ-আপদে তোমাকে সাহায্য করতো! আবূ বকর (রা.) বললেন, 'আব্বা, আমি যা কিছু করছি তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করছি।'

এইভাবেই সিদ্দীকে আকবার (রা.) অসহায় কৃতদাসদেরকে মুক্ত করে সেই 'দুর্ভেদ্য দুর্গম ঘাঁটি' পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি এ কাজ করেছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। তৎকালীন পরিস্থিতিতে তার এই পদক্ষেপ ও সদয় আচরণ আল্লাহর পথে সে দুর্গম ঘাঁটি পার হওয়ার ব্যাপারে এক অনবদ্য অবদান রেখেছিলো। এ প্রসংগে উল্লেখিত আল্লাহর বাণী, 'অথবা খাদ্য দান করো দুর্ভিক্ষের দিনে নিকটাত্মীয় ও এতীমদেরকে, অথবা ধূলামলিন, নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদেরকে।'

'মাসগাবাতুন' বলতে বুঝায় জাহেলী যুগের ওই ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনকে, যখন খাদ্যসংকট চরম রূপ নিয়েছিলো, সেই সময়ে অভুক্তদেরকে খাদ্য দানই ছিলো ঈমানের প্রমাণ পেশ করার একটি বড় উপায়। জাহেলী যুগে আরবের এ নিষ্ঠুর পরিবেশে এতীমদের সাথে চরম হৃদয়হীন ব্যবহার করা হতো। তাদের প্রতি যুলুম নির্যাতন, অবিচার অনাচার, সকল সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলো। এমনকি অতি আপন লোকদের সন্তানরা এতীম হয়ে গেলে তাদের সাথেও এই একই আচরণ করা হতো। এই সময়ে ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে কোরআনের বিভিন্ন অধ্যায়ে উপদেশের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে। যেগুলো দেখলে সে সমাজে এতীমদের প্রতি যে কি নিদারুণ ব্যবহার করা হতো তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। মাদানী সূরাগুলোতেও মীরাস, ওসিয়ত ও বিয়ে-শাদী সম্পর্কিত আইন প্রবর্তন উপলক্ষে এতীমদের ব্যাপারে বহু উপদেশ এসেছে। বিশেষভাবে সূরা 'নেসা'-তে' এ বিষয়ক আলোচনা প্রচুর।

সূরা বাকারা সহ আরও কয়েকটি সূরাতে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে এ আলোচনা এসেছে। এসেছে অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্ব মানব শ্রেণীকে খাদ্য খাওয়ানোর কথা। এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সে সব মানুষ, যারা ক্ষুধার জ্বালা ও চরম দুরবস্থার কারণে মাটির সাথে মিশে থাকতো। কোরআন পাকে চরম 'দুর্ভিক্ষের দিন' এ খাদ্য দান শব্দটি উল্লেখ করে এ কাজের সাথে ভীষণ কন্টকাকীর্ণ 'দুর্গম গিরিপথে' চলার তুলনা করা হয়েছে।

কারণ এ দুঃসময়ে সবাই যখন কঠিন দুর্যোগের কবলে পতিত, তখন ত্যাগ-তিতিক্ষা, দয়া-সহানুভূতি, দুঃস্থ মানুষের খোঁজ-খবর নেয়া ও নিজ প্রয়োজনের ওপর অপরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দানের মাধ্যমে যে ঈমানী জয্বা ফুটে ওঠে এবং একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির আকাংখার উদ্দেশ্যে দাসমুক্তি ও খাদ্য দানের যে বদান্যতার বহিপ্রকাশ ঘটে তা অবশ্যই গভীর ঈমানী চেতনার পরিচয় বহন করে। যদিও অন্যান্য সময়ে এ দুটি গুণ অনেকের মধ্যে পাওয়া যায়! কিন্তু এ কঠিন সময়ে এ দুটি কাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ হয়েছে। তারপর এই কঠিন কাজ এ কঠিন সময়ে যারা করতে পেরেছে তারাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেই মোবারক দলে—যারা ঈমান এনেছে এবং একে অপরকে উপদেশ দিয়েছে সবরের ও দয়া প্রদর্শনের।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কেতাবে যে বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তারই কারণে সকল শব্দ সকল জায়গায় একইভাবে ব্যবহৃত হয়নি। তাই, 'সূম্মা' এখানে সময়-জ্ঞাপক হিসেবে

আসেনি, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে এ শব্দটি (অব্যয়টি) যেন সেই কথার–ভূমিকা।

এই ভূমিকা দ্বারা এই কথাটি বলতে চাওয়া হচ্ছে যে, ঈমান আনার কারণেই তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সবর করার উৎসাহদান, দয়া, মায়া, মমতা, ভালবাসা বিনিময়ের অভ্যাস গড়ে উঠেছে। আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস ও তাঁর প্রিয় হওয়ার প্রবল আকাংখা না থাকলে এই গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। মুল্যবান গোলাম, যার দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যায় এবং আরাম-আয়েশ লাভ করা সম্ভব হয় তাকে মুক্ত করে স্বাধীন করে দেয়া ও কঠিন দুর্দিনে অভাবী মানুষদের খাবার খাওয়ানো পার্থিব দৃষ্টিতে বড় একটা ক্ষতি স্বেচ্ছায় মেনে নেয়ার নামান্তর কিন্তু আখেরাতের বিচার দিনে পাপ-পূণ্য ওযনের পাল্লায় যে এটি বিরাট অবদান রাখবে একথার প্রতি গভীর ও অবিচল ঈমান না থাকলে এ কাজ করা কঠিন। একমাত্র পাক্কা ঈমানদার ব্যক্তিই অনুভব করে যে, এই ত্যাগ স্বীকার ব্যর্থ হবে না এবং এর বিনিময় সেই কঠিন দিনে পাওয়া যাবে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি আকারে, যা সেদিন তার বড় প্রয়োজন হবে।

আল্লাহ তায়ালা যেন বলতে চান, দাসমুক্তি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বন্দীমুক্তি বা ঋণগ্রস্তকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে ঋণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ করে দেয়া অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অভাবীদেরকে খাওয়ানো, কিংবা বাস্তহারাকে আশ্রয় দান, সর্বোপরি পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে যাওয়া এবং পরস্পরের মধ্যে সবরের উৎসাহ দান ও দয়া প্রদর্শন করা–এগুলো বড়ই মহৎ গুণ। সুতরাং 'সুম্মা' এখানে সম্মান ও মহত্তের গুণকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে।

ঈমানদার মানুষের সাধারণ গুণাবলীর মধ্যে সবরের গুণটি এক বিশেষ উপাদান। দুর্গম ঘাঁটি অতিক্রম করা হচ্ছে একটি বিশিষ্ট গুণ। এসব গুণ অর্জনের জন্য উৎসাহ দান সবরের মর্যাদার ওপর অতিরিক্ত আর এক ধাপ মর্যাদা বয়ে আনে, মোমেনদের দল অবশ্যই এ গুণটির অধিকারী হবে। সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকার জন্য এরা পরস্পরকে উৎসাহ দেবে এবং উপদেশ দান করার মাধ্যমে এ গুণটিকে বাস্তব রূপ দেবে। ঈমানী চেতনাকে কাজে লাগানোর জন্য এই গুণের অধিকারীরা একে অপরের সহযোগিতা করে।

সবরের এ গুণটি হচ্ছে এক তীব্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। যার দ্বারা ইসলামী দলের লোকেরা পৃথিবীর বুকে ঈমান ও তার দাবী প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম-সাধনায় প্রচুর শক্তি লাভ করে। এ জন্যেই তারা পরস্পরকে সবরের মযবুত বাঁধনে আবদ্ধ রাখতে চায়। তারা একে অপরকে দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে, যেন কোনো অবস্থাতেই তাদের মধ্যে অস্থিরতা না আসে। এহেন ইসলামী দলের সদস্যরা পরস্পরকে শক্তি যোগায়, যার ফলে এরা জীবনের কোনো অবস্থাতেই হার স্বীকার করে না।

একটু চিন্তা করলেই এটা বুঝা সহজ হবে যে, সবরের এই কাজটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের কোনো গুণ নয় এটি একটি সামষ্টিক গুণ। তবে হাঁ ব্যাক্তিগতভাবে কারো মধ্যে সবর থাকলে তাও ওই একইভাবে মোমেনদের দলবদ্ধ জীবনে অপরের জন্য উদ্দীপক শক্তি হিসেবে কাজ করে। মানুষের মধ্যে লালিত এ গুণটি তাকে অপমানিত বা লাঞ্চিত করে না, বরং তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তা সহায়ক হয়। তাকে কোনো অপমানজনক পরাজয়ের দিকে এগিয়ে দেয়না, বরং তাকে 'দুর্গম' ও কঠিন পথ-পরিক্রমায় শক্তি যোগায়। তার অন্তর মনকে ভয়ে আচ্ছন্ন করে না, বরং তাকে দান করে এমন এক আত্মসম্ভ্রম যার কারণে সে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করে।

এ ভাবে মোমেনের যেন্দেগীতে পারস্পরিক দয়ামায়া প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ দান সমভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। দয়া প্রদর্শনের সাথে সাথে এ গুণটি আর একটি বাড়তি গুণ হিসেবে কাজ করে। দলবদ্ধ যেন্দেগীর প্রতিটি ধাপে দয়া-সহানুভুতির পারস্পরিক বিনিময় সে দলের সদস্যদের মধ্যে

ব্যক্তিগতভাবে দয়ালু হওয়া ও দয়া প্রদর্শন করার মহৎ গুণ সৃষ্টি করে। এভাবে ব্যক্তি মানুষ থেকে সঞ্চারিত দয়া-সহানুভূতির স্রোতধারা সমষ্টির মনোজগতে এক দুর্জয় প্লাবন আনে। তদুপরি অপরকে উৎসাহ দান করা ব্যক্তিগত গুণের মর্যাদা থেকে উন্নীত করে সামষ্টিক গুণে পরিণত করে। এর ফলে সামষ্টিক জীবনে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় বৃদ্ধি পায় এবং একে অপরকে সাহায্য করার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

এ জীবন ব্যাখ্যার মধ্যে জামায়াত বা দলবদ্ধ জীবন যাপন ও দলবদ্ধভাবে কাজ করার কথা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এ দলবদ্ধ যেন্দেগী সম্পর্কে যেমন কোরআনের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট কথা এসেছে-হাদীসেও এ বিষয়ে পরিষ্কার বর্ণনা এসেছে, যাতে করে দ্বীন ইসলামের মূল উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে দলের প্রয়োজন যথাযথভাবে অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হচ্ছে গোটা মানবমন্ডলীর সুখশান্তি সমৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রদত্ত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এখানে ব্যক্তির স্বার্থ ও প্রয়োজনকে পুরোপুরি অক্ষুন্ন রেখেই সমষ্টির নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসা এই জনতাই 'দুর্গম পথ' অতিক্রম করবে। এদের সম্পর্কেই কোরআনে পাকে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। বলা হচ্ছে, 'ওরাই ডানপন্থী যারা যুক্তিপূর্ণ ও সঠিক পথের শান্তিকামী যাত্রী।' এভাবে কোরআনের আরও বিভিন্ন স্থানে এই ডানপন্থী লোকদের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এদের কথা বলা হয়েছে যে, এরা দক্ষিণপন্থী, এরাই সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী। ওপরে বর্ণিত উভয় অর্থই ঈমানী যেন্দেগীর সাথে সামঞ্জস্যশীল।

'আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আমার আয়াতগুলোতে যথাযথ বিবৃত এবং সুস্পষ্ট বর্ণিত করা ও নিশ্চিত সত্য সমাগত হওয়ার পর তাকে অস্বীকার করে যারা কুফরী করেছে তারাই হচ্ছে বামপন্থী, তাদের জন্যই রয়েছে আটকে রাখা আগুন যা তাদেরকে ঘেরাও করে রাখবে।'

এখানে এসে বামপন্থীদের বর্ণনা দিতে গিয়ে নীচের এই কথাটি ছাড়া অন্য কোনো গুণ বর্ণিত হয়নি। 'আমার আয়াতগুলোকে যারা অস্বীকার করেছে; কারণ অস্বীকার করার এই খাস্‌লতটি উদ্দেশ্যের দিকে ও সঠিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে বিরাট অন্তরায়। সুতরাং কুফর বা অস্বীকৃতির সাথে কোনো কল্যাণ বা 'ভালো'র কোনো সম্পর্ক নেই। আর 'কুফরী' থেকে নিকৃষ্ট জিনিস আর কিছু নেই। সব মন্দ এই কুফরীর মধ্যেই নিহিত।(১)

এরাই হচ্ছে বামপন্থী হতভাগার দল। বামপন্থী বা হতাশাবাদী হওয়ার কারণে এরা চরমভাবে অধপতিত। এরা 'দুর্গম ঘাঁটির' অপর প্রান্তে অবস্থান করবে, ঘাঁটি পাড়ি দিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌছানো এদের পক্ষে সম্ভব নয়।

'এদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে আবদ্ধ করে রাখা আগুন।' অর্থাৎ এমন আগুন যা তাদেরকে ঘিরে রাখবে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, যখন তারা দোযখের আগুনে শাস্তি পেতে থাকবে, তখন তার দরজাগুলো বন্ধ থাকার কারণে তার তাপ বের হওয়ার কোনো রাস্তা থাকবে না, অথবা এর অন্য অর্থ এটা হতে পারে যে, ওরা সে আযাবের জায়গা থেকে কোনোভাবেই আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। কেননা আল্লাহরই হুকুমে ও ব্যবস্থাপনায় তাদের ওখানে আবদ্ধ থাকা। অতএব, সে প্রতিবন্ধকতা দূর করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অবশ্য দুটি অর্থ একে অন্যের পরিপূরক-বিরোধী নয়।

এই স্বল্প পরিসরে মানুষের সীমিত শক্তি ও ব্যাখ্যার যোগ্যতায় উপস্থাপিত এগুলোই হচ্ছে মানব-জীবনের মৌলিক সত্য, যা ঈমানী দৃষ্টিকোন থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে এবং এগুলো কোরআনের বিশেষ বর্ণনাভংগি ও একক ব্যখ্যায় বর্ণিত চরম সত্য!

---

(১) প্রচলিত পরিভাষায় ডানপন্থী ও দক্ষিণপন্থী বলতে যা বুঝায় কোরআনে বর্ণিত এ পরিভাষার সাথে কিন্তু এর কোনো সম্পর্ক নেই-কোরআনে নেককাজকে মাঝে মাঝে 'ডান বা দক্ষিন' বলে পেশ করা হয়েছে।-সম্পাদক

সূরা আশ্ শামস

আয়াত ১৫ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣ وَالَّيْلِ
اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَّمَا
سَوّٰهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَآ ۝١١ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ۝١٢ فَقَالَ لَهُمْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۥ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ
رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا ۝١٤ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝١٥

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. শপথ সূর্যের এবং তার রৌদ্রচ্ছটার, ২. শপথ চাঁদের যখন সে (সূর্যের) পেছনে পেছনে আসে, ৩. শপথ দিনের যখন সে তাকে আলোকিত করে ফেলে, ৪. শপথ রাতের যখন সে তাকে ঢেকে দেয়, ৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন– তাঁর, ৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন– তাঁর, ৭. শপথ মানব প্রকৃতির এবং যিনি তার যথাযথ বিণ্যাস স্থাপন করেছেন– তাঁর, ৮. অতপর আল্লাহ তায়ালা তা তার পাপ (পথে গমন) ও (পাপ) থেকে বেঁচে থাকার জ্ঞান প্রদান করেছেন, ৯. নিসন্দেহে মানুষের মধ্যে সে-ই সফলকাম যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে, ১০. আর যে তাকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে, ১১. সামুদ জাতি তার অবাধ্যতার কারণে (আল্লাহর নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, ১২. যখন তাদের বড়ো না-ফরমান ব্যক্তিটি ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠলো, ১৩. তখন আল্লাহর নবী তাদের বললো, এ হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো উটনী এবং এ হচ্ছে তার পানি পান (করার জায়গা); ১৪. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং উটনীটিকে তারা হত্যা করে ফেললো, অতপর তাদের এ না-ফরমানীর কারণে তাদের মালিক তাদের ওপর (মহা) বিপর্যয় নাযিল করলেন, অতপর তিনি তাদের (মাটির সাথে) একাকার করে দিলেন, ১৫. (আর রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালা,) তিনি এসব ব্যাপারে (যে পাপিষ্ঠ) তার পরিণতির পরোয়া করেন না।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই ছোট্ট সূরার মধ্যে একটিমাত্র আলোচ্য বিষয়, একটি মাত্র সুরের ঝংকার রয়েছে। তবে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্য থেকে বেশ কয়েকটি সুন্দর ছবি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভংগিতে সূরাটির শুরুতে তুলে ধরা হয়েছে। অন্য যে সব বিষয়ের আলোচনা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে মানব-সৃষ্টির রহস্য ও তার প্রকৃতিগত শক্তিনিচয়, তার ঝোঁক প্রবণতা, তার পছন্দ ও ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে তার নিজস্ব দায়িত্ব কর্তব্য। আবার এ সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রাকৃতিক সকল জিনিসের সাথে এগুলোর যোগাযোগ সম্পর্কে এক বিশদ আলোচনা সূরাটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

এরপর আলোচনা এসেছে সামুদ জাতির ইতিহাস নিয়ে। কিভাবে তারা তাদের রাসুলকে মিথ্যাবাদী সাজালো, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত উটনীকে কিভাবে পা কেটে দিয়ে হত্যা করলো, তার পরিণতিতে কিভাবে তাদের ওপর ধ্বংস ও সামগ্রিক অধপতন নেমে এলো। এগুলো সবই ছিলো সে হতভাগাদের ব্যর্থতা ও ধ্বংসের উদাহরণ, যারা পাপাচারী তাদের পাপ কাজ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা কিছু ঢিল দেন, যার কারণে বহু পাপ কাজে তারা লিপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহর ভয়-ভীতিকে তারা শিকেয় তুলে রাখে, যেমন এই সূরার প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই সাফল্য লাভ করলো সে, যে নিজেকে পবিত্র রেখেছে এবং ব্যর্থ হলো সে, যে তার নফসকে কলুষিত করেছে।

'কসম সূর্যের এবং এর উজ্জ্বল আলোর। কসম চাঁদের যখন তা এর পেছনে পেছনে আসে। কসম দিনের, যখন সে (দিনের) উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যায়। রাতের কসম, যখন রাত তাকে (সূর্যকে) ঢেকে ফেলে, আকাশের কসম এবং তাঁরও কসম, যিনি তাকে বানিয়েছেন। কসম পৃথিবীর এবং তাঁর যিনি তাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। কসম প্রাণের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। তারপর তার মধ্যে দান করেছেন ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্যবোধ, সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র রেখেছে এবং ব্যর্থ মনোরথ হলো সে, যে তার নফসকে কলুষিত করেছে'।

তাফসীর

এখানে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে সৃষ্টিজগত ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের কসম খেয়েছেন, সেইভাবে মানব প্রাণের, তার সুবিন্যস্ত হওয়া ও তার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে গোপন নির্দেশ (এলহাম) আসা সম্পর্কেও কসম খেয়েছেন। এখানে কসমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সৃষ্টিলোকের সব কিছুর মধ্যেই যে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, তা ফুটিয়ে তোলা এবং সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে মানুষ সে সব কিছুর তাৎপর্য বুঝার চেষ্টা করে এবং সেগুলোর সাথে মানুষের সম্পর্ক কি তার জীবনে সেগুলো থেকে সেও শিখতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

আল্লাহর শপথবাক্য

প্রকৃতির এই দৃশ্যাবলী, এগুলোর আত্মপ্রকাশ ও বিবর্তনের সাথে মানুষের এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, যার কারণে এগুলোর সাথে মানুষের যোগাযোগ হয় অজানা, অচেনা বা অব্যক্ত ভাষার মাধ্যমে। এ গোপন যোগাযোগ হয় মানুষের অন্তরের সাথে। রহস্যরাজির অব্যক্ত ভাষা মানুষের হৃদয়ে যে দোলা দিয়ে যায়, তা অনুভূতিশীল মানুষ গভীরভাবে অনুভব করে। জাগ্রত মানব-হৃদয় যখন প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মানসে প্রতিবেশ ও পরিবেশের সকল কিছুর দিকে তাকায়, তখন প্রকৃতি যেন জীবন্ত রূপ নিয়ে তার সামনে হাযির হয়ে এমনভাবে তাকে অনেক কিছু বলে যায়, যে আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে তার মনে আর কোনো দ্বিধাদন্দ্ব থাকে না। তার মন নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। সমস্যায় জর্জরিত সমাধানপ্রার্থী মন যখন উন্মুখ হয়ে

ওই রহস্যরাজির দিকে তাকায়, তখন যেন সব কিছু তার চাওয়া পাওয়ার রূপ নিয়ে তাকে প্রশান্ত করতে থাকে। প্রকৃতির পক্ষ থেকে এ প্রতিক্রিয়া কখনও আসে সরাসরি শব্দের মাধ্যমে, আর কখনও বা আসে কোনো আনন্দঘন মুহূর্তে সূক্ষ্ম ইংগিতের আকারে।

এ কারণেই দেখা যায় কোরআন মজীদ মানুষের অন্তরকে বেশী বেশী করে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে। সমগ্র কোরআন ব্যাপীই রয়েছে এই আহবান। কোথাও সরাসরি ডাক দিয়ে কোনো রহস্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, আবার কখনও রয়েছে পরোক্ষভাবে চিন্তা করার আহবান। যেমন আলোচ্য সূরাটিতে উপস্থাপিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক জিনিসের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সে জিনিসগুলোর গুরুত্ব এবং বিশ্বসৃষ্টির স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতার জন্য সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। কোরআনে পাকের এই অংশের (আমপারার) মধ্যে প্রাকৃতিক বহু দৃশ্য ও সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণী বহু আবেদনের নযীর পাওয়া যায়। আর সত্যিকারে বলতে কি, এ অংশের একটি সূরাও এমন নেই, যার মধ্যে এ প্রকৃতির দৃশ্যের বর্ণনা তথা অন্তর মনকে জাগিয়ে তোলার মতো কোনো না কোনো আবেদন নেই। নেই, আবেগ ভরা মনের গোপন আকুতি এবং তার জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত জওয়াব-যা প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর মধ্যে মূর্ত হয়ে রয়েছে। এটা আল্লাহ পাকের উপস্থিতি ও ক্ষমতার কথা বর্ণনায় প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল রয়েছে।

এখানে আমরা সূর্য ও তার উজ্জ্বল আলোকের শপথ গ্রহণ করা দেখতে পাই। সাধারণভাবে সূর্যের কসম খাওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে সুর্যের কসম খাওয়ার সাথে সাথে দিকচক্রবালে উদীয়মান সদ্যস্নাত প্রভাত-বেলার এই স্নিগ্ধ আলো বড়োই মধুর, বড়ই মনো-মুগ্ধকর একথা বলা হয়েছে। আরও মিষ্টি লাগে তখন যখন শীতের সকালের স্বচ্ছ আকাশে উদীয়মান সূর্য মুঠো মুঠো রূপালী আলো ছড়িয়ে শীতক্লিষ্ট শরীরগুলোকে উত্তপ্ত করে তোলে। আর গ্রীষ্মকালে এশ্‌রাকের নামাযের সময়ে প্রভাতের আলোর সৌন্দর্য বড়ই চমৎকার লাগে, যেহেতু দুপুরের প্রাণান্তকর তাপের ছোঁয়া লাগার পূর্বেই এ সময়ের সুশীতল স্নিগ্ধতা হৃদয়-মনকে পুলকিত করে। এ আলোর ছটায় আশপাশের সবকিছু স্বচ্ছ ও আলোয় ঝলমল হয়ে উঠে। অবশ্য অনেকে মনে করেন 'দোহা' অর্থ সারাটা দিন। কিন্তু এ শব্দটির নিকটতর অর্থ বাদ দিয়ে অন্য একটি রূপক অর্থ গ্রহণ করার কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাইনা, অবশ্য আমরা এটা লক্ষ্য করেছি ' দোহা' শব্দটি এ প্রসংগেই এই বিশেষ সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

'আর চাঁদ,-এর পেছনে পেছনে আসে' বলতে বুঝানো হয়েছে যখন এই চাঁদ সূর্যকে অনুসরণ করে এবং তার পেছনে মৃদু আলো নিয়ে এগিয়ে এসে পৃথিবীকে স্নিগ্ধতা ও সোনালী আভায় ভরে দেয়। চাঁদের সাথে মানুষের মনের গভীর ভালোবাসা বহু প্রাচীন কাল থেকে কিংবদন্তীর মতো প্রচলিত রয়েছে। এ ভালোবাসা মানব মনের গভীরে গ্রথিত। চাঁদের এ আলো মানুষের মনের গহীনে বরাবরই প্রেম-ভালোবাসার আবেগ জাগায়। চাঁদনী রাতে মনের মাঝে কোন্ প্রেয়সী যেন ফিসফিসিয়ে তার প্রেমের বার্তা ছড়িয়ে হৃদয়-মনকে উজ্জীবিত করে তোলে। মনে হয় সব কিছু প্রিয়তম স্রষ্টার প্রেমে বিভোর হয়ে তাঁর তাসবীহ জপতে শুরু করেছে। কবিমন এ মধুর জোৎস্নালোতে যেন এক সুমধুর সুরের লহরী শুনতে পায়। এই চাঁদনী রাতেই প্রেমিক মন আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের সুধা পান করে তাঁর প্রেমগাথা গাইতে গাইতে মুগ্ধ আবেগে আত্মহারা হয়ে যায়, বিধৌত হয়ে যায় তার কলুষিত মন। জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোকে অবগাহন করে প্রেমাস্পদ আল্লাহ তায়ালার আলিংগনে নিজেকে সঁপে আল্লাহর পাগলরা পরম পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ে।

আবার আল্লাহ তায়ালা দিনের কসম খাচ্ছেন,যখন দিন রৌদ্রের আলোকে আলোকিত হয়। ওহী স্বরূপ যে 'দোহা' শব্দটি এসেছে তার দ্বারা বিশেষ একটি সময়কে বুঝানো হয়েছে-দিনের সমগ্র সময়টি নয়। 'জাল্লাহা'র মধ্যে যে 'হা' সর্বনামটি রয়েছে, তার দ্বারা বাহ্যত সুর্যকেই বুঝায়। কিন্তু কোরআনের বর্ণনার ধারাতে এর দ্বারা গোটা বিশ্বব্যাপী সব কিছুকেই বুঝায়। কোরআন পাক আরও যে জিনিসগুলোর প্রতি বিশেষভাবে ইংগিত দিয়েছে তা হচ্ছে, সূর্য উদয়ের সাথে সাথে আশেপাশের সব কিছু আলোকজ্জ্বল হয়ে যায় এবং এগুলো মানুষের হৃদয়ানাভূতিতে বিপুল সাড়া জাগায়। মানুষের অবচেতন মনে তার অজান্তেই আলোকোজ্জল দিন এমন এক আনন্দানুভূতি সৃষ্টি করে, যা ব্যক্ত করতে মানুষের ভাষা সত্যিই অক্ষম। মানুষের জীবনে দিনের আলোর প্রয়োজন ও প্রভাব যে কতো গভীর, তা প্রত্যেক মানুষই জানে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই দিনের সৌন্দর্য ও তার প্রভাব সম্পর্কে উদাসীন থাকে। এজন্যই এখানে তাদের অনুভূতিতে সাড়া জাগানোর উদ্দেশ্য এবং কতো ব্যাপকভাবে এসব জিনিস মানুষের জীবনে ক্রিয়াশীল, সে বিষয়ে সজাগ করার জন্য এই বিষয়গুলোর অবতারণা করা হয়েছে।

এমনি করে কসম খেয়ে বলা হয়েছে, 'রাতের কসম যখন তা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে' আচ্ছন্ন করে ফেলা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করার বিপরীত। রাতের ঢেকে ফেলা বলতে বুঝায় রাতের আগমনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাওয়া। যেমন দিনের আলো মানুষের মনকে প্রভাবিত করে, তেমনি রাতের অন্ধকারও বিভিন্নভাবে মানুষের মনের ওপর ক্রিয়াশীল।

তারপর আকাশের এবং এর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কসম খাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আকাশের কসম এবং যিনি একে বানিয়েছেন তাঁর কসম। আরবী 'মা' শব্দটি এখানে 'উৎস'কে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আকাশ শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে আমাদের মাথার ওপর অবস্থিত এই মুক্ত শূন্যলোককে। যেদিকে তাকালে গোলাকার বিশাল এক ছাদ, যাকে ছাতার মতো মনে হয়। এই বিশাল শূন্যলোকে তারকারাজি ও গ্রহ-উপগ্রহগুলো দিন-রাত নিজ নিজ কক্ষপথে এক নির্ধারিত গতিতে যেন সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। সত্যিকারে বলতে কি, আকাশ বলতে আমরা কিন্তু কিছুই জানি না, বুঝিনা। যে জিনিসটি আমাদের চর্মচোখে আমরা নিরন্তর দেখি তা হচ্ছে এক মহা নিপুণ শিল্পীর নির্মিত কারুকার্য খচিত এক ভূবনজোড়া আকৃতি, যা দিবানিশি একই ভাবে এক বিশেষ নিয়মে ও অবিরাম ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার মধ্যে কোনো ছেদ নেই, নেই কোনো বিরতি বা বিশৃংখলা। দেখলে মনে হয় সুবিশাল অট্টালিকার এ এক মযবুত ছাদ। এই অট্টালিকাটি কি এবং কি দিয়ে এটা তৈরী সে কথা বুঝার সাধ্য আমাদের নেই। এই মহাশূন্যলোকের শুরু বা শেষ কোথায় তাও আমরা জানি না। আর আকাশ সম্পর্কে এতদিন যতো কথা বলে আসা হয়েছে তা নিছক আন্দাজ-অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের তৈরী মতবাদ যে কোনো সময় নাকচ হয়ে যেতে পারে, তার কোনো স্থিরতাও নেই, স্থায়িত্বও নেই। সর্বশেষে আমরা এই বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যে, একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অদৃশ্য হাত এই মহাপ্রাসাদকে দাড় করিয়ে রেখেছে। বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে এমন ভাবে ধরে রেখেছেন যে, তা ঢলে পড়ে যায় না বা স্থানচ্যুত হয় না। যদি এগুলো স্থানচ্যুত বা অচল হয়ে পড়তো, তাহলে এগুলোকে সচল ও কার্যকর করার ক্ষমতা আর কারো থাকতো না।' এটিই হচ্ছে নিশ্চিত এবং একমাত্র সঠিক জ্ঞান ভিত্তিক কথা।

এভাবে কসম খাওয়া হচ্ছে পৃথিবীর ও তাকে বিছিয়ে রাখার। বলা হচ্ছে, 'কসম যমীনের এবং তাঁর যিনি একে বিছিয়ে রেখেছেন' এবং 'আদ দুহ্উ' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বিছানা ও

জীবনের জন্য আরামাদায়ক বানানো। এ জিনিসটি এমন এক প্রতিষ্ঠিত সত্য, যার ওপর মানব জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে। অন্যান্য জীবজন্তু ও কীটপতংগ সবকিছুই এই পৃথিবীর বিস্তৃতির ওপর নির্ভরশীল। সৃষ্টিকর্তা নিজেই এই পৃথিবীকে তাদের বাসোপযোগী করে ওদের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে একে সাজিয়ে দিয়েছেন। সে সকল দ্রব্যসামগ্রীর কোনো একটিও যদি কোনো সময় দুর হয়ে যায়, তাহলে কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। এমনকি প্রাকৃতিক জিনিসগুলো নিজ নিজ পথে নিরন্তর যে এগিয়ে চলছে তাও আর চলবে না–একথা আামাদের সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমেই বুঝতে সক্ষম হয়েছি। পৃথিবীকে আরামদায়ক বানানো সম্পর্কে অন্য আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'এরপর পৃথিবীকে আরামদায়ক বানানো হয়েছে, বের করা হয়েছে তার থেকে তার পানি ও গবাদিপশুর জন্য ঘাসপাতা।'(১) পৃথিবীর পক্ষে বাসোপযোগী হওয়ার জন্য এই দু'ধরনের জিনিস পানি ও সবুজ শাকসবজী, তরুলতা, গুল্ম ও গাছপালা সর্বাধিক জরুরী। আর এসব কিছুর পেছনে মহা দয়াময় আল্লাহর অদৃশ্য হাত সদা সক্রিয় রয়েছে। মানুষ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসগুলোর দিকে তাকালে চিন্তাভাবনার জন্য সেসব থেকে সে যথেষ্ট উপাদান পেতে পারে।

এরপর এই কসম খাওয়ার মধ্যে যে মহাসত্যটি ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে, মানুষের মানবসত্ত্বা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ। চেয়ে দেখুন মানুষের জীবন কিভাবে প্রকৃতির সব কিছুর সাথে এক সুতোয় বাঁধা। সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে পারস্পরিক যে নিবিড় সম্বন্ধ বর্তমান, তার মধ্যে মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা, আল্লাহকে চেনার জন্য এক বিরাট নিদর্শন হিসেবে কাজ করছে। এ বিষয়ে যে আলোচনা এসেছে তা হচ্ছে, কসম মানবাত্মার এবং তাঁর যিনি একে সুবিন্যস্ত করেছেন, করেছেন সুসামঞ্জস্যভাবে গঠিত।

সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সৃষ্টি-নৈপুণ্যের বিশেষ বিশেষ দিক চিন্তাশীল হৃদয়কে সত্যিই চমৎকৃত করে, কিন্তু মানব সৃষ্টির মধ্যে যে নৈপুণ্য বর্তমান রয়েছে তার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে তার প্রতিটি অংগপ্রত্যংগ সম্পর্কে চিন্তা করলে মানুষ দেখতে পাবে যে, এর কোনো একটিকেও যদি নিজস্ব স্থান থেকে সরিয়ে অন্য কোনো জায়গায় স্থাপন করা হয়, তাহলে গোটা দেহযন্ত্রটা বিকল হয়ে যাবে। মহা শিল্পী আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনার এ এক অত্যাশ্চর্য দিক যে, দেহযন্ত্রের মধ্যে যে যন্ত্রাংশটি যেখানে সর্বাধিক খাপ খায়, সেখানেই সেটিকে বসানো হয়েছে। এর যেকোনো বিকল্প চিন্তা শুধু বিপর্যয়ই ডেকে আনতে পারে।

তারপর তার মধ্যে তিনি দিয়েছেন যুগপৎ পাপ-প্রবণতা ও আল্লাহ্ভীতি এমতাবস্থায় সে-ই সাফল্যমন্ডিত হবে, যে নিজের প্রবৃত্তিকে পবিত্র রাখলো। আর ব্যর্থতায় ভরে গেলো তার জীবন, যে এ প্রবৃত্তিকে অন্যায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে কলুষিত ও অপবিত্র করলো।

ভালোমন্দ যাচাইয়ের ক্ষমতা

এই চারটি আয়াতকে পূর্বের সুরা 'আল-বালাদ'-এর আয়াত 'আর আমি (আল্লাহ তায়ালা), তাকে দুটি পথ দেখিয়েছি' এবং সূরায়ে 'আল্ এনসান'-এর আয়াত 'আমি (আল্লাহ তায়ালা) তাকে পরিচালিত করেছি সঠিক পথে, তা সে শোকর করুক আর না শোকরি করুক'-এই দুটি আয়াত ইসলামী দৃষ্টিভংগির উজ্জ্বল নমুনা তুলে ধরেছে। এ আয়াতগুলোতে এই কথাটিই মুখ্যত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মানব-প্রকৃতি কোনো একক সত্ত্বা হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে না; তার অস্তিত্ব যেমন নির্ভরশীল তার স্বগোত্রীয় মানব গোষ্ঠীর সাথে, তার সম্পর্কের ভিত্তির ওপর, তেমনই গোটা বিশ্বসৃষ্টির সবকিছুর সাথে নিবিড় এক বন্ধনে আবদ্ধ থাকার ভিত্তির ওপরও।

(১) দেখুন, সূরা আন নাযেয়াতে (আয়াত ৩০-৩১)

যেমন বলা হয়েছে সূরা 'সোয়াদে', 'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি দ্বারা মানুষ বানাতে চাই।' তারপর যখন তার সুসামঞ্জস্য গঠন-ক্রিয়া সমাপ্ত করলাম এবং আমার রূহ (আত্মা) তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম, তখন তার জন্য তারা সেজদায় পড়ে গেলো।(২) এটা যেন বহু আয়াতে আলোচিত অনেক কথারই সমাপ্তি। যেমন সূরা 'মোদ্দাসসের'-এ আল্লাহর কথা 'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দায়ী হতে হবে সে বিষয়ে যা সে উপার্জন করেছে।' আর এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিভিন্ন ব্যবহার বুঝানোর জন্য অন্য কোনো মানুষেরই কর্মকান্ডকে তুলে ধরেছেন। যেমন সূরা 'রা'দ'-এ বলা হয়েছে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতির ভাগ্য ততোক্ষণ পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা পরিবর্তন করে।'

ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলো ও উদাহরণসমূহ থেকে মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সারা বিশ্বলোকে যতো সৃষ্টিই আছে তার কেউই এককভাবে বর্তমান নেই। বরং সবাই প্রকৃতিগতভাবে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের যোগ্যতার ও কর্মতৎপরতার বিকাশ ঘটে পারস্পরিক চেষ্টায় এবং তারা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে উপনিত হওয়ার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করে। দ্বৈত সম্পর্ক বা জোড় সম্পর্ক বলতে আমি বুঝাতে চাচ্ছি প্রকৃতিগতভাবে সবকিছুই দুই-এর সম্মিলনে সৃষ্ট ও প্রসারিত। দেখুন মানুষের প্রথম সৃষ্টিতেও তাকে মাটি দ্বারা গঠন ও আল্লাহ্ তায়ালার রূহ ফুঁকে দেয়ার মাধ্যমেই তা পূর্ণাংগ মানুষের অস্তিত্বে এসেছে।

যোগ্যতা গড়ে তুলতে গিয়ে কম-বেশী করা, বিচার করা এবং ভাল মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা সে নিজে অর্জন করেনি। তার প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজেই এই ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। জন্মগতভাবে এবং আল্লাহ পাকের দেয়া এই যোগ্যতাকে কখনও কোরআন 'এলহাম' বলে আখ্যায়িত করেছে। বলা হচ্ছে, 'আর মানুষ এবং তাঁর কসম, যিনি তাকে সুসাম স্য করেছেন। তারপর তার মধ্যে পাপপ্রবণতা ও আল্লাহভীতি যুগপৎভাবে দান করেছেন।'

আবার কখনও এই ভালমন্দের বুঝকে হেদায়াত বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমি (মহান আল্লাহ) দেখিয়েছি তাকে দুটি পথ।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের এই ক্ষমতা তার মজ্জাগত বা তার অন্তরের অন্তস্থলের মধ্যে গোপনে লুকিয়ে আছে, যা হয় ভালো বা মন্দ যে কোনো একটি কাজ করার প্রস্তুতি আকারে প্রকাশিত। ঐশী বার্তা প্রেরণ (রেসালাত) পথ প্রদর্শন এবং বাহ্যিক কার্যকারণ এসবই সে মজ্জাগত যোগ্যতাকে জাগিয়ে তোলে, তীব্র করে, ধারালো বানায় এবং তার মনোযোগকে কখনও এদিকে ফেরায় আবার কখনও ওদিকে ফেরায়। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, ভাল-মন্দের তারতম্য বোধ এটা মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি কোনো গুণ নয়, এটা হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত এক মহা গুণ। এটা মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি সংগোপনে মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে!

এ কারণেই এই প্রকৃতি প্রদত্ত সত্য মিথ্যা বা ভাল ও মন্দের জ্ঞানের মধ্যে তারতম্য করার যোগ্যতা এটা একটা গোপন শক্তি, যা মানুষের চেতনার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। এই শক্তির দ্বারাই

---

(২) 'লাহু' বুঝায় তার জন্য তার উদ্দেশ্যে, তার খাতিরে, তার সম্মানার্থে। 'সেজদা' শব্দটি দ্বারা বুঝায় বিনয়ের সাথে অবনত হওয়া: যদিও পারিভাষিক অর্থে নামাযে দৃষ্টি অংগ দ্বারা মাটিতে মাথা রাখাকেই সেজদা বুঝায়। এখানে আরবী আভিধানিক অর্থই বুঝান হয়েছে: যেমন সূরায়ে ইউসুফ-এ বলা হয়েছে 'ওয়া খাররা লাহু সুজ্জাদান' আর তার জন্যে তারা অনবত হল।

তাকে সে যে কোনো পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই শক্তিকে যে নিজ আত্মা পবিত্র করার জন্য ব্যবহার করে, যে একে সুন্দর করতে চায়, সে-ই প্রকৃতপক্ষে সাফল্যের অধিকারী হয়। আর যে ব্যক্তি এ শক্তিকে দাবিয়ে দেয়, গোপন করে রাখে বা দুর্বল করে ফেলে, সে নিজেকে কলুষিত করে, ব্যর্থ হয় তার জীবন। আল্লাহর ঘোষণা, 'সাফল্য লাভ করলো সে, যে একে পবিত্র করলো এবং ব্যর্থ হলো সে, যে একে দাবিয়ে দিলো।'

এখানে এসে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি তা হচ্ছে, মানুষকে ভাল বা মন্দ গ্রহণ করার এক সজ্ঞান ও সজাগ শক্তি দেয়া হয়েছে, যা তার এখতিয়ারাধীন এবং যে তাকে পরিচালনা করতে সক্ষম। এ শক্তি তার অনাগত প্রকৃতি প্রদত্ত যোগ্যতাকে কল্যাণের কাজে যেমন এগিয়ে দিতে পারবে, তেমনি এগিয়ে দিতে পারবে অকল্যাণকর কাজেও। এ পর্যায়ে এসে স্বাধীনতার সাথে তার দায়িত্ববোধ সক্রিয় হয়ে উঠবে। তাকে বিবেক ও বুঝশক্তি দেয়ার সাথে বিশেষ দায়িত্ববোধও দেয়া হয়েছে।

মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র রহমত সদা সর্বদা আছে বলেই তিনি তাকে প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত বুঝ ও যোগ্যতার ওপর নির্ভর করার জন্য ছেড়ে দেননি অথবা যে শক্তিকে কাজে লাগানোর এখতিয়ার তাকে দেয়া হয়েছে, সেই শক্তির ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করার জন্য তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি বরং রেসালাত-রূপ নেয়ামত তাকে দেয়া হয়েছে, যাতে করে সে কঠিন ভাবে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা লাভ করে এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে চলতে পারে। এই ভাবে রেসালাত (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসা ওহীর জ্ঞান) তার অন্তরের মধ্যে সঠিক পথ চেনার যুক্তিপ্রমাণ হাযির করে এবং আশেপাশের সবকিছু থেকে সে জ্ঞান পেতে পারে। এই ওহীর জ্ঞানের কারণে সে কুপ্রবৃত্তির বলগাহীন আবেগ থেকে রেহাই পেয়ে সত্যকে তার আসল ও সঠিক চেহারায় দেখতে সক্ষম হয়। আর এভাবে তার সত্য সঠিক পথ এমন ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তার মনের মধ্যে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। তখন সে তার সচেতন শক্তিকে উদঘাটনের জন্য এবং সঠিক পথ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাকে কাজে লাগিয়ে সেই পথে চলতে থাকে। মোট কথা, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন এবং তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে থেকে যা সে করে তাই তার কাছে আল্লাহ্ তায়ালার দাবী এবং এতোটুকুর জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা তাকে মর্যাদা দান করবেন।

স্বাধীনতার স্বরূপ

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বেশ কিছু জরুরী তথ্য পাওয়া যায়। প্রথম, এই মতবাদ মানুষকে তার কাজের জন্য যে তাকে দায়ী হতে হবে এই অনুভূতি দান করে এবং নিজ ইচ্ছাকে পরিচালনার স্বাধীনতা দান করে। (এই স্বাধীনতা হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার মরজীর গন্ডীর মধ্যে থেকে নিজেকে পরিচালনার স্বাধীনতা)। সুতরাং স্বাধীনতা ও আনুগত্য-এই দুটি যোগ্যতা মানুষকে সারা জগতে যথাযথ মর্যাদার অধিকারী করে এবং সৃষ্টিকুলের সেই যোগ্যতার আসনে তাকে বসায়, যার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে সৃষ্টি করেছেন, সুসামঞ্জস্য করেছেন এবং বিশ্বজগতের অনেকের ওপর তাকে সম্মান দিয়েছেন।

দ্বিতীয় সত্য হচ্ছে, এই মতবাদ অনুসারে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার হাতেই। (এটাও আল্লাহ্‌রই ইচ্ছাক্রমে, যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) এবং জানানো হয়েছে যে, তার যে কোনো ভাল-মন্দের জন্য সে নিজেই দায়ী। এই অনুভূতির ফলে তার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দায়িত্বানুভূতি এবং আল্লাহর ইচ্ছা তার কাজ ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে কার্যকরী হয়।

এ জন্যই বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা কোনো জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে তার ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করে না', আসলে পরিবর্তনের এই ইচ্ছাটা হচ্ছে এমন এক দায়িত্ব যা মানুষের কাছে সর্বদা সজাগ ও দৃঢ় থাকার দাবী জানায়, যাতে করে সে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে যমীনের বুকে টিকে থাকতে পারে এবং তার কুপ্রবৃত্তি তাকে ধোকা দিতে না পারে বা ভুল পথে চালিত করতে না পারে, তাকে ধ্বংসের দিকে না নিতে পারে। সর্বোপরি তার জন্য একথাও যেন প্রমাণিত না হয় যে, সে তার কুপ্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়েছে। এ ভাবেই সে আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভ করতে পারে। তাঁর পথনির্দেশনাতেই পথ দেখে এবং বিভিন্ন পথের গোলকধাঁধার মধ্য থেকে বেছে নেয় হেদায়াতের শুভ্র সমুজ্জ্বল পথ।

এভাবে আত্মার পরিশুদ্ধির পথ সরাসরি মানুষ আল্লাহর কাছ থেকেই পায়। আর তখন সে যেন তাঁর নুরের আলোকে অবগাহন করতে থাকে এবং মানুষের অস্তিত্বকে ধ্বংস করা ও তাকে ভুল পথে পরিচালনার জন্য যে সকল স্রোতধারা মানব সমাজে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেগুলো থেকে আল্লাহ তায়ালাই তাকে বাঁচান।

অহংকারী জাতির পরিণতি

এরপর সূরাটিতে ওই সকল লোকের কিছু উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, যারা নিজেদেরকে নানা প্রকার পাপ কাজের দ্বারা কলুষিত করেছে এবং এভাবে হেদায়াতের আলো থেকে নিজেদেরকে আড়াল করে আপন সম্মানকে লাঞ্ছিত করেছে। এই উদাহরণগুলোর মধ্যে সামুদ জাতির গযবপ্রাপ্ত হওয়া ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্যে আসা শাস্তি এবং অবশেষে তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বলা হচ্ছে, 'সামুদ জাতি (নবীকে) অস্বীকার করলো, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো ও উপেক্ষা করলো তাদের অহংকার ও সীমালংঘন করার মাধ্যমে (তারা বাড়াবাড়ি করলো)। স্মরণ করে দেখো সেই সময়ের কথা, যখন তারা তাদের সব থেকে দুষ্ট লোকটিকে (তাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য) পাঠালো। তখন তাকে আল্লাহ্র রসূল বললেন, ছেড়ে দাও আল্লাহর উটনীকে, তাকে তার নিজ হিসসার পানি খেতে দাও। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করলো। এর ফলে, তাদের রব, তাদের অপরাধের দরুন উপর্যুপরি আযাবের কশাঘাত হানলেন এবং তাদের শহর-নগরগুলোসহ তাদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। এভাবে নাফরমান জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার পরিণতি কী হবে, সে বিষয়ে বিশ্বপালক আল্লাহ্ তায়ালা কাউকে ভয় করেন না ভয় করার তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু তাঁর ওপর কথা বলার ক্ষমতা কারো নেই।

সামুদ জাতি ও তাদের নবী সালেহ (আ.) সম্পর্কে কোরআন পাকের বহু স্থানে অল্প-বিস্তর বর্ণনা এসেছে। সর্বত্রই তাদের বিষয়ে বিভিন্নমুখী কিছু আলোচনাও এসেছে। বেশ কিছু বিস্তারিত বিবরণ এসেছে এই পারার সূরা 'আল ফজ্র'-এ দেখুন, ।

আলোচ্য সূরটিতে বলা হয়েছে, অহংকারের কারণেই সামুদ জাতি তাদের নবীকে মিথ্যাবাদী বলে দোষারোপ করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একমাত্র অহংকারই ছিলো তাদের মিথ্যাবাদী বলে দোষারোপ ও নবীকে অস্বীকার করার কারণ। তাদের এই অহংকার ও বিদ্রোহ তাদের সব থেকে দুষ্ট ও হতভাগা লোকটিকে চরম সর্বনাশা এ কাজটি করার উদ্দেশ্য বের করে আনলো যা অবশেষে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিলো, আর সে কাজটি ছিলো, উটনীকে মেরে ফেলা। সে ব্যক্তিটি ছিলো

চরম কুলক্ষণে ও সব থেকে বড় বদমায়েশ। যে অপরাধ সে করেছিলো তার পরিণতি ছিলো সার্বিক ধ্বংস। অবশ্য এই দুঃসাহসিক কাজ করার পূর্বেই আল্লাহ্র রসুল তাদেরকে যথাযথভাবে সতর্ক করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও, যদি তোমরা আল্লাহর উঁটনীকে হত্যা করো অথবা যদি ওই উঁটনীর পানি পান করার নির্ধারিত দিনে তোমরা পানি স্পর্শ করো, তাহলে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই উঁটনীটিকে সত্যতার এক নিদর্শন রূপে পাঠানো হয়েছিল। নিশ্চিত সে উঁটনীর কোনো কোনো বিশেষত্ব ছিলো, যে বিষয়ে আমরা মাথা ঘামাবো না। আসলে মাথা ঘামানোর কোনো অধিকারও আমাদের নেই। কারণ সে বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কিছু বলেননি। অকৃতজ্ঞ ও সীমালংঘনকারী জাতি ওরা, সতর্ককারী নবীকে তারা মিথ্যাবাদী করলো এবং উঁটনীটিকে হত্যা করলো। যে ব্যক্তি নিজ হাতে উঁটনীটিকে হত্যা করেছিলো সে-ই ছিলো তাদের মধ্যকার সব থেকে বড় বদমায়েশ এবং চরম হতভাগা।

যদিও উঁটনীটিকে সে একাই হত্যা করেছিলো, তবু যেহেতু তাদের পক্ষ থেকেই সে এ কাজটি করেছিলো এবং তারাই তাকে এ কাজে নিয়োগ করেছিলো, আর হত্যা করার পারে তারা অনুতপ্তও হয়নি এবং সে লোককে কোনো ভর্ৎসনাও করেনি, বরং এ কাজকে তারা পছন্দই করেছিলো, এজন্য গোটা জনপদকে এই হত্যার জন্য দায়ী করা হয়েছে। এটা ইসলামের মূলনীতিসমূহের অন্যতম যে, দুনিয়ার জীবনে যখন কোনো কাজের কোনো পরিণতি বা ফল দেখা যায়, তখন তার জন্য সে জাতির সকল লোককেই যৌথভাবে দায়িত্ব বহন করতে হয়।

এ কথা তখন আর বলার সুযোগ থাকে না যে, একের কাজের ফলে সবাইকে কেন দায়ী হতে হবে। সেদিন 'কেউ কারো বোঝা বহন করবে না।' প্রকৃতপক্ষে দুটি কথার মধ্যে আসলে কোনো বৈপরীত্য নেই। এসব যুক্তি খাটানো যাবে না। যেহেতু 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সয়ে তারা একই সমান'। কোনো এক ব্যক্তির অন্যায় কাজের প্রতিরোধে গোটা জাতির লোকগুলো এগিয়ে না এলে অথবা এতে খুশী হলে, তারাও প্রকারান্তরে সে অন্যায় কাজের সহযোগী বলে বিবেচিত হবে।

এহেন অবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার অদৃশ্য হাত নড়ে ওঠে এবং ভীষণভাবে সে যালেম জাতিকে পাকড়াও করে বসে। 'আর এরই কারণে, তাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাদের ওপর কঠিন ও ধ্বংসকর এক আযাব এসে পড়লো, যা সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিলো এবং তাদের শহর ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়ে গেলো।

'দামদামাতু' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্র ক্রোধ এবং তার ফলে আগত চরম শাস্তিকে বুঝায়। শব্দটির মুল হচ্ছে 'দাম্‌দামু' যার অর্থ সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া। শব্দটির মধ্যে এমন একটি প্রলয়ের ঝংকার রয়েছে যার দ্বারা ভয়ংকর এক অবস্থা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে সে আযাবের ফলে যমীনকে ওলট-পালট করে দেয়া হয়েছিলো। এ এমন এক দৃশ্য, যার ভয়াবহতা, যার ধ্বংসকর চেহারা কল্পনা করাও দুষ্কর।

'তিনি ভয় করেন না এর পরিণতিকে' মহাপবিত্র আল্লাহ তায়ালাই সর্বশক্তি ওসকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস! তিনি আবার কাকে ভয় করতে যাবেন? কোন জিনিসকেই বা তিনি ভয় করবেন?

তার ভয় করার প্রশ্নই বা কেমন করে আসতে পারে? একথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বারবার আল্লাহ্ তায়ালার সর্বব্যাপী শক্তি-ক্ষমতার কথাই এসে যায়। যাঁর কোনো ভয় নেই, তিনি সে বিদ্রোহী জাতিকে শাস্তি দিতে কেন কুণ্ঠাবোধ করবেন?—যারা তাঁর রাজ্যে তাঁর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে ও তাঁর দূতকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এবং নিজেদের প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়? 'অবশ্যই তিনি তাদেরকে চরম শক্তভাবে পাকড়াও করবেন' একথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তিনি ধরবেন, তখন এমন শক্তভাবে ধরবেন যে, কোনোভাবেই আর থেকে সে নাফরমানদের বাঁচা সম্ভব হবে না। এ কথাটাই আল্লাহ তায়ালা এভাবে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই, আল্লাহর পাকড়াও বড় শক্ত।' সেই কঠিন পাকড়াও আসার আগে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার মানুষের কাছে একথাগুলো পেশ করে তাদেরকে সময় থাকতেই সাবধান হতে বলছেন।

এভাবে এই বিশাল সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে মানুষকে যথাসময়ে অবহিত করা হচ্ছে এবং বিশ্বজগতের স্থায়ী দৃশ্যাবলীর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রকৃতির সবকিছুর সাথে তার একটি নিবিড় যোগসূত্র কায়েম করার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। যারা এগুলো দেখার পরও আল্লাহ তায়ালা থেকে মন ফিরিয়ে রাখবে তাদেরকে ওই কঠিন অবস্থার মধ্যে নির্ঘাত পাকড়াও হতে হবে। সতর্ক না করে তিনি কাউকে শাস্তি দেন না তাই এ কঠিন অবস্থাগুলোর কথা বারংবার তুলে ধরা হচ্ছে। এটাই মিথ্যাবাদী ও বিদ্রোহীদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার রীতি। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রতিটি কাজের জন্য যে সীমানা নির্ধারিত রয়েছে, তারই ভিত্তিতে প্রত্যেক জিনিসের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য একটা দিনক্ষণও নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রত্যেক ফায়সালার পেছনে রয়েছে যুক্তি ও বুদ্ধি। তিনিই সকল প্রাণী জগত ও জড়জগতের মালিক ও সকলের ভাগ্য-নিয়ন্তা।

সূরা আল লায়ল

আয়াত ২১ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ﴿۱﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ﴿۲﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۙ﴿۳﴾

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۗ﴿۴﴾ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ﴿۵﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ﴿۶﴾

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۗ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ﴿۸﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ﴿۹﴾

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۗ﴿۱۰﴾ وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۗ﴿۱۱﴾ اِنَّ عَلَيْنَا

لَلْهُدٰى ۖ﴿۱۲﴾ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿۱۳﴾ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۚ﴿۱۴﴾ لَا

يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۙ﴿۱۵﴾ الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۗ﴿۱۶﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۙ﴿۱۷﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. রাতের শপথ যখন তা (আঁধারে) ঢেকে যায়, ২. দিনের শপথ যখন তা (আলোয়) উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ৩. পুরুষ ও নারী যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তারও শপথ, ৪. অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা (হবে) নানামুখী; ৫. অতএব যে (আল্লাহর পথে) দান করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে, ৬. ভালো কথাগুলো যে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, ৭. অবশ্যই আমি তা আরামের পথে চলা সহজ করে দেবো; ৮. যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে, ৯. এবং যে ভালো কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ১০. অতএব আমি তার দুঃখ কষ্টতে এ পথে চলা সহজ করে দেবো, ১১. তার (রাশি রাশি) ধনসম্পদ তার কাজে লাগবে না যখন তার পতন হবে? ১২. (আসলে মানুষকে) সঠিক পথ প্রদর্শন করাই হচ্ছে আমার কাজ, ১৩. দুনিয়া আখেরাতের (নিরংকুশ মালিকানা) আমারই জন্যে। ১৪. অতএব আমি তোমাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের ব্যাপারে সাবধান করছি, ১৫. নির্ঘাত পাপী ছাড়া অন্য কেউই সেখানে প্রবেশ করবে না। ১৬. যে (পাপী এ দিনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; ১৭. যে (আল্লাহকে) বেশী বেশী ভয় করে তাকে আমি (এ থেকে) বাঁচিয়ে দেবো,

الَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا

ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾

১৮. যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে (আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ) ব্যয় করেছে ১৯. (অথচ) তোমাদের কারোই তাঁর কাছে এমন কিছু ছিলো না, (যার জন্যে) তোমাদের কোনো রকম প্রতিদান দেয়া হবে, ২০. (হাঁ, পাওনা) এটুকুই, সে শুধু তার মহান মালিকের সন্তুষ্টিই কামনা করেছে, ২১. (এ কারণে) অচিরেই তার মালিক (তার ওপর) সন্তুষ্ট হবেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বিশ্ব-জগতের মধ্যে অবস্থিত রহস্যরাজি ও মানব-প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান বৈশিষ্টগুলো বর্ণনা করা এবং তার সঠিক কাজ ও তার ফল কী হবে সে বিষয় নিশ্চিত জ্ঞানদান করা। সূরাটির মধ্যে এই সত্যকে বিভিন্ন কায়দায় চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, 'অবশ্যই, তোমাদের চেষ্টাগুলো বিভিন্ন মুখী, এমতাবস্থায় যে দান করলো (সে-ই সাফল্যের পথে চললো), আল্লাহর ভয়ের কারণে বাছ বিচার করে চললো এবং ভালো কাজ ও সদ্ব্যবহারকে (তার বাস্তব কাজ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে) সত্যায়িত করলো.......খরচ করে। (আয়াত ৪-১৬)

এই মহাসত্যটির বহিপ্রকাশ ঘটেছে দুইভাবে এবং দুইদিক থেকে। প্রকৃতি ও স্বয়ং মানুষের নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে দুভাবে বিষয়টি সুন্দর করে আলোচনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'কসম নিশীথ রাতের, যখন তা ঘনীভূত অন্ধকারে (সব কিছুকে) আচ্ছন্ন করে। আর শপথ উজ্জ্বল দিবালোকের, যা আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেলো'। (একই আয়াতে দুটি কালের ব্যবহার, 'ইয়াগশা' ভবিষ্যত বা নিত্য বর্তমান এবং 'তাজাল্লা' অতীত, অবশ্যই কিছু তাৎপর্য রাখে। সে অর্থাৎ যা সবকিছু, এমনকি মানুষের মনগযকেও আচ্ছন্ন করে, তারা অবশ্যই সফল যারা গাফলতির ঘুমকে ঝেড়ে-মুছে ফেলে উঠে পড়লো। কতোই না সৌভাগ্যবান তারা, যেহেতু ঝলমলে দিনের আলোয় তারা খুঁজে নিতে পারলো নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তুকে।

সুতরাং, এ সময় ও সে সময়—একটি আর একটির পরিপূরক বিধায় এই উভয় সময়ের কসম খেয়ে এবং দুটি সময়ের জন্য দুই ধরনের কাল ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা অনাগত মানুষকে বলতে চেয়েছেন যে, প্রতিনিয়ত আগত অন্ধকারের ঘনঘটার মধ্য থেকে নিশ্চিতভাবে যখনই হেদায়াতের আলোর আভা বিচ্ছুরিত হবে তখন, যতো কষ্টই হোক না কেন গাফলতির চাদরকে দূরে নিক্ষেপ করে তাকে আলোর পথে আসতে হবে। 'আর কসম সেই মহান সত্ত্বার, যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারীকে। আর এই বর্ণনা পদ্ধতি কোরআনে পাকের মধ্যে বর্ণীত ব্যাখ্যার অতি মনোহর একটি দিক।(১)

'কসম নিশীথ-রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে। আর কসম দিবাভাগের যখন তা (রাত্রি শেষে) উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয় এবং কসম তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারীকে।'

(১) এ প্রসংগে আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন লেখকের রচিত 'কোরআনের শিল্পগত চিত্র' বই-এর শৈল্পিক সংগতি (আত্তাসওয়ীরুল কান্নিউ ফীল কোরআন-আত্তানাসুকুল ফান্নি ফীল কোরআন।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ওই দুটি আয়াতে রাত ও দিন এবং এ দুইয়ের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট বর্ণনা করে সেগুলোর কসম খেয়েছেন। 'রাত যখন ঢেকে ফেলে' এবং 'যখন দিন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।' এগুলোতে যে কথাগুলো বিধৃত হয়েছে তা হচ্ছে, রাত যখন বিস্তীর্ণ ধরণীকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলে, তার ওপর পর্দা নিক্ষেপ করে তাকে গোপন করে ফেলে আর দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল হয়, উদ্ভাসিত হয় এবং তার আলোতে সব কিছু আলোকিত হয়।

সুতরাং এ দুটি সময় উন্মুক্ত আকাশের বুকে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় পরস্পর মুখোমুখি হয়-সাক্ষাত করে, ওরা একে অপরকে নিজ নিজ চেহারা দেখিয়ে। দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত বৈশিষ্টগুলোও পরস্পর সাক্ষাত করে এবং তাদের প্রতিক্রিয়াগুলোও সামনাসামনি হয়। এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির সবকিছুকে দুই ভাগে ভাগ করে তাদের কসম খাচ্ছেন। 'কসম তার যিনি পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন।' বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে।

যেটাই গ্রহণ করা হোক না কেন, কোনোটাই অশুদ্ধ হবে না। 'মা' যদি 'মান্' অর্থে আসে তো বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে 'এবং তাঁর কসম যিনি পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন আর যদি 'মা' (যা কিছু) নিজ অর্থে আসে, তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে, সৃষ্টির 'সব কিছুর মধ্যে পুরুষ ও নারী বা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক যে বৈশিষ্টগুলো রয়েছে তাদের কসম।' একথা বলে সূরাটির বাইরে যে কথাগুলো বলা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সূরাটির অভ্যন্তরে যে কথাগুলো বর্তমান রয়েছে এই দুইয়ের মাঝে অবস্থিত সে বৈষম্য দূর করে দেয়া হয়েছে।

তাফসীর

রাত ও দিন-এই দুটি অবস্থা, প্রাকৃতিক অন্য যে কোনো অবস্থার তুলনায় মানুষের অন্তরের মধ্যে বেশী অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। এ দুটি অবস্থা সম্পর্কে যখন মানুষ চিন্তা করে, তখন তার সামনে সৃষ্টি রহস্যের অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত হতে থাকে। রাত ও দিনের আবর্তনের সাথে সাথে মানুষের অজান্তে সে এমনভাবে প্রভাবিত হতে থাকে যে, ইচ্ছা করলেই সে প্রভাব থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না।

বিস্ময়কর কিছু কসম

'রাত যখন ঢেকে ফেলে এবং সব কিছুর ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়, আর দিন যখন আলোকিত হয় এবং শুভ্র আলো ছড়াতে থাকে।' এই বিবর্তনে মানুষের মনেও পরিবর্তন আসে এবং জীবনে সজীবতার ছোঁয়া লাগে। এই ক্রমাগত রাত ও দিনের যে নিরন্তর আবর্তন চলছে তার কারণে মানুষের মনে নিজে থেকেই পরিবর্তন আসতে থাকে। একবার রাতের পর্দা সব কিছুকে ঢেকে দিয়ে মানুষের অনেক কিছুকে গোপন করে ফেলে, যার কারণে অব্যক্ত এক আমেজ ও দুর্বলতা মানুষ অনুভব করে, আবার দিনের শুভাগমনে দুনিয়া যখন উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে, তখন স্তিমিত হৃদয়-মন পুলকিত হয়ে ওঠে এবং নতুন এক আবেগ এসে তাকে কঠোর থেকে কঠোর কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

রাত ও দিনের এই গমনাগমনের প্রভাব এমনই তীব্র ও শক্তিশালী যে, ইচ্ছা করলেই এর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া বা এর প্রভাবকে উপেক্ষা করে চলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলতে কি, যে যতো শক্তিশালীই হোক না কেন, রাত-দিনের পরিবর্তনের প্রভাব বলয় থেকে বাইরে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

ওপরে বর্ণীত এই সত্য অবস্থাটির ওপর গভীর ভাবে চিন্তা করলে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে এই যে, এই আবর্তন ও প্রভাব বিস্তারকারী অবস্থার অন্তরালে এমন এক শক্তিশালী ও মযবুত শক্তি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে যার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কারো নেই, তা সে যেই হোক না কেন, এই সত্যটি থেকে আরো যে মহাসত্যটি প্রকাশ পাচ্ছে তা হচ্ছে এই বিশাল সৃষ্টিকে যে ব্যবস্থাপক সুনিপুণভাবে পরিচালনা করছেন তিনি সারা বিশ্বের সকল মানুষকেও সেই একই সুদৃঢ় হাতে পরিচালনা করছেন। অতএব, তাদেরকে তিনি এমনিই ছেড়ে দেবেন না, যেহেতু তিনি তাদের অযথা সৃষ্টি করেননি।

বিরোধি ও গোমরাহ লোকেরা এ সত্যকে যতোই দাবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করুক না কেন এবং এ সত্য থেকে মানুষের দৃষ্টি যতোই ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করুক না কেন, বিশ্বজগতের এ সকল রহস্যপূর্ণ জিনিসের দিকে মানুষের দৃষ্টি ফিরে আসতে বাধ্য। এসব ঘটনার সাথে তার সাক্ষাত হবেই। এই পরিবর্তনগুলো একটু খেয়াল করলে তার নযরে পড়বেই এবং সত্যি বলতে কি, এসব কিছুর মধ্যে বিরাজমান রহস্যগুলো অনুভব করার জন্য খুব বেশী চেষ্টা-তদ্বীরেরও প্রয়োজন হয় না। এসব কিছুর পরিচালনায় মহা এক ব্যবস্থাপকের হাত নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে এটা মানুষের বোধশক্তিতে ধরা পড়বেই। এই সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব যে বর্তমান রয়েছে, তা যে কোনো সুস্থ বুদ্ধি ও বিবেকবান ব্যক্তির কাছে ধরা পড়বেই, নির্বোধ ও হঠকারী ব্যক্তিরা তা যতোই অস্বীকার করুক না কেন?

এমনি করে চিন্তা উদ্রেককারী তথ্য, নর ও নারী সৃষ্টি মানুষ ও স্তন্যপায়ী সকল পশুর মধ্যে যে একই নিয়মে সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলছে তা হচ্ছে এই যে, নারী বা স্ত্রীলিংগের প্রাণীর গর্ভাশয়ে বাচ্চাদানীতে শুক্র জীবাণু গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায় এবং নারীদেহের ডিম্বাশয়ের সাথে মিলিত হয়ে বাচ্চাগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই একই পদ্ধতিতে সব জীবজন্তুর সৃষ্টির সূচনা হলেও প্রশ্ন আসে বাচ্চা কেন বিভিন্ন প্রকারের হয়? কোনোটা হয় নর শিশু এবং কোনোটা হয় নারীশিশু। এসব কিছু সংঘটিত হয় কোন সে অদৃশ্য শক্তির নীরব ইশারায়? কোন সে শক্তি, কোন সে মহান সত্ত্বা যিনি কোনোটিকে বলেছেন, 'পুরুষ হয়ে যাও' আবার কোনোটিকে বলেছেন, 'হয়ে যাও নারী'? অথচ প্রক্রিয়ায় যে সব কার্যকারণ ক্রিয়াশীল সেগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তবু ফলশ্রুতিতে কেন এই বিভিন্নতা আসে? কিভাবে মায়ের গর্ভে শুক্রানু পুরুষ হয়ে যায় আবার কোনোটা হয়ে যায় নারী? এটা যদি হয় এক ঘটনাচক্র যার মাধ্যমে সকল জীবের জীবন প্রবাহ একই নিয়মে চলছে এবং ভবিষ্যতেও এভাবেই চলতে থাকবে। এতে কোনো পরিবর্তন আনা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে কোন সে মহা নিয়ন্তার অমোঘ নিয়ম-শৃংলা যার মধ্যে পরিবর্তন আনা কারো পক্ষে সম্ভব নয়?

আসলে এটা কি নিছক একটি আকস্মিকতা বা হঠাৎ করে সংঘটিত হয়ে যাওয়া কোনো এক ঘটনা? তাই যদি হয়, তাহলে তারও তো একটা নিয়ম কানুন থাকবে। সে নিয়ম হচ্ছে, আকস্মিক ঘটনাবলীর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃংখলা কার্যকর থাকে না, অর্থাৎ আকস্মিক কোনো ঘটনার মধ্যে ক্রিয়াশীল সকল অংশগুলো পরস্পর সংগতি রক্ষা করে চলতে পারে না। এক্ষেত্রে একটি মাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে, আর তা হচ্ছে এক মহা প্রকৌশলীর নিয়ন্ত্রণাধীন এসব কিছু আবর্তিত

হচ্ছে, যার ইচ্ছার খেলাফ কেউ কিছু করতে পারে না, কিছুই সংঘটিত হতে পারে না। তিনিই সৃষ্টি করছেন একই নিয়মে এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে, যা ব্যাহত করার সাধ্য কারো নেই। এই ব্যাবস্থাপনার মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনার কারো এখতিয়ার নেই।

স্তন্যপায়ী জীব ছাড়াও সৃষ্টিকুলের অন্যান্য জীব ও জিনিসের মধ্যেও এই একই নিয়ম ক্রিয়াশীল। সবকিছুর মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বা জোড় ও বেজোড় আছে। জীবজন্তু, কীটপতংগ, গাছপালা, তরুলতা, শাকসবজী সবকিছুর মধ্যে একই নিয়ম বিরাজমান, যার ব্যতিক্রম কোথাও নেই। একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া একক শক্তি বা এক বলতে কিছু নেই, যিনি ক্রটি বা দুর্বলতার উর্ধে, যার সমকক্ষ বা যার মতো কেউ নেই, কিছু নেই!

বিশ্বসভার অসংখ্য জিনিসের মধ্য থেকে এই কয়েকটি জিনিস তুলে ধরা হলো যা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে মানব মনে যথেষ্ট পরিমাণে সাড়া জাগায়। মানব সমাজের এই চরম ও পরম সত্যটির কসম খেয়েছেন মহান আল্লাহ তায়ালা, যাতে করে তাঁর পরিচালনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর পরিচালনা যে সুগভীরভাবে সকল বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল তা জানা যায়। এই প্রেক্ষাপটে কোরআন এই মহাসত্যটি তুলে ধরেছে যে, বিশ্বলোকের এই রহস্যরাজি অবলোকন করার পর যে কোনো বিবেকবান মানুষ ভাল-মন্দ কাজের তাৎপর্য বুঝবে এবং সকল কাজে সত্যনিষ্ঠ হবে। মন্দ, কাজ ও ব্যবহার পরিহার করে পরকালে সুন্দর প্রতিদানের অপেক্ষায় থাকবে এবং দুনিয়ার জীবনের তুলনায় আখেরাতের জীবনের গুরুত্ব অনুভব করবে।

বহুমুখী জীবনধারা

এ সব প্রকাশ্য জিনিস এবং প্রতিনিয়ত যে সব দৃশ্য বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য থেকে ফুটে উঠছে এবং মানুষের মধ্যকার যে সব জিনিস আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করছে এ সকল জিনিসের কসম খেয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, মানুষের চেষ্টা বিভিন্নমুখী-তার জীবনপথও বিভিন্ন । আর এ কারণেই তাদের প্রাপ্য প্রতিদানও বিভিন্ন। এতএব, ভালো কখনও মন্দের সমান হতে পারে না, সংশোধনী প্রচেষ্টা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী অশান্তিকর ব্যবহারের মতো নয়। এভাবে যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহ্র ভয়ের ভিত্তিতে জীবন যাপন করে আর যে কার্পণ্য করে এবং তার মন্দ পরিণতির ব্যাপারে বেপরোয়া ভাব দেখায়, তারা কখনও একই প্রকারের হতে পারে না। যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর সত্য পথের কল্যাণকারিতা মেনে নেয়, সে কখনও নবী ও তাঁর আনীত জীবন পথকে মিথ্যা বলে ঠুকরিয়ে দেয় যে ব্যক্তি- তার সমান হতে পারে না। প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে তার নিজের পছন্দ করা জীবনপথ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ গন্তব্যস্থান বেছে নেয় এবং প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে তার স্বকীয় কাজের সঠিক পরিণতি।

'অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা নানা-প্রকারের। .... আর কিই বা উপকারে লাগবে তার জন্য তার মাল-সম্পদ যখন (নিজেই) সে ধ্বংস হয়ে যাবে!' (আয়াত-৪-১১)

অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা নানা ধরনের বলতে বুঝায় তাদের প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষেই উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হবে এবং প্রয়োজনের কারণেও বিভিন্ন হবে, আর বিভিন্ন হবে প্রচেষ্টা শেষে যে ফল তাও। পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। ঝোঁকপ্রবণতা ও ধ্যান-ধারণার দিক দিয়েও যেমন তাদের মধ্যে বিভিন্নতা আছে, তেমনি বিভিন্নতা আছে তাদের কোনো বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ ও যত্নবান হওয়া-না হওয়ার দিক দিয়েও। এমনকি, একই নেতৃত্বাধীনে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও চিন্তা ও চেষ্টার বিভিন্নতা বর্তমান।

এটাই বাস্তব সত্য, কিন্তু আরো একটি সত্য আছে, যা সকল সত্যের চাইতে বড়। আর তা হচ্ছে, নানা দিক দিয়ে মানুষে মানুষে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা সত্তেও কিছু জিনিস এমন আছে যার ভিত্তিতে সকল মানুষ নিজেদের মধ্যে এক ও অবিচ্ছিন্ন মিল অনুভব করে এবং এ কারণেই দৃশ্যমান সকল জিনিস একই সুতায় আবদ্ধ রয়েছে বলে দেখা যায়। তারা পরস্পরকে ধরে রেখেছে পৃথক পৃথক দুটি বন্ধনের মাধ্যমে, পরস্পর মুখোমুখি দুটি সারিতে দুটি পতাকার তলে। দেখুন, বলা হচ্ছে, যে দান করলো ও ভয় করে চললো এবং ভালো মত ও পথকে মেনে নেয়ার সাথে সত্যকে দৃঢ় সমর্থন জানালো পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর লোকের কথা বলা হয়েছে, যে (দান করার পরিবর্তে) কৃপণতা করলো, অভাবী লোকদের সংকট-সমস্যার ব্যাপারে উদাসীন হলো এবং ভালো কাজ ও কথাকে উপেক্ষা করলো।'

যে তার জান ও মাল দান করলো এবং আল্লাহর গযব ও আযাবকে ভয় করলো আর এই বিশ্বাসের সাথে মেনে নিলো সত্য সঠিক জিনিসকে এবং যখন 'নেকী'র কথা তার কাছে পেশ করা হলো, তখন এ সত্য অবশ্যই তাকে কল্যাণের পথ দেখাবে বলে সে বিশ্বাস করলো, এমতাবস্থায় সে এটা স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে পারবে যে, এটাই প্রকৃতপক্ষে সাফল্যের পথ। অপরদিকে বলা হয়েছে আর এক ব্যক্তির কথা, যে জান ও মাল দেয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করলো সংকীর্ণতা দেখালো এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রদর্শিত পথ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেলো। সে হেতায়াতকে উপেক্ষা করলো এবং এই কল্যাণকর পথকে অস্বীকার করলো। এই হচ্ছে সেই দুই শ্রেণীর মানুষ যার অন্তর্গত সকল মানুষ যারা বিভিন্ন মত, পথ, অনুভূতি, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্ম প্রচেষ্টায় বিভক্ত। তাদের প্রত্যেকেরই আছে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগি ও চলার পথ। প্রত্যেকেরই রয়েছে পৃথক পৃথক যোগ্যতা! এসব কিছুকে সামনে নিয়ে আবারও চিন্তা করে দেখুন! যে ব্যক্তি দান করলো ও তাকওয়া-পরহেযগারীর জীবন যাপন করলো ও কল্যাণকর কাজের স্বীকৃতি দিয়ে তা মনে প্রাণে মেনে নিলো। 'আমি মহান আল্লাহ তার জন্য সরল সঠিক পথপ্রাপ্তিকে অচিরেই সহজ করে দেবো।'

এটা অতি সত্য কথা যে, যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহকে সদা-সর্বদা ভয় করে চলে এবং নেকী ও কল্যাণকর কাজ এবং ভালো মত ও পথকে ভাল বলে গ্রহণ করে সে অবশ্যই তার চেষ্টা সঠিক পথেই ব্যয় করে এবং তার চেষ্টা সঠিক খাতেই প্রবাহিত হয়। যার কারণে তার আত্মাকে সে পবিত্র করতে পারে এবং আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের পথ গ্রহণ করতে পারে। এই অবস্থাতেই সে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য লাভ করে এবং তখনই অনিবার্যভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দেয়া হয়। তখন তাকে, তার ইচ্ছাকে এবং তার কর্ম-প্রচেষ্টাকে আল্লাহ রাব্বুল ইযযত নিজ কুদরতী হাতে পরিচালনা করেন। অপরদিকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীর তোয়াক্কা করে না, সে যেমন তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি দুনিয়ার জীবনেও তার উদ্দেশ্য শেষ নাগাদ ব্যর্থ হয়।

সে সহজ জীবন লাভে ধন্য হয়। দ্বীনের পথে চলা তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা সহজ করে দেন, সে অবশ্যই সহজ ও শান্তিপূর্ণ জীবন লাভে ধন্য হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে অতি আসানীতে তার লক্ষ্যে সে উপনীত হয়। পৃথিবীতে যেমন, আখেরাতেও তেমনি সে শান্তির মুখ দেখতে পাবে। তার আশপাশের সবকিছু তার জন্য ক্রমান্বয়ে শান্তিদায়ক হয়ে ওঠে এবং দেরীতে

হলেও অন্য সবার জন্য সে শান্তিদায়ক হয়ে যায়। তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ হবে সহজ ও সাবলীল। তার চলার পথ যা এক সময় ছিলো অতি কঠিন তা হয়ে যাবে তার জন্য সুগম। বিভিন্ন কাজের জটিলতা তার জন্য হয়ে যায় সহজসাধ্য। আর ছোটো-বড়ো সকল কাজ পরম পরিতৃপ্তির সাথে সে সমাধা করার যোগ্যতা লাভ করে। এভাবে এমন একটি পর্যায়ে সে উপনীত হয়, যখন সকল দিক থেকে তার যোগ্যতার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এটাই হচ্ছে তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়, যখন সে রসূল (স.)-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদার এই হকদার হয়! 'আমি (মহান আল্লাহ) সহজ করে দেবো তার জন্য সহজ সুন্দর জীবন পথকে।'

'আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো ও বেপরোয়া হয়ে গেলো এবং সত্য সঠিক ও ভালো কাজকে অস্বীকার করলো আমি (মহান আল্লাহ) তার জন্য কষ্টের পথপ্রাপ্তি সহজ করে দেবো। আর তার ধন-দৌলত তার কোনোই কাজে লাগবে না যখন তার ওপর ধ্বংস নেমে আসবে।'

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে নিজের জান-মালের কোনো কষ্ট বরদাশত করতে রাযী নয় এবং নিজ প্রভুর সন্তোষ পাওয়ার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখায় ও তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত লাভ করতে চায় না, উপরন্তু তাঁর দিকে আহবান জানানো হলে এবং তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হলে সে তা অস্বীকার করে। দ্বীনের দাওয়াতকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে চায়। অর্থাৎ তার কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো হলে সে কোনো কৌশলে তা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অথবা সরাসরি অত্যন্ত কর্কশভাবে তা অস্বীকার করে ও চরম ভাবে বিরোধিতা করে এবং এভাবে আল্লাহ তায়ালার গযবের যোগ্য হয়ে যায়, যার কারণে সব দিক থেকে তার ওপরে কষ্টই এসে পড়ে, তখন তার জন্য কষ্টের পথই সামনে এসে যায়! এই অবস্থায় সব দিক থেকে সে ক্লান্তিকর অবস্থার শিকার হয় এবং তার প্রতি পদে পদে ভুল হতে থাকে, সহজ অবস্থা তার জন্য যেন হারাম হয়ে যায় এবং তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ কষ্ট ও বাধা-বিঘ্নের মধ্যে পড়ে যায়। এ অবস্থায় সে নেক পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নোংরামী ও নষ্টামির পথে চলতে থাকে। অথচ সে মনে করে যে, এটাই তার জন্য সার্বিক সাফল্যের পথ। আসলে এই ধরনের হতভাগা ব্যক্তির প্রতি পদে পদে পদস্খলন হতে থাকে।

যতোবার সে পদস্খলন থেকে দূরে সরে যাবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ থেকে দুরে সরে যাবে ততোবার সে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে ও পা পিছলে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যেতে থাকবে, তখন তার সেই ধন-সম্পদ যা সে কৃপণতা করে করে জমা করে রেখেছিলো তা তাকে উদ্ধার করার ব্যাপারে কোনো কাজেই লাগবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর পথ প্রদর্শন থেকে বেপরোয়া ছিলো তার অবস্থাও ওই একই প্রকার হবে।

তাই বলা হচ্ছে, 'যখন সে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে, তখন তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজেই লাগবে না।' অন্যায় অসৎ ও অকল্যাণকর কাজে লিপ্ত হওয়া সহজ, একথার অর্থ হচ্ছে কষ্টটাই সহজলভ্য হওয়া। আর ধরে নেয়া যাক যদি পার্থিব জীবনে এহেন ব্যক্তি সফলতা লাভ করে ও কষ্ট থেকে মুক্তি পায়ও, কিন্তু কি অবস্থা হবে তার আখেরাতের জীবনে? সেখানে যদি মুক্তি না পায় এবং সেখানকার চূড়ান্ত কষ্ট জাহান্নাম তার ভাগ্যে জুটে যায়, তাহলে সে কষ্ট কি তার জন্য আরো বেশী কঠিন নয়? জাহান্নাম লাভ থেকে বেশী কষ্টকর আর কোনো জিনিস হতে পারে? বরং, সেটা হচ্ছে চূড়ান্ত কষ্ট!

পথ মাত্র দুটি

এভাবে সূরার প্রথম অধ্যায়টি শেষ হলো। এখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, প্রত্যেক যামানায় এবং প্রতিটি দেশে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বদাই দুটি মত ও পথ বিরাজ করছে। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সর্বদাই পৃথিবীতে দুটি দল ও দুটি অভিমত বর্তমান ছিলো–তা সে মতের অনুসারীরা যে ধরনের হোক বা সংখ্যায় তাদের তারতম্য যাই হোক না কেন এবং তাদের সংকট-সমস্যা যাই থাকুক না কেন। আর এটাও সত্য কথা যে, প্রত্যেক মানুষ তা-ই করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। তখন তার পছন্দমতো পথপ্রাপ্তিকেই তার জন্য আল্লাহ তায়ালা সহজ করে দেন তা সে সহজ জিনিসের জন্যই হোক বা কঠিন জিনিসের জন্য হোক।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই শ্রেণীর প্রত্যেকের শেষ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে ওই শ্রেণীর পরিণতির কথা যাদের জন্য তাদের সঠিক পথপ্রাপ্তিকে সহজ করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে যাদের জন্য সঠিক পথপ্রাপ্তিকে দুর্গম করা হয়েছে, তাদের পরিণতির কথাও সাফ সাফ করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পরিণতিকে সম্পূর্ণ ইনসাফভিত্তিক ও যুক্তিসংগত বলে ঘোষণা করা হয়েছে–সে পরিণতি পুরস্কার আকারে হোক বা শাস্তি আকারেই আসুক। এটাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ওই পরিণতিগুলো অবশ্যই আসবে এবং নির্দিষ্ট সময়েই আসবে। সুতরাং আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী, ওই পরিণতিসমূহ আসার পূর্বেই তিনি হেদায়াতের পথকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে স্ফুলিংগবিশিষ্ট আগুনের ভয় দেখিয়েছেন।

নিশ্চয়ই, অবশ্যই আমার ওপর রয়েছে হেদায়াতের দায়িত্ব, আর দুনিয়া ও আখেরাতের নিরংকুশ মালিকানা আমারই জন্যে। সুতরাং, আমি তোমাদেরকে স্ফুলিংগে ভরা ডগডগে আগুনের আযাবের ভয় দেখাচ্ছি। এতে সে হতভাগা ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করবে না, যে আল্লাহর রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে বদনাম করেছে এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। অচিরেই এর থেকে নাজাত দেয়া হবে সেই মোত্তাকী পরহেযগার লোককে, যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিজ দায়িত্ববোধে ভাল কাজ করে এবং ইচ্ছায় অভাবগ্রস্তকে অভিলাষে পবিত্র হওয়ার দান করে।

'আর তাঁর কাছে কারো কোনো কিছু পাওয়ার অধিকার নেই। শুধু এটুকুই তার সম্বল যে, সে সুমহান আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি পেতে চায়। এই সন্তুষ্টি প্রাপ্তির প্রচেষ্টাই তাকে আল্লাহর নেয়ামত লাভের সন্তুষ্টি ও অধিকার দান করে। সুতরাং, এই একটি মাত্র উপায়ে যখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাইবে, তখন অবশ্যই তিনি তার ওপর খুশী হয়ে যাবেন। আর শীঘ্রই সে খুশী হয়ে যাবে।

অবশ্যই, আল্লাহ্ তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করাকে নিজের ওপর বাধ্যতামূলক বানিয়ে নিয়েছেন। মানুষকে সুপথ দেখানোর যে ব্যবস্থা তিনি করেছেন সে পথ গ্রহণ করার যোগ্যতাও প্রকৃতিগতভাবে তিনি মানুষের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। আর এই সঠিক পথকে ব্যাখ্যা করে বুঝানোর জন্য তিনি ঐশী বাণী দিয়ে পয়গাম্বরদেরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। যাতে করে সে অস্বীকার করা বা না মানার মতো কোনো যুক্তি খুঁজে না পায় বা কেউ কারো ওপর যুলুম না করতে পারে। এ জন্যই তাঁর ঘোষণা, 'অবশ্যই আমার ওপরে রয়েছে তাদেরকে হেদায়াতের দায়িত্ব'।

এর পরে আসছে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার যিনি অধিকারী সেই মহান সত্ত্বার বিবরণ। যার ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সমগ্র মানবমন্ডলীর ওপর এবং যার ক্ষমতার সীমানা পার হয়ে কোথাও কারো আশ্রয় পাওয়ার জায়গা নেই। এরশাদ হচ্ছে, 'আর অবশ্যই দুনিয়া আখেরাতের নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আমারই'। সুতরাং আমার থেকে সরে গিয়ে কোন্ সুদূরে তারা চলে যাবে?'

উপরে তিরস্কারের সাথে কিছু কথা বলার পর আল্লাহ্ তায়ালা পুনরায় সান্ত্বনার স্বরে জানাচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে সঠিক পথ দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, নেক কাজ করার জন্যে দুনিয়া ও তার যথাযথ প্রতিদান পাওয়ার জন্যে আখেরাতই উত্তম সময়। একথাগুলো বলে মৃদু তিরস্কারের সাথে আল্লাহ্ তায়ালা মৃত্যুর কথা স্মরণ করাচ্ছেন এবং প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সময়মতো বিশদভাবে জানিয়ে দিয়ে তাদেরকে আসলে কেয়ামতের ভয় দেখিয়েছেন এবং তার আযাব থেকে বাঁচার জন্য সময়মতো সতর্ক করেছেন।

বলছেন, 'আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি ডগডগে আগুনের আযাব সম্পর্কে।'

সেদিন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে এই কঠিন আগুন। সেখানে ভয়ানক দুষ্ট লোক ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না।' অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে ভয়ানক দুষ্ট লোক যারা, তারা সবাই ওই আগুনে প্রবেশ করবে। আর ওই আগুনে যারা প্রবেশ করবে তাদের থেকে হতভাগা ও অসহায় আর কে হতে পারে? এরপর যে হতভাগা ব্যক্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সে হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নবীকে এবং তাঁর আনীত দ্বীনকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। দ্বীন ইসলামের দাওয়াতকে সে যুক্তিহীনভাবে ঠুকরে দিয়েছে। কোরআনরূপী হেদায়াতের আলো এবং তার মহান প্রভুর আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। অথচ ওই ব্যক্তিকে তিনি সঠিক পথ দেখানোর ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর নিকট থেকে হেদায়াত পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে এগিয়ে আসবে। 'আর যে তাকওয়া পরহেযগারী করে চলবে তাকে সরিয়ে নেয়া হবে ওই আগুন থেকে'। এ হচ্ছে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে ওই হতভাগা দুষ্ট লোকটির মোকাবেলায় সঠিক ভূমিকা প্রদর্শন করবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা এ পরহেযগার ব্যক্তির বর্ণনা পেশ করতে গিয়ে বলছেন, 'সে হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে তার ধন-সম্পদ দান করে, সে হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে তার ধন-সম্পদ খরচ করে, যাতে করে সে এ মাল দ্বারা নিজেকে পবিত্র করতে পারে, মানুষকে দেখানোর জন্য বা নিজের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য নয়। সে আনুগত্যবোধে খরচ করে, কারো সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নয় বা কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে নয়; বরং নিছক তার পরওয়ারদেগারের সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির আশাতে সে খরচ করে, যেহেতু একমাত্র তিনিই তার সুমহান প্রতিপালক।

'অথচ তোমাদের কারোরই তাঁর কাছে এমন কিছু ছিলোনা যে যার জন্যে তোমাদের কোনোরকম প্রতিদান দেয়া হবে। হাঁ, পাওনা এটুকুই যে সে শুধু তার মহান মালিকের সন্তুষ্টিই কামনা করেছে'।

তারপর কী হবে? কী অপেক্ষা করবে এই নেক ব্যক্তির জন্যে? যে পবিত্রতা লাভ করার মানসে দান করে এবং তার সুমহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় এই ত্যাগ স্বীকার করে! অবশ্যই, রূহ্গুলো বা মোমেন মানবাত্মাসমূহকে শান্তি দেয়ার উদ্দেশ্য কোরআন পাক যে আকর্ষণীয় পদ্ধতি ব্যবহার করেছে তা বড়ই চমৎকার, বিস্ময়কর এবং অসাধারণ। 'এবং অবশ্যই

খুব শীঘ্র সে খুশী হয়ে যাবে।' এই পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ে এই পৃথিবীতেই সন্তুষ্টি ঢেলে দেয়া হয়। এই সন্তুষ্টিই তার অংগ-প্রত্যংগে দান করা হয়, এই সন্তুষ্টিই ছেয়ে যায় তার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে। এই সন্তুষ্টির অনুভূতিই তার জীবনকে সজীব করে, উজ্জীবিত করে তার গোটা সত্ত্বাকে! কি চমৎকার তাঁর প্রতিদান, আর কি চমৎকারই না তাঁর মহান নেয়ামত।

'আর অবশ্যই, অতি শীঘ্র সে খুশী হয়ে যাবে।' খুশী হয়ে যাবে সে তার জীবন পথে যা আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দিয়েছেন, খুশী হয়ে যাবে তার পরওয়ারদেগারের ওপর, যখন যা পাবে তাতেই সে খুশী থাকবে, খুশী থাকবে সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায়। স্বাচ্ছন্দে-সংকটে, বিপদে শান্তিতে সর্বাবস্থায় সে সন্তুষ্ট থাকবে। তখন কিছুতেই সে পেরেশান হবে না, সংকীর্ণ হবে না তার হৃদয়, ব্যস্তও হবে না সে। কোনো বোঝা তাকে ক্লান্ত করবে না, কোনো পক্ষই তার কাছে খুব দুর মনে হবে না। এই সন্তুষ্টিই হচ্ছে তার প্রতিদান, এই প্রতিদানই হচ্ছে সব কিছুর সেরা। যা কিছু জান-মালের কোরবানী দিয়েছে সে দুনিয়ার জীবনে তার কারণেই সে এই প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য। প্রতিদান তার জন্য, যে দান করে পবিত্রতা লাভের আশায়– আর যে খরচ করে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কামনায়।

এ প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এই মহাদানের পবিত্র সুধা তিনি ঢেলে দেন সেই সকল হৃদয়ে যেগুলো পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে এবং ঐকান্তিকভাবে তাঁর জন্য নিবেদিত এ হৃদয়গুলো আর কিছু দেখেনা, আর কিছু বুঝেনা। এদের প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে উদাত্ত ঘোষণা, 'আর অতি শীঘ্র অবশ্যই সে খুশী হয়ে যাবে।'

যখন সে টাকা পয়সা খরচ করেছে এবং যা কিছু দেয়ার মতো সবই দিয়েছে, তখনই সে খুশী হয়ে যাবে।

এ সন্তুষ্টি বোধ প্রত্যেক মোমেনের দিলে হঠাৎ করে উদিত হবে না বরং এ সন্তুষ্টি বোধ ওই হৃদয়ে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকবে, যে পবিত্র উদ্দেশ্যে তার মাল সম্পদ দান করতে থাকবে। আর সে কখনোই আল্লাহর সন্তোষ ছাড়া অন্যকিছু আশা করেনা করতে পারেনা।

সূরা আদ দোহা

আয়াত ১১ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ۙ﴿١﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ﴿٣﴾ وَلَلْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ؕ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ﴿٥﴾ اَلَمْ
يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۪﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۪﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا
فَاَغْنٰى ؕ﴿٨﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ؕ﴿٩﴾ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ؕ﴿١٠﴾ وَاَمَّا
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. শপথ আলোকোজ্জ্বল মধ্য দিনের, ২. শপথ রাতের (অন্ধকারের), যখন তা (চারদিকে) ছেয়ে যায়, ৩. তোমার মালিক (ওহীর সাময়িক বিরতিতে) তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাননি এবং তিনি তোমার ওপর অসন্তুষ্টও হননি; ৪. অবশ্যই তোমার পরবর্তীকাল আগের চেয়ে উত্তম; ৫. অল্পদিনের মধ্যেই তোমার মালিক তোমাকে (এমন কিছু) দেবেন যে, তুমি (এতে) খুশী হয়ে যাবে; ৬. তিনি কি তোমাকে এতীম অবস্থায় পাননি— অতপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, ৭. তিনি কি তোমাকে (এমন অবস্থায়) পাননি যে, তুমি (সঠিক পথের সন্ধানে) বিব্রত ছিলে, অতপর তিনি তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, ৮. তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাননি, অতপর তিনি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন, ৯. অতপর তুমি কখনো এতীমদের ওপর যুলুম করো না; ১০. কোনো প্রার্থীকে কোনো সময় ধমক দিয়ো না; ১১. তুমি তোমার মালিকের অনুগ্রহসমূহ বর্ণনা করে যাও।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটির আলোচ্য বিষয়, বর্ণনাধারা, দৃশ্যাবলী, অন্তর্নিহিত অর্থ, এর আয়াতগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ছন্দের ও শব্দাবলীর চমৎকারিত্ব সব কিছু নিয়ে সূরাটি প্রতিটি পাঠকের মনে যেন এক স্নেহ ও মায়া-মমতার পরশ বুলিয়ে দেয়। এমন মধুমাখা শব্দ ও মমতা মাখা কথা এতে ব্যবহার করা হয়েছে যে, মনে হয় যেন প্রভাত বেলার সুরভিত মৃদু সমীরণ প্রেমের বার্তা পৌঁছে পরম প্রেমাস্পদের সাথে বিরহী হৃদয়ের এক যোগসূত্র কায়েম করতে চায়। তা যেন বিনম্র এক মহা শুভ সংবাদের বার্তা বয়ে আনে যেন মন থেকে যাবতীয় দুঃখ বেদনা ও ক্লান্তির ছাপকে মুছে দিতে চায়আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও তাঁর রহমতের নিশ্চিত সম্ভাবনা আত্মাকে যেন দোলা দিয়ে যায়। অনাগত দিনের সাফল্যের আশা যেন ভরে দিতে চায় এবং রাব্বুল আলামীনের অদৃশ্য হাত তাঁর মহব্বতের অমিয়ধারা যেন আকাংখীদের হৃদয় কন্দরে পরম আবেগে ঢেলে দেয় আর তাকে কানায় কানায় প্রশান্তিতে ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ভরে দিতে চায়।

এ সব কিছুই বলা হয়েছে নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য। এসব কিছু তাঁর রব ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া, তাঁর কঠিন দিনগুলোর কষ্ট দূর করা এবং তাঁর মনকে নিশ্চিন্ততায় ভরে দিতে গিয়ে পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে আসা এ এক অমিয় বার্তা। এসব কিছু হচ্ছে তাঁর রহমতের বারিধারার প্রতীক। প্রেমের ডাক, নৈকট্যের স্বাদ এবং ব্যথিত ও শ্রান্ত-ক্লান্ত এবং সমস্যাপীড়িত হৃদয়ের জন্য আদরের এক মৃদু-মধুর দোলা।

অনেক রেওয়ায়াতে পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট ওহী আসা বন্ধ থেকেছে এবং জিবরাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাতে বিলম্ব করেছেন। এ সময় মোশরেকরা বিদ্রূপাত্মকভাবে বলেছে, 'মোহাম্মদকে তাঁর রব (প্রতিপালক) পরিত্যাগ করে গেছে। এতে তিনি যে দুঃখ পেয়েছেন তা প্রশমনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি নাযিল করেন।

পরম প্রেমাস্পদ, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে আসা ওহী, জিবরাঈল (আ.)-এর সাক্ষাত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভই ছিলো রসূল (স.)-এর জন্য ওই সংকটপূর্ণ জীবনের একমাত্র পাথেয়। অসভ্য জাতির হৃদয়হীন ব্যবহার ও হঠকারিতামূলক অস্বীকৃতির মধ্যে এগুলোই ছিলো তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। প্রায় গোটা সমাজ যখন তাঁকে পরিত্যাগ করলো, নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাঁকে ও তাঁর সংগী-সাথীদের জীবনকে বিপন্ন করে তুললো। ঈমান গ্রহণের জন্য তাঁর উদাত্ত আহবানকে যুক্তিহীনভাবে ঠুকরে দিলো ও সত্যের এ বাতিকে নিভিয়ে দিতে নানা চক্রান্ত করতে থাকলো। সেই কঠিন দিনে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতা ও জিবরাঈল (আ.)-এর সান্ত্বনাবাণী রসূল (স.)-এর হৃদয়ে স্নিগ্ধ শান্তি ও সংকল্পের দৃঢ়তা আনতো।

কিন্তু ওহী আসার এ ধারা (সাময়িকভাবে হলেও) যখন থেমে গেলো, তখন রসূল (স.)-এর চলার পথের সকল রসদ যেন ফুরিয়ে গেলো এবং তিনি আল্লাহর মহব্বত থেকে বঞ্চিত হয়ে বড় একাকী অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগলো তিনি এক জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে এক শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক। বান্ধবহারা হয়ে তিনি বড়ই অসহায় বোধ করতে লাগলেন। সকল দিক থেকে তাঁর পথ যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

এমনই এক নাযুক মুহূর্তে এই সূরাটি নাযিল হলো। প্রিয়তম মালিকের অমিয় সুধায় ভরা প্রিয় বাণী, তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্যের বার্তাবাহী ও সংবাদ তাঁর স্নিগ্ধ ও মধুমাখা আশ্বাস পেয়ে মন আবার সতেজ হয়ে উঠলো। সামাজিক বন্ধনকে মযবুত করার জন্য তার প্রয়োজনীয় হেদায়াত এবং অন্তরের প্রশান্তি ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনয়নকারী বাক্যের সমাবেশ এ সূরাটিতে। এরশাদ

হচ্ছে, 'তোমাকে তোমার রব পরিত্যাগ করেননি, অযত্ন-অবহেলা বা ঘৃণাভরে ছেড়ে দেননি তোমাকে। (জেনে রেখো), অবশ্য অবশ্যই অতীতের থেকে ভবিষ্যত তোমার জন্য খুবই উজ্জল। আর শীঘ্র তোমার রব তোমাকে এমন কিছু দেবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।'

(এটাও তোমার জানা দরকার যে) তোমার রব ইতিপূর্বেও তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করেননি। তিনি এর আগে কোনো সময় তোমাকে ঘৃণা ভরে ছেড়েও দেননি। কখনও তাঁর রহমত ও পরিচালনা থেকে তোমাকে দূরেও রাখেননি, তোমাকে আশ্রয়হীনও করেননি।

(স্মরণ করে দেখো), তোমাকে কি তিনি এতীম অবস্থায় পাননি? যে অবস্থায় তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, আর যখন তুমি সঠিক পথটি খুঁজে পাচ্ছিলে না সে অবস্থায় তিনিই তোমাকে সে পথের সন্ধান দিয়ে দিলেন। আবার তোমাকে অসচ্ছল অবস্থায় পেলেন, সেখান থেকে তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করলেন।'

এ সব কথার সত্যতা কি তুমি তোমার জীবনে দেখতে পাওনি? তোমার অন্তরের মধ্যে কি একেবারেই এ সকল কথার বাস্তবতা অনুভব করোনি? এসব নেয়ামতের কোনো প্রভাব কি তোমার পরিবেশে দেখোনি? না, না কিছুতেই তোমার রব তোমাকে ছেড়ে দেননি এবং তোমাকে তিনি অবহেলাও করেননি। তোমাকে তোমার সৎগুণাবলী, সততা ও সত্যবাদিতা থেকে কখনও দূরে সরিয়ে দেননি। 'আর স্পষ্ট জেনে নাও যে, তোমার জন্য তোমার আগামী দিনগুলো অবশ্যই পূববর্তী দিনগুলো থেকে ভালো।' তখন আরো অনেক বেশী এবং আরো অনেক পূর্ণাংগ জিনিস তুমি লাভ করবে। 'আর শীঘ্র এমন কিছু তোমাকে তিনি দেবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে।'

এই গভীর ও মধুর স্নেহের বাণী শুধু যে আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে তা-ই নয়। এ কথাগুলোর প্রবল দোলা রসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করেছে। এর সাথে গোটা পরিবেশ পরিস্থিতি প্রিয়তমের ভালবাসার আবেগভরা মধুর গুঞ্জরণে ভরে গিয়েছে। গোটা বিশ্ব-চরাচরের যত স্থানে এ বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে সেখানেই এ সূরের মূর্ছনা সব কিছুকে যেন মাতিয়ে তুলেছে।

তাফসীর

'কসম আলোকজ্জ্বল মধ্যদিনের, আর কসম সেই নিশীথ বেলার যা গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যায়।'

ওপরের আয়াতে মহব্বতের স্রোতধারা পরম দরদী ও প্রিয়তম মালিকের প্রেম সাগর থেকে নির্গত হয়ে এসেছে, আরো এসেছে তাঁর প্রিয় রসূলের জন্য যে ব্যগ্রতার এমন কিছু ছোঁয়াচ তা যে কোনো পাঠক ও শ্রোতাকে মুগ্ধ আবেগে অভিভূত করবে।

না, কিছুতেই নয়, তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি, অযত্ন অবহেলায় ছেড়েও দেননি তোমাকে। অবশ্যই .... আর তোমাকে অভাবগ্রস্ত অবস্থাতে কি তিনি পাননি, যার পর তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করলেন?'

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা সকল দয়ার আধার তিনি, সন্তুষ্টি দান করার মালিকও তিনি, আর তাঁর প্রিয় রসূলের জন্য তাঁর এই যে ব্যগ্রতা, সূরাটির প্রতিটি ছত্রের কোমল বর্ণনা ধারায় এবং শব্দের মূর্ছনায় যার ছাপ পাওয়া যায়। যতো ব্যাখ্যা দান করা হোক না কেন, প্রত্যেক ভক্ত হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে এ সূরাটির ততোই যেন মধুর সুর বেজে ওঠে। এ সুর তার হৃদয়, মনে ও তার প্রতি পদক্ষেপে বেজে উঠে। আহ, কি মধুর সে সুর, যার লহরীতে ফুটে ওঠে এক প্রাণ মাতানো ব্যাগ্রতা।

তারপর যখন ও করুণাময়ের কৃপাপ্রার্থী হওয়ার জন্য নবী পাক (স.) তাঁর কোমল স্নেহের আলিংগনে, ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর সেই সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় ব্যকুল হয়ে পড়লেন যার প্রবাহ সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান রয়েছে, তখন তিনি যেন সুকোমল প্রভাতের পর আগত স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল ও স্বচ্ছ আলোর সন্ধান পেলেন। যেন নীরব নিথর গভীর রাতের শীতল কোলে ঢলে পড়লেন। এ সময়টি রাত ও দিনের মধ্যে সব থেকে স্বচ্ছ সময়, সব কিছুর কোলাহল থেমে যায়, ঘুমের চাদর মুড়ি দিয়ে সবাই এসময় প্রায় অচেতন হয়ে যায়।

এ প্রহরে ভক্ত হৃদয় নিজ প্রভুর সান্নিধ্য লাভের বাসনায় ব্যকুলচিত্তে দাড়িয়ে যায়। সৃষ্টিজগত ও তার স্রষ্টার সাথে তখন সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সৃষ্টির সবকিছু তার উৎসের কথা অনুভব করে এবং সৃষ্টিকর্তার দিকে পাক সাফ হয়ে খুশীতে তার প্রশংসা গীতি গাইতে গাইতে অগ্রসর হয়। এখানে এই সকল বিষয়ের উপস্থাপনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পেশ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে রাত্রির যে বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে ওই গভীর রাত্রি যা ঘনীভূত হয়, কিন্তু তা ঘোর অন্ধকারও হয়ে যায় না। গভীর রাত বলতে বুঝায় মধ্য রাতের পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময়টি। যখন হালকা মেঘের পাতলা পর্দা ছড়ানো থাকে। কখনও আকাশে এ চাদর ঝুলতে থাকে আবার কখনও তা একেবারেই মিলিয়ে গিয়ে তারকাখচিত স্বচ্ছ নীল আকাশ দৃশ্যমান হয়।

কখনও আকাশ ঢেকে যায় পাতলা মেঘের ছায়ায়, যার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় সুদূর নীল আকাশে। এ সময়ে ভক্তহৃদয়ে যে কোমল মধুর আবেগের সৃষ্টি হয়, এ যেন ওই এতীমের নাযুক অনুভূতির মতো যা মুগ্ধ আবেশে আপন পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার কামনায় দিশেহারা হয়ে যেতে চায়। এ সময়টি পার হওয়ার পরই দিনের উজ্জ্বল প্রথম দিবাভাগের আগমন ঘটে। উজ্জ্বল সূর্যালোকের আলোকে আশপাশের সবকিছু রংগীন হয়ে যায়। এই ভাবে সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে এক অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি হয়।(১)

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির মধ্যে এই যে, সুন্দর কারুকার্যখচিত শিল্পের কাজ– এটা যখন কারো দৃষ্টিগোচর হয় তখন তার কাছে মনে হয় হঠাৎ পাওয়া এক আবিষ্কার। এ এমন শিল্প যার সাথে মানুষের তৈরী কোনো শিল্পের তুলনা হয় না।

'কসম প্রথম দিবাভাগের এবং কসম গভীর রাত্রের যখন তা চারিদিকে ছেয়ে যায়। তোমাকে তোমার রব পরিত্যাগ করেননি এবং অযত্ন অবহেলায় তোমাকে ছেড়েও দেননি। আর তোমার জন্য পরবর্তীকাল পূর্ববর্তীকাল থেকে ভালো এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমন কিছু দেবেন যাতে তুমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবে।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া সান্ত্বনা বাণী

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এই শান্ত, সুশীতল আবেগ আনয়নকারী দুটি সময়ের কসম খেয়ে প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে মনোজগতের অনুভূতির যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান, সে বিষয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। মানব হৃদয়ে ভাবাবেগের যে প্রস্রবণ নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে, যা প্রকৃতির মন মাতানো সৌন্দর্যের সংস্পর্শে এসে উদভ্রান্তের মতো নেচে ওঠে তার কাছে আল্লাহ তায়ালা এ মধুর বাণী পেশ করছেন। পথহারা অজানা-অচেনা শ্রান্ত, ক্লান্ত, তৃষিত মরুযাত্রী হঠাৎ করে পানির সন্ধান পেয়ে যেমন করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, ঠিক তেমনি যেন নবী (স.) মহব্বত ভরা অপূর্ব ও সূরার কথাগুলো পেয়ে পরম পুলকিত হয়ে উঠলেন।

---

(১) 'আত্তাসওয়ীরুল ফান্নি ফীল' (৪র্থ সংস্করণ) থেকে।

এ সূরার ছত্রে ছত্রে বর্ণিত কথাগুলোর মধ্যে দয়া মায়া মমতা ও গভীর ভালবাসার এক মধুর আমেজ রয়েছে, সময়ের প্রেক্ষিতে এটাও বান্দার চরম ও পরম কাম্য। নিগৃহীত, নির্যাতিত, সমাজ পরিত্যক্ত রসূলের এ মুহূর্তে ওই মধুমাখা বাণীর প্রয়োজন ছিলো খুব বেশী। যার আগমনে মুহূর্তেই তার বুকভরা বেদনারাশি ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেলো। পাহাড় সম নিষ্ঠুর বোঝা যেন অকস্মাৎ তাঁর দুটি নাযুক কাঁধ থেকে নেমে গিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিলো।

এ ভালোবাসা ভীতি আনয়নকারী নয়, নয় এটা কোনো নতুন অথবা বিচ্ছিন্ন কিছু। আলোচ্য সূরার মাধ্যমে সর্বত্র এ ভালোবাসারই বার্তা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই ভালোবাসাই সকল শক্তির মূল। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সেতুবন্ধ। আর সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যে, বিশেষ করে মানুষে মানুষে এ ভালবাসার বন্ধন মযবুত হোক এটাই আল্লাহ তায়ালা সূরাটির প্রথম অধ্যায়ে বলতে চেয়েছেন। এই ভালবাসার কারণে মানুষে মানুষে সম্পর্ক সুশীতল হবে, মানুষ সুখী-সমৃদ্ধশালী হবে।

গোটা সৃষ্টির মধ্যে ভালবাসার এ সম্পর্ককে উজ্জীবিত করার পর অতি গুরুত্ব সহকারে যে সুসংবাদটি এসেছে তা হচ্ছে, 'না, তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি, ঘৃণাও করেননি তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা অবহেলা করেননি। যারা তোমার অন্তরাত্মাকে কষ্ট দিতে চায়, তোমার দিলে যারা আঘাত দেয়ার জন্য সদা ব্যস্ত, যারা তোমার জীবনকে সংকটে ফেলতে চায়, তারাই এমনি করে কথা বলে। অসহায় অবস্থায় তাদের হাতে তিনি তোমায় ছেড়ে দেননি। তিনিই তোমার রব প্রতিপালক, আর তুমি তাঁর বান্দা, তাঁর সাথে তুমি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। তাঁর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে তুমি জীবন যাপন করছো। তিনিই তোমার পরিচালক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁর মেহেরবানীর প্রস্রবণ কখনও শুকিয়ে যায়নি এবং তাঁর দান কখনও থেমে যায়নি।

সুতরাং সাময়িকভাবে ওহী বিরতির কারণে তোমার কিছু কষ্ট হয়ে থাকলেও দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ভাল তোমাকে দেয়া হয়েছে, আখেরাতে তার থেকে অনেক বেশী কল্যাণ তোমাকে তিনি দেবেন। এরশাদ হচ্ছে, 'আর অবশ্যই পরবর্তীকাল তোমার জন্য পূর্ববর্তীকাল থেকে ভালো।' এ 'ভালো' হচ্ছে প্রথম ও শেষের কল্যাণ। অর্থাৎ কল্যাণ দিয়ে তোমার জীবন শুরু হয়েছে এবং কল্যাণের মধ্যেই তোমার পরিসমাপ্তি ঘটবে। মাঝখানে সাময়িকভাবে কিছু কষ্ট যদি আসেও তাতে তুমি মুষড়ে পড় না।

মহান আল্লাহ তায়ালা তোমার দাওয়াতকে প্রসারিত করার জন্য তোমার যে যোগ্যতা প্রয়োজন তা অবশ্যই তোমাকে দান করবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে। তোমার পথের অন্তরায়কে তিনি দূরীভূত করবেন। তোমাকে তোমার জীবন লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেবেন এবং সত্য প্রকাশের পথকে সুগম করে দেবেন। এ সকল কাজেই তো রসূল (স.)-কে সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আর এ কারণেই তাঁকে শত্রুতা, অস্বীকৃতি, কষ্ট গালিগালাজ ও ষড়যন্ত্রের শিকারও হতে হয়েছিলো।

'অবশ্যই তিনি শীঘ্র তোমাকে দেবেন এমন কিছু যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে।'

এরপর সূরার পরবর্তী কথাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সেই বিষয় সম্পর্কে জানানো হয়েছে যা তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়ে বিরাজমান ছিলো। যেন তিনি তাঁর পরোয়ারদেগারের দেখা পরবর্তীকালের নেয়ামতগুলো উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি যেন বুঝতে পারেন কোন কোন জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের মহব্বত ও মেহেরবানী তাঁর ওপর বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা চান, কোথায়, কিভাবে এবং কোন আকারে তার রহমত বর্ষণ করা প্রয়োজন এটা যেন তিনি বুঝেন। সেই সর্বব্যাপী নেয়ামত যা মানুষকে স্মরণ করানো হয় এই চমৎকার ভংগিতে তার বর্ণনা এসেছে।

'তিনি কি তোমাকে এতীম অবস্থায় পাননি, সে অবস্থা থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে তিনি কি আশ্রয় দেননি? আর তোমাকে কি সঠিক পথ থেকে দূরে দেখতে পাননি? সে অবস্থা থেকে উন্নীত করে তিনি কি তোমাকে অভাবমুক্ত করেননি?' তাকিয়ে দেখো তোমার বর্তমান বাস্তব অবস্থার দিকে এবং তোমার পেছনের জীবনের দিকে। তোমার রব কি তোমাকে সত্যিই পরিত্যাগ করেছেন তোমাকে কি ঘৃণা বা অবহেলা করেছেন? এমনকি তোমাকে এ দায়িত্ব দান করার পূর্বেও কি তিনি তোমাকে অবহেলিত করেছেন? তোমার এতীম থাকা বয়সে কি তোমাকে তিনি পরিচালনা করেননি? তুমি কি দ্বিধাগ্রস্থ থাকা অবস্থায় তাঁর পথ প্রদর্শন অনুভব করে নি? তোমার দারিদ্রকে তুমি কি তাঁর মহান দান বলে বুঝতে পারোনি?

তুমি এতীম অবস্থায় পিতার মৃত্যুর পর জন্ম গ্রহণ করেছিলে। সে অবস্থায় কি তিনি তাঁর নিজের কাছে তার নিজ তত্ত্বাবধানে তোমাকে আশ্রয় দেননি এবং তোমার প্রতি কি তিনি অনুরাগী থাকেননি! আর তুমি ছিলে অভাবগ্রস্ত। সে অবস্থায় কী তোমার মনে তিনি অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য ধৈর্য দান করেননি? অর্থনৈতিকভাবে স্বল্প আয়ের ওপর তোমাকে তুষ্ট রেখেছিলেন) সে অবস্থায় তুমি অভাববোধ করোনি বা অন্যদের অর্থ সম্পদ দেখে মন খারাপ করোনি।

এরপর খেয়াল করে দেখো, তৎকালীন আরব জাহেলিয়াতের মধ্যে যে সব ধারণা ও নানা প্রকার ধর্মীয় মতবাদ বিরাজ করতো সেই পরিবেশেই তো তুমি বড় হয়েছিলে। যখন মানুষের মন মগয পরস্পর বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিলো এবং নীতি নৈতিকতা বলতে কিছুই ছিলো না, সেই সব বিভিন্নমুখী ব্যবহারের মধ্যে তুমি তাদের কারো সাথে নিশ্চিন্ত মনে মিশে যেতে পারতে, কিন্তু তখনও তোমার নিজস্ব, স্বকীয় ও স্বতন্ত্র একটা পথ ছিলো। সে পথে তুমি পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলে না, তুমি জাহেলী কোনো ধ্যান ধারণার সাথে ছিলে না, না মূসা ও ঈসা (আ.)-এর ভ্রান্ত অনুসারীদের পরিবর্তিত ও মনগড়া কোনো নিয়মনীতির মধ্যে ছিলে। তারপর, আল্লাহ রব্বুল ইযযত তোমাকে সেই সঠিক পথের সন্ধান দিলেন যার বাস্তবায়নের জন্য তোমার কাছে পরবর্তীতে ওহী পাঠালেন এবং সে সুস্পষ্ট পথ দিয়েই তিনি তোমাকে পরিচালনা করলেন।

সে জাহেলী মতবাদের অনুসারী শ্রান্ত-ক্লান্ত দিশেহারা সমাজের প্রতি ছিলো তাঁর নির্দেশনা। এ ছিলো এক এমন বাস্তবসম্মত পথ যার সমকক্ষ অন্য কোনো মত ও পথ কোনোদিন হতে পারে না। এ দিকদর্শন ছিলো সকলের জন্য এক তৃপ্তিজনক, চিন্তামুক্ত ও সংকটমুক্ত অবস্থা, যাকে কোনো সংকট এসে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। যাকে কোনো বড় থেকে বড় সমস্যা এসে কোনদিন ক্লান্ত ও হতাশ করতে পারেনি। আর এ কারণেই তখন রসূলুল্লাহ্ (স.) বেশী ক্লান্ত ও মনোবেদনায় সাময়ীক ভেঙ্গে পড়েছিলেন যখন ওহী আসার ধারাবাহিকতা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকলো এবং ওই সুযোগে ওই অভদ্র সমাজের মোশরেক লোকেরা তাঁর প্রতি নানা প্রকার কটূক্তি করলো। তারা চেয়েছিলো নানা প্রকার বাজে কথা বলে আল্লাহ তায়ালার এই প্রেমিককে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে। পরিশেষে এলো এই স্মরণিকা ও তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ততাদানকারী কথা যে, না তিনি কখনও তেমাকে ছাড়বেন না, ওহীও বন্ধ রাখবেন না। এটা কি সত্য কথা নয় যে, অতীতেও তোমাকে কখনও তিনি ছাড়েননি বা অবহেলিত করেননি!

এ প্রসংগে তাঁর রব অতীতে এতীম থাকা অবস্থায় তাঁর করুন জীবনের কথা তাঁকে স্মরণ করাচ্ছেন। তারপর বিভ্রান্তির বেড়াজালে যখন তিনি আবদ্ধ ছিলেন এবং যখন তিনি পারিবারিক জীবনে নানা প্রকার সংকটের সম্মুখীন ছিলেন, তখন কিভাবে তাঁর রব তাঁকে পরিচালনা করলেন! এই পথ প্রদর্শনায় তাঁর সমস্যার সমাধান দান করার সাথে সাথে আশেপাশের অন্যান্য মুসলমানের

কাছে এতীমের প্রতি কি ব্যবহার করতে হবে সে সমস্যার সমাধানের পথও খোলাসা হয়ে গেলো। যে ব্যক্তি বঞ্চিত বা অভাবগ্রস্ত অবস্থায় হাত পাততে বাধ্য হয়, তাদের সাথে ব্যবহারের নীতি এবং আল্লাহ্র নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে সদুপদেশ দানের হকও এতে আদায় হয়ে গেলো। প্রথম দিককার এই পথ নির্দেশনার মাধ্যমে এতীম ও অভাবীদেরকে দান করা দ্বীন ইসলামের কল্যাণকর ভাবধারার অবিচ্ছেদ্য একটি অংগে পরিণত হলো।

'সুতরাং, যে এতীম বাচ্চা, তাকে কোনো চাপ দিয়ো না, আর যে হাত পেতে চায় তাকে ধমক দিয়ো না। তোমার রবের নেয়ামত (যা তুমি লাভ করেছো) তা প্রকাশ করতে থাকো।'

এখন এতীম-অনাথ বাচ্চাদের কদর করা, তাদের প্রতি জবরদস্তি বা কোনো কঠোর ব্যবহার না করা, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা এবং কোনো অভাবী সাহায্যের জন্যে এলে তাকে নরম কথা বলা ও সাধ্যানুযায়ী তাদের অভাব দুর করার চেষ্টা করা এই সব বিষয়ে বারবার আমরা উল্লেখ করেছি। সে চরম নিষ্ঠুর সমাজে, নিগৃহীত, অবহেলিত মানবতা ইনসাফের আশায় দ্বারে দ্বারে কেঁদে ফিরছিলো, যেখানে দুর্বলদের অধিকারের কোনো মূল্যই যেখানে ওই দুর্বলদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনো শক্তিও ছিলো না, সেখানে এসব কথা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানুষের ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার ছিলো অসাধারণ এক কৌশল। এ ধরনের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইসলাম এগিয়ে এসেছে। বঞ্চিত ও মযলুমদের অধিকার আদায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ্র ভয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য পালনে ব্রতী হয় এবং আল্লাহ্প্রদত্ত সীমার মধ্যে যেন সবাই জীবন যাপন করতে পারে সে ব্যবস্থা করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দেয়া সীমানার মধ্যে থাকার কথা সর্বদা খেয়াল রাখে এবং যেসকল দুর্বল লোক নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো কোনো শক্তি বা ক্ষমতা রাখে না তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে এবং তাদের অধিকার যারা নষ্ট করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তারা অবশ্যই আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করে।

আল্লাহ্র নেয়ামত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা, বিশেষ করে হেদায়াত ও ঈমান-রূপে যে নেয়ামত আল্লাহ্ তায়ালা দান করেছেন সে সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা এটাও তাঁর শোকরগোযারির (একটি) অংশ। আল্লাহ্র নেয়ামতের এ স্বীকৃতির পর তাঁর হুকুম পালনের মাধ্যমে তাঁর শোকরগোযারীর পূর্ণতা লাভ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তব কাজের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এটাই হচ্ছে আসল শোকরগোযারী।

সূরা আল এনশেরাহ

আয়াত ৮ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ
ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (হে মোহাম্মদ,) আমি কি (জ্ঞান ধারণের) জন্যে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? ২. (হাঁ, অতপর) আমিই তো তোমার (ওপর) থেকে তোমার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, ৩. (এমন এক বোঝা) যা তোমার পিঠ নুইয়ে দিচ্ছিলো, ৪. আমিই তোমার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি, ৫. অতপর কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে; ৬. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম; ৭. অতপর যখনি তুমি অবসর পাবে তখনি তুমি (এবাদাতের) পরিশ্রমে লেগে যাও, ৮. এবং সম্পূর্ণ নিজের মালিকের অভিমুখী হও।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটি কোরআনের ৯৪নং সূরা। সূরা আদ দোহার পরপরই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে এবং সত্য বলতে কি এটি যেন সূরা দোহারই পরিপূরক। এ সূরার মধ্যে ফুটে উঠেছে নবী করীম (স.)-এর জন্যে আল্লাহর দরদ ও মহব্বত। পুরা সূরাটি জুড়ে রয়েছে অতি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে উপস্থাপিত একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। এর মধ্যে রসূলের প্রতি আল্লাহর যত্ন ও সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে অনাগত দিনের সুসংবাদ দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে তাঁর সংকট কেটে উঠবে এবং যাবতীয় সমস্যা দূরীভূত হয়ে সহজ ও সুন্দর দিনের দেখা পাওয়া যাবে। সূরাটির মধ্যে সহজ জীবন যাপনের মূল রহস্য ফুটে উঠেছে, আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কের দৃঢ়তা সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

তাফসীর

এরশাদ হচ্ছে,

আমি তোমার বুককে তোমার জন্য খুলে দেইনি এবং যে গুরুভার তোমার পিঠকে ঝুঁকিয়ে দিচ্ছিলো তা কি আমি লাঘব করে দেইনি? আর তোমার (সম্মান বৃদ্ধির) জন্য তোমার স্মরণকে কি আমি ওপরে তুলিনি?' এ কথাগুলো দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আদর্শের প্রচার প্রসারকল্পে সে সময়

রসূলুল্লাহ (স.)-এর অন্তর-প্রাণ বড় কষ্টের মধ্যে ছিলো। যে দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়েছিলো তার মিশনের অগ্রগতির পথে যে ভীষণ বাধা-বিপত্তি আসছিলো, দ্বীনের এ দাওয়াতকে, ইসলামের উদাত্ত আহবানকে স্তব্ধ করার জন্য চতুর্দিকে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয়েছিলো তা যেন তাঁকে মুষড়ে ফেলতে চাইছিলো। তিনি অনুভব করছিলেন যেন তাঁর পিঠ ওই কঠিন অবস্থার চাপে ভেংগে যাচ্ছে। এগুলোই ছিলো মূলত সে বোঝা, যা তাঁর পিঠকে ভেংগে দিচ্ছিলো, আর এই চিন্তাতেই তাঁর বুক ভারাক্রান্ত ছিলো। এমতাবস্থায় তিনি একান্তভাবে কারো সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। এই দুর্গম পথের পথিক অনুভব করছিলেন যে, তাঁর কিছু বলিষ্ঠ পাথেয়র প্রয়োজন। মনে-প্রাণে চাচ্ছিলেন বলিষ্ঠ হাত নিয়ে কেউ এই বলে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে, 'আমি তোমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেইনি? দাওয়াতকে প্রসারিত করার জন্যে তোমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেইনি? এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে কি আমি সহজ করে দেইনি? তোমার অন্তরে এই কাজকে কি আমি প্রিয় করিনি? এর দুর্গম পথকে কি আমি মসৃণ করিনি? আলোতে ভরে দেইনি কি তোমার পথটি? যাতে করে সৌভাগ্যের শেষ অবধি তুমি দেখতে পারো।

আল্লাহর সান্ত্বনাবানী

তোমার অন্তরের মধ্যে হাতড়ে দেখো না একবার, সেখানে কি কোনো প্রাণ প্রবাহ, কোনো উন্মুক্ততা, কোনো উজ্জ্বলতা এবং কোনো আলো কি দেখতে পাচ্ছো না? এই মহা দানের স্বাদ তোমার অনুভূতির গভীরে দেখতে পাও কিনা তা একবার ভেবে দেখো! আর বলো, তুমি কি প্রতিবারে কষ্ট করার পর নানা প্রকারের সফলতা পাচ্ছো না? প্রত্যেক কঠিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম, প্রতিটি কঠিন অবস্থার পর সহজ অবস্থা, প্রতিটি হতাশার পর সন্তোষজনক পরিণতি কি আসছে না?

'আমি তোমার থেকে তোমার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা তোমার পিঠকে ভেংগে দিচ্ছিলো।' তোমার ব্যর্থ প্রচেষ্টা তোমার পিঠের ওপর দুর্বিসহ এক বোঝারূপে অনুভূত হচ্ছিলো। যার ভারে তোমার পিঠ ভেংগে যাচ্ছিলো। সেই সময়, তোমার অন্তর প্রশস্ত করে দিয়ে আমি তোমার সে বোঝাকে নামিয়ে দিলাম, আর তখন তুমি স্বস্তি বোধ করতে লাগলে, তখন আমি তোমার যোগ্যতাকে আরো বাড়িয়ে দিলাম, দাওয়াত দানের পথটি সহজ করে দিলাম। মানুষের অন্তরে তোমার কথাকে গ্রহণযোগ্য করে তুললাম, আর এমন সব গুরুত্বপূর্ণ কথা ওহী স্বরূপ পাঠালাম, যা সত্য প্রকাশে সফলতা অর্জন করলো এবং মানুষের মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলো সহজ ও সাবলীল ভাষার মাধ্যমে তা গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য করে দিলো।

তুমি কি ক্লান্তিময় কঠিন অবস্থায় ছিলে না যা তোমার পিঠকে ভেংগে দিচ্ছিলো? তুমি কি তোমার ব্যর্থতাকে হালকা করে দেখোনি, আর আমি (আল্লাহ) কি তোমার বুককে খুলে দেইনি? আর আমি কি তোমার স্মরণকে উঁচুতে তুলিনি, প্রধান প্রধান ফেরেশতাদের সামনে তোমার মর্যাদাকে কি উঁচু করে তুলে ধরিনি? এবং এই সৃষ্টিলোকের মধ্যেও কি আমি সমভাবে তোমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিনি? মানুষের অন্তরে তোমাকে স্মরণ রাখার জন্যে আমি যে ব্যবস্থা করেছি, তা একবার খেয়াল করে দেখো। আমি আল্লাহ তায়ালা– কিভাবে আমার নামের সাথে তোমার নামকে অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে জুড়ে দিয়েছি। যতোবার (আমার স্মরণে) মানুষের ঠোঁট নড়ে ওঠে

ততোবারই তোমার নামটিও সেখানে উচ্চারিত হয়, 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু, মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'-এর ওপর স্মরণ বৃদ্ধির আর কোনো স্তর নেই, থাকতে পারে না। এর চেয়ে বেশী কোনো সম্মানও নেই আর এই মর্যাদাপূর্ণ স্থানে তুমি একাই বসে আছো, এ স্থানে সারা জগতের আর কেউ পৌঁছুতে পারেনি।

আর লাওহে মাহ্ফুযেও তোমার নাম লিখে রেখে তোমার মর্যাদা ও স্মরণকে আমি সমুন্নত রেখেছি। সেখান দিয়ে যেতে হবে সকলকে এবং আমার নাম উচ্চারণের সাথে সাথে তোমার নামও আসবে। আমি চিরস্থায়ীভাবে এ ব্যবস্থাটি করে রেখেছি। যে কোনো যুগের বা যে কোনো জাতির মানুষ সেখান থেকে আসা যাওয়া করুক না কেন এবং যতো ফেরেশতাকুল আছে সবাই সালাত, তাসলীম ও গভীর মহব্বতের সাথে সে স্থান অতিক্রম করার সময় এ নাম দেখবে ও পড়তে থাকবে।

আমি তোমার স্মরণকে আরো বেশী মর্যাদাপূর্ণ করেছি, সুউচ্চে তুলেছি। অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল ইযযতের এই সম্মানিত পথে তোমার নাম বাঁধা রয়েছে, আর তোমার নামের এই মর্যাদা অত্যন্ত সহজ সরলভাবে সবার কাছে গৃহীত হয়েছে। এ মর্যাদা লাভ আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। হবেও না কোনোদিন।

তাহলে বলো, এখন কোথায় থাকলো তোমার কষ্ট, ক্লান্তি, দুঃখ এবং এই মহা দানের সামনে তোমাকে ছোটো করার মতো সৃষ্টিজগতে কিছু কি বাকি থাকলো? এ মহান মর্যাদা তোমার সকল দুঃখ, কষ্ট, কঠোরতা ও কঠিন পরিশ্রমের জন্যে ক্লান্তিহারক নয় কি?

এর সাথে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধুর দুঃখ দূর করে দিয়েছেন– যাকে তিনি নিজেই সবার মধ্য থেকে প্রিয়তম বলে পছন্দ করে নিয়েছেন। তাঁর জন্যে সবার মনে মহব্বতে ভরে দিয়েছেন। তাঁকে প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন, তাঁর জন্যে যে কোনো জটিল কঠিন অবস্থা সহজ সাবলীলভাবে অতিক্রম করা সহজ করে দিয়েছেন। অনেক কষ্ট পরিশ্রমের পর তার সুদিন এন দিয়েছেন। পরিশেষে নিশ্চয়তার সাথে একথাটা জানিয়েছেন যে, এই মহিমান্বিত মর্যাদা তাঁকে আর কখনও ছেড়ে যাবে না।

এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং প্রতিটি কঠিন অবস্থার সাথে রয়েছে সহজ অবস্থা, অবশ্যই প্রতিটি কঠিন অবস্থার সাথে সহজ অবস্থা রয়েছে।'

সূরা আত্ তীন

আয়াত ৮ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣ لَقَدْ
خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥ اِلَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦ فَمَا
يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. শপথ 'তীন' ও 'যয়তুনে'র, ২. এবং শপথ সিনাই উপত্যকার, ৩. (আরো) শপথ এ নিরাপদ (মক্কা) নগরীর, ৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে পয়দা করেছি, ৫. তারপর (তার অকৃতজ্ঞতার কারণেই) আমি তাকে সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষেপ করবো, ৬. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে এমন সব পুরস্কার, যা কোনোদিন শেষ হবে না; ৭. (বলতে পারো,) কোন্ জিনিস এরপরও তোমাকে শেষ বিচারের দিনটি মিথ্যা প্রতিপাদন করাচ্ছে? ৮. আল্লাহ তায়ালা কি সব বিচারকের (তুলনায়) শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরাটি এক বুনিয়াদী সত্যকে পেশ করেছে, আর তা হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে যে মযবুতী দান করা হয়েছে, তা ঈমানী জীবন যাপনের মাধ্যমেই প্রকাশ করা সম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও আল্লাহর ভয়-ভীতি হৃদয়ে পোষণ করে জীবন যাপন করলেই আল্লাহ তায়ালার বাঞ্ছিত সেই দৃঢ়তা ও মযবুতী আসে। পক্ষান্তরে, যখন মানুষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতি ও ঈমানী জীবন যাপন করা থেকে সরে দাঁড়ায়, তখনই তার পতন শুরু হয় এবং পরিশেষে তার জীবনে চরম অধপতন নেমে আসে।

তাফসীর

'তীন' ও 'যায়তুন' ফল দুটির কসম খেয়ে আল্লাহ তায়ালা একটি সরল সত্য কথাকে তুলে ধরেছেন। তিনি আরো কসম খেয়েছেন সিনাই উপত্যকায় অবস্থিত তূর পর্বতের এবং নিরাপদ ও নিরাপত্তাদানকারী পবিত্র (মক্কা) নগরীর। কোরআনে পাকের এই পারার অনেক সূরার মধ্যেই এই কসম খাওয়ার দৃশ্য নযরে পড়ে। মক্কা নগরীর যে পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর মধ্য থেকে তৎকালীন

সত্যের নিশানবরদাররা ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন আমপারার এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে তা তুলে ধরার জন্যই যেন অনেকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ সূরার পাশপাশি সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

সিনাই উপত্যকায় অবস্থিত তূর পর্বত বলতে সেই পর্বতটিকে বুঝানো হয়েছে, যেখান থেকে মূসা (আ.)-কে ডাক দেয়া হয়েছিলো এবং নিরাপদ শহর বলতে পবিত্র মক্কা নগরীকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে মহা সম্মানিত আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ অবস্থিত। এই দুই স্থানের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা হচ্ছে এ দুটি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ঈমানী ধ্যান-ধারণার প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রভূমি। এই কারণেই আলোচ্য অধ্যায়ের সূরাগুলোতে এই সত্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে তীন ও যায়তূন ফল দুটির উল্লেখ যে কোন বিশেষ কারণে করা হয়েছে তা বুঝা কঠিন। এ বিষয়ে তাফসীরকারকদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, তীন বলতে দামেশ্ক নগরীর পাশে অবস্থিত তূর পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত তীন নামক পাহাড়ে উৎপন্ন এক প্রকারের ফলকে বুঝানো হয়েছে।(১)

বলা হয়েছে, 'তীন' দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে ওই তীন গাছের দিকে, যা আদম (আ.) ও তাঁর বিবি হাওয়া (আ.)-কে স্বস্তি দিয়েছিলো। দুনিয়ার এই জীবনে নেমে আসার পূর্বে জান্নাতে থাকা কালে তারা এই গাছের পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকেছিলেন। এ পর্যায়ে আরও একটি কথা জানা যায় যে, তীন বলতে বুঝায় ওই পাহাড়ের ওপরে আঞ্জিরের গাছ উৎপন্ন হওয়ার স্থান, যেখানে নূহ্ (আ.)-এর নৌযানটি পানি শুকানোর সময় আটকে গিয়েছিলো।

আর 'যায়তূন' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে বায়তুল মাকদেস নগরে অবস্থিত 'যায়তা' নামক পাহাড়টি। আবার কেউ কেউ খোদ বায়তুল মাকদেসকেই যায়তূন বলে উল্লেখ করেছেন। আরও একটি কথা যায়তূন সম্পর্কে প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে, নূহ্ (আ.)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের সমাপ্তি পর্যায়ে পানি ও তূফানের অবস্থা জানার জন্য তিনি একটি কবুতর পাঠিয়েছিলেন, এই কবুতরটি এসে যে গাছের ডাল ভেংগে নিয়ে গিয়েছিলো এবং যা দেখে নূহ্ (আ.) বুঝেছিলেন যে, পানি শুকিয়ে এসেছে এবং গাছ-পালা জেগে উঠেছে আর কিছু কিছু নতুন গাছপালা অংকুরিত হতেও শুরু করেছে– সেই গাছটিকেই এখানে বুঝানো হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তীন ও যায়তূন মূলত আমাদের পরিচিত দুটি ফলের নাম। এগুলোর ইংগিত অন্য কিছুর প্রতি নয়। এগুলো আমরা অহরহ খেয়ে থাকি। এগুলো খুব অভিনব কিছু নয়। কারো কারো মতে ফল দুটি যে অঞ্চলে পয়দা হয়, সেই এলাকাকে বুঝানোর জন্য কোরআনে কারীমে ইংগিত দেয়া হয়েছে।

কোরআনে পাকের অন্য স্থানে বর্ণিত 'যায়তূন' শব্দটি দ্বারা তূর পাহাড়ের আশে-পাশের এলাকার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এমন একটি গাছ যা উদগতো হয় সাইনা এলাকায় অবস্থিত তূর পাহাড় থেকে। এ গাছ তৈলসমৃদ্ধ হয়েই পয়দা হয়, রংগীন রসে ভরা সকলের কাছেই অত্যন্ত সুপেয়' এবং রংগীন রস অর্থাৎ সুস্বাদু এ ফলটি যেমন তৈলাক্ত তেমনি এমন টকটকে রং ভরা যে যারা খায় তাদের মুখ লাল হয়ে যায়। এভাবেই যায়তূনের বর্ণনাও এসেছে,

(১) তূর পর্বতে উৎপন্ন এ ফলটিকে কেউ আনজির (পেয়ারা) এবং কেউ ডুমুর বলে বুঝাতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এক নতুন ফল যা ব্যক্ত করতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি? বিভিন্ন জিনিস সদৃশ বিভিন্ন ফলের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলে 'তীন' নিজেই স্বতন্ত্র এক ফল। আনজির বা ডুমুর কোনোটি নয়।

তবে 'তীন' শব্দটি শুধু এ সূরাতেই এবং গোটা কোরআনের মধ্যে একটি বারের মতো উল্লেখ হয়েছে। এ বর্ণনা থেকে এ ফল দুটি সম্পর্কে আমরা চূড়ান্তভাবে কোনো কিছুই স্থির করতে পারি না। বড়জোর কোরআনের বিভিন্ন সূরার মধ্যে প্রাপ্ত বর্ণনার প্রেক্ষাপটে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, দ্বীন ও ঈমানের সাথে যার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মানুষের সুন্দরতম গঠন-প্রক্রিয়ার সাথে পূর্ণ সংগতি রেখে তার অবগতির ব্যাপারে তীন ও যায়তূন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই অর্থ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে সে মূল সত্যের প্রতি ইংগিত দান করা হয়েছে, যা এই সূরার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, আর তা কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

মানুষের আত্মিক ও দৈহিক গঠন

এ সূরার মধ্যে আলোচিত মূল বক্তব্য বিষয়টি হচ্ছে, 'অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে, তারপর তাকে আমি নিক্ষেপ করেছি সর্বাধিক নিম্নস্তরে। তবে ওই সকল মানুষ ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, সুতরাং তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ প্রতিদান।'

সুন্দরতম আকৃতি দান থেকে শুরু হয়েছে মানুষের প্রতি নেয়ামত দানের আলোচনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সব কিছুকেই অতি সুন্দর করে পয়দা করেছেন। সে সব কিছুর মধ্যে মানুষের সৃষ্টির বিষয়টি হচ্ছে সুন্দরতম আকৃতিসম্পন্ন। তার দেহ সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য। এ এমন এক বৈশিষ্ট যা অন্য কোনো কিছুকেই দেয়া হয়নি।

মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার এই অবদান এবং মেহেরবানী সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। যদিও তার মধ্যে নানাবিধ দুর্বলতা, ঝগড়াঝাটি ও নাফরমানী করার প্রবণতা বর্তমান রয়েছে, তবু তার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে তার এক বিশিষ্ট মর্যাদা রয়েছে। এ মর্যাদা যেমন তার শারীরিক গঠন প্রকৃতিতে, তেমনি তার মানসিক ও আত্মিক শ্রেষ্ঠত্বে। এসব কিছু মিলে তাকে তুলে রাখা হয়েছে সবকিছুর ওপরে। তার শারীরিক গঠন এতো সুন্দর যে, তার সাথে অন্য কোনো সৃষ্টির কোনো তুলনাই হয় না। তার বুদ্ধির কথা চিন্তা করতে গেলে দেখা যায় যে, এ ধরনের বুদ্ধি অন্য কাউকেই দেয়া হয়নি। সর্বোপরি তার রয়েছে আত্মিক মর্যাদা, এ ক্ষেত্রে সে তো অনবদ্য।

তার আত্মিক অবস্থার উন্নতি যে কতো অধিক হতে পারে তা শুমার করে শেষ করা যাবে না। তার এই দিকটাকেই এই সূরার মধ্যে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে যখন তার অবনতি হয়, তখন দৈহিক দিক থেকে তো তেমন কিছু পরিবর্তন বুঝা যায় না। দেহ তেমনি থাকা সত্তেও তার মানসিক চারিত্রিক ও গুণগত বিপর্যয় ঘটে গেলে সে সবার কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়ে। তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের অভাব হলেই সে সবার নযর থেকে পড়ে যায়, তার মান-মর্যাদা খতম হয়ে যায়। পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের এতো প্রিয় সৃষ্টি হওয়া সত্তেও তাঁর কাছে সে চরম ঘৃণা ও আযাবের অধিকারী হয়ে যায়। ঈমানের দাবী থেকে যখন সে সরে দাঁড়ায়, তখন তার যাবতীয় মান-মর্যাদা আল্লাহর কাছে শেষ হয়ে যায়। বান্দার কাছেও নীতিহীনতার কারণে সে ঘৃণ্য হয়।

সুতরাং, আলোচ্য সূরাতে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও সুন্দরতম হওয়ার যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে স্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে তার নৈতিক ও আত্মিক বিষয়। এ কারণেই তার মর্যাদাকে ফেরেশতাদের চেয়েও ওপরে তোলা হয়েছে। একথারই সাক্ষ্য বহন করছে মে'রাজের ঘটনাটি। সেখানে জিবরাঈল (আ.) একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গিয়ে থেমে গেলেন এবং তার অনেক অনেক উর্ধে তোলা হলো আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকে। রসূল তিনি, তবে তিনি মানুষও বটে।

এই তো সেই মানুষ যাকে এতো উর্ধে তোলা হলো, যার মর্যাদাকে সবার ওপর স্থান দেয়া হলো, কিন্তু নাফরমানীর কারণে যখন তার নৈতিক অধপতন শুরু হলো তখন সেই অধপতন তাকে ডুবিয়ে দিলো এবং তাকে নিক্ষেপ করলো অবনতির অতল তলে। যেখানে কোনো জীবজন্তু বা অপর কোনো সৃষ্টিই কোনোদিন পৌছুবে না। ওই পর্যায়ে পৌছে গেলে তার তুলনায় একটি হিংস্র জন্তুও মর্যাদাশীল ও নিজ মর্যাদায় মযবুত অবস্থানের অধিকারী হতে পারে। কারণ সে জন্তুটি তার প্রাকৃতিক স্বভাবের ওপরে টিকে থাকে। তার রব কর্তৃক প্রদত্ত আনুগত্যবোধ অনুসারে সে কাজ করে যায় এবং সে নিজ দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করে। অপরদিকে দেখুন ওই ব্যক্তিকে যে সৃষ্টির সেরা হওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত। সে তার নিজের মনিবকে মনিব বলে মানতে অস্বীকার করেছে। সে চলেছে তার লাগাম ছাড়া প্রবৃত্তির কথা মতো। এটা এমন একটা নিম্নস্তর, যেখানে কোনো জীবজন্তু পর্যন্ত পৌছায় না অর্থাৎ তার মতো করে নাফরমানী করে না।

'অবশ্যই, আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠন প্রণালী দিয়ে 'তারপর তাকে নিক্ষেপ করেছি নিম্ন থেকে নিম্নতম স্তরে।' যখন সে তার প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা থেকে দূরে সরে যায় তখনই তার এই পতন। যদিও এ অবস্থায় টিকে থাকার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই তাকে পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু ভুল পথ ও সত্যসঠিক পথকে তিনি তার কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তারপর তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, সে সত্য পথে চলবে না ভুল পথে চলবে। অর্থাৎ ভাল ও মন্দ দু'টি পথ তার সামনে রয়েছে, এ দুটোর যে কোনো একটা গ্রহণ করার স্বাধীনতা আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়েছেন।

'তবে, যে সব লোক ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তারা বাদে।' এরাই হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সঠিক পথে অবস্থান করেছে এবং তাদেরকে দেয়া দায়িত্ব ঈমান ও ভালো কাজ করার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পালন করে চলেছে। এভাবে তারা সেই পূর্ণত্বের সোপানে আরোহণ করছে যা তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। এই ভালো কাজের পরিণতিতে তারা পৌছে যাবে চিরস্থায়ী বাসস্থানে, চিরন্তন যিন্দেগী নিয়ে। 'সুতরাং তখন তাদের দেয়া হবে এমন প্রতিদান, যা কখনও শেষ হবে না।'

যারা তাদের আপন প্রকৃতির আহ্বানে বিপর্যয়কারী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তারা শেষ নাগাদ ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যায়। এই অবস্থাই তাকে সকল জিনিসের নিচে নামিয়ে দেয়, আর নিচের সেই স্থানটি হচ্ছে জাহান্নাম। যে মানবতার কারণে ছিলো তার বিশেষ মর্যাদা সেই মানবতা যেখানে শেষ হয়ে যাবে সেখানে থাকবে চরম নীচুতা ও হীনতা এবং অমর্যাদার অভিশাপ।

সুতরাং, এই দুই শ্রেণীর মানুষ জীবন পথে যখন যাত্রা শুরু করে, তখন তারা পৃথক পৃথক দুটি চরম পথের দিকে অগ্রসর হয়। এক দল তার প্রকৃতির সঠিক ও মযবুত পথ ধরে চলতে থাকে, ঈমানের সাথেই যার পরিপূর্ণতা আসে। সৎকর্ম দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে এই নেক কাজ তাকে নেয়ামতে ভরা জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তার সাফল্যকে চূড়ান্ত স্তরে পৌছিয়ে দেয়। অপরদিকে যে ব্যক্তি প্রকৃতির সুস্থ ও সঠিক আহ্বানে সাড়া না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, কুপ্রবৃত্তির চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে সর্বোপরি আল্লাহর সন্তোষজনক পথ থেকে দূরে সরে চলে যায়, সে পরিশেষে ধ্বংস ও অবনতির অতল জাহান্নামে পৌছে যায়।

এ অবস্থার মধ্যেই মানুষের জীবনে ঈমানের মূল্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উন্নতির এটা হচ্ছে এমন একটি স্তর, যেখানে পৌঁছে সঠিক মানব প্রকৃতি তার পরিপূর্ণতা পায়। ঈমানের এই রশি মানব-প্রকৃতি ও তার মনিব আল্লাহ তায়ালার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন সৃষ্টি করে। এটা হচ্ছে এমন এক নূর বা জ্যোতি যা ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে পথ দেখায়, যা শেষ পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দেয় চিরন্তন ও সম্মানিত যিন্দেগীতে।

আবার যখন ঈমানের এই রশি ছিড়ে যায়, এই উজ্জ্বল বাতি নিভে যায় তখন এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হয় যে, সে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায় এবং পরিশেষে সে পৌঁছে যায় অবনতির নীচু থেকে নীচু স্তরে, আর এই শেষ অবস্থা হচ্ছে মানবতার সামগ্রিক ও চূড়ান্ত বিপর্যয়। এ স্তরে পৌঁছে গিয়ে সে মানব সৃষ্টির মৌলিক উপাদান এক দলা মাটিতে পরিণত হয় এবং এই মাটি দোযখের আগুনের ইন্ধন পাথরের সংলগ্ন হয়ে দোযখের আগুনের জ্বালানিতে পরিণত হয়।

এ বাস্তবতার ছায়াতলে মানুষকে ডাক দিয়ে বলা হচ্ছে, 'এই সত্য সমাগত হয়ে যাওয়ার পর কোন সে জিনিস যা তোমাকে সত্যকে অস্বীকার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলো? বিচার দিবসকেই বা অস্বীকার করতে কোন শক্তি তোমাকে বাধ্য করলো? আল্লাহ তায়ালা কি সকল বিচারক থেকে বড় বিচারক নন?'

এই বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরও তোমাকে কোন জিনিস বা কোন শক্তি বাধ্য করলো যে, তুমি নবীর উপস্থাপিত সকল সত্যকে অস্বীকার করছো এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছো? আল্লাহ তায়ালা কি সকল বিচারক থেকে সূক্ষ্ম, পারদর্শী ও সুবিচারক নন? মানুষের জীবনে ঈমান আনার সুফলকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করার পরও কোন সে জিনিস যা তোমাকে সেই সত্যকে উপেক্ষা করতে উৎসাহ যোগাচ্ছে? বিশেষ করে যখন তোমরা বেঈমানদের চলার বীভৎস পথ দেখতে পাচ্ছো, দেখতে পাচ্ছো তারা সত্যের আলোতে জীবনের সঠিক পথ দেখতে পাচ্ছে না এবং আল্লাহর মযবুত রশিকেও তারা ধারণ করছে না, তখন তাদেরকে, কোন স্বার্থ কোন শক্তি এ কাজে এগিয়ে দিচ্ছে?'

এসব নিষ্ঠুর ও হঠকারিতার সঠিক বিচার করার জন্যে 'আল্লাহ তায়ালা কি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন ও দৃঢ় বিচারক নন? নন কি তিনি সকল বিচারক থেকে বড় বিচারক? বিশেষ করে এ সময়ে, যখন এই নরাধম ও হঠকারীদের মোকদ্দমা তাঁর সামনে পেশ করা হবে? মোমেন ও বে-ঈমানদের মধ্যে ফায়সালা করার প্রশ্ন যখন তাঁর আদালতে পেশ করা হবে, তখন তাঁর বিচার ক্ষমতা কি কার্যকর ভূমিকা রাখবে না?

সেদিন সুবিচার সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে। এ প্রসংগে একটি 'মারফু' হাদীস হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি 'ওয়াত্তীনে ওয়ায যায়তূনে' সূরাটির শেষ আয়াত 'আলাইসাল্লাহু বে-আহকামিল হাকেমীন' পর্যন্ত পড়বে তখন সে যেন বলে, 'বালা, ওয়া আনা আলা যালেকা মিনাশ্ শাহেদীন!' 'হাঁ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তায়ালার চাইতে বড়ো বিচারক আর কেউ নেই।

সূরা আল আলাক্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সর্বসম্মত অভিমত এ সূরার প্রথম অংশটি কোরআনের সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। আর যেসব বর্ণনায় সূরাটির অবশিষ্ট অংশটিও শুরুর দিকে নাযিল হয়েছে বলে বলা হয়েছে, সেগুলো খুব নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম আহমদ বলেন, পর্যায়ক্রমে আবদুর রাযযাক, মোয়াম্মার ইবনে যুহরী, ওরওয়াহ, অবশেষে হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স.)-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে শুরু হওয়ার পূর্বে প্রথম অবস্থা এভাবে এসেছে যে, ঘুমের মধ্যে তাঁকে সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। ভোর বেলার শুভ্র ও স্বচ্ছ আলোর মতোই তাঁর দেখা স্বপ্নগুলো ছিলো সত্য সঠিক। তারপর তাঁর কাছে একাকীত্ব প্রিয় হয়ে ওঠে এবং তিনি হেরা গুহার নির্জনতায় একাকী ধ্যানমগ্ন থাকতে শুরু করেন। এটাকে সাধারণভাবে তপস্যা নামে অভিহিত করা হয়। স্ত্রী-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক রাত এ ভাবে তাঁর কাটতে থাকে। এ জন্য কয়েক দিনের মতো কিছু খাদ্য-খাবার তিনি সংগে নিয়ে যেতেন। ফুরিয়ে গেলে আবার খাদিজা (রা.)-এর কাছ থেকে কয়েক দিনের খাবার নিয়ে যেতেন। শেষ পর্যন্ত, এই হেরা গুহায়ই একদিন সত্য সমাগত হলো।

সর্বপ্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা

একদিন ফেরেশতা এসে বললেন, 'পড়ো'। তিনি বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' রসূল (স.) বলেন, সেই ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের সাথে এমন করে চাপ দিলেন যে, আমার দম বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবার তিনি বললেন, 'পড়ো'। আবার আমি বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।' এরপর তিনি দ্বিতীয়বারের মতো আবারও আমাকে এমনভাবে সজোরে বুকে চেপে ধরলেন যাতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তিনি আমাকে ছেড়ে পুনরায় বললেন, 'পড়ো'। আমি আবারও বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।' তারপর তিনি তৃতীয়বারের মতো আমাকে ধরে চাপ দিলেন, যাতে আমার দম যেন বেরিয়ে যেতে লাগলো। তারপর বললেন, 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিন্ড থেকে, পড়ো এবং তোমার রব অতি সম্মানিত। যিনি শিখিয়েছেন কলমের সাহায্যে, শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।'

তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খাদিজা (রা.)-এর কাছে ফিরে এলেন। খাদিজা (রা.)-এর কাছে এসে তিনি বললেন, 'কে আছো, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢাকো, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢাকো।' তারপর তিনি তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং এর কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর ভয়টা দূর হয়ে গেলো। তারপর তিনি বললেন, 'খাদিজা! কী হলো আমার!' একথা বলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তিনি জানালেন। সব শুনে খাদিজা (রা.) বললেন, চিন্তা করবেন না, এ ঘটনা থেকে আপনি সুসংবাদ নিন। আপনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। সত্য কথা বলেন, অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্য করেন। মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথে থাকতে গিয়ে কেউ বিপদে পড়লে তাকে আপনি সাহায্য করেন।' এসব সান্ত্বনা বানী শোনানোর পর খাদিজা (রা.) তাঁকে নিয়ে তার আপন চাচাত ভাই ওরাকা ইবনে নওফেল-এর কাছে চলে গেলেন। ওই ব্যক্তি জাহেলিয়াতের অবস্থায় সত্য ধর্ম পাওয়ার ইচ্ছায় নাসারা (খৃষ্টান) হয়ে গিয়েছিলো। তিনি আল্লাহর মরযীতে হিব্রু ভাষায় রচিত ইনজীল কেতাবের আরবী অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ। তাকে খাদিজা (রা.) বললেন, 'হে আমার চাচাত ভাই, আপনার ভাতিজার কথা একটু খেয়াল করে শুনুন। তিনি বললেন, 'ভাতিজা, কী হয়েছে তোমার?' রসূলুল্লাহ (স.) যা কিছু দেখেছিলেন সব তাকে খুলে বললেন। তখন ওরাকা বললেন, হাঁ, তিনি সেই বিশ্বস্ত ফেরেশতা যিনি মূসার নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি

হচ্ছেন জিবরাঈল (আ.)। আহ্, আফসোস আমার দুর্বল শরীরের। যদি আমার শরীরে শক্তি থাকতো, যদি আমি বেচে থাকতাম সেই সময়, যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে!'

একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'আমাকে কি আমার দেশবাসী বের করে দেবে?' ওরাকা বললেন, 'হাঁ, যে কাজ নিয়ে তুমি এসেছো, অতীতে এ কাজ নিয়ে যারাই এসেছে, তাদের প্রত্যেকের সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। আহ্ সে দিনটিতে যদি আমি বেঁচে থাকতাম, তাহলে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতাম। এরপর অল্প কিছু দিনের মধ্যে ওরাকা মারা গেলেন। যুহরী বর্ণিত এ হাদীসটি বোখারী ও মুসলিম রেওয়ায়াত করেছেন।

তাবারীও সঠিক বর্ণনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি পেশ করেছেন, 'রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তিনি তখন এলেন। তিনি রেশমী কাপড়ের একটি টুকরা নিয়ে এলেন। এ কাপড়ে কিছু লেখা ছিলো। অথবা সে কাপড়ে মোড়া ছিলো একটি কেতাব। তখন তিনি বললেন, 'পড়ো'। বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।' তিনি আমাকে সজোরে বুকে চেপে ধরলেন, এতো জোরে ধরলেন মনে হলো যেন আমি মরে যাবো। তারপর ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললেন, 'পড়ো'। বললাম, কী পড়ব আমি?' একথাটি বললাম এ জন্য যাতে করে তিনি আমার সাথে পুনরায় পূর্বের মতো ব্যবহার না করেন। তখন তিনি বললেন, 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন.......মানুষকে শিখিয়েছেন সেই জিনিস যা সে জানতো না।' এ পর্যন্ত পড়ে থামলেন। আল্লাহর রসূল বলেন, 'তখন আমি পড়লাম। তিনিও তখন ক্ষান্ত হলেন এবং আমার থেকে দূরে সরে গেলেন। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। তখন আমার মনে হচ্ছে, কেউ যেন আমার অন্তরের পাতায় কিছু কথা লিখে দিয়ে গেছে। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আমার কাছে কবি বা পাগল থেকে অপ্রিয় আর কেউ নয়। তিনি বললেন, 'আমি মনে মনে বললাম, আমি কি কবি বা পাগল হয়ে গেলাম! কোরায়শরা আমাকে কি চিরদিন এই কথাই বলবে? আমার দৃঢ় ইচ্ছা জাগলো আমি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠি এবং সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ে আত্মহত্যা করি! এভাবে আমার সকল জ্বালার সমাপ্তি ঘটুক। এই সব কথা ভেবে আমি গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম এবং পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলাম। পাহাড়ে আরোহণের মাঝপথে পৌঁছে আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম। কেউ বলছিলো, 'হে মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসূল এবং আমি জিবরাঈল।' তিনি বললেন 'আমি মাথা তুলে আকাশপানে তাকিয়ে দেখি সেখানে জিবরাঈল একজন মানুষের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পা দু'টি দিগন্ত বলয়ে পরিব্যাপ্ত। তিনি বলছেন, 'হে মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি হচ্ছি জিবরাঈল।' তিনি বললেন, তখন আমি তার দিকে তাকিয়েই রইলাম। এ অবস্থা আমাকে আমার পূর্ব ইচ্ছা থেকে বিরত রাখলো। আমি সামনে বা পেছনে নড়তে পারছিলাম না। আকাশের দিগন্ত বলয়ের চতুর্দিকে আমি বারবার নযর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলাম। কিন্তু যেদিকেই তাকাচ্ছিলাম, সেই দিকেই এ একই মূর্তি নযরে পড়ছিলো। এভাবে আমি ওই স্থানে দাঁড়িয়েই রয়ে গেলাম। না সামনে, না পেছনে আমি সরতে পারছিলাম। এমনকি ওই সময়ে খাদিজা আমার খোঁজে লোক পাঠিয়েও আমার সন্ধান পেলো না। সে লোকেরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আমাকে না পাওয়ার কথা জানালো, আর তখনো আমি সেই জায়গাতেই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ সময় পরে তিনি অদৃশ্য হলেন আর আমিও ফিরে এলাম আমার পরিবারের কাছে।'

ইবনে ইসহাক, পর্যায়ক্রমে ওহাব ইবনে কায়সার এবং ওবায়েদ-এর বরাত দিয়ে এই হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন। আমি নিজেও আজ সে ঘটনার ইতিবৃত্ত সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছি, যা ইতিহাস ও তাফসীরের কেতাবে বারবার অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু মনে হচ্ছিলো ভাসা ভাসা ভাবেই তা পড়েছি। তারপর অন্য কাজে মনোনিবেশ করেছি অথবা খুব কমই গভীরভাবে খেয়াল দিয়েছি ওই ঘটনার প্রতি। পড়েছি এবং এক সময় তা ভুলে গিয়েছি।

সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

আসলে ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতার নিরিখে এতো গুরুত্বপূর্ণ যে গুরুত্বের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ওই গুরুত্ব বুঝার জন্যে আজ পর্যন্ত যতো প্রকার প্রচেষ্টাই করা হয়েছে তা সবই তার প্রয়োজনের তুলনায় কম। ওই ঘটনার মধ্যে এমনও অনেক দিক আছে, যেগুলো সর্বদাই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে, বরং অতিরঞ্জিত না করে বললেও বলতে হয় প্রকৃতপক্ষে মানব ইতিহাসে এ মুহূর্তের ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সব থেকে বেশী, যার সাথে অন্য কোনো জিনিসের তুলনাই হতে পারে না।

আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন, কোন্ সে জিনিস যা এই দৃশ্যকে এতো গুরুত্বপূর্ণ করে দিলো। এই ঘটনাকে সামনে রেখে যে সকল বাস্তব সত্যকে আমরা উপলব্ধি করি, সেগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে, এ ঘটনা থেকে মহান আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতাসহ বর্তমান আছেন তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি সর্ববিজয়ী, তাঁর শক্তি দিয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছাকে সর্বদা কার্যকর করতে পারেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম এ ঘটনাটি তারও সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বিশ্ব-জোড়া রাজ্যের একমাত্র বাদশাহ। যার একচ্ছত্র আধিপত্য সর্বত্র চলে। অতএব সম্ভ্রম, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁরই, তিনি মানুষ নামক এই জীবটির প্রতি এক সময় তাঁর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বড় মেহেরবানী করে তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে বাছাই করে তার মাথায় খেলাফতের সম্মানজনক তাজ পরিয়ে দিলেন। অথচ তাঁকে বা তার নামকে সৃষ্টিকুলের অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বড় দয়া করে তিনি এই তুচ্ছ সৃষ্টিকে সম্মানিত করলেন। তিনিই সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তাঁর হেদায়াতের নূর তিনি দিলেন, বানালেন তাকে ওহী ধারণ করার পাত্র এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই তুচ্ছ সৃষ্টিটাকে কাংখিত সম্মান পাওয়ার যোগ্য বানালেন।

এ হচ্ছে এক মহা সত্য। এটা এতো বড়ো সত্য যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এ সত্যের বিভিন্ন দিক মানুষের কাছে তখনই প্রকাশ পায়, যখন সে এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে, আর চিন্তা ভাবনা করলে সে অনুভব করে যে, চিরস্থায়ী সেই স্বাধীন সার্বভৌম সত্ত্বার পক্ষ থেকেই মানুষকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মানুষকে এই নেয়ামত দান করায় একথাও সুস্পষ্ট বুঝা গেলো যে এই সীমিত, অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বান্দাকে তিনি কতো গভীরভাবে ভালোবাসেন। যারা আল্লাহ তায়ালার আপন হয়ে যায়, জীবন যাদের আল্লাহ কেন্দ্রিক হয়ে যায়, সেই মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী অনেক ব্যাপক। এমতাবস্থায় মানুষ তার তীব্র ও প্রিয় অনুভূতির স্বাদও পেতে শুরু। বিনম্র চিত্তে, কৃতজ্ঞতা ভরে, পরম খুশীর সাথে ও নিবেদিতপ্রাণে মানুষ আল্লাহ তায়ালার এই মহাদান অনুভব করে। সে আল্লাহ তায়ালার কথাগুলোর গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভব করে এবং বাস্তব আনুগত্যের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলের সবাই এ কথাগুলোর জবাব দেয়। সৃষ্টিকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই পেয়েছে সেই পবিত্র ওহী, অন্য আর কেউ নয়, যদিও অনেকের থেকে সে দুর্বল।

আলোচ্য ঘটনাটি কোন বিশেষ জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে? ঘটনাটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দিকে মানুষের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। তাদের জানাচ্ছে যে, তিনি অতি বড় দয়াময়, তিনি পূর্ণ রহমতের মালিক। বড়ই মর্যাদাবান তিনি, অতি বড় প্রেমময় তিনি। তিনিই তাঁর নেয়ামত প্রদর্শন করতে পারেন। তিনি তাঁর বাস্তব দান ও মেহেরবানী মানুষকে বিনা কারণে এবং বিনা যুক্তিতেও দিতে পারেন। সীমা সংখ্যাহীন ও এ বিশেষ দান করার ক্ষমতা তাঁর গুণাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট।

আবার মানুষের প্রতি ওই ঘটনার হেদায়াত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা যে হেদায়াতের মাধ্যমে তাকে এত বেশী সম্মান দিয়েছেন যার কল্পনাও করা যায় না এবং যার শোকরিয়া আদায় করাও তার ক্ষমতার বাইরে। এমনকি সারা যিন্দেগী ভর রুকু-সেজদায় কাটালেও তাঁর শোকর আদায় করা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই তাঁর বান্দার কথা স্মরণে রাখেন এবং সর্বদাই তার দিকে মনোযোগী থাকেন। প্রতিনিয়ত তাকে আল্লাহকে পাওয়ার পথ বাতলে দিচ্ছেন। মানুষের মধ্য থেকেই তিনি রসূল পাঠিয়েছেন। তার জন্যে বাসস্থান, নির্ধারণ করেছেন যেখানে সৃষ্টির সবাই ভয় ও নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর কথামতো চলে।

সমগ্র মানুষের জীবনে এই ভয়ানক বিবর্তন ঘটার যে চিহ্ন বিদ্যমান তা মানব সৃষ্টির গোড়া থেকেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এটা মূলত শুরু হয়েছে মানব ইতিহাসের সূচনাতে। যখন মানুষের বিবেকের শক্তি জাগ্রত হয়েছে, তখন থেকে মানুষ তার লাগাম ছাড়া চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তখন থেকেই সে তার চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে, তার নিজের মূল্য ও কদর বুঝতে পেরেছে। আসলে পৃথিবীতে মান-মর্যাদা, আকর্ষণ বা কুপ্রবৃত্তির চাহিদা দমনই এক্ষেত্রে মূল কথা নয়, বরং বিশ্বাস করা যে এটা হচ্ছে সর্বময় ক্ষমতার মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ইশারা ইংগীতে সংঘটিত কাজ।

সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল্লাহ তায়ালার চোখের সামনে (তদারকিতে) মানুষের অন্তর-প্রাণে উন্নতির এই অপ্রতিরোধ্য ভাবধারা জারি রয়েছে এবং এই অনুভূতি নিয়েই তারা নড়াচড়া ও কাজকর্ম করে চলেছে। তারা আশা করছে যে, আল্লাহ তায়ালার পরিচালনায় তাদের কর্মকুশলতার হাত আরো দীর্ঘায়িত হতে থাকবে এবং তাদের অগ্রগতির পদক্ষেপগুলো এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাবে। তাদের এই অগ্রগতির কারণে তাদের ভুল-ভ্রান্তিরও অবসান হতে থাকবে এবং সঠিক কাজের দিকে তারা ধীরে ধীরে এগুতে থাকবে। তাদের অগ্রযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে তারা সব সময়ই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওহী (সরাসরি নির্দেশ) লাভের আশা করেছে। এ ওহী হচ্ছে আসলে তাদের অন্তরেরই প্রতিধ্বনি, অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে যে দাবী সৃষ্টি হয়েছে এই পথনির্দেশনা দানের মাধ্যমে তাদের সেই সব দাবী পূরণ করা হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ডাক দিয়ে বলেছেন, এটা গ্রহণ করো এবং ওটা পরিত্যাগ করো।

প্রকৃতপক্ষে নবী (স.)-এর তেইশটি বছরের জীবনের সময়কাল বিশ্বমানবের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়। এ সময়ের মধ্যে মানুষ ও ফেরেশতাদের প্রকাশ্য ও সরাসরি যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। এ সময়ের মূল্য ও সঠিক তাৎপর্য তারাই বুঝতে পেরেছিলেন, যারা তাঁর সময়ে বর্তমান ছিলেন এবং ওহীর মাধ্যমে এ যোগাযোগকে নিজেরা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। এরা ওহী শুরু হওয়ার অবস্থাটি যেমন দেখেছিলেন, তেমনি দেখেছিলেন এর সমাপ্তি পর্যায়ের অবস্থা। তারা কথা ও কাজের এই সম্মিলনের মিষ্টতার স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্পষ্টভাবেই তারা

অনুভব করতেন যে, আল্লাহ রব্বুল ইযযত কিভাবে তাঁর অদৃশ্য হাত দ্বারা তাদের চলার পথ রচনা করেছেন। তারা তাদের এ পথ-পরিক্রমার করুণ সূচনালগ্ন যেমন দেখেছিলেন, তেমনি দেখেছিলেন ইসলামের বিজয় লাভের গৌরবজনক অবস্থা। এ সময়কাল ছিলো এমন একটি আর্শ্চজনক অধ্যায় যার পরিমাপ পৃথিবীর কোনো মাপকাঠি দিয়েই করা সম্ভব হয়। কিন্তু সুবিশাল এই বিশ্বে সময়ের ব্যবধানে যে সব ঘটনা ঘটে তার একটা থেকে আর একটা যেমন দূর বলে আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করি তার থেকেও অনেক অনেক বেশী অনুভব করি এর গ্রহ-নক্ষত্রাদির মধ্যকার দূরত্বের ব্যবধান। এগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব পৃথিবীর কোনো জিনিসের পারস্পরিক দূরত্ব দিয়ে মাপা যাবে না। এমনকি কোনো একটি আকাশের দূরত্ব আন্দাজ করেও সেগুলোর দূরত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে মানুষের মনগড়া মতবাদ ও ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জীবন বিধানের মধ্যে রয়েছে এক আকাশচুম্বী পার্থক্য। জাহেলিয়াতের কার্যকলাপ ও ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যেও অনুরূপ ব্যবধান রয়েছে। এর থেকেও বেশী দূরত্ব বিরাজ করছে সাধারণ মানবতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ও আল্লাহওয়ালা লোকের মধ্যে পার্থক্য।

বরং একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, ওদের মধ্যকার পার্থক্য সৌরজগতের মধ্যে অবস্থিত আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার পার্থক্য থেকেও বেশী। সেই সোনার মানুষরা তাদের জীবদ্দশাতেই ঈমানের স্বাদ বুঝতে পেরেছেন, পেয়েছেন এর মিষ্টতা, বুঝেছেন এর মূল্য। অন্তরের গভীরে প্রিয় নবী (স.)-কে হারানোর ব্যথাও তারা তীব্রভাবে অনুভব করেছেন, বিশেষ করে যখন নশ্বর এ পৃথিবী থেকে পরম প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্যে তিনি চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা.), ওমর (রা.)-কে বললেন, চলো, আমরা উম্মে আয়মন (রা.)-এর সাথে একটু দেখা করে আসি, যেমন করে রসূলুল্লাহ (স.) মাঝে মাঝে তার সাক্ষাৎ করতেন। এরা দু'জন এ মহীয়সী মহিলার কাছে এলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। এরা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে? আপনি কি জানেন না, রসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ভালো অবস্থাতে আছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই আমি তা জানি, তিনি আল্লাহর কাছে যে খুবই ভালো অবস্থায় আছেন সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি শুধু কাঁদছি এ জন্য যে, আকাশ থেকে ওহী আসার পথ বন্ধ হয়ে গেলো। একথা শুনে তারা দু'জনও ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবং তিনজন বহুক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন।

নবী (স.)-কে হারানোর ব্যথার প্রতিক্রিয়া সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একইভাবে চলে আসছে, আর যতোদিন পৃথিবী বেঁচে থাকবে এবং এর অধিবাসীরা পৃথিবীর ওপরে বিচরণ করতে থাকবে ততোদিন এই শোকের প্রবাহ একইভাবে চলতে থাকবে।

প্রিয়নবী (স.)-এর আগমনের পর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত ওহীর শিক্ষা লাভ করেই মানুষ এক নতুন জীবন লাভ করেছিলো এবং জীবনের এমন এক নতুন মূল্য তারা খুঁজে পেয়েছিলো যা পৃথিবীর কোনো জিনিস বা কোনো মানুষের পক্ষ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই জীবনের এই মূল্যবোধ পাওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত কারো ইচ্ছা অথবা জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে এ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন পাওয়া সম্ভব নয়। (১)

ওহীর নযুল শুরু হওয়ার পর ইতিহাসের গতিপথের এমন বিপ্লবাত্মক কিছু পরিবর্তন সূচিত হলো, যা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি এবং এর পরেও আর কখনও হবে না। যেদিন প্রথম জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন ঘটলো, সেদিনকার সেই ঘটনা ছিলো হক্ব ও বাতিল-এর মধ্যে পার্থক্য

(১) 'আবাসা ওয়া তাওয়াললা' সূরাটির তাফসীর দ্রষ্টব্য।

নির্ণয়কারী এক অভিনব ও অভূতপূর্ব ঘটনা। পৃথিবীর বুকে এ ঘটনা এমন এক স্মরণীয় ঘটনা, এমন উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ঘটনা, যা আজও স্পষ্টভাবে সর্বত্র বিরাজ করছে। মহাকালের আবর্তন কোনোদিন তাকে মুছে দিতে পারে নি এবং এমন কোনো দিন আসবে না যখন মানুষ ওই ঘটনা একেবারে ভুলে যাবে। বস্তুতপক্ষে, সে ঘটনার কারণে মানুষের বিবেকের মধ্যে সৃষ্টিজগত ও জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে এমন ধ্যান ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে ইতিপূর্বে কখনও আর হয়নি এবং ভবিষ্যতেও সারা বিশ্বের কোথাও এতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর ঘটবে না।

এ ঘটনার মধ্যে দিয়েই সর্বশক্তিমান আল্লাহর দেয়া কর্মসূচী পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং বিশ্বমানবের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক সমাধানও তাতে পেশ করা হয়েছিলো যাতে করে যুক্তির নিরীখেও ইসলাম তার ভাবমুর্তি তুলে ধরতে পারে। ইসলামী জীবন বিধানের মধ্যে কোনো গোঁজামিল বা অস্পষ্টতা নেই, কোনো দ্ব্যর্থবোধক বা অন্ধবিশ্বাসের স্থানও এখানে নেই। সত্য সমাগত হওয়ার পর গোমরাহির পথ যারা এখতিয়ার করে তা– না জানা বা না বুঝার কারণে নয়, বরং সম্পূর্ণ জেনে-বুঝে ইচ্ছা করেই তারা সত্য থেকে দূরে থাকছে।

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনার মাধ্যমে ইতিহাসের যে তুলনাহীন অধ্যায় শুরু হলো তা পূর্বেকার অধ্যায় থেকে ভিন্ন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ অধ্যায়ের সূচনার কারণেই পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলো। নবতর এই যুগান্তকারী ঘটনার আগমন মানবেতিহাসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সারা পৃথিবীতে তার দোলা লেগেছে। এ দোলা লাগার ফলে পূর্ববর্তী মানুষ থেকে এ অধ্যায়ের মানুষগুলো সম্পূর্ণ নতুন এক রূপ ও চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হলো। পূর্ববর্তী মানুষগুলো কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করতো না এবং বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়ারও কোনো প্রয়োজন অনুভব করতো না। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ের মানুষ আখেরাতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে বিবেকসম্মত কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো এবং যে মহান উপদেশমালা তারা পেলো তার অনুসরণে পুরোপুরী আত্মনিয়োগ করলো। নবী (স.)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হওয়ার সে শিক্ষা কোনোক্রমেই তারা ভুলে যায়নি। সর্বোতভাবে এই নতুন শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে গোটা মানবমন্ডলী নতুনভাবে জন্মলাভ করলো। এই ধরনের আমুল পরিবর্তন এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর এমন আন্তরিক অনুসরণ ইতিহাসে এই একটি বারই মাত্র ঘটলো।

এ পর্যন্ত এসে আলোচ্য সূরাটির প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত হলো। সূরাটির বাকি অংশের আলোচনা এখন শুরু হচ্ছে। আমরা সবাই জানি যে, দ্বিতীয় অধ্যায়টি নাযিল হয়েছে পরবর্তীকালে। এ অধ্যায়ে আলোচনা এসেছে নবুওতপ্রাপ্তির পরে যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোকে কেন্দ্র করে। ওই সময়ে তাঁর নবী হওয়ার ঘোষণা এসে গেছে। প্রকাশ্যে দাওয়াতী কাজ ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত চলছিলো এবং এগুলোর প্রতিক্রিয়ায় মোশরেকদের বিরোধিতাও চলছিলো। তাই এগুলোর দিকে আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইংগিত দিয়েছেন। বলেছেন, 'তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে বাধা দিয়েছে সে বান্দাকে যে নামায পড়ছিলো.......।' কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হলেও সূরাটির মধ্যে আলোচিত পূর্ব ও পরের অংশগুলোর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণনা-পরম্পরা ও উভয় অংশে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ মিল থাকায় মনে হয় উভয় অংশ অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সাথে জড়িত।

সূরা আল আলাক্ব

আয়াত ১৯ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَاْ

وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ۝ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ

الرُّجْعٰى ۝ اَرَءَيْتَ الَّذِیْ يَنْهٰى ۝ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝ اَرَءَيْتَ اِنْ

كَانَ عَلَى الْهُدٰى ۝ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (হে মোহাম্মদ), তুমি পড়ো, (পড়ো) তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, ২. (যিনি) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে, ৩. তুমি পড়ো এবং (জেনে রাখো) তোমার মালিক বড়োই মেহেরবান, ৪. তিনি (মানুষকে) কলম দ্বারা (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিখিয়েছেন, ৫. তিনি মানুষকে (এমন সবকিছু) শিখিয়েছেন যা (তিনি না শেখালে) সে কখনো জানতে পারতো না; ৬. (আর) হাঁ, এ মানুষই (বড়ো হয়ে) বিদ্রোহে মেতে ওঠে, ৭. সে দেখতে পায় তার যেন (এখন আর) কোনো অভাব নেই; ৮. অথচ (এ নির্বোধ ভেবে দেখে না,) একদিন তার মালিকের দিকেই (তার) প্রত্যাবর্তন হবে; ৯. তুমি কি সে (দাম্ভিক) ব্যক্তিটিকে দেখেছো যে তাকে বাধা দিলো, ১০. (বাধা দিলো আল্লাহর) এক বান্দাকে যে নামায পড়ছিলো; ১১. তুমি কি দেখেছো, সে কি সঠিক পথের ওপর আছে, ১২. কিংবা সে কি (অন্যদের আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করার আদেশ দেয়? ১৩. সে ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি মনে করো যে (আল্লাহকে) মিথ্যা প্রতিপাদন করে এবং (তাঁর থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়; ১৪. এ (দাম্ভিক) লোকটি কি জানে না আল্লাহ তায়ালা (তার সব কিছুই) পর্যবেক্ষণ করছেন; ১৫. (কিছুতেই) না, যদি সে (এ থেকে) ফিরে না আসে, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি সম্মুখভাগের চুলের গোছা ধরে হেঁচড়াবো,

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا ۚ لَا

تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

১৬. (তুমি কি জানো সে কে যার চুল ধরে আমি হেঁচড়াবো?) সে হচ্ছে (আমাকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী না-ফরমান ব্যক্তিটি, ১৭. সে (আজ বাঁচার জন্যে) তার সংগী-সাথীদের ডেকে আনুক, ১৮. আমিও তার জন্যে (আযাবের) ফেরেশতাদের ডাক দেবো, ১৯. কখনো নয়; তুমি কিছুতেই তার অনুসরণ করো না, তুমি (বরং) তোমার মালিকের সামনে সাজদাবনত হও এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করো।

তাফসীর

এরশাদ হচ্ছে, 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ত-পিন্ড থেকে। পড়ো, এবং (জেনে রেখো) তোমার প্রভু সম্মানিত, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা। শিখিয়েছেন মানুষকে এমন কিছু যা সে জানতো না।'

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনালগ্নে অবতীর্ণ এটিই প্রথম সূরা। রসূলুল্লাহ (স.) এই সর্বপ্রথম মনোযোগী হলেন আল্লাহর আরশ থেকে আগত সেই দূতের দিকে। তিনি তাকিয়ে দেখলেন তাকে– যিনি এই সূরাটি বহন করে প্রথম আগমন করলেন। ভ্রান্ত মানুষকে সত্যের দিকে আহবান জানানোর জন্যে দাওয়াতী কাজের সূচনাতে এই হলো তাঁর প্রথম পদক্ষেপ, গোটা মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে তাঁর মনোযোগকে সর্বপ্রথম আকর্ষণ করা হলো আল্লাহর নামে পড়ার কথা বলে। বলা হলো, 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে।' এখানে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের গুণাবলীর মধ্যে সেই গুণটির কথা উল্লেখ করে ওহী নাযিল হওয়া শুরু হলো যা দিয়ে সৃষ্টির সূচনা হলো, তাই বলা হয়েছে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। এরপর বিশেষভাবে মানব সৃষ্টি ও তার সূচনার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিন্ড থেকে। সেই একটি শুক্রবিন্দু যা পর্যায়ক্রমে জমাট হয় এবং মাতৃগর্ভে রক্তপিন্ডের আকার ধারণ করে। সৃষ্টিলোকে সেই ক্ষুদ্র সৃষ্টিটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে সুন্দর ও বলিষ্ঠ শরীরের আকার ধারণ করে সৃষ্টিকর্তার মহত্ব প্রকাশ করে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস ও তার মাধ্যম

তুচ্ছ একটি শুক্রবিন্দুকে এমন সুন্দর মানুষে পরিণত করা তাঁর মহা ক্ষমতার কী চমৎকার বহিপ্রকাশ! তারপর আল্লাহ তায়ালা যাকে মর্যাদাবান বানাতে চান, তাকে ওই রক্তপিন্ড থেকে উন্নীত করে পরিপূর্ণ এমন মানুষের রূপ দান করেন যে সে জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখায় ও শেখে। আল্লাহ তায়ালা একথাটাই আলোচ্য অংশে জানাচ্ছেন 'পড়ো এবং (জেনে রেখো) তোমার রব মহা সম্মানিত, যিনি শিখিয়েছেন কলম দ্বারা, শিখিয়েছেন মানুষকে এমন কিছু যা সে জানতো না।'

মানুষের এই বিবর্তন– সৃষ্টির সূচনা থেকে তার পরিণত বয়স এবং পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত– এটা কোন সহজ ব্যাপার নয়, চিন্তা বা ইচ্ছা দ্বারা এটা সম্ভব

বলে কেউ মনে করে না, বা করতে পারে না বরং এ কাজ সেই মহা বিজ্ঞানময় ক্ষমতাধর আল্লাহ তায়ালা আঞ্জাম দেন। তিনি মহা সম্মানিত। এই পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে গেলে যে কোনো লোকের মাথা ঘুরে যায়।

আর এই সত্যের দিকে ইশারা করতে গিয়েই শিক্ষা দানের গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে। এ শিক্ষাদান হচ্ছে কলম দ্বারা। কলম মানুষের জন্যে সারা বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটা বড়ো নেয়ামত। এ শিক্ষাদান পূর্বেও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো এবং আজও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা বুঝতে পারছি। শুধু তাই নয় শিক্ষা দানের যতো উপায় আছে সেগুলোর মধ্যে কলমের গুরুত্ব সর্বাধিক। এর গুরুত্ব বেশী প্রভাবশালী এবং বেশী কার্যকর। আগে কলমের দ্বারা শিক্ষা লাভ যতোটা সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, আজ তা তার থেকে অনেক বেশী সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ। কলমের মাধ্যমে আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদান চলছে এবং এর বহুমূখী উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কলমের গুরুত্ব পূর্বেও জানতেন এখনও জানেন বিধায় রেসালাতের অধ্যায়গুলোর মধ্যে প্রথম অধ্যায়েই সেই দিকে ইশারা করেছেন। পবিত্র কোরআনের প্রথম সূরাতে এ বিষয়ের প্রতি ইশারা করেছেন। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ কলমের গুরুত্বের কথা নিয়ে যে নবীর কাছে এই সূরাটি নাযিল হলো, তিনি নিজে ছিলেন নিরক্ষর, কলমের ব্যবহার তিনি জানতেন না। আসলে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাঁকে নিরক্ষর রাখার রহস্য হচ্ছে, মানুষকে একথা জানার সুযোগ দেয়া যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এই মহাগ্রন্থ পেশ করা ওহী এবং রেসালাত লাভ ছাড়া এই নিরক্ষর নবীর দ্বারা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না।(২)

এরপর শিক্ষার উৎস বলা হচ্ছে। সে উৎসটি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। মানুষ যা কিছু জেনেছে বা জানবে একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই জানবে। সারা বিশ্বের সৃষ্টিরহস্যের যে দ্বার তার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। জীবনের যে দুর্ভেদ্য তথ্য সে জানতে পেরেছে, তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সব তথ্য সে অবগত হয়েছে তা সবই তাঁর কাছ থেকে সে জানতে পেরেছে। জানতে পেরেছে সেই একমাত্র উৎস থেকে, যিনি ব্যতীত স্থায়ী আর কেউ নেই, কেউ হতে পারে না।

আলোচ্য অধ্যায়ে যখন নবী (স.) মহাকাশের মালিক আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত হলেন এবং তখন থেকে তিনি ঈমানের বহিপ্রকাশ ঘটানোর জন্যে এক নিয়মের অনুবর্তী হয়ে গেলেন। আর নিয়মটি হচ্ছে,

প্রতিটি ব্যাপার, প্রতিটি নড়াচড়া, প্রতিটি পদক্ষেপ এবং প্রত্যেক কাজের শুরু আল্লাহর নাম নিয়ে করা। আল্লাহর নামে চলতে থাকা, আল্লাহমুখী হওয়া এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ তায়ালা সেই মহান সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি শিখিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকেই সকল কিছুর সূত্রপাত হয়েছে, তাঁর থেকেই শিক্ষা লাভ ও জ্ঞান অর্জন ....আর মানুষ যা কিছু শেখে বা জানে সে সব কিছুর মূলে রয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন, যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি শিখিয়েছেন, 'শিখিয়েছেন মানুষকে এমন কিছু– যা সে জানত না।'

---

(২) তাঁর সংগী-সাথী যারা ওহীর কথাগুলো লিখতেন, তারাই এর সর্বোত্তম সাক্ষী যে, তিনি নিজে হাতে কিছুই লেখেননি। তিনি কোথাও কারো কাছে পড়েন নি; কোনো জ্ঞানী-গুণী লোকের সাথে বেড়ানোর সুযোগও তিনি পাননি। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কিছুই জানতেন না। হঠাৎ করে ৪০ বছরে পড়তেই 'পড়ার' গুরুত্ব, কলম দ্বারা লেখার গুরুত্ব, এতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা এবং আগত কথাগুলো চিরদিন নির্ভুল থাকা ওহী ছাড়া কি করে সম্ভব হলো! সূরা ইউনুসের ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'বলো, আল্লাহ না চাইলে আমি তোমাদেরকে একথাগুলো পড়ে শুনাতাম না। একথাগুলো আসার পূর্বে আমি তো তোমাদের মধ্যে পুরো বয়সটাই কাটিয়ে দিয়েছে, তোমরা কি কিছুই বুঝো না–অনুবাদক

কোরআনের প্রথম সত্য এটাই, যা নবুওতের প্রথম অবস্থাতে রসূল (স.)-অনুভব করেছিলেন এবং মহাসত্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর সমগ্র চেতনা হয়ে উঠেছিলো। এই সময়েই তাঁর যবান গিয়েছিলো এবং তাঁর কাজ ও জীবনের গতিপথ নির্ণীত হয়ে গিয়েছিলো এবং ঈমানের প্রথম গুণ হিসাবে সর্বত্র তাঁর নাম নিয়ে চলার অভ্যাস গড়ে উঠেছিলো।

ইমাম শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে কাইয়েম আল জাওযী তার রচিত 'যাদুল মায়াদ ফী হাদ্য়ি খাইরিল ইবাদ' গ্রন্থে যেকেরকে রসূলুল্লাহ (স.)-এর পথ প্রদর্শনার সারসংক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, 'নবী (স.) ছিলেন আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাপারে সৃষ্টিজগতে সব থেকে পূর্ণাংগ মানুষ। অন্য কথায় বলতে গেলে তাঁর সমস্ত কথাই ছিলো আল্লাহর। তিনি যে সব ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছিলেন তাও ছিলো আল্লাহর যেকের। তাঁর নির্দেশ ও নিষেধ এবং উম্মাতের জন্যে আইন প্রবর্তন সবই ছিলো আল্লাহর যেকের। রব্বুল আলামীন-এর নাম, গুণাবলী, ফয়সালাসমূহ, কাজ, ওয়াদা ও তিরস্কার সব কিছুই ছিলো আল্লাহর যেকের। আল্লাহর নেয়ামতের কথা উল্লেখ ও তাঁর প্রশংসা করা, তাঁর বড়ত্ব, তাঁর কৃতিত্ব এবং তাঁর আনুগত্য করা সম্পর্কে যতো কথা আছে সবই তাঁর পক্ষ থেকে আল্লাহর যেকের। তাঁর প্রার্থনা, আল্লাহ তায়ালার দিকে ঐকান্তিক একাগ্রচিত্তে এগিয়ে যাওয়া, তাঁর নীরবতা ও কোনো কিছু জানতে বা শুনতে পেরে চুপ থাকা ছিলো তাঁর অন্তরের যেকের। অতএব, প্রকৃত সত্য ও সঠিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা তাও হবে আল্লাহর যেকের। আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হবে তার অন্তরের মধ্যে দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। তাঁর চলা-ফেরা, ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্যেই আল্লাহর যেকের পরিস্ফুট হয়েছিলো।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর পুরোটা জীবন এভাবেই কেটেছে। তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ ছিলো আল্লাহ কেন্দ্রিক। নবুওতের প্রথম সূচনাতে যে আবেগ-অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন তার উজ্জ্বল আভায় তা ছিলো উদ্দীপিত। তাঁর ধ্যান-ধারণায় সেই ঈমানী চেতনাটি সদা-সর্বদা দোলা দিয়ে যেতো।

যারা সত্যকে গ্রহণ করে না

মানুষ যখন এ সত্য জানতে-বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ তায়ালাই তাকে সৃষ্টি করেছেন, শিক্ষা দান করেছেন এবং সৃষ্টিকুলের সবার ওপর তাকে সম্মানিত করেছেন, তখন মানুষের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহকে সঠিকভাবে চেনা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের ব্যবহারে তার বিপরীত অবস্থা পাওয়া যায়। যে কারণে এ সূরাটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার কর্তব্যে গাফলতি, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং দায়িত্বহীন ব্যবহারের কথা আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে,

'না, কিছুতেই তারা বিরোধিতা করে সাফল্য লাভ করবে না। এই ব্যবহার দ্বারা নিশ্চয়ই মানুষ সঠিক মালিকের সাথে বিদ্রোহ করছে। কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখতে পাচ্ছে। অবশ্যই তোমার রবের কাছে (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে।'

যিনি তাকে এতো সব জীবনসামগ্রী দান করেছেন এবং অভাবমুক্ত করেছেন তিনিই আল্লাহ তায়ালা। তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন, সম্মানিত করেছেন এবং শিক্ষাদান করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ সেই মহান দাতাকে অস্বীকার করে, তাঁর না-শোকরি করে এবং তাঁর থেকেই বেপরোয়া হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ রহমত দিয়ে যার ঈমানকে রক্ষা করেছেন তার কথা স্বতন্ত্র আসলে সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি যে তাঁকে অস্বীকার করে অথচ তিনিই তাকে সৃষ্টি করে

অতি সুন্দর অবয়ব দিয়েছেন, ভাল-মন্দ বুঝবার জ্ঞান, এরপর পৃথিবীতে বসবাসকালীন সময়ে তাকে তিনি দিয়েছেন প্রয়োজনীয় সকল জীবন সামগ্রী-এর পরেও সে মূল মালিকের সাথে বিদ্রোহ করে এবং তাঁর নাফরমানী করে, অহংকার করে এবং নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন করে। অথচ এটি অবধারিত সত্য যে, তাঁর কাছেই একদিন তাকে ফিরে যেতে হবে। একথা যদি সে অনুভব না করে বা বুঝতে না চায়, তাহলে ওই অহংকারী এবং বেপরোয়া ব্যক্তি মৃত্যুর পরে কোথায় যাবে? অথবা যখন সে বুঝতে পেরেছে যে, সেই মহান মালিকের কাছেই তাকে ফিরে যেতে হবে, তার পরেও সে বিদ্রোহ করে কোথায় পালাবে? কার কাছে আশ্রয় পাবে?

এই আলোচনায় একথাটিও প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, যে যাই-ই করুক না কেন, আর যতো অর্থ-বৈভব নিয়ে সে পৃথিবীতে দাপট দেখিয়ে চলুক না কেন–অবশেষে তাঁর কাছেই তাকে যেতে হবে। মৃত্যুর পরে আল্লাহ তায়ালার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী থাকাটাই হলো ঈমানের মূল দাবী। তার প্রতিটি পদক্ষেপে, অন্তরের প্রতিটি গোপন কথার মধ্যে একথা থাকতে হবে যে, সব কিছুর পরিণতি ও পরিসমাপ্তিতে সেই মালিকের দরবারে তাকে যেতে হবে। ভাল ও মন্দ সবাইকেই সেখানে যেতে হবে। তাঁর কাছেই অনুগত ও অপরাধী, হকপন্থী ও না-হকপন্থী সবার প্রত্যাবর্তন অবধারিত। নেক লোক ও দুষ্ট লোক, সচ্ছল ও অভাবগ্রস্ত সবার শেষ গন্তব্যস্থল হলো আল্লাহর দরবার, আজ সে যতোই দাম্ভিকতা, অহংকার কিংবা উদাসীনতা দেখাক না কোনোএকদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। জেনে রেখো, সব কিছুকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। শুরু যেমন তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাবর্তনও তাঁর কাছেই।

আল্লাহর চরমপত্র

এমনি করে সূরাটির দুই অংশের মধ্যে ঈমানের ধ্যান-ধারণার বিভিন্ন দিক ও বিভাগের সম্মিলন ঘটেছে। সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি দান করা সম্মানিত করা ও শিক্ষা দান করা তারপর প্রত্যাবর্তন করা– এ সবই নির্ধারিত। এরপর এ ছোট্ট সূরার মধ্যে রয়েছে তৃতীয় আর একটি অধ্যায় যার মধ্যে অহংকারের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য থেকে মাত্র একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি মানুষের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়। যে কোনো মানুষই এথেকে বাঁচতে চায় এবং কোরআনের তুলনাহীন বর্ণনায় জানা যায় যে, সে অবস্থাটি অত্যন্ত ভয়াবহ।

যে ব্যক্তি নামাযে বাঁধা দেয় তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে–

'দেখেছো কি ওই ব্যক্তিকে যে বাধা দেয় সেই ব্যক্তিকে– যে নামায পড়ে? ....এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় (এই উভয় ব্যক্তির কী পরিণতি হতে পারে?)

বাধা দানকারী ওই ব্যক্তি কি সত্যিই জানে না যে আল্লাহ তায়ালা সব শ্রেণীর লোকের সকল ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করছেন?

নামাযে বাধা দানকারীর বিশ্রী কাজের চিত্র যেভাবে এই আয়াতে ফুটে উঠেছে সে ধরনের বর্ণনার কোনো ভাষা আজও লিখিত হয়নি এবং যা বুঝানোর জন্যে এমন কথাও ব্যবহৃত হয়নি। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভংগি অত্যন্ত দ্রুতবেগে এবং সংগোপনে মনের ওপর দাগ কাটে। দেখুন বলা হচ্ছে, 'তুমি দেখেছো কি?' অপ্রীতিকর কাজটিকে? দেখেছো কি ওই লজ্জাজনক মুহূর্তটিকে যখন এ জঘন্য ব্যবহারটি সংঘটিত হচ্ছিলো? দেখেছো কি ওই ব্যক্তিকে যে বাধা দিচ্ছিলো নামায আদায়কারীকে। ওই বাধা দান করার কদর্য কাজটি বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 'আরাআইতা'? এই শব্দ দ্বারা ওই কাজের বীভৎসতা অত্যন্ত প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। বলা হচ্ছে, সে ব্যক্তি যখন নামায পড়ছিলো, তখন তাকে যে নির্দয়-নিষ্ঠুর ভাবে বাধা দিচ্ছিলো এই অসভ্য

লোকটিকে তুমি দেখেছো কি? এতে সেই ব্যক্তির চরিত্রের যে জঘণ্য কদর্যতা ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করার মতো এর চেয়ে যুৎসই কোনো ভাষা নেই। নামায আদায়কারী ব্যক্তিটি তো সত্য সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো অথবা মানুষকে সে 'তাকওয়া' পরহেযগারী তথা আল্লাহকে ভয় করে চলার শিক্ষা দিচ্ছিলো অথচ এই জঘন্য লোকটি তাকে এই কল্যাণময় কাজে বাধা দিচ্ছিলো।

'আরাআইতা' শব্দটি দ্বারা ওই অপ্রিয় কাজটির প্রতি চরম ঘৃণা প্রদর্শন করা হচ্ছে। 'তুমি কি দেখেছো যে, সে বাধা দান করার পর তাকে কেমন করে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে এবং পরে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে? পূর্বের অধ্যায়ের শেষে যেভাবে ধমকের সুরে কথা বলা হয়েছে, এখানে এসেও একই ধমকের সুর বর্তমান রয়েছে! সে কি জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখছেন, তার মিথ্যা সাব্যস্ত করার প্রয়াস এবং মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া সবই তাঁর নযরে রয়েছে। যে বান্দা নামায পড়ছে, তাকে বাধা দানের অবস্থাটাও তিনি দেখছেন, অথচ সে তো সত্য-সঠিক পথেই আছে। সেও এটা জানে এবং অন্তরে বিশ্বাস রাখে যে, এ ব্যক্তি সঠিক পথে রয়েছে কিন্তু স্বার্থ নষ্ট হবে বলে প্রকাশ করে না। সে সদা-সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলতে বলে এটাও বাধা দানকারীর অজানা নয়। সে নিজে রসূল (স.)-এর কর্মধারাকে দেখছে এবং পরবর্তী অবস্থা দেখার ব্যাপারেও অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করে। সে হঠকারিতা করে। বুঝেও না বুঝার ভান করছে। তার এই কৃত্রিমতা কি আল্লাহর কাছে ধরা পড়ছে না, আল্লাহ তায়ালা দেখছেন বলে কি সে জানে না?

দাওয়াত ও ঈমানের পথে বাধা দানকারী এই অহংকারী ব্যক্তিটি দ্বীনের পথে কাঁটা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজে আল্লাহর আনুগত্য করে না, অন্যকেও আনুগত্য করার ব্যাপারে সে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। অতএব, তার জন্যেই এই চূড়ান্ত ধমক এবং এ ধমক এখানে খোলাখুলিভাবেই দেয়া হয়েছে, কোনো আকারে-ইংগিতে নয়। না কিছুতেই সে এই হঠকারিতার মন্দ পরিণতি থেকে বাঁচতে পারবে না। যদি সে তার এ কদর্য ব্যবহার থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাকে তার মাথার সামনের দিকের চুল ধরে আমি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে আসবো। চুল ধরে টানা– এই চরম অপমানজনক পরিণতি এ জন্যে যে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী অপরাধী। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে সে যেন তার দলের সাথীদেরকে ডাকে, আমি দোযখের দারোয়ান ফেরেশতাকে ডেকে বলবো তাকে পাকড়াও করো।

এই চূড়ান্ত এবং কঠিনতম ধমক হচ্ছে মহা দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। এখানে 'নাসফায়াম বিন নাসিয়াহ' শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার কঠিন পরিণতি বুঝানোর জন্য। শব্দটি শুনতেও বেশ কঠিন। 'নাসিয়াহ' হচ্ছে মাথার সামনের উঁচু জায়গার চুল। এ অহংকারীরা সাধারণভাবে অহংকার প্রদর্শনের জন্য এভাবে চুল রাখে এবং অহংকার দেখানোর জন্য এই চুলের গুচ্ছকে ঝাঁকি মেরে ওপরে তুলে দেয় এবং আবোল-তাবোল বলতে থাকে। এই এখানে মিথ্যার সাথে মাথার অগ্রভাগের চুলের একটা সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এ চুল কোনো ভালো লক্ষণ নয়। এ দ্বারা অহংকার ও অপরাধপ্রবণতা বুঝায় 'এ চুল মিথ্যাবাদী অপরাধী।' যে তা রাখে যেন নিজেই নিজের মুখে একটা কলংক কালিমা লেপে দেয়। সে ব্যক্তি ভাবছে যে, তার দলের এবং তার গোষ্ঠীর লোকজন তাকে শক্তি যোগাবে। এজন্য সে তাদের ডাকতে বলছে বা ডাকার হুমকি দিচ্ছে। এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসছে, ঠিক আছে, সে তার লোকদের ডাকুক। আমিও ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমিও জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদের ডাকবো। তারা হবে বড়ই কঠোর। সুতরাং সে অবস্থা থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্যে কিছু চেষ্টা-সাধনা অবশ্যই সবার প্রয়োজন। সে

ভয়ানক অবস্থা থেকে প্রত্যাবর্তনের চিন্তাকে সামনে রেখে সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে যাতে করে আল্লাহবিশ্বাসী ও অনুগত বান্দারা ঈমানের ওপর দৃঢ় থাকতে পারে এবং আল্লাহর আনুগত্যে অটল হতে পারে।

'কিছুতেই সে ব্যক্তি সাফল্য পাবে না, ওর কথা মেনে নিয়ো না, বিশ্ব পালক আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে তুমি সাজদা করো এবং তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হও।'

কিছুতেই সফলতা পাবে না। যে অহংকারী ব্যক্তি নামায ও ইসলামের দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করছে সে কিছুতেই সফল হতে পারে না। তুমি তোমার রব-এর উদ্দেশ্যে সাজদা করো এবং আনুগত্য প্রদর্শন ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক এবাদাত এবং যাবতীয় হুকুম পালনের মাধ্যমে তুমি তাঁর নৈকট্য হাসিল করো। আর ছেড়ে দাও এই অহংকারী ও সত্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিটিকে, জাহান্নামের দারোয়ান ফেরেশতাদের হাতে ওকে ছেড়ে দাও।

কোনো কোনো সহীহ রেওয়ায়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, এ সূরার প্রথম অবতীর্ণ অংশটুক (১-৫ আয়াত) বাদে বাকী অংশটুকু আবু জাহল সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। নাযিল হয়েছিলো সেই সময়টিকে কেন্দ্র করে যখন মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামাযে রত রসূলুল্লাহ (স.)-এর পাশ দিয়ে সে যাওয়ার সময় সে বলেছিলো, 'ওহে মোহাম্মদ, আমি তোমাকে কি এই কাজ (নামায আদায়) করতে মানা করিনি?' এ কথা বলার সময় সে হতভাগা রসূলুল্লাহ (স.)-কে ধমকাতে লাগলো এবং এক পর্যায়ে অত্যন্ত কড়া ভাষা প্রয়োগ করলো। এই সময়েই সম্ভবত রসূলুল্লাহ (স.) তার গলা টিপে ধরে বলেছিলেন, ধ্বংস হয়ে যাও হতভাগা, আবারও বলছি, তুমি চিরদিনের মতো ধ্বংস হয়ে যাও।' সে তখন বলেছিলো, হে মোহাম্মদ কোন্ সাহসে তুমি আমাকে এমন করে ধমকাচ্ছো? তুমি কি জানো না এই অঞ্চলে আমার দলই সবচেয়ে বড়ো দল? তাদেরকে নিয়ে আমি সভা-সমিতি করি এবং তারা আমার যে কোনো ডাকে সাড়া দেয়? ঠিক ওই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যায়টি নাযিল হয়েছে।

'ঠিক আছে, ডাকুক সে তার দলীয় লোকদের। আমিও শীঘ্র জাহান্নামের ফেরেশতাদের ডাকবো।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি নিজের লোকদের সে সত্য সত্যই ডাক দিতো তাহলে আযাবের ফেরেশতারাও সংগে সংগে হাযির হয়ে যেতো।

সূরাটির শিক্ষা হচ্ছে বিদ্রোহী, অহংকারী, নামাযে বাধা সৃষ্টিকারী, আনুগত্য করতে অস্বীকারকারী এবং যারা শক্তির বড়াই করে পরিণামের দিক থেকে তারা সবাই সমান। আল্লাহ তায়ালার যে উদ্দেশ্য এ সূরার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তা হচ্ছে– না, কারোই কোনো ক্ষমতা নেই, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সব ক্ষমতার মালিক। অতএব, আনুগত্য অন্য কাউকে দিও না, সাজদা করো আল্লাহকে এবং এই সাজদার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাসিল করো। যেহেতু সাজদার মাধ্যমেই সব থেকে বেশী নৈকট্য লাভ করা যায়।

এভাবে সূরাটির অংশগুলো বিভিন্ন সময়ে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সেগুলোর মধ্যে চমৎকার মিল রয়েছে এবং ঘটনাগুলো একটি আর একটির পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে।

সূরা আল ক্বাদর

আয়াত ৫ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ① وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ② لَيْلَةُ
الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ③ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ
رَبِّهِمْ ۚ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ④ سَلٰمٌ ۛ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ⑤

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আমি এ (গ্রন্থ)-টি নাযিল করেছি এক মর্যাদাপূর্ণ রাতে, ২. তুমি কি জানো সেই (মর্যাদাপূর্ণ) রাতটি কি? ৩. এ মর্যাদাপূর্ণ রাতটি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম; ৪. এতে (ফেরেশতা ও তাদের সর্দার) 'রূহ' তাদের মালিকের (সব ধরনের) আদেশ নিয়ে (যমীনে) অবতরণ করে, ৫. (সে আদেশ বার্তাটি হচ্ছে চিরন্তন) প্রশান্তি, তা ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত (অব্যাহত) থাকে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরাতে যে বরকতময় রাতের বর্ণনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে সে মহিমান্বিত রাত যাকে কেন্দ্র করে গোটা সৃষ্টিজগত আনন্দ এবং আল্লাহর প্রেমের সাগরে অবগাহন করে। এ হচ্ছে পৃথিবী ও ঊর্ধ জগতের মহামিলনের রাত। এই রাতেই রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর প্রথম কোরআন নাযিল হতে শুরু করে। সারা বিশ্ববাসীর জন্যে এ রাত হচ্ছে সব থেকে বেশী আনন্দময় রাত, যার যতো মর্যাদাপূর্ণ আর কোনো রাত কোনো দিন আসেনি। অর্থাৎ এমন মর্যাদাপূর্ণ রাত ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েও কখনো আসেনি। এ রাতে সারা বিশ্বের জন্যে হেদায়াতের যে অফুরন্ত ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছে, তা ইতিপূর্বে কেউ কোনোদিন দেখতে পায়নি। এ রাতের প্রভাব যেভাবে মানুষের জীবনকে আপ্লুত করে, তাদের মধ্যে যে হৃদয়াবেগ সৃষ্টি করে তার নযীর আর কখনও মানুষ দেখেনি। এমন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষ আর কখনও অনুভব করেনি। তাই বলা হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি নাযিল করেছি এই কেতাব (কোরআনকে) এক মহা মহিমান্বিত রাতে। তুমি কি জানো সেই মহিমান্বিত রাতটি কী? সে মহান রাত হচ্ছে এতো মর্যাদাপূর্ণ যে, তা হাজার মাস থেকে ও উত্তম এবং মর্যাদাপূর্ণ।

কোরআনে বর্ণিত এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে এ রাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ সূরাটি পড়ার সময়েই মনের ওপর এর উজ্জ্বলতা প্রতিভাত হয়।

তাফসীর

এই সূরাটিতে আলোচিত রাত সম্পর্কে সূরা 'দোখান'-এ বলা হয়েছে, 'আমিই নাযিল করেছি এ কোরআনকে পবিত্র এক রাত্রিতে, আমি তো বরাবর সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক কাজকে ভালো ও যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করে আলাদা ভাবে রাখা হয়। আমার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় হেদায়াতও আসে। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আমিই পাঠিয়েছি এই মহান বাণী। এটা তোমার রব-এর পক্ষ থেকে রহমত হিসাবে এসেছে। নিশ্চয়ই তিনি শোনেন জানেন।'

এ রাতটি হচ্ছে রমযান মাসের একটি রাত। সূরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতে বর্ণিত 'রমযান মাস– যার মধ্যে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে নাযিল হয়েছে কোরআন। এ কোরআন মানুষের জন্যে পথ প্রদর্শক, হেদায়াতের কথা স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে বর্ণনাকারী এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য-সৃষ্টিকারী' অর্থাৎ ওই রাতেই রসূল (স.)-এর ওপর কোরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছিলো, যাতে করে তিনি মানবমন্ডলীকে সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারেন। ইবনে ইসহাক-এর রেওয়ায়াত অনুসারে জানা যায়, সূরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত রমযান মাসেই নাযিল হয়েছিলো। সে সময়ে রসূলুল্লাহ (স.) হেরা গুহার মধ্যে গভীর ধ্যানে মশগুল ছিলেন।

এ রাতটির স্থিরীকরণের ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস পাওয়া যায়। কোনো হাদীস অনুসারে এই রাত হচ্ছে ২৭শে রমযানের রাত। কোনোটি অনুসারে ২১-এর রাত, আবার কোনোটি অনুসারে শেষ দশটি রাতের মধ্যে যে কোনো একটি বেজোড় রাত। আবার কারো মতে সারাটি রমযানের যে কোনো একটি রাত।

লাইলাতুল কদর

এই রাতের নাম হচ্ছে লাইলাতুল কদর। এর অর্থ হচ্ছে তকদীর ও তদবীর। অন্য অর্থ হচ্ছে মূল্যবান ও মর্যাদাবান। উভয় অর্থই সেই মহান ও সার্বজনীন ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল, যা সে রাতে ঘটেছিলো। অর্থাৎ কোরআন, ওহী ও রসূল নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা। গোটা সৃষ্টিজগতে এর থেকে বড় এবং স্থায়ী ঘটনা আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি। বান্দার জীবনে তকদীর ও তদবীর সম্পর্কে নির্দেশক ঘটনা এর থেকে বেশী আর কোনোটিই নয়। এ রাতটি হাজার মাস থেকেও উত্তম। আসলে হাজার মাসের কথা উল্লেখ করে বিশেষ একটি সীমাবদ্ধ সময়ের অর্থ বুঝানো হয়নি, বরং আধিক্য বুঝানোর জন্যই এ সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়েছে! এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে, হাজার হাজার মাস থেকেও বান্দার জীবনে এই রাতটি উত্তম। ওই ঘটনার পর হাজার হাজার মাস ও হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু সে মোবারক রাতে যে ঘটনাটি ঘটে গেলো অনুরূপ ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি– আর কোনোদিন ঘটবেও না। অর্থাৎ বিশ্বনবী (স.)-এর প্রতি ওহী আগমন, তাঁকে সারা বিশ্বের নেতা নির্বাচন এবং অবহেলিত, নিগৃহীত, মযলুম ও বঞ্চিত মানবতাকে স্বাধীন ও অধিকার সচেতন করে তোলার জন্যে এ রাতেই বিধান রচিত হয়েছিলো। যালেমদের যুলুমের হাতকে দমন করে মানুষকে খেলাফতের আসনে সমাসীন করার জন্যে সারা বিশ্বের মহান সম্রাটের পক্ষ থেকে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা দানের এই বিপ্লবী ইতিহাস এই দিনেই রচিত হয়েছিলো। এ কাজ ও এমন দায়িত্বপ্রদান না পূর্বে কখনও হয়েছে, না আর কখনও হবে। সুতরাং মানুষের জীবনে হাজার হাজার কেন লক্ষ কোটি বছরেও কখনও অনুরূপ ঘটনা ঘটেনি আর কখনও ঘটবেও না। তাই, সেই রাতটির মর্যাদা স্মরণে এবং এ রাতের বরকত লাভের জন্য সে রাতের মধ্যে অবতীর্ণ অফুরন্ত বর্ণনাধারাতে অবগাহন ও তা আকণ্ঠ পান করা এবং প্রেমময় আল্লাহ পাকের দরবারে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার কাজ যে করতে পারে সে বড়োই সৌভাগ্যবান, বড়োই মর্যাদাবান।

লাইলাতুল কদরের তাৎপর্য

এই মহান রাতের সঠিক মূল্যায়ন ও সঠিক চেতনা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। তাই তো বলা হচ্ছে, 'লাইলাতুল কদ্‌র' যে আসলে কি ও কতো মহান তা তুমি কি জানো? আসলে সেই মর্যাদাকে হৃদয়ংগম করার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীগুলোর আশ্রয় নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কোরআন পাক নাযিলের কাজ শুরু করার জন্যে সে রাতটির নির্বাচনই সে রাতের মর্যাদার জন্যে যথেষ্ট। উপরন্তু গোটা ধরার বুকে সে মহিমাময় আলোর উজ্জ্বলতার প্লাবন এবং বিশ্বমানবতার জীবনে সে রাতে শান্তির যে ফোয়ারা ফুটেছিলো, যে বিপ্লব এসেছিলো মানুষের আকীদা-বিশ্বাসে, যে দোলা লেগেছিলো তাদের চিন্তাধারায় ও জীবন যাপন পদ্ধতিতে এবং তার মাধ্যমো পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়কর যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিলো, মানুষের সাংস্কৃতিক অংগনে এবং গোটা মানবতার জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের বিবেক যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিলো তাও চির অমলিন। (১)

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অনুমতিক্রমে কোরআন বহনকারী জিবরাঈল (আ.) সহ অন্যান্য বহু ফেরেশতার নাযিল হওয়া এবং এই রাতেই তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আর তার পরেই মহাকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হওয়ার চিত্র সূরাটির মধ্যে আঁকা হয়েছে। এসব কিছু মিলে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এর মাধ্যমে এক অভাবনীয় উপহার দান করেছে।

আজ বহু বসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা যখন সে পবিত্র ও সৌভাগ্যময় রাতের দিকে তাকাই, তখন আমরা অবশ্যই সেই ঐশী দূতের মধুর পরশকে স্মরণ করি, কল্পনা করি অপরূপ সেই ওহীর আগমনজনিত আনন্দ-উৎসবের দৃশ্যটিকে, যা সে মধুর রাতে বিশ্ব অবলোকন করেছিলো, সেই বাস্তব সত্যের ব্যাপারে যদি আমরা ভাবি যা সে রাতে সংঘটিত হয়েছিলো তাহলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় এবং এতোগুলো শতাব্দী পার হয়ে যাওয়ার পরও আমরা বারবার স্মরণ করছি ও পাতার পর পাতা লিখে চলেছি। পৃথিবীর এতো বিবর্তনের পরেও সে সুখময় মুহূর্তগুলোকে বড়ো যত্ন করে অন্তর ও অনুভূতির মণিকোঠায় ধরে রেখেছি। পৃথিবীর অসংখ্য ঘটনারাজির মধ্য থেকে বের করে নেয়া সেই মধুর বার্তাকে আটকে রেখেছি। আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাই সত্য সঠিক এক মহা প্রলয়ংকারী ঘটনাকে। দেখতে পাই এ রাতে আগত কোরআনের ইংগিতবাহী নিগূঢ় সত্যটিকেও! তাই তো আল্লাহর পক্ষ থেকে, জিজ্ঞাসার সুরে বলা হচ্ছে। 'তুমি কি জানো সেই 'লাইলাতুল কদর'টি কি?'

এ রাতে প্রত্যেকটি বিজ্ঞানময় কাজ, যুক্তিভিত্তিক প্রত্যেকটি কথা ও জ্ঞানপূর্ণ বার্তা পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত হয়েছে। সকল কিছুর যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দ্বার এ রাতেই উন্মোচিত হয়েছে। মানুষের প্রকৃত মূল্যায়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো এবং অবিচার-অনাচারে ভরা বিশ্বে সুবিচার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হলো। মানুষ তার বাঞ্ছিত মর্যাদা পেলো, সারা বিশ্বের ইতিহাসে যা কোনোদিন কোনো জাতির, কোনো গোত্রের কোনো মানুষ লাভ করেনি। সমাজের বুকে প্রত্যেকে তার যথাযথ স্থান পেলো, পেলো অনবদ্য মানসিক শান্তি!

---

(১) আরো জানার জন্যে দেখুন লেখকের রচিত, 'আসসালামুল আলামে ওয়াল ইসলাম।'

আজ মানুষের দুর্ভাগ্য, মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে এ পবিত্র রাতের সঠিক মূল্যায়ন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সে জানে না সেই সৌভাগ্য রজনীতে আগত ঘটনার প্রকৃত মর্যাদা। এর কারণ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহ পাকের দেয়া নেয়ামতসমূহকে ভুলে গেছে এবং তার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি থেকে উদাসীন হয়ে গেছে। সে সৌভাগ্যের সুফল পেতে সে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রকৃত শান্তি লাভ করা থেকে আজ সে বহু যোজন দূরে সরে গিয়েছে। সে আজ বিবেকের শান্তি ও ঘরের শান্তি হারিয়ে ফেলেছে।(১) এটা একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই তাকে দিয়েছে, দিতে পেরেছে। যা বস্তুবাদী– 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও' এর প্রবক্তারা এবং পুঁজিবাদের ধ্বজাধারীরা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। এ হচ্ছে মানবতার এক চরম দুর্ভাগ্য, সব রকমের বিলাস ব্যসন দ্রব্য লাভের পরও এবং সর্বপ্রকার জীবন ধারণ সামগ্রী হাসিলের পরেও নিজ প্রকৃত মনিব ও তাঁর বাণীকে ভুলে যাওয়ার এ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

সে মোবারক রাতে, সে পবিত্র রজনীতে যে সৌভাগ্যপ্রদীপ তার সমুজ্জ্বল প্রভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো, সুন্দর ও মধুমাখা সেই নূরের ঝলক আজ নিভে গেছে, আজ আধুনিকতাগর্বী হতভাগা ব্যক্তির হৃদয় থেকে সেই উজ্জ্বল খুশী হারিয়ে গেছে, যা এক সময়ে তাকে ঊর্ধাকাশের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলো, আজ তার অন্তরাত্মার আনন্দ ও শান্তি দূর হয়ে গেছে। আত্মার শান্তি সঠিক জ্ঞানের সুষমাময় আলো এবং ইল্লিয়্যীনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছানোর যে আশা-ভরসা ছিলো, তার পরিবর্তে আজ যা সে পাচ্ছে তা তার জীবনকে হতাশায় ভরে দিয়েছে।

অপরদিকে আমরা মোমেন বা যারা আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্ত তারা যেন ভুলে না যাই অথবা উদাসীন না হয়ে যাই সে মহামূল্যবান উপদেশমালা আমাদের কাছে আছে তার সূত্রপাত হয়েছিলো মহান রাতে, যা আমাদেরকে আমাদের প্রিয়নবী (স.) জীবন যাপনের সহজ সরল পথ হিসাবে দিয়ে গেছেন। যাতে করে আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় আমরা চিরদিন তার শিক্ষাকে সঞ্চিত রাখতে পারি, পরিবর্তিত পৃথিবীর যাবতীয় ঝড়ঝঞ্ঝার কবল থেকে এ কেতাবের প্রতি আমাদের মহব্বতকে রক্ষা করতে পারি। এই রাত্রির জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি এবং তাকে অনুসন্ধান করি রমযানের শেষ দশ রাতে। বোখারী ও মুসলিম দুটি সহীহ হাদীসে যে হাদীসটি আমরা পাই তা হচ্ছে, রমযান মাসের শেষ দশ রাতে কদরের রাতকে অনুসন্ধান করো। এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীস জানা যায় এবং তা হচ্ছে, ঈমান ও আত্মজিজ্ঞাসা সহকারে যে ব্যক্তি রমযান মাসে আল্লাহর স্মরণে দাঁড়ালো, নামায আদায় করলো তার পূর্ববর্তী সকল গুণাহ মাফ করে দেয়া হবে।

ইসলাম শুধু বাহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.) এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। লাইলাতুল ক্বদর-এ যে ক্বেয়াম করা হয় তা হতে হবে 'ঈমান ও আত্মজিজ্ঞাসা সহকারে।' এই ভাবে নামায পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেন এই রাতে সেই মহান অর্থ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কেয়াম করতে (নামাযে দাঁড়াতে) পারে যে উদ্দেশ্যে এই কোরআন নাযিল করা হয়েছে। 'ঈমান' সহ, অর্থাৎ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই এই দাঁড়ানোর কাজটি (নামায পড়া) যেন সংঘটিত হয়। 'এহ্‌তেসাবান',

(১) লেখকের রচিত 'আসসালামুল আলামি ওয়াল ইসলাম।' পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায় দ্রষ্টব্য

অর্থাৎ মনের মধ্যে এই দাঁড়ানোর সঠিক তাৎপর্য যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠে। কোরআন নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য যেন এই কাজের দ্বারা সফল হয়।

প্রশিক্ষণের ইসলামী পদ্ধতি হচ্ছে অন্তরের মধ্যে এবাদাত এবং তার তাৎপর্যকে পুনরুজ্জীবিত করে রাখা, এই সকল তাৎপর্যকে স্পষ্ট ও জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তোলার উপায় হিসাবে একে গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে মানুষের চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় এবং কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে সীমাবদ্ধ না হয়ে যায়। একথা প্রমাণিত সত্য যে, এবাদাতের তাৎপর্য হচ্ছে তাকে বাস্তব রূপ দেয়া। বিবেককে জাগিয়ে তোলা এবং জীবনকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য এটাই একমাত্র সঠিক পদ্ধতি। অর্থাৎ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে ইসলামী প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। মুখের কথার সাথে কাজের যদি মিল না থাকে তবে ইসলামে সে বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। শুধু মুখের দাবী ব্যক্তি জীবন বা সামষ্টিক জীবনে কোনো পরিবর্তন বা পরিশুদ্ধি আনয়ন করে না। মুখে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং একমাত্র তাঁরই অনুগত বান্দা বলে দাবী করার পর যদি বাস্তব জীবনে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত অন্য কারো হুকুমের কাছে নতি স্বীকার করা হয়, তাহলে তা তার ঈমানের দাবীর বিপরীত– এহেন দাবী নিষ্ফল ও নিরর্থক।

এই জন্যে লাইলাতুল কদরে আল্লাহ পাকের স্মরণ-এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণ ঈমানী চেতনা নিয়ে আল্লাহর আনুগত্য বাস্তবে করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে আত্মজিজ্ঞাসা করা এবং সাথে সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হওয়া। আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতায় বিশ্বাসী থেকে যে ব্যক্তি তার কথা ও কাজের মিল আনয়ন করার চেষ্টা করবে এবং এভাবে কাজ করতে গিয়ে যে কোনো ঝুঁকির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত থাকবে, তারই লাইলাতুল কদরে দাঁড়ানোর মাঝে সার্থকতা আছে বঝুতে হবে। নিছক বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত দ্বারা এই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

সূরা আল বাইয়্যেনাহ

আয়াত ৮ রুকু ১

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى

تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (১) رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً (২) فِيْهَا كُتُبٌ

قَيِّمَةٌ (৩) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ

الْبَيِّنَةُ (৪) وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (৫) اِنَّ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (৬) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মাঝে যারা (আমার আয়াত) অস্বীকার করে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা কখনো ফিরে আসতো না, ২. (আর সে প্রমাণ হচ্ছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল (আসবে), যারা (এদের) আল্লাহর পবিত্র কেতাব পড়ে শোনাবে, ৩. এতে রয়েছে উন্নত (মূল্যবোধ) ও সঠিক বিষয়বস্তু; ৪. আগের কেতাবধারী লোকেরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও বিভেদ এবং অনৈক্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে; ৫. অথচ এদের এ ছাড়া আর কিছুরই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও এবাদাত নিবেদিত করে নেবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে, (কেননা) এ হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান; ৬. আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মাঝে যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে) অস্বীকার করেছে, তারা অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে থাকবে, সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল, এ লোকগুলোই হচ্ছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি; ৭. অন্যদিকে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তারাই হচ্ছে

أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝٨ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٩

সৃষ্টিকুলের (মধ্যে) সর্বোৎকৃষ্ট; ৮. তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার রয়েছে (এমন এক) জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত থাকবে ঝর্ণাধারা, এরা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে; ৯. আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন, তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট হবে; (তা) সে যে তার মালিককে (না দেখে) ভয় করে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অধিকাংশ রেওয়ায়াত অনুসারে এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে একে মক্কী বলা হয়েছে। রেওয়ায়াতের দিক দিয়ে এবং বক্তব্য উপস্থাপনার ভংগির দিক দিয়ে সূরাটির মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা যদিও বেশী, তথাপি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া যায় না। সূরায় যাকাত ও আহলে কেতাবের উল্লেখকে এ ক্ষেত্রে প্রতিকূল সাক্ষ্য হিসাবে ধরা যায় না। কেননা, অকাট্যভাবে মক্কায় অবতীর্ণ এমন সূরাতেও আহলে কেতাবের উল্লেখ আছে। মক্কায় আহলে কেতাবের কিছু লোক বাসও করতো। তাদের কেউবা ঈমান এনেছে, কেউ আনেনি। নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদল যে রসূল (স.)-এর সাথে মক্কাতেই সাক্ষাত করতে এসেছিলো এবং ঈমান এনেছিলো, সেটা তো সুবিদিত। কতিপয় মক্কী সূরায় যাকাতেরও উল্লেখ দেখা যায়।

মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করে এমন রেওয়ায়াত তো রয়েছেই। তদুপরি এ সূরায় এমন কিছু ঐতিহাসিক ও ঈমান বিষয়ক সত্য প্রতিবেদনের ভংগিতে তুলে ধরা হয়েছে, যা এর মাদানী হওয়াকেই অগ্রগণ্য বলে সাব্যস্ত করে।

উক্ত সত্যসমূহের মধ্যে পয়লা সত্যটি এই যে, আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্য থেকে যারা গোমরাহী ও মতদ্বৈধতার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো, তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য রসূল (স.)-কে পাঠানো অপরিহার্য ছিলো। তাঁর আগমন ছাড়া তারা কিছুতেই সেই ভ্রান্তপথ থেকে ফিরে আসতো না। প্রথম তিনটি আয়াত 'আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিলো, তারা কুফরী ছাড়তে রাযী ছিলো না যতক্ষণ তাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ না আসে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল, যিনি পবিত্র গ্রন্থ পড়ে শোনাবেন। যাতে শাশ্বত ও সঠিক বিধানসমূহ লেখা থাকবে-এর এটাই বক্তব্য।

দ্বিতীয় সত্য এই যে, আহলে কেতাব তাদের ধর্মের ব্যাপারে যে দ্বিমত পোষণ করেছে সেটা তাদের অজ্ঞতার জন্যও নয় এবং এই ধর্মে কোনো অস্পষ্টতা থাকার জন্যও নয়। বরঞ্চ তাদের কাছে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আসার পরেই তা করেছে। চতুর্থ আয়াতে, 'পূর্বে যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছিলো, তাদের কাছে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ আসার পরই তারা বিভেদগ্রস্ত হয়েছিলো'-একথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

তৃতীয় সত্য এই যে, দ্বীন বা ধর্ম মূলগতভাবে এক ও অভিন্ন। তার মূলনীতি ও বিধিগুলো সহজ-সরল ও স্পষ্ট। এ সব মূলনীতি ও বিধি এত সরল ও সহজ বৈশিষ্টের অধিকারী যে, তা কখনো মানুষকে বিভেদ ও কোন্দলের শিক্ষা বা প্ররোচনা দেয় না। সূরার চতুর্থ আয়াতের বক্তব্য এটাই।

চতুর্থ সত্য এই যে, অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আসার পরও যারা ইসলামকে অস্বীকার করে, তারা হলো নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। আর যারা ঈমান আনে, তারা উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। এ জন্য উভয় গোষ্ঠীর কর্মফলেও আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

'আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে চিরদিন থাকবে। তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা হচ্ছে উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান হলো চিরস্থায়ী বেহেশ্ত।'

এ চারটি সত্যসহ ইসলামী আকীদা ও শেষ নবীর ভূমিকাকে অনুধাবন করার ব্যাপারে সূরাটি অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রাখে

তাফসীর

নিম্নে এর বিশদ বিবরণ দিচ্ছি, 'আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল না আসা পর্যন্ত তারা এ পথ থেকে ফিরবে না। এই সুস্পষ্ট দলীল হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একজন রসূল, যিনি পবিত্র লিপিসমূহ পাঠ করেন, সেই লিপিসমূহে রয়েছে অকাট্য ও অনড় বিষয়সমূহ।'

পৃথিবী এক নতুন নবুওতের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছিলো। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে অন্যায়, অনাচার ও অরাজকতা এতো ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো যে, একটি নতুন নবুওত, নতুন বিধান ও নতুন আন্দোলন ছাড়া সেই পরিস্থিতি শোধরানোর কোনো আশা ছিলো না। পূর্ববর্তী আসমানী কেতাবসমূহের জ্ঞান লাভকারী এবং পরে তাকে বিকৃতকারী আহলে কেতাব আরব উপদ্বীপ ও অন্যান্য জায়গায় পৌত্তলিকরা-এদের সকলেরই আকীদা ও বিশ্বাস কুফরী তথা আল্লাহর অবাধ্যতার মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত ও কলুষিত হয়ে পড়েছিলো।

এ কুফরীতে তারা এতটা আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো যে, এই রেসালাতের অভ্যুদয় ছাড়া এবং এই নবীর সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া তারা তা থেকে ফিরে আসতো না। এই নবীর ব্যক্তিত্বই ছিলো একটি সুস্পষ্ট, অকাট্য ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী দলীল বিশেষ। 'আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এক রসূল, যিনি পবিত্র লিপিসমূহ পাঠ করেন'। অর্থাৎ কুফর ও শেরেক থেকে পবিত্র। 'তাতে রয়েছে সুসংহত ও অকাট্য বিষয়সমূহ।' কেতাব শব্দটি দ্বারা বিষয় বা অধ্যায় বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন, 'কেতাবুত তাহারাত' পবিত্রতা সংক্রান্ত অধ্যায় বা বিষয়, 'কেতাবুস সালাত-নামাযের অধ্যায় বা বিষয়, 'কেতাবুল কদর' অদৃষ্ট সংক্রান্ত বিষয় বা অধ্যায়, 'সুহুফুম্ মুতাহ্হারা' দ্বারাও কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে কোরআনে সুদৃঢ় ও সুসংহত আ্লোচ্য বিষয়সমূহ, অধ্যায়সমূহ বা তথ্যসমূহ রয়েছে।

সুতরাং এই রেসালাত এবং এই রসূল উপযুক্ত সময়েই এসেছেন। আর বিভিন্ন অধ্যায়, বিষয় ও তথ্য সম্বলিত এই কোরআন এই উদ্দেশ্যে এসেছে যেন সমগ্র পৃথিবীতে এমন এক নতুন ঘটনা ও নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, যা পৃথিবীকে পরিশুদ্ধ করার জন্য অপরিহার্য ছিলো। এই রসূল এবং এই রেসালাত সমগ্র পৃথিবীর জন্য কিভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো, সে বিষয়টি বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী, নদভীর লেখা একটি গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার সেই গ্রন্থের নাম 'মা যা খাসেরাল আলামু বে এনহেতাতিল মুসলেমীন' (মুসলমানদের অধোপতনে বিশ্ব কি হারালো) এ বিষয়ে আমি এ যাবত যতো লেখা পড়েছি, তন্মধ্যে এই পুস্তকটি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট। এর প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে,

অন্ধকার থেকে আলোর পথে

'এ কথা সর্ববাদী সম্মত সত্য যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দী ছিলো ইতিহাসের সবচেয়ে অধপতিত যুগ। শত শত বছর ধরে মানবতা ক্রমেই অবনতির দিকে এগিয়ে চলছিলো। পৃথিবীর কোথাও এমন কোনো শক্তি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না, যা তাকে চরম অধপতন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। বরঞ্চ যুগের আবর্তনে ক্রমেই তার অধপতন ত্বরান্বিত হচ্ছিলো। এই শতাব্দীর মানুষ তার স্রষ্টাকে ভুলে গিয়েছিলো। সেই সাথে নিজেকে ও নিজের পরিণতিকেও ভুলে গিয়েছিলো। সত্য জ্ঞান, ভালো ও মন্দের পার্থক্য এবং ন্যায় ও অন্যায়ের ভেদাভেদ জ্ঞানও সে হারিয়ে ফেলেছিলো। দীর্ঘকালব্যাপী নবীদের দাওয়াতও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। তাঁদের তিরোধানের পর তাদের জ্বালানো প্রদীপগুলো হয় নিভে গিয়েছিলো, নতুবা তার আলো এত নিস্প্রভ হয়ে পড়েছিলো যে, দেশ থেকে দেশে এবং জনপদ থেকে জনপদে তার আলো বিকীর্ণ হতো না। বড়োজোর দু'চার জন মানুষের মন ও বিবেকে কিছুটা দীপ্তি ছড়াতো। ধর্মপ্রাণ লোকেরা জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্র থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে উপাসনালয়ে অথবা নিভৃতস্থানে আশ্রয় নিয়েছিলো, যাতে দুনিয়ার ঝক্কি-ঝামেলা ও গোমরাহীর বিপদ থেকে তাদের ধর্ম ও সততা রক্ষা পায়, নিরাপদে ও শান্তিতে বেঁচে থাকা যায় এবং জীবনের রকমারি দায়-দায়িত্ব ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তাদের অনেকে ধর্ম ও রাজনীতির দ্বন্দ্বে এবং আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদী ভোগবাদী জীবন ধারার সংঘাতে পরাজয় বরণ করার কারণেও কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছিলো। যারা ময়দানে টিকে ছিলো, তারা রাজ-রাজড়া ও দুনিয়াবাসীর সাথে আপোস রফা করে নিয়েছিলো, তাদের যুলুম ও অত্যাচার ও পাপ-পংকিল জীবনধারার সাথে সহযোগিতা করা এবং অবৈধ পন্থায় মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করার পথ অবলম্বন করেছিলো।

'সেখানে বড় বড় অপরাধী ও বকধার্মিকদের তামাশা ও ছিনিমিনি খেলার শিকার হয়ে পড়েছিলো। ফলে তার প্রাণশক্তি ও বাহ্যিক রূপ-উভয়ই এত বিকৃত হয়ে পড়েছিলো যে, সেসব ধর্মের পূর্বসূরীরা পুনরুজ্জীবিত হলে সে ধর্মকে চিনতেই পারতো না। সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি এবং রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলগুলো নৈরাজ্য, অনাচার, দুর্নীতি, দুঃশাসন, অত্যাচার ও অব্যবস্থার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। তারা এমন আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে পড়েছিলো যে, তাদের জীবনেরও কোন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সারবত্তা ছিলো না। কোনো ঐশী ধর্মের কোনো পথ-নির্দেশ কিংবা কোনো স্থিতিশীল মানবীয় শাসন ব্যবস্থা তাদের করায়ত ছিলো না।'

এই ক্ষুদ্র বিবরণটি সংক্ষেপে মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওতের পূর্বেকার বিশ্ব পরিস্থিতি ও ধর্মীয় অবস্থার চিত্র তুলে ধরে। পবিত্র কোরআনে একাধিক জায়গায় আহলে কেতাব ও পৌত্তলিকদের জীবনে সমভাবে বিরাজমান কুফরীর বৈশিষ্টসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। ইহুদী খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে উচ্চারিত এসব আয়াতের একটি হচ্ছে সূরা তাওবার ৩০ নং আয়াত, 'ইহুদীরা বলে ওযায়ের আল্লাহর পুত্র, আর খৃষ্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র।'

সূরা আল বাকারার ১১৩ নং আয়াত, 'ইহুদীরা বলতো, খৃষ্টানদের কাছে কিছুই নেই। আর খৃষ্টানরা বলতো ইহুদীদের কাছে কিছুই নেই।'

সূরা আল মায়েদার ৬৪ নং আয়াত, 'ইহুদীরা বলতো, আল্লাহর হাত বাঁধা রয়েছে। অথচ তাদেরই হাত বাঁধা। তাদের এ কথার জন্য তারা অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহর হাত দু'টাই বরং উন্মুক্ত, যেমন খুশী তিনি তেমন ব্যয় করেন।'

সূরা আল মায়েদার ৭৩ নং আয়াত,' যারা বলেছে যে, মারইয়ামের পুত্র মাসীহই আল্লাহ, তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে।'

আর পৌত্তলিকদের সম্পর্কে কোরআন বলেছে, 'বলো, হে কাফেরগণরা! তোমরা যার পূজা করো আমি তার পূজা করি না, আর আমি যার এবাদাত করি, তোমরা তার এবাদাত করো না। তোমরা যার পূজা করো, আমি তার পূজা করি না। আর আমি যার এবাদাত করি তোমরা তার এবাদাত করো না। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।'

এই কুফরী ছাড়াও সারা পৃথিবী জুড়ে বিরাজ করতো অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অত্যাচার-অনাচার ও শত্রুতা। মোটকথা, পৃথিবীতে সুস্থ মনমেযাজসম্পন্ন একটি জাতিও ছিলো না, চরিত্র ও সততার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো সমাজও ছিলো না। ইনসাফ ও সহৃদয়তা ভিত্তিক কোনো সরকার ছিলো না। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো নেতৃত্ব ছিলো না এবং নবীদের কাছ থেকে আগত কোনো বিশুদ্ধ ধর্ম ছিলো না।' (মুসলমানদের অধপতনে বিশ্ববাসী কী হারালো)।

এ কারণে মানব জাতির প্রতি দয়া ও মহানুভবতার তাগিদে আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে একজন রসূল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, যিনি আল্লাহর কেতাব পড়ে তাদেরকে শোনাবেন। এই মহা ত্রাণকর্তা, মহান পথপ্রদর্শক রসূলকে না পাঠানো হলে পৌত্তলিক ও আহলে কেতাব গোষ্ঠী সেই অনাচার ও দুষ্কৃতি থেকে ফিরে আসতো না।

সূরার শুরুতে এই সত্য বর্ণনা করার পর পুনরায় বলা হচ্ছে যে, বিশেষভাবে আহলে কেতাব তাদের ধর্মের ব্যাপারে যে বিভেদ ও বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছে, সেটা ধর্মের ব্যাপারে কোনো অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা বা জটিলতার কারণে নয়, বরং তাদের রসূলদের মাধ্যমে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পরই তারা বিভেদ ও বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। 'সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই আহলে কেতাব বিভেদের শিকার হয়েছে।' এ ধরনের প্রথম বিভেদের ঘটনা ঘটে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের পূর্বে ইহুদী উপদলসমূহের ভেতরে। তারা বহু দলে-উপদলে বিভক্ত হয়। অথচ একই তাওরাত তাদের কেতাব এবং একই হযরত মূসা (আ.) তাদের নবী ছিলো। তারা পাঁচটি প্রধান উপদলে বিভক্ত ছিলো। যথা, সাদুকী, ফারেসী, আসেয়ী, গালী ও সামেরী। প্রত্যেক উপদলের আলাদা নিদর্শন ও লক্ষ্য ছিলো। এ ছাড়া ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিজেদের মধ্যেও ছিলো বৈরিতা ও বিভেদ। অথচ হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলেরই অন্যতম নবী ও শেষ নবী। তিনি তাওরাত কেতাবের সমর্থক হয়েই এসেছিলেন। তথাপি ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এই দুই জাতির মধ্যে সংঘটিত যে সব যুদ্ধ ও রক্তপাতের ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা এক কথায় লোমহর্ষক।

বর্বর ইহুদী খৃষ্টানদের ইতিহাস

৭ম শতাব্দীর প্রথম দিকে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে একে অপরের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলে এবং তাদের সুনাম মারাত্মকভাবে নষ্ট করে। শাহ ফোকাসের রাজত্বের শেষ বছরে অর্থাৎ ৬১০ খৃষ্টাব্দে ইহুদীরা এন্তাকিয়ার খৃষ্টানদের ওপর আক্রমণ চালায়। ফলে সম্রাট তাদের বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে তার সেনাপতি ইবনোসোসকে পাঠান। সেনাপতি এই বিদ্রোহ দমন করতে এমন নিষ্ঠুর দমন অভিযান চালায়, যার কোন নযির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সে তরবারি দিয়ে, ফাঁসি দিয়ে, পানিতে ডুবিয়ে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে, প্রহার করে, হিংস্র জানোয়ার

লেলিয়ে দিয়ে গোটা শহরবাসীকে সম্পূর্ণরূপে নিধন করে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে এ ধরনের গণহত্যা মাঝে মাঝেই হতো। ঐতিহাসিক মিকরিযী স্বীয় গ্রন্থে বলেন যে, রোম সম্রাট ফোকাসের আমলে পারস্য সম্রাট কিসরা সিরিয়া ও মিসরে স্বীয় সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা জেরুযালেম, ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার সকল গীর্জা ধ্বংস করে, সকল খৃষ্টান জনগণকে পাইকারীভাবে হত্যা করে। তাদেরকে খুঁজতে মিসরে এসে বিপুল সংখ্যক মিসরবাসীকে হত্যা করে এবং অসংখ্য মানুষকে বন্দী করে। পারস্যের এই হানাদার বাহিনীকে খৃষ্টানদের হত্যা ও গীর্জা ধ্বংস করার কাজে ইহুদীরা পূর্ণ সহযোগিতা দেয়। অতপর তাবারিয়া, জাবালুল জলীল, নাসেরিয়া শহর, সূর অঞ্চল ও জেরুযালেমের ভেতর দিয়ে পারস্যের দিকে অগ্রসর হয় এবং এই সময় খৃষ্টানদের ব্যাপক হত্যাকান্ড ও ধ্বংসলীলা চালায়। জেরুযালেমে তাদের দুটো গীর্জা ধ্বংস করে, তাদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়, খৃষ্টানদের পবিত্র ক্রুশের কাঠের একটা অংশ ছিনিয়ে নেয় এবং জেরুজালেমের বিশপ ও তার বহু সহচরকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

জেরুজালেম বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে সূর শহরে ইহুদীরা বিদ্রোহ করে, তারা তাদের অবশিষ্ট লোকজনকে নিজ নিজ শহরে পাঠিয়ে দেয় এবং খৃষ্টানদের ওপর হামলা ও তাদের হত্যা করার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে। এভাবে ইহুদীদের নিজেদের ভেতরে যুদ্ধ বেধে যায়। এই যুদ্ধে প্রায় ২০ হাজার ইহুদী অংশ নেয়। সূর শহরের বাইরে খৃষ্টান গীর্জাগুলো ধ্বংস করা হয়। এতে খৃষ্টানরা তাদের ওপর মরিয়া হয়ে হামলা করে। ফলে ইহুদীরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং তাদের অনেকেই নিহত হয়। এই সময় হিরাক্লিয়াস রোমের বাদশাহ হন। তিনি সুকৌশলে পারস্য বাহিনীকে পরাভূত করেন। পারস্য সম্রাট সেখান থেকে বিদায় হন। এরপর তিনি সিরিয়া ও মিসরে যান এবং পারসিকদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলকে পুনর্নির্মাণ করেন। এ সময় তাবারিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের ইহুদীরা তার কাছে উপঢৌকনাদি নিয়ে সাক্ষাৎ করে এবং তার কাছে নিরাপত্তা চায়। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন এবং তাদের ওপর কোনো হামলা না করার শপথ করেন। তারপর তিনি জেরুজালেমে প্রবেশ করেন। খৃষ্টানরা তাকে ইঞ্জিল গ্রন্থসমূহ, ক্রুশ ও জ্বলন্ত মোমবাতিসহ স্বাগত জানায়। হিরাক্লিয়াস জেরুজালেমের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে ভীষণ ব্যথিত হন। জেরুজালেমের খৃষ্টানরা তাকে জানায় যে, পারসিক বাহিনীর সহযোগিতায় ইহুদীরা এই সব ধ্বংস অভিযান চালিয়েছে। তারা জানায় যে, ইহুদীরা স্বয়ং হানাদার পারসিকদের চেয়েও বেশী হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। তারা হিরাক্লিয়াসকে ইহুদীদেরকে হত্যা করার প্ররোচনা দেয়। হিরাক্লিয়াস প্রতিবাদ করে বলেন যে, তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং শপথ করেছেন। কিন্তু সমস্ত খৃষ্টান পন্ডিত ও ধর্মযাজকরা তাকে এই মর্মে ফতোয়া দেয় যে, যেহেতু তারা হিরাক্লিয়াসকে তাদের অপকর্মের কথা জানবার সুযোগ না দিয়ে প্রতারণামূলকভাবে তার কাছ থেকে নিরাপত্তা আদায় করেছে কাজেই তাদেরকে হত্যা করলে কোনো দোষ হবে না। আর এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ খৃষ্টানরা প্রতি বছরে এক শুক্রবার রোযা রাখবে এবং এটা অনন্তকাল ধরে চলবে। এরপর হিরাক্লিয়াস তাদের কথায় রাযী হয়ে যান এবং ইহুদীদেরকে এমন পাইকারী হত্যা করেন যে, সিরিয়া ও মিসরে দু'একজন পালিয়ে বাঁচা ছাড়া একজন ইহুদীও রক্ষা পায়নি।'

এ সব বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, ইহুদী ও খৃষ্টান এই দুই জাতি মানুষের রক্তের সাথে কিরূপ নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা দেখিয়েছে এবং কিভাবে শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মনুষ্যত্বের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

এরপর খোদ খৃষ্টানদের ভেতরেই বিভেদ ও কোন্দল শুরু হয়ে যায়। অথচ তারা একই কেতাব ও একই নবীর অনুসারী। প্রথমে তারা মতভেদে লিপ্ত হয় আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে, তারপর পরস্পর বিরোধী ও পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণকারী দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যক্তি সত্ত্বা কি রকম ছিলো, তিনি কি অন্যান্য মানুষের মতো মরণশীল ছিলেন, না অমর ও অক্ষয় দেহের অধিকারী ছিলেন, তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। সেই সাথে তার মাতা মরিয়ামের স্বভাব-প্রকৃতি নিয়েও বিরোধ দেখা দেয়। তাদের ধারণা অনুসারে যে ত্রিত্ব থেকে 'আল্লাহ'র সৃষ্টি হয়, সেই ত্রিত্ব আসলে কি জিনিস, তা নিয়ে তারা মতভেদের শিকার হয়। কোরআন তাদের দুটি মত উল্লেখ করেছে। এক জায়গায় বলেছে, 'যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছে তিন ইলাহের একজন, তারা কাফের।' আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, হে মরিয়ামের পুত্র ঈসা! তুমি কি জনগণকে বলেছিলে যে, তোমরা আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ ছাড়া দুই ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করো?' (সূরা আল মায়েদা, আয়াত ১১৬)

'আর এই ধর্মীয় মতভেদের সবচেয়ে উগ্র রূপ দেখা দেয় সিরিয়া , রোম সাম্রাজ্য ও মিসরের খৃষ্টানদের মধ্যে। অন্য কথায় মালাকানী ও মনোকেসী খৃষ্টানদের মধ্যে। মালাকানীদের বিশ্বাস, হযরত ঈসা (আ.) একাধারে মানুষ ও ইলাহ দুই ছিলেন। আর মনোকেসীদের আকীদা এই যে, হযরত ঈসা (আ.) শুধু ইলাহ ছিলেন, তার ভেতরে মানবীয় বৈশিষ্ট্য এমনভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিলো যেমন এক ফোঁটা সির্কা অথৈ সমুদ্রের পানিতে পড়ে বিলীন হয়ে যায়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে এই দুই গোষ্ঠীর মতভেদ এমন যুদ্ধংদেহী রূপ ধারণ করে যে, তা দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের মধ্যকার বিরোধ বা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যকার বিরোধ বলে মনে হতে থাকে। উভয়ে উভয়কে ধর্মচ্যুত বা বিধর্মী বলে আখ্যায়িত করতো।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস পারসিকদের ওপর বিজয় লাভের পর সকল খৃষ্টান উপদলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এজন্য এই ফর্মুলা উদ্ভাবন করা হয় যে, লোকেরা হযরত ঈসার প্রকৃত স্বরূপ কি, তিনি একক না দ্বৈত রূপের অধিকারী, সে বিষয়ে কোনো কথা বলবে না। তবে আল্লাহ যে একক ইচ্ছা বা একক ফায়সালার অধিকারী, সে কথা সবাই মেনে নেবে। ৬৩১ খৃষ্টাব্দের শুরুতে ফর্মুলা স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে মনোকেসী তত্ত্ব রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করে। রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত গীর্জাসমূহের অনুসারীদের জন্যও এই তত্ত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। নতুন এই তত্ত্বকে হিরাক্লিয়াস অন্য সকল তত্ত্বের ওপর যে কোনো মূল্যে স্থান দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে মিসরের কিবতীরা এটিকে 'বেদয়াত' বলে প্রত্যাখ্যান করে। তারা এর প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয় এবং পুরানো তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

সম্রাট পুনরায় ধর্মের একীভূতকরণ ও মতান্তর নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন, তবে তিনি (ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে) শুধু আল্লাহর একক ইচ্ছার ধারণাটি মেনে নেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। এরপর দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো এই ইচ্ছাকে বাস্তবে কার্যকরী করা। এ ব্যাপারে সম্রাট যে কোনো বিতর্ক ও মত প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেন। অতপর এই মতকে তিনি রাষ্ট্রীয় ও সরকারী অভিমত হিসাবে সমগ্র প্রাচ্য দেশে প্রচার করেন। কিন্তু এতে মিসরের কোন্দল থামলো না। ফলে রোম সম্রাটের হাতে মিসরে লোমহর্ষক অত্যাচার চলে এবং তা দশ বছর যাবত অব্যাহত থাকে। এক একজন ভিন্ন

মতাবলম্বীকে নির্যাতন করে পানিতে ডুবিয়ে অথবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। কাউকে বালুভর্তি বস্তায় ঢুকিয়ে সাগরে ফেলে দিয়ে এবং অন্যান্য বহু বীভৎস পন্থায় কষ্ট দিয়ে তাদের হত্যা করা হয়। (১)

আর এই সমস্ত কোন্দল ও মতবিরোধ খোদ কেতাবধারীদের মধ্যেই সংঘটিত হয়। জ্ঞানের অভাবে বা অস্পষ্টতার কারণে এসব ঘটেনি, ঘটেছে বিকৃতি ও স্বার্থপরতার কারণে।

যেহেতু দ্বীন তথা আল্লাহর নাযিল করা ধর্ম মূলত, সুস্পষ্ট এবং তার আকীদা-বিশ্বাস সহজ-সরল ও জটিলতামুক্ত, তাই এই পটভূমিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তাদেরকে শুধুমাত্র এই আদেশই দেয়া হয়েছিলো যে, তারা যেন আল্লাহর এবাদাত এমনভাবে করে যে, আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নেয় এবং সর্বতোভাবে তাঁর প্রতি একাগ্র থাকে, আর নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। বস্তুত এটাই চিরস্থায়ী বিধান।' আল্লাহর দ্বীনের চিরন্তন মূলনীতি এটাই যে, একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করতে হবে, আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে ও সর্ববিষয়ে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। শেরেক ও মোশরেকদেরকে বর্জন করতে হবে, নামায কায়েম করতে হবে ও যাকাত দিতে হবে। 'এটাই চিরস্থায়ী দ্বীন বা বিধান।' অর্থাৎ অন্তরে নির্ভেজাল আকীদা-বিশ্বাস স্থাপন এবং সেই আকীদার আলোকে আল্লাহর এবাদাত ও আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয়। এই ব্যয়ের নাম হচ্ছে যাকাত। যে ব্যক্তি এইসব মূলনীতি বাস্তবায়িত করবে সে ঈমানকেই বাস্তব রূপ দান করবে। আহলে কেতাবকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এবং এটাই সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। একই দ্বীন ও একই আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে একের পর এক রসূলদের আবির্ভাব ও রেসালাতের আগমন ঘটেছে। এ দ্বীনে কোনো অস্পষ্টতা নেই, জটিলতা নেই। এ আকীদা-বিশ্বাসে কোনো দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের উস্কানি ও প্ররোচনা নেই। আল্লাহর এহেন সহজ সরল ও উদার দ্বীনের সাথে মানবরচিত জটিল ও বিতর্কিত আদর্শের কোনো তুলনা হয় না।

অন্ধকারে আলোর দিশা

এভাবে ইতিপূর্বেও সকল জাতির কাছে তাদের নবীদের মাধ্যমে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এসেছিলো। এবারও রসূল (স.)-এর মাধ্যমে এই দলীল-প্রমাণ জীবন্ত অবস্থায় এসেছে। তিনি পবিত্র গ্রন্থ আবৃত্তি করে শুনান এবং মানুষের কাছে সহজ-সরল সুস্পষ্ট আকীদা পেশ করেন। এভাবে মানুষের চলার পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। আর যারা ঈমান আনে এবং যারা কুফরী করে উভয়ের পরিণাম অবহিত হওয়া যায়।

'নিশ্চয় আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে। তারা সৃষ্টির অধম, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান হলো চিরস্থায়ী বেহেশ্ত, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাসূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এটা তাদের জন্য যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে।' বস্তুত মোহাম্মদ (স.) শেষ রসূল এবং তিনি যে ইসলাম নিয়ে এসেছেন তা সর্বশেষ আসমানী বিধান। আবহমানকালের নিয়ম ছিলো এই যে, যখনই দুনিয়া অনাচার ও অরাজকতায় ভরে যেতো, অমনি একের পর এক নবীদের

(১) সাইয়েদ আলী আহসান আলী নদভীর একই পুস্তক থেকে।

আগমন ঘটতো। মানুষকে সততার পথে ফিরিয়ে আনাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। পথহারা মানুষকে একের পর এক অবকাশ দেয়া হতো। বর্তমান রেসালাত সর্বশেষ ও পূর্ণাংগ রেসালাত। এটি দ্বারা আল্লাহ সমস্ত নবুওত ও রেসালাতের সমাপ্তি ঘটাতে চান। সুতরাং সর্বশেষ রেসালাতের ব্যাপারে অবকাশ সীমিত। ঈমান আনলে মুক্তি, কুফরী করলে ধ্বংস। কেননা এখন কুফরী করলে তা হবে সীমাহীন অনাচার ও অকল্যাণের শামিল। আর ঈমান আনলে তা হবে অফুরন্ত কল্যাণের নামান্তর।

'নিশ্চয় আহলে কেতাব ও মোশরেকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে। তারা সৃষ্টির অধম।' এটা এক অকাট্য ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এ নিয়ে কোনো বিতর্ক বা বাদানুবাদের অবকাশ নেই। কুফরীতে লিপ্ত এ সব লোকের ভেতর ব্যক্তিগত পর্যায়ে যতোই ভালো কাজ ও সৎ গুণাবলী এবং সামষ্টিকভাবে যতোই সৎ ও কল্যাণমূলক বিধি ব্যবস্থা, রীতিপ্রথা ও চালচলন থাকুক না কেন, শেষ নবী ও শেষ নবীর বিধানের প্রতি ঈমান না থাকলে তাতে কোনোই ফলোদয় হবে না। এ আয়াতে যে সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে, তা যে কোন ন্যায় ও সৎ গুণবৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই সন্দেহাতীতভাবে বজায় থাকবে, যদি তা আল্লাহর চিরন্তন ও নিখুঁত বিধানের সাথে সংযোগহীন হয়।

'নিশ্চয়ই যারা মোমেন ও সৎকর্মশীল, তারা সৃষ্টির সেরা।' এটিও একটি অকাট্য ও অনড় ফায়সালা। এতে কোনো বিবাদ বিসম্বাদের অবকাশ নেই। তবে স্পষ্টতই এর জন্যও শর্ত সত্যিকার ঈমান- শুধুমাত্র মুখে ইসলামের বুলি আওড়ানো, মুসলিম দেশে অথবা মুসলিম নামে পরিচিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা কিংবা মুখে ইসলামের বক্তব্য উচ্চারণ করা যথেষ্ট নয়। যে ঈমান বাস্তব জীবনে তার আলামত ও ফল উৎপন্ন করে, সেই ঈমানই আবশ্যক। এজন্যই 'মোমেন' শব্দটির সাথেই রয়েছে 'সৎকর্মশীল'। বস্তুত ইসলাম শুধু ঠোঁট দিয়ে উচ্চারিত কথার নাম নয়। সৎকর্ম বলতে বুঝায় আল্লাহ যা কিছু করার আদেশ দিয়েছেন-চাই তা এবাদাত হোক, চরিত্র হোক, কাজ হোক বা ব্যবহার ও লেনদেন হোক। আর সবচেয়ে বড় ও প্রধান সৎকর্ম হচ্ছে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন চালু করা এবং আল্লাহর সেই আইন অনুসারে বিচার-ফায়সালা ও শাসন চালানো। যারা এসব কিছু সহ সৎকর্মশীল, তারাই সৃষ্টির সেরা।

'তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট চিরস্থায়ী বেহেশত, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।'

অর্থাৎ মনোরম উদ্যানসমূহ থাকবে এবং তার নেয়ামতসমূহের মধ্যে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করার ব্যবস্থা থাকবে। সেই নেয়ামত কখনো ধ্বংস হবে না ও তার মধ্যকার অবস্থানের মেয়াদ কখনো ফুরাবে না, এ ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি রয়েছে। যে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দুনিয়ার জীবনের সকল সুখ-শান্তিকে কন্টকিত করে তোলে, সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির আশ্বাস দেয়া হয়েছে। বেহেশতের নিচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়াও এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির প্রতীক। কেননা এটা হচ্ছে সৌন্দর্য, সজীবতা ও স্বাচ্ছন্দের আলামত।

এরপর এই চিরস্থায়ী নেয়ামতকে আরো এক মাত্রা বা কতক মাত্রা বৃদ্ধি করে চিত্রিত করা হচ্ছে নিম্নোক্ত বাক্যে 'আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট।'

আল্লাহর এই সন্তুষ্টি হচ্ছে সকল নেয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট নেয়ামত। আর আল্লাহর প্রতি তার সৎকর্মশীল বান্দাদের মনে সৃষ্টি হওয়া এই সন্তুষ্টির কারণ এই যে, তিনি তাদের সৎকর্মের মর্যাদা দিয়েছেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও নেয়ামত বিতরণ করেছেন এবং তাঁর সাথে তাদের এই দুর্লভ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বস্তুত এই সন্তোষ মানুষের মনকে নিশ্চিন্ততা, নিরাপত্তাবোধ এবং নির্ভেজাল ও সুগভীর আত্মতৃপ্তিতে ভরে দেয়। বস্তুত, 'আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট'-এই বাক্যটি প্রত্যক্ষভাবে এমন একটি ভাব প্রকাশ করে, যার সমতুল্য ভাব প্রকাশের ক্ষমতা অন্য কোনো বাক্যের নেই।

'এটি তারই জন্য যে স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে।' এ হচ্ছে মোমেনকে প্রদত্ত এই সূরার সর্বশেষ আশ্বাসবাণী। এ আশ্বাসবাণীতে বলা হচ্ছে যে, ওপরে যে সব মহান প্রতিদান ও অনুগ্রহের কথা বলা হলো, তা শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে বান্দার আন্তরিক নিবিড় সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল, সে সম্পর্ক কেমন হবে তাও প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহকে ভয়ের অনুভূতির ওপরও তা নির্ভরশীল। সে ভীতি এমন হওয়া চাই, যেন তা সততার দিকে মানুষকে চালিত করে এবং বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি থেকে বিরত রাখে। এই ভীতির অনুভূতি সকল বাধা সরিয়ে দেয়, সকল আবরণ তুলে দেয় এবং মানুষের মন সরাসরি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে সকল আচরণমুক্ত হয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। খোদাভীতির এই অনুভূতি মানুষের এবাদাতকে খালেস ও নির্ভেজাল হতে সাহায্য করে এবং তাকে সব রকমের লোক দেখানোর মনোবৃত্তি ও সর্ব প্রকারে শেরেক থেকে মুক্ত রাখে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করে, তার হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিন্দুমাত্র প্রভাব থাকতে পারে না। কেননা সে জানে যে, বান্দা যদি আল্লাহর সাথে সাথে আর কারো সন্তুষ্টির আশা নিয়ে কোনো এবাদাত করে, তবে তা কবুল হয় না। আল্লাহর কাছে শেরেক হচ্ছে সবচেয়ে বেশী বিরক্তিকর অপছন্দনীয় জঘন্য, ও অমার্জনীয় অপরাধ। কাজেই একমাত্র তাঁর জন্য এবাদাত করতে হবে। নচেৎ তিনি তা গ্রহণ করবেন না।

ওপরে সেই চারটি প্রধান সত্য বর্ণনা করা হলো, যা এই ক্ষুদ্র সূরার বক্তব্যের সমষ্টি। পবিত্র কোরআন এগুলো নিজস্ব ভংগিতে বর্ণনা করেছে। এ ধরনের ক্ষুদ্র সূরাগুলোতে কোরআনের এই ভংগিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সূরা আয যেলযাল

আয়াত ৮ রুকু ১

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ وَقَالَ

الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۗ

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۗ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۚ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. যখন ঝাঁকুনি দিয়ে পৃথিবীকে তার (প্রবল) কম্পনে কম্পিত করা হবে, ২. এবং পৃথিবী যখন তার (মানুষের কৃতকর্মের) বোঝা বের করে দেবে, ৩. তখন মানুষরা (হতভম্ব হয়ে) বলতে থাকবে, এর কী হলো (সে সব কিছু উগরে দিচ্ছে কেন)? ৪. সেদিন সে (তার সব কিছু) খুলে খুলে বর্ণনা করবে, ৫. মূলত তোমার রবই তাকে এ (কাজে)-র আদেশ দেবেন; ৬. সেদিন সমগ্র মানব সন্তান দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে, যাতে করে তাদেরকে তাদের কর্মকান্ড দেখানো যায়; ৭. অতএব যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ কোনো ভালো কাজ করবে (সেদিন) তাও সে দেখতে পাবে; ৮. (ঠিক তেমনি) কোনো মানুষ যদি অণু পরিমাণ খারাপ কাজও করে, তাও সে (তার চোখের সামনে) দেখতে পাবে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি অনেকের মতে মদীনায় অবতীর্ণ, আবার অনেকের মতে মক্কায় অবতীর্ণ। আমার মতে সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষের বর্ণনাই অগ্রগণ্য। সূরার আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনাভংগিও শেষোক্ত মতেরই সমর্থক।

সূরাটি শিথিল ও উদাসীন লোকদের মনে প্রচন্ড আলোড়ন তোলে। এর বক্তব্য বিষয়, দৃশ্যপট ও ছন্দময় শব্দ সব কিছু মিলেই এই আলোড়ন সৃষ্টি করে। সূরাটি একটি বিকট চিৎকার স্বরূপ, যা পৃথিবীকে ও পৃথিবীবাসীকে প্রকম্পিত করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বাক্যের মধ্য দিয়ে যতক্ষণ না তাদের সামনে হিসাব-নিকাশ, ওযন ও কর্মফলের পূর্ণ দৃশ্য তুলে ধরা না হয়, ততক্ষণ তাদের সম্বিত ফিরতে চায় না। শুধু এই সূরার নয়, গোটা আমপারারই বর্ণনাভংগি এ রকম। তবে এ সূরায় এই বর্ণনাভংগিটি অত্যন্ত জোরদারভাবে উপস্থিত।

তাফসীর

'যখন পৃথিবীকে ভীষণভাবে দোলানো হবে এবং পৃথিবী নিজের ভেতরকার সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং মানুষ বলে উঠবে, পৃথিবীর কী হয়েছে? সেদিন পৃথিবী নিজেই নিজের অবস্থা বলে দেবে। কেননা তোমার প্রভু তাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

এটি কেয়ামতের দিনের বিবরণ। এ সময়ে স্থিতিশীল পৃথিবী প্রকম্পিত হবে এবং তার ভেতরে যতো ভারী বস্তু যথা বিভিন্ন প্রাণীর মৃতদেহ ও খনিজ দ্রব্যাদি, যা সে দীর্ঘকাল যাবত বহন করে চলেছে, তা ছুঁড়ে ফেলে দেবে এবং দীর্ঘকালের ভারমুক্ত হয়ে সে হালকা হয়ে যাবে।

এটি এমন একটি দৃশ্য যা এই সূরার শ্রোতাদের মনে হতে থাকে যেন পায়ের নীচে সব কিছু টলটলায়মান, কোনো মতেই যেন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তাদের পায়ের নিচে মাটি যেন দুরুদুরু করে কাঁপছে ও দুলছে। এটি এমন একটি অবস্থার প্রতিচ্ছবি, যা মনকে পৃথিবীর সকল সংলগ্নকারী জিনিসের সংলগ্নতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং তাকে স্থায়ী ও স্থিতিশীল মনে করে। কোরআনে অংকিত এ ধরনের দৃশ্যপটসমূহের এটা হচ্ছে প্রথম প্রতিক্রিয়া। কোরআন এ ধরনের দৃশ্যপটকে শুধু অংকিতই করে না, বরং তার ভেতরে এমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে, যা শোনামাত্রই শ্রোতার স্নায়ুতন্ত্রীতে স্থানান্তরিত হবার উপক্রম হয়।

আর এই নিদর্শন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দৃশ্যপটের সমান্তরালে মানুষ কে এবং তার প্রতিক্রিয়াকেও চিত্রিত করা হয়। এই দৃশ্য দেখেই 'মানুষ বলে পৃথিবীর কী হয়েছে?'

এটি এমন এক হতবুদ্ধি, হতচকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তির জিজ্ঞাসা, যে তার কল্পনা বহির্ভূত একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছে, যা সে বুঝতে পারছে না, তার মুখোমুখি হচ্ছে এবং যা দেখে চুপ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে থাকা যায় না তা দেখতে পাচ্ছে। 'তার কী হয়েছে?' অর্থাৎ কি কারণে সে কাঁপছে? যেন এ কথা বলার সময় সে নিজেও পৃথিবীর সাথে সাথে দুলছে এবং তাকে ধরে রাখতেও সহায়তা দিতে পারে এমন যে কোন বস্তু আঁকড়ে ধরার সে চেষ্টা করছে। কেননা তার আশপাশের সবকিছু প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত ও আলোড়িত হচ্ছে।

মানুষ ইতিপূর্বে অনেক ভূমিকম্প এবং অনেক আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ দেখেছে। আর সে সব দুর্ঘটনা দেখে ভয় ও আতংক ভুগেছে এবং অনেক ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু সে কেয়ামতের দিনের বিস্ফোরণের কোনো সাদৃশ্যই দেখবে না। এটা একটা অভিনব জিনিস, যা সে আগে কখনো দেখেনি, যার কোনো রহস্য সে বুঝতে পারবে না, যার কোনো নযীর সে দেখবে না। তা এমন এক বিভীষিকা, যা সেই দিনই প্রথম সংঘটিত হবে।

' যেদিন পৃথিবী তার সকল খবর বলবে' অর্থাৎ যেদিন এই ভূমিকম্প হবে এবং তার সামনে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, সেদিন পৃথিবী নিজের সকল তথ্য ফাঁস করবে, 'তার প্রভু তাকে এরূপ করতে বলেছেন।' অর্থাৎ তাকে দুলতে, কাঁপতে এবং ভেতরের সকল বোঝা ছুঁড়ে ফেলতে বলেছেন। তাই সে তাঁর নির্দেশ পালন করেছে। 'সে তার প্রভুর নির্দেশ পালন করবে এবং সেইটি তার জন্য উপযুক্ত।' সে তার খবর জানাবে। বস্তুত এই ভয়ংকর পরিস্থিতি স্বয়ং একটি বর্ণনা বিশেষ, যা পৃথিবী কর্তৃক নেপথ্য থেকে আল্লাহর আদেশ ও ওহীপ্রাপ্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এখানে 'মানুষ' হতচকিত ও বন্দী। সূরার বক্তব্য আতংক, ভীতি, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আলোড়ন প্রতিফলিত করে। মানুষ ভীতবিহ্বল হয়ে জিজ্ঞাসা করবে 'তার কী হয়েছে?' অর্থাৎ তাকে হাশর, হিসাব-নিকাশ, ওযন ও কর্মফলের সম্মুখীন হতে হচ্ছে কেন? ব্যাপার কি?

'যেদিন মানুষ আত্মপ্রকাশ করবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, যাতে তাদের আমলনামা দেখানো হয়।'

এক পলকের ভেতরেই আমরা দেখতে পাই কবর থেকে উত্থানের দৃশ্য। 'সেদিন মানুষ আত্মপ্রকাশ করবে বিচ্ছিন্নভাবে।' অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকেরা বিচ্ছিন্নভাবে উঠে এসে হাযির হবে। 'যেন তার বিক্ষিপ্ত পংগপাল।' এটাও মানুষের জন্য একটি অভিনব ও অচিন্তনীয় দৃশ্য। পূর্ব ও পরের সমস্ত সৃষ্টি সর্বদিক থেকে জীবিত হয়ে উঠে আসবে। 'যেদিন পৃথিবী দ্রুতগতিতে তাদের ওপর থেকে সরে পড়বে।' যখনই দৃষ্টি প্রসারিত হবে, তারা একটি আকৃতি দেখবে এবং তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে সেদিকে চলতে আরম্ভ করবে। আশেপাশে কোনো দিকে তারা দৃষ্টিপাত করার ফুরসত পাবে না। ঘাড় লম্বা করে চোখ বিস্ফারিত করে 'আহ্বানকারীর দিকে ছুটবে।' সেদিন প্রত্যেকের এমন ঝামেলা থাকবে যে, অন্যের দিকে সে নযর দিতে পারবে না।'

কেয়ামতের এই দৃশ্যের বর্ণনা দিতে মানবীয় ভাষা অপারগ। এক কথায় বলা যায়, দৃশ্যটা ভয়াবহ, আতংকজনক, বীভৎস ও বিব্রতকর।

এসব শব্দ এবং আরো যতো শব্দ অভিধানে আছে, এ পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। 'সেদিন মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, যাতে তাদের আমলনামা দেখতে পায়।' এটা হচ্ছে আরো কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতি। যেখানে আমলনামা দেখানো হবে, তারা সেদিকেই যাবে, যাতে তারা আমলনামা দেখতে পায় এবং কর্মফল লাভ করে। নিজের কাজের মুখোমুখি দাঁড়ানো মানুষের জন্য অনেক সময় তার প্রতিফল ভোগ করার চেয়েও নির্মম ও বিব্রতকর হয়ে থাকে। মানুষ যখন নিজের বিবেকের দংশনে ও অনুশোচনায় জর্জরিত হয়, তখন নিজের ঘৃণ্য অপকর্ম একাকী দেখেও তার বিরক্তি লাগে। আর মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ ও সমগ্র সৃষ্টিজগতের সামনে নিজের কাজের মুখোমুখি হওয়া তো আরো মারাত্মক ব্যাপার।

শুধু আমলনামার সম্মুখীন হওয়া বা দেখাও একটা ভয়ংকর শাস্তি। আর যে কণা পরিমাণও খারাপ কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে।' প্রাচীন তাফসীরকাররা বলতেন 'যাররা' অর্থ মশা। আবার কেউ কেউ বলতেন, সূর্যরশ্মিতে প্রতিভাত হয় এমন ধূলিকণা কেননা তখনকার সময়ে এগুলোই ক্ষুদ্রতম বস্তু হিসাবে 'যাররা'র প্রতিশব্দ গণ্য হতো।

তবে এখন আমরা জানি যে, 'যাররা' এমন জিনিস, যা সূর্যালোকে দৃশ্যগোচর ধূলিকণার চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র। ধূলিকণা তো খালি চোখে দেখা যায় কিন্তু 'যাররা' বা পরমাণুকে বৃহত্তম অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্কে তা 'স্বপ্ন' মাত্র। আজ পর্যন্ত কেউ একে খালি চোখেও দেখেনি, অণুবীক্ষণ দিয়েও দেখেনি, যা কিছু দেখেছে, তা হচ্ছে পরমাণুর আলামত মাত্র।

এত ক্ষুদ্র পরিমাণ ভালো বা মন্দ কাজের ফলও মানুষকে ভোগ করতে হবে।

সুতরাং মানুষের ছোট বা বড় কোনো কাজকেই তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। এ তো ছোট জিনিস। এর হিসাবও নেই, ওযনও নেই। এরূপ বলাটা আদৌ ঠিক নয়। সেই সূক্ষ্মতম দাঁড়িপাল্লা যেমন পরমাণুকে মাপতে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে কিংবা শূন্যে উঠে যায়, ঠিক তেমনি নিজের ক্ষুদ্রতম আমলের সামনে গিয়েও মানুষের অনুভূতি শক্তি কেঁপে উঠবে।

মোমেনের অন্তর ছাড়া আর কোন কিছুর সাথে এই দাঁড়িপাল্লার তুলনা হয় না। কেননা এই অন্তর অণু পরিমাণ ভালো বা মন্দ কাজকেও অনুভব করে। অথচ পৃথিবীতে এমন হৃদয়ও আছে যা পাহাড় সমান পাপ দেখেও কাঁপে না। সে সব হৃদয় পাহাড়ের চেয়ে বড়, ভালো ও কল্যাণের কাজকে নষ্ট করে দিয়েও তার মধ্যে কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয় না।

পৃথিবীতে সে সব হৃদয় অসাড়, অনুভূতিহীন, হিসাবের দিন নিজের বোঝার নিচে পিষ্ট হবে এই হৃদয়গুলো।

সূরা আল আ'দিয়াত

আয়াত ১১ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣ فَاَثَرْنَ
بِهٖ نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝٦ وَاِنَّهٗ عَلٰى
ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا
فِى الْقُبُوْرِ ۝٩ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۝١٠ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝١١

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. শপথ (সেই) দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোর, যারা (উর্ধ্বশ্বাসে) শব্দ করতে করতে দৌড়ায়, ২. শপথ সেসব সাহসী ঘোড়ার, যাদের খুরে অগ্নিস্ফুলিংগ বের হয়, ৩. শপথ এমন সব ঘোড়ার যারা প্রত্যুষে ধ্বংসলীলা ছড়ায়, ৪. (এর ফলে) যারা বিপুল পরিমাণ ধুলা উড়ায়, ৫. শত্রু শিবিরে পৌঁছে যারা তা ছিন্নভিন্ন করে দেয়, ৬. মানুষ সত্যিই তার মালিকের ব্যাপারে বড়োই অকৃতজ্ঞ, ৭. মানুষ (তার) এ অকৃতজ্ঞ আচরণের ওপর সাক্ষী হয়ে থাকে, ৮. অবশ্য সে মানুষটি ধন-দৌলতের মোহেই বেশী মত্ত থাকে; ৯. এরা কি (একথা) জানে না, যখন কবর থেকে তা উপরে ফেলা হবে? ১০. (মানুষের) অন্তরে যা (ছিলো) তাও প্রকাশ করে দেয়া হবে, ১১. এদের (সবার) সম্পর্কে তাদের মালিকই সবচেয়ে ভালো জানবেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ত্বরিতগতিতে প্রভাব বিস্তারকারী, প্রচন্ড শক্তি নিয়ে আঘাতকারী ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পরশ বুলানোর মধ্য দিয়ে এ সূরার অভিযাত্রা। এক স্তর থেকে আর এক স্তরে এ অভিযান অব্যাহত থাকে। কখনো দৌড়, আবার কখনো লাফঝাঁপের আকারে, কখনো হালকাভাবে, কখনো ক্ষিপ্রভাবে এবং কখনো একটানা গতিতে। এভাবে শেষ বাক্যে পৌঁছার পর থেমে যায়, এর শব্দ-স্থির হয়ে যায় এর ছায়া-শেষ হয়ে যায় এর বক্তব্য এবং এর ছন্দ মিলিয়ে যায়। ঠিক যেমন কেউ দৌড়াতে দৌড়াতে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে স্থির ও নিশ্চিত হয়ে যায়।

সূরাটি শুরু হয়েছে হ্রেষাধ্বনি করতে করতে টগবগিয়ে ছুটে চলা ঘোড়ার পায়ের দৃশ্য দিয়ে, যারা নিজেদের পায়ের ক্ষুর দিয়ে আগুনের ফুলকি তোলে। যারা অতি প্রত্যুষে আক্রমণ চালায়, যারা ধূলি উড়াতে উড়াতে ধাবমান হয়, আর এভাবে ধাওয়া করতে করতেই অকস্মাৎ ঢুকে পড়ে শত্রুর শিবিরে। অতপর তাদের মধ্যে ত্রাস ও আতংক ছড়িয়ে দেয় এবং পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে উদ্বুদ্ধ করে।

এর পরপরই উপস্থাপন করা হয় মানস জগতের দৃশ্য-যা অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকৃতি, ঔদ্ধত্য ও প্রচন্ড সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ। এরপর দেখানো হয় কবরবাসীর বিক্ষিপ্ত হওয়ার এবং হৃদয়ের গোপন বিষয়ের প্রকাশের দৃশ্য।

সবার শেষে উড়ানো ধূলির অবসান ঘটে, অকৃতজ্ঞতা ও সংকীর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটে, পরিসমাপ্তি ঘটে বিক্ষিপ্ত হওয়া ও একত্রিত হওয়ার প্রক্রিয়ার। আর সবার শেষে আল্লাহর কাছে পৌঁছে সব কিছু থেমে যায়। 'নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল থাকবেন।'

সূরার সুরেলা ছন্দেও এক ধরনের কঠোরতা ও কর্কশতা, এক ধরনের হৈচৈ ও শোরগোলের শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ভাষায় এই কর্কশতা কেয়ামতের সময়কার কবরসমূহের বিক্ষিপ্ততাজনিত হৈচৈ ও শোরগোলের পরিবেশের সাথে, বক্ষের গোপন তথ্য প্রচন্ড শক্তির বলে উদঘাটনের সাথে এবং অকৃতজ্ঞতা, অমান্যতা, ঔদ্ধত্য ও সংকীর্ণতার পরিবেশের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহ তায়ালা যেন এই সকল অবস্থার জন্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ উপলক্ষ চাইলেন, তখন অনুরূপ একটা হৈচৈপূর্ণ পরিবেশকেই উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ করলেন। হ্রেষা রব সহকারে ধূলি উড়িয়ে পা দিয়ে আগুনের ফুলকি তোলে, আকস্মিকভাবে অতি প্রত্যুষে আক্রমণ চালানো অশ্ববাহিনী সেই কাংখিত পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। চিত্রের সাথে উপলক্ষ এবং উপলক্ষের সাথে চিত্র চমৎকারভাবে মিশে গেছে। (আমার লেখা 'আততাসওয়ীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' দেখুন)

তাফসীর

' সেইসব ঘোড়ার শপথ, যারা হ্রেষা রব তুলে ছুটে চলে, পরে (নিজের ক্ষুর দিয়ে) স্ফুলিংগ সৃষ্টি করে, আর ভোর বেলায় আক্রমণ চালায়। আর সে সময় ধূলিঝড় সৃষ্টি করে এবং সে অবস্থায়ই কোনো ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বস্তুত মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ, সে নিজেই এর সাক্ষী, আর সে সম্পদের লালসায় খুবই কঠোর।'

আল্লাহ তায়ালা যোদ্ধা ঘোড়ার গুণ একে একে বর্ণনা করে শপথ করেছেন। ঘোড়া দৌড়ানোর সময় যে সুবিদিত শব্দ করে থাকে সেই শব্দ সহকারে পায়ের ক্ষুর দ্বারা পাথরে আঘাত করে আগুনের ফুলকি তোলা, অতি ভোরে শত্রুর ওপর অতর্কিত হামলা চালানো, ধুলো উড়াতে উড়াতে অতর্কিতে শত্রুর লাইনের ভেতরে ঢুকে হৈচৈ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে দেয়া-এসব তৎপরতার একটি একটি করে বিবরণ দিচ্ছেন।

অকৃতজ্ঞ মানুষ

বস্তুত এগুলো যুদ্ধের তৎপরতা এবং কোরআনের প্রথম সম্বোধিত লোকদের এসব তৎপরতার প্রতি স্বভাবসুলভ আকর্ষণ ছিলো। এই প্রসংগে ঘোড়ার শপথ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে এসব তৎপরতাকে ভালোবাসতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় এর মূল্য কতোখানি তা বুঝা এবং সেদিকে আল্লাহ তায়ালা পক্ষথেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর এ ব্যাপারে যথার্থই উৎসাহ জন্মাবে। আগেই যেমন বলেছি, যেসব দৃশ্যের নামে শপথ করা হয়েছে এবং যেসব দৃশ্যের কথা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে আলোচ্য দৃশ্যের পরিপূর্ণ সমন্বয় রয়েছে। তবে সেই সমন্বয়ের চেয়েও বড় কথা হলো প্রকারান্তরে এই সামরিক তৎপরতাকে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ যে বিষয়টি বলার জন্যে শপথ করছেন, তা মানুষের ভেতরে একটা বাস্তব সত্যের আকারে বিরাজমান, যখন তার মন ঈমানী চেতনা ও উদ্দীপনা থেকে বঞ্চিত থাকে। কোরআন তাকে তার এই দুর্বল দিকটি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে, যাতে সে তার প্রতিরোধের জন্যে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রস্তুত ও সবল করতে পারে। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজেই জানেন, তার ভেতরে এ দুর্বলতার শেকড় কতো গভীরে উপ্ত এবং এর অস্তিত্বের বোঝা তার ব্যক্তিত্বে কতোখানি।

'নিশ্চয় মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে।' মানুষ তার মনিবের নেয়ামত ও বিপুল অনুগ্রহের কথা স্বীকার করে। এই অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকৃতি মানুষের বিভিন্ন কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সে সব কাজ ও কথা তার অকৃতজ্ঞতার সাক্ষীস্বরূপ। এগুলো তার নিজের সামনেও সাক্ষ্য দেয়, আবার কেয়ামতের দিনও সাক্ষ্য দেবে।

'নিশ্চয়ই সে এর ওপর সাক্ষী।' অর্থাৎ কেয়ামতের দিন নিজের বিরুদ্ধে নিজেই সাক্ষ্য দেবে। সেদিন কোনো জারিজুরিও খাটাবে না, কোনো বিতর্কেরও অবকাশ থাকবে না।

'আর সে ধন-সম্পদের প্রতি অতিশয় আসক্ত।' যেহেতু সে নিজেকে অত্যধিক ভালোবাসে, তাই সে সম্পদকে এবং কল্যাণকেও ভালোবাসে। তবে এই সম্পদের মোহ তাকে শুধু সম্পদের আসক্তিতেই সীমাবদ্ধ রাখে না বরং তাকে ক্ষমতার মোহেও পেয়ে বসে এবং তার মধ্যে দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ ভোগের স্পৃহা ও লালসা তীব্রতর হয়।

এটাই তার সহজাত প্রবণতা এবং স্বভাবসুলভ স্পৃহা, যতক্ষণ তার অন্তরে ঈমানের ছোঁয়া না লাগে। পক্ষান্তরে ঈমান যদি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে তার সমস্ত ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ ও গুরুত্ববোধ পাল্টে যায়। তার অকৃতজ্ঞতা ও নেয়ামতের অস্বীকৃতি আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় ও তার অনুগ্রহের স্বীকৃতিতে পরিবর্তিত হয়। তার অহংকার, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা অপরকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দান এবং করুণা ও দয়া প্রদর্শনের রূপ নেয়। এগুলোই হচ্ছে সেইসব মূল্যবোধ, যা মোমেনের কাছে যথার্থই কাম্য ও বাঞ্ছিত বলে প্রতীয়মান হয় এবং যার জন্য আগ্রহী হওয়া, প্রতিযোগিতা করা ও কঠোর পরিশ্রম করা যথার্থই সমীচীন বলে মনে হয়। এসব মূল্যবোধ টাকা-কড়ির চেয়েও উচ্চ মূল্য, ক্ষমতা ও পদমর্যাদার চেয়েও সম্মানিত এবং পার্থিব সম্পদকে নিছক জৈবিক ও পাশবিক রুচি দ্বারা উপভোগ করার চেয়েও মর্যাদাবান।

বস্তুত ঈমান ছাড়া মানুষ নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, ক্ষুদ্র তার গুরুত্ববোধ ও অগ্রাধিকারের বিচারে, তুচ্ছ তার লোভ-লালসা ও আসক্তির দিক দিয়ে। মানুষের লোভ যতোই বাড়বে, আকাংখা ও কামনা-বাসনা যতোই তীব্র হবে, আশা যতোই উচ্চ হবে, ততোই সে পৃথিবীর নোংরা কাঁদামাটিতে

ডুবে যাবে, পার্থিব আয়ুষ্কালের সংকীর্ণ গন্ডীতে সীমিত হয়ে যাবে, আপন ব্যক্তিসত্ত্বার কারাগারে বন্দী হয়ে যাবে। সেই অবস্থা থেকে মুক্তি ও উন্নতি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে দুনিয়ার চেয়ে বৃহত্তর এক জগত, পার্থিব জীবনের চেয়ে প্রশস্ততর এক জীবন এবং আপন সত্ত্বার চেয়ে মহত্তর এক সত্ত্বার সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন। সে জগতের উৎপত্তি হয়েছে অনাদি-অনন্ত আল্লাহ থেকে, তার প্রত্যাবর্তনও ঘটেছে অনাদি-অনন্ত আল্লাহর দিকে এবং সেই জগতে গিয়ে ইহকাল ও পরকাল পরস্পরে মিলিত হয়ে এক অন্তহীন জগতের রূপ ধারণ করে।

এ কারণে সূরার সর্বশেষ মনোযোগ-আকর্ষণী বক্তব্যটি অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকৃতি, আত্মম্ভরিতা ও সংকীর্ণতার প্রতিকারের লক্ষ্যে প্রদত্ত হয়। এর উদ্দেশ্য প্রবৃত্তির কারাগার ভেংগে মানুষকে তা থেকে মুক্তি প্রদান। আর এ উদ্দেশ্যে কেয়ামতের দৃশ্য এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে সম্পদের মোহ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয় এবং আত্মম্ভরিতাজনিত উদাসীনতা থেকে সম্বিত ফিরে পাওয়া যায়।

'তবে কি সে জানে না যখন কবরের অধিবাসীদেরকে বিক্ষিপ্ত করা হবে এবং বুকের ভেতরে যতো গোপন কথা লুকিয়ে আছে, তা ফাঁস করা হবে?'

বস্তুত এটি একটি ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় দৃশ্য। কবরের অধিবাসীদের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত হওয়া, সেই বিক্ষিপ্ততাকে এই উত্তেজন-নির্দেশক (বু'সেরা) শব্দটি দ্বারা তা ব্যক্ত করা এবং বুকে লুকিয়ে রাখা গোপন তথ্যগুলো প্রকাশ করা আর এ বিষয়টিও এই তেজোদ্দীপ্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা-এ সব মিলে গোটা পরিবেশটাই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'তবে কি সে জানে না যে, যখন কবরে যা কিছু সমাহিত আছে তা বের করা হবে এবং বুকের ভেতর যা কিছু লুকিয়ে আছে, তা বের করে আনা হবে?' কথাটির মর্ম দাঁড়াচ্ছে এই যে, এসব ঘটনা যে সময়ে ঘটবে সে সময়ের কথা কি তার জানা নেই? অথবা জানা থাকলে তা কি তার মনে নেই? কেননা সে দিনটির কথা জানা থাকাই চেতনা ও প্রেরণা উদ্দীপিত করার জন্যে যথেষ্ট। এরপর মানুষের মনকে এ প্রশ্নের উত্তেজনাপূর্ণ তৎপরতার কি পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা কল্পনা করতে হবে। অতপর এই সকল তেজস্বী তৎপরতার অবসান ঘটে এবং স্থিরতা ও স্তব্ধতা নেমে আসে। এভাবে সকল জিনিস, সকল কাজ ও সকল পরিণতিরই এক সময় অবসান ঘটে থাকে।

'নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সেদিন তাদের সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকবেন।' আর তাদের প্রতিপালকের কাছেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সেদিন 'তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল থাকবেন। তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন। আল্লাহ তায়ালা শুধু 'সেদিন' নয় সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় সকল গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানবেন-সে কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, এতে তাদের সচেতনতা ও সতর্কতা জাগ্রত হবে, বস্তুত জানার একটা পরিণতি আছে। এ জানার পেছনে জবাবদিহি ও কর্মফল যুক্ত রয়েছে। এই আনুষংগিক তত্ত্বটাই এখানে লক্ষণীয় বিষয়।

সূরাটি আগাগোড়াই একটি উদ্দীপক সংবাদ বিশেষ, যা পরকালের জবাবদিহির চেতনা ও ভীতি জাগায়, প্রেরণা ও আবেগের সৃষ্টি করে এবং অবশেষে কোরআনের নিজস্ব ভংগিতে শাব্দিক, আর্থিক ও ছান্দিকভাবে এ সমাপনী বক্তব্যে গিয়ে উপনীত হয়।

সূরা আল্ ক্বারিয়াহ

আয়াত ১১ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥ فَاَمَّا مَنْ

ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨

فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. এক মহা (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) দুর্যোগ! ২. কি সে মহাদুর্যোগ? ৩. তুমি জানো সে মহাদুর্যোগটা কি? ৪. (এ হচ্ছে এমন একদিন,) যেদিন মানুষগুলো পতংগের মতো (ইতস্তত) বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, ৫. পাহাড়গুলো রঙ বেরঙের ধুনা তুলার মতো হবে; ৬. অতপর যার ওযনের পাল্লা ভারী হবে, ৭. সে (অনন্তকাল ধরে) সুখের জীবন লাভ করবে; ৮. আর যার ওযনের পাল্লা হালকা হবে, ৯. হাবিয়া দোযখই হবে তার (আশ্রয়দায়িনী) মা, ১০. তুমি কি জানো সে (ভয়াল আযাবের) গর্তটি কি? ১১. তা হচ্ছে প্রজ্বলিত আগুনের এক (বিশাল) কুন্ডলী।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

'আল কারিয়া' মানে কেয়ামত। কোরআনে ব্যবহৃত এর আরও কয়েকটি সমার্থক শব্দ হচ্ছে আত য়্যাতা'ম্মাহ, আস সফফাহ, আল হাক্কাহ ও আল্ গাশিয়াহ। 'আল কারিয়া' শব্দটির ভেতরে আঘাত ও থাপ্পড়ের মর্ম নিহিত। কেননা এ ঘটনা স্বীয় ভয়াবহতা দ্বারা মানব হৃদয়কে আঘাত করে। সমগ্র সূরাটি এই কেয়ামত তথা তার স্বরূপ, তার ঘটনাবলী ও শেষ পরিণতির বিষয়ে কেন্দ্রীভূত। গোটা সূরা কেয়ামতের একটি দৃশ্য উপস্থাপন করে। এখানে যে দৃশ্যটির অবতারণা করা হয়েছে, তা একটা ভয়াল দৃশ্য। তার লক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া মানুষ ও পাহাড়-পর্বতের ওপর বিস্তৃত। মানুষ সংখ্যায় যতোই বেশী হোক, এ ঘটনার পটভূমিতে তাদেরকে ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে হয়। তারা 'বিক্ষিপ্ত পতংগের' ন্যায়। পতংগ যেমন দায়িত্বহীন ও কান্ডজ্ঞানহীনভাবে ভয়ে দিশাহারা হয়ে নিজের ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়, কোন্ দিকে সে যাবে এবং কোথায় তার গন্তব্য, তা সে জানে না, তেমনি কেয়ামতের দিন মানুষের অবস্থাও তদ্রূপ হবে। আর যে পাহাড়-পর্বত একদিন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তা হবে ধুনা পশমের ন্যায়। বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে এবং তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। সুতরাং কেয়ামতের সুসমন্বিত দৃশ্য তুলে ধরার

জন্যে তাকে 'কারেয়া' নাম দেয়াই সংগত। এ শব্দ থেকে তা মানুষ ও পাহাড়ে বিস্তৃত কেয়ামতের ঘটনার প্রতিক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এর অন্তর্নিহিত মর্ম মানুষের মন ও ভাবাবেগকে আলোড়িত করে। হিসাব গ্রহণ ও কর্মফল প্রদানের মধ্য দিয়ে দৃশ্যটির যে পরিণতি হয়, এটা তারই ভূমিকা 'কারিয়া! কারিয়া কি?' তুমি কি জানো যে 'কারিয়া' কি? সূরার শুরুতে কোনো বাক্য নয়, শুধু একটি শব্দ 'আল' সম্পূর্ণ না করে শুধু 'আল্ কারিয়াহ' বলার উদ্দেশ্য হলো, এর ভীতি সঞ্চারকারী ও বিভীষিকাময় বিকট ধ্বনি ঝংকৃত করা।

তাফসীর

এরপর ভীতির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে 'কারিয়া' কি? কেননা ব্যাপারটি এখানে ভীতিময়, রহস্যময় ও কৌতূহলোদ্দীপক। পুনরায় জবাব দেয় হয়েছে অজ্ঞতা মিশ্রিত প্রশ্ন দ্বারা। 'কারিয়া' কি জিনিস,তা কি তুমি জানো?' বস্তুত, তা কল্পনারও উর্ধে, বোধশক্তিরও আয়ত্তের বাইরে।

এরপর জবাব দেয়া হয়েছে কেয়ামতে যা ঘটবে তার বর্ণনা দিয়ে, কেয়ামতের প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করে নয়। কেননা আগেই বলেছি যে, তার প্রকৃত রহস্য কল্পনা ও বোধশক্তি উভয়েরই আওতার বাইরে। 'যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতংগের ন্যায় এবং পাহাড় পর্বত ধুনা পশমের ন্যায় হয়ে যাবে।'

এটা হচ্ছে কারিয়া, তথা কেয়ামতের প্রথম দৃশ্য। এ দৃশ্য মনে আলোর ঝলকানি দেয় এবং স্নায়ুগুলোতে শিহরণ জাগায়। এ দৃশ্যটি দেখে শ্রোতার মনে হতে থাকে যেন পৃথিবীতে এ যাবত সে যতগুলো জিনিসকে আঁকড়ে ধরেছিলো, তা সব ধুলোবালির মতো উড়ে যাচ্ছে। এরপর উপসংহারে সকল মানুষের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে, 'যার দাঁড়িপাল্লা ভারী হবে, সে সন্তোষজনক জীবনে থাকবে, আর যার দাঁড়িপাল্লা হালকা হবে, তার মা হবে 'হাবিয়া'। তুমি জি জানো হাবিয়া কি? তা তো জ্বলন্ত আগুন।'

দাঁড়িপাল্লা ভারী হওয়া ও হালকা হওয়া এমন কতক মূল্যবোধের সন্ধান দেয়, যা আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং যা তার কাছে গুরুত্বহীন। আর এটাই এর মোটামুটি অর্থ। আর সম্ভবত আল্লাহও এটাই বুঝিয়েছেন। প্রকৃত ব্যাপার অবশ্য তিনিই ভালো জানেন। যাহোক, এইসব শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া কোরআনের প্রতি যুলুমের শামিল। এটা এমন এক অর্থহীন কাজ, যা পবিত্র কোরআন ও ইসলামকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া থেকেই উদ্ভূত।

'যার দাঁড়িপাল্লা ভারী হবে' অর্থাৎ আল্লাহর বিবেচনায় ও মূল্যায়নে ভারী হবে, 'সে থাকবে আনন্দিত জীবনে।' এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। এ দ্বারা চেতনায় সন্তুষ্টির ভাবমূর্তি অংকিত করা হচ্ছে সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক নেয়ামত।

'আর যার দাঁড়িপাল্লা হালকা হবে, অর্থাৎ আল্লাহর বিবেচনায় হালকা হবে, 'তার মা হবে হাবিয়া', মা হয়ে থাকে শিশুর আশ্রয়স্থল। আর কেয়ামতের দিন কাফেরদের আশ্রয়স্থল হবে হাবিয়অ নামক দোযখ। বস্তুত, বাচনভংগিতে সুস্পষ্ট অভিনবত্ব ও চমৎকার সমন্বয় বিদ্যমান। অবশ্য এতে কিছু অস্পষ্টতাও আছে, যা এর ব্যাপকতাকে হৃদয়ংগম করার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং ঈপ্সিত প্রভাবের গভীরতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

'তুমি কি জানো হাবিয়া কি?' অজ্ঞতাসূচক ও ভীতি সঞ্চারক প্রশ্ন। কোরআনে এ ধরনের প্রশ্ন সুপরিচিত। এর উদ্দেশ্য হলো, সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কল্পনা ও বোধগম্যতার সীমানা থেকে বের করে আনা। এরপর সমাপনী সূচক জবাব আসে-'জ্বলন্ত আগুন।' এই হচ্ছে সেই ব্যক্তির মা, যার দাঁড়িপাল্লা হালকা হয়ে যাবে। এরই কোলে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। মায়ের কাছে সাধারণত, আরাম ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়। কিন্তু এই মায়ের কাছে কী পাওয়া যাবে? কী আশা করা যায় এই জ্বলন্ত আগুন হাবিয়ার কাছে?

এটা আসলে নির্মম সত্যকে বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত এক ধরনের নাটকীয় বাচনভংগী মাত্র।

সূরা আত্‌ তাকাসুর

আয়াত ৮ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰى زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۳﴾ ثُمَّ
كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ؕ﴿۴﴾ كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡيَقِيۡنِ ؕ﴿۵﴾ لَتَرَوُنَّ الۡجَحِيۡمَ ۙ﴿۶﴾
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ الۡيَقِيۡنِ ۙ﴿۷﴾ ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِيۡمِ ﴿۸﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (জীবন সামগ্রীর) আধিক্য তোমাদের গাফেল করে রেখেছে, ২. এমনি করেই (ধীরে ধীরে) তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে; ৩. এমনটি কখনো নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, ৪. কখনো নয়, তোমরা অতি সত্বরই (এর পরিণাম) জানতে পারবে; ৫. (কতো ভালো হতো!) যদি তোমরা সঠিক জ্ঞান কি তা জানতে পারতে; ৬. অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে, ৭. (একদিন) তোমরা অবশ্যই তোমাদের নিজ চোখে তা দেখতে পাবে, ৮. অতপর (আল্লাহ তায়ালার) নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি অত্যন্ত গভীর, ভীতিময় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্যে সমৃদ্ধ। মনে হয় যেন একজন সতর্ককারী কোনো উচ্চস্থানে আরোহণ করে সুউচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে ঢেড়া পিটিয়ে সেই সব লোককে হুশিয়ার করছে, যারা অলস, উদাসীন, অপরিণামদর্শী, গভীর ঘুমে অচেতন। জাহান্নামের কিনারে পৌঁছেও চোখ বুঁজে পড়ে আছে এবং তাদের গোটা স্নায়ুমন্ডলী জাদুর প্রভাবে অবশ হয়ে আছে। সতর্ককারী যত জোরে সম্ভব চিৎকার করে তাদেরকে বলছে, 'কবরের সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত বেশী বেশী সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে উদাসীন করে দিয়েছে।'

তাফসীর

হে অপরিণামদর্শী সীমালংঘনকারী মোহমত্ত জনমন্ডলী, শোনো! যারা খেলাধুলায় মত্ত-ধনবল, জনবল ও পার্থিক ভোগের উপকরণের আধিক্যে গর্বিত অথচ একদিন এগুলো ছেড়ে যেতেই হবে সে কথা বিস্মৃত, তারা শোনো! বর্তমান জীবনের অব্যবহিত পরে যে জীবন, তাকে যারা ভুলে বসে আছ, তারা শোনো! অর্জিত প্রাচুর্যের গর্বে এবং আরো অধিক অর্জনের প্রতিযোগিতায় যারা ভুলে আছো যে, একদিন এসব সম্পদ ত্যাগ করে সংকীর্ণ একটা গর্তে আশ্রয় নিতে হবে, তারা শোনো!

প্রতিযোগিতা ও অহংকার এবার থামাও। জাগো এবং চোখ মেলে তাকাও। 'অতিরিক্ত অর্জনের নেশা তোমাদেরকে উদাসীন করে দিয়েছে। কবরের সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত তোমাদের এ অবস্থাই চলতে থাকবে।'

অতপর কবরের সাক্ষাত লাভের পর সেখানে তাদের জন্যে যে পরিণাম অপেক্ষা করছে, তার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মনকে হুশিয়ারী সংকেত দিচ্ছেন অত্যন্ত শান্ত ও গুরুগম্ভীর ভাষায়, 'কখনো নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।'

তারপর এই হুশিয়ারী সংকেতের পুনরাবৃত্তি করছেন একই ধরনের ভীতি সঞ্চারক গুরুগম্ভীর ভাষায়, 'পুনরায় (বলছি) কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।'

এরপর অধিকতর গভীর ও ভীতিপ্রদ ভংগিতে, আরো জোরালো ভাষায় একই হুশিয়ারীর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। দৃষ্টির আড়ালে যে গুরুতর ব্যাপার রয়েছে, যার প্রকৃত স্বরূপ শ্রোতাদের কাছে তাদের প্রাচুর্যের মোহ ও অহংকারের দরুন সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছে না, তার প্রতি ইংগিত দেয়া হচ্ছে, 'কখনো নয়, তোমরা যদি সংশয়মুক্তভাবে জানো'। তারপর এই ঈঙ্গিত ভয়াল সত্যটি উম্মোচন করা হচ্ছে 'তোমরা অবশ্যই দোযখকে দেখতে পাবে।' অতপর এ সত্যের পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে যাতে মানুষের হৃদয়ে এর প্রভাব আরো গভীর হয়, 'পুনরায়, তোমরা চাক্ষুস নিশ্চয়তা সহকারে তা দেখতে পাবে।'

অতপর সর্বশেষ হুশিয়ারীটি উচ্চারণ করা হচ্ছে, যাতে উদাসীন লোকেরা সম্বিত ফিরে পায়। অচেতন লোকদের চেতনা জাগে, অহংকারী সতর্ক হয়, সুখী ও বিলাসী লোকদের মধ্যে জাগরণ আসে এবং প্রাচুর্যের মধ্যেও যেন দায়িত্বের অনুভূতি অক্ষুণ্ন থাকে, 'অতপর তোমাদেরকে নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

জিজ্ঞাসা করা হবে কোথা থেকে তোমরা সম্পদ অর্জন করেছো এবং কোথায় তোমরা তা ব্যয় করেছো? আল্লাহর আনুগত্যের ভেতর দিয়ে উপার্জন ও ব্যয় করেছো, না তাঁর অবাধ্যতা ও নাফরমানীর ভেতর দিয়ে? হালাল উপায়ে না হারাম উপায়ে? তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় করেছো, না নাশোকরী করেছো? তোমার আর্থিক দায়িত্ব কি পালন করেছো? সমাজের কাজে কি অবদান রেখেছো? অপরের স্বার্থকে কি অগ্রাধিকার দিয়েছো? তোমরা যে প্রাচুর্যের অহংকার ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। সম্পদের প্রাচুর্য আসলে একটা ভারী বোঝা। তোমরা নিজেদের খেলা তামাশার মধ্যে অতিমাত্রায় মগ্ন থাকার কারণে তাকে হালকা মনে করো। অথচ তার অপরদিকে রয়েছে দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার ভারী বোঝা। এ সূরাটি নিজেই নিজের ব্যাখ্যা দিচ্ছে, এর মর্ম ও ছন্দময় ভাষা চেতনায় এক অনির্বচনীয় অনুভূতির সঞ্চার করে। দুনিয়ার যতো আজেবাজে চিন্তা ও তুচ্ছ কাজে নিষ্কর্মা লোকেরা ব্যস্ত থাকে, তার উর্ধে আখেরাতের চিন্তাকে স্থান দেয়ার জন্যে এ সূরা শ্রোতার মনকে উদ্বুদ্ধ করে। সূরাটি দুনিয়ার জীবনকে একটি দীর্ঘ ভিডিও ক্যাসেটের এক জায়গায় চোখ ধাঁধাঁনো আলোর ঝলকানি হিসাবে চিত্রিত করে। 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে উদাসীন করে দিয়েছে এমনি করেই তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে' এ কথাটুকুতে সেই ধারণা বিদ্যমান। দুনিয়ার জীবনে দেখা দেয়া আলোর ঝলক এক সময় শেষ হয়ে যায় এবং তার জীবনের ক্ষুদ্র পাতাটিও এক সময় উল্টানো সম্পন্ন হয়।

তারপর সময় প্রলম্বিত হয় ও গড়িয়ে যায় এবং দায়িত্বের বোঝাও সম্প্রসারিত হতে থাকে। ভাষাগত অভিব্যক্তি স্বয়ং এই বক্তব্য উচ্চারণ করে, ফলে বাস্তবতা ও ভাষাগত অভিব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ ঐকতান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গুরুগম্ভীর ভীতি সঞ্চারক সূরাটি যখন কেউ পড়ে এবং তার সুউচ্চ ও সুদূরপ্রসারী বক্তব্যকে তার সুগভীর তাৎপর্যসহ উপলব্ধি করে, তখন সে তার এই পার্থিব জীবনের গুরুদায়িত্বসমূহ অনুভব করে এবং তা পালন ও বহন করে পথ চলতে থাকে। অতপর সে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও নিজেই নিজের হিসাব নেয় এবং নিজের কাছে জবাবদিহি করে।

সূরা আল আসর

আয়াত ৩ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. সময়ের শপথ, ২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত) আছে, ৩. সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মাত্র তিনটি আয়াতের সমাহার এই ক্ষুদ্র সূরাটিতে মানব জীবনের জন্যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বিদ্যমান। এ জীবন বিধানের রূপরেখা, অবিকল ইসলাম যেমন মানব জীবনের জন্যে হওয়া উচিত বলে প্রত্যাশা করে, তেমনি। অত্যন্ত স্পষ্ট, নিখুঁত ও সূক্ষ্মভাবে ঈমানী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার বৈশিষ্টগুলোকে তার সর্বব্যাপী ও বিরাট মূলতত্ত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে এই সূরায়। সত্যি বলতে কি, এ সূরাটি তার শেষ আয়াতে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়ে গোটা ইসলামী শাসনতন্ত্র ও সংবিধান রচনা ও প্রতিষ্ঠিত করেছে, মুসলিম উম্মাহর জাতিসত্ত্বার বর্ণনা দিয়েছে, তার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছে। এটি এমন এক অলৌকিক কীর্তি, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সম্পাদন করতে সক্ষম নয়।

যে মহাসত্যক এই সূরা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে, তাহলো সকল যুগে ও সর্বকালে মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে একটিমাত্র জীবন যাপন পদ্ধতি ছিলো এবং আছে, যা লাভজনক ও উপকারী এবং যা মানুষের মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। যে জীবন যাপন পদ্ধতির সীমারেখা এই সূরায় অংকিত হয়েছে এবং যে জীবন ব্যবস্থার রূপ কাঠামো এই সূরায় দেয়া হয়েছে, সেটিই উল্লেখিত জীবন ব্যবস্থা। এর বাইরে যতো রকমের জীবনাচার ও জীবন পদ্ধতি আছে, তার সবই সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক।

তাফসীর

'মহাকালের শপথ, মানুষমাত্রই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, সত্যের সপক্ষে মানুষকে উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের সপক্ষে উপদেশ দিয়েছে।'

সেই জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ঈমান, সৎকাজ, সত্যের উপদেশ ও ধৈর্যের উপদেশ-এই চারের সমষ্টি।

বৈশিষ্টমণ্ডিত ঈমান

এখানে আমরা ঈমানের ফেকাহ শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা দিচ্ছি না। আমরা ঈমানের স্বরূপ ও মানব জীবনে তার মূল্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করছি।

যে মহান স্রষ্টা খোদ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার থেকেই গোটা সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছে। এ কারণেই সেই উৎস থেকে উৎসারিত অন্যান্য সৃষ্টিজগতের সাথে, এই জগতকে পরিচালনাকারী ফেরেশতা ও আল্লাহর অনুগত অন্যান্য শক্তির সাথে এবং এই জগতে সঞ্চিত শক্তিসমূহের সাথে তাকে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন করতে ও রক্ষা করতে হবে। আর এ কারণে তাকে তার নিজ সত্ত্বার ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে জগতের বিশাল প্রান্তরে স্থান নিতে হবে। তার দুর্বল শক্তির সংকীর্ণ সীমানার ভেতর থেকে বেরিয়ে অজানা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিশালত্বের দিকে তাকে যাত্রা করতে হবে। তার ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে অনন্তকালীন জীবনের দিকে যাত্রা করতে হবে-যে জীবনের সীমা পরিসীমা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। (লেখকের 'ইসলাম ও বিশ্বশান্তি' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

এই সংযোগ ও সম্পর্ক মানুষকে শক্তি, সামর্থ ও স্থিতি দান করে, তাছাড়াও তাকে জগত কিছু সম্পদ ও সৌন্দর্য প্রদান করে থাকে। অনুরূপভাবে তার আত্মা আল্লাহর কিছু সৃষ্টির আত্মার সহানুভূতি লাভ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হবে, ইহকালীন জীবন আসলে মানুষের জন্যে প্রতিষ্ঠিত একটি খোদায়ী মেলায় পরিভ্রমণের শামিল। পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বক্ষণ এই মেলা বিদ্যমান। এই জীবন একটা বিরাট সৌভাগ্য, একটা নির্মল আনন্দ এবং জীবন ও জগতের সাথে সখ্য, ঠিক যেমন বন্ধুর সাথে বন্ধুর সখ্য হয়ে থাকে। এই সখ্য ও মৈত্রী এমন একটি দুর্লভ প্রাপ্তি যার সমতুল্য আর কোনো প্রাপ্তি নেই এবং এর অভাব এমন শূন্যতা ও ক্ষতি, যার সমতুল্য আর কোনো ক্ষতি নেই।

ঈমানের বৈশিষ্ট্যগুলো খোদ্ মানবতারই বৈশিষ্ট্য। এগুলো খুবই সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

প্রথম বৈশিষ্ট্য

ঈমানের বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য জিনিস হলো এক আল্লাহর এবাদত। এটি মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্য সত্ত্বার দাসত্ব থেকে উর্ধে উন্নীত করে। তাকে সকল সৃষ্টির সাথে সমতা দান করে। কাজেই সে কাউকে কুর্নিশ করে না। আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নোয়ায় না। এখান থেকেই শুরু হয় মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতার জয়যাত্রা। এ জয়যাত্রা শুরু হয় তার বিবেক থেকে এবং জগতের বাস্তব সত্য থেকে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই, আর কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং এই চিন্তাধারা থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বতস্ফূর্ত উৎপত্তি ঘটে। কেননা এটাই একমাত্র যৌক্তিক সত্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক- মনে এই বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন। তাঁর সত্তার এই দিকটি থেকেই মানুষ নিজের মতাদর্শ, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, বিচার-বিবেচনার মানদণ্ড, আইন ও বিধান এবং আল্লাহর সাথে, সৃষ্টির সাথে ও মানুষের সাথে তার সম্পর্ক কী হবে, তা গ্রহণ করে। সুতরাং জীবন থেকে স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ ও স্বেচ্ছাচারিতা উৎখাত হয়ে যায়। তার জায়গায় স্থান নেয় আইন ও ন্যায়নীতি। মোমেনের চিন্তা-চেতনায় স্বীয় আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার মূল্য বেড়ে যায়, তার মর্যাদা জাহেলী চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের ওপরে এবং পার্থিব সম্পর্ক-সম্বন্ধ থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধের ওপরে উন্নীত হয়, যদিও সে হয় একজন একক

ব্যক্তি। কেননা সে জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করে সরাসরি আল্লাহ তায়ালা থেকে প্রাপ্ত চিন্তাধারা, আদর্শ, মূল্যবোধ ও বিচার-বিবেচনার বলে। কাজেই সে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা শক্তিমান এবং সকলের সম্মান ও আনুগত্যের পাত্র হয়ে থাকে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্কের স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা এবং প্রভুত্বের স্থান ও দাসত্বের স্থান যথাযথভাবে প্রকাশিত হওয়া। এরই বদৌলতে এই নশ্বর সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ অমর ও অক্ষয় সত্যের সাথে সরাসরি ও কোনো জটিলতা ছাড়াই সংযুক্ত হয়। এরই কল্যাণে তার হৃদয় জ্যোতির্ময় হয়, আত্মা পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয় ও আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়। সেই সাথে সন্দেহ ও সংশয়ের উচ্ছেদ ঘটে, ভীতি উদ্বেগের, উত্তেজনা ও অরাজকতার উচ্ছেদ ঘটে ও সমাপ্তি হয় পৃথিবীতে অনধিকার অহমিকা ও অহংকারের এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর অবৈধভাবে ও প্রতারণার মাধ্যমে আধিপত্য চিন্তার।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধানের ওপর অচল-অটলভাবে টিকে থাকা। সুতরাং কল্যাণ কোনো ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক জিনিস বা দুর্ঘটনা হিসাবে আসে না, বরং বিভিন্ন উপাদান থেকে তার জন্ম হয়, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গন্তব্য অভিমুখে তা চলে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বান্দারা সহযোগিতা করে। কাজেই মুসলিম দল বা সমাজের একটি ঐক্যবদ্ধ স্বচ্ছ লক্ষ্য থাকে, একটি সুনির্দিষ্ট পতাকা থাকে, আর পরবর্তী প্রজন্মগুলো এই অটুট বন্ধনের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য

পঞ্চম বৈশিষ্ট হচ্ছে, আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদার অধিকারী হওয়ার প্রত্যয়। নিজেকে নিজের বিবেচনায়ও সে উন্নত রাখে। আর আল্লাহ তায়ালা যে উচ্চ মর্যাদায় তাকে আসীন করেছেন, তা থেকে সে নিজেকে নিচে নামায় না। এ জন্যে তার বিবেকে পর্যাপ্ত লজ্জা ও শালীনতাবোধ জন্মে। বস্তুত মানুষ নিজের ব্যাপারে যতো উচ্চ ধারণা পোষণ করে, এটি তার মধ্যে উচ্চতম। সে আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল মতাদর্শ মানুষকে তার নিজের দৃষ্টিতেই হীন ও ইতর বানিয়ে দেয়, তাকে অত্যন্ত তুচ্ছ জাত বলে দেখায় এবং তার মধ্যে ও ফেরেশতাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এটা আসলে এমন ধারণা বা বিশ্বাস, যা তাকে নিম্নস্তরের সৃষ্টিতে পরিণত করে, যদিও একথা তারা স্পষ্ট করে বলে না।

এ বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ডারউইনবাদ, ফ্রয়েডবাদ ও মার্কসবাদ মানব জাতির ওপর আপতিত জঘন্যতম আপদও অপবাদ। এ সব মতবাদ মানুষকে এই ধারণা দেয় যে, প্রত্যেক নীচতা, হীনতা, নোংরামি ও দুষ্কৃতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত জিনিস। এতে অস্বাভাবিক ও নতুনত্ব কিছুই নেই। এতে লজ্জারও কিছু নেই। অথচ আসলে তা মানবতার বিরুদ্ধে একটা নিন্দনীয় নিকৃষ্ট অপরাধ।

আর আবেগের পরিচ্ছন্নতা এই অনুভূতির প্রত্যক্ষ ফল যে, আল্লাহর কাছে মানুষ সম্মানিত ও মর্যাদাবান। তিনি বিবেকের তদারকী করেন এবং তার সকল গুপ্ত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত। যে সরল সোজা মানুষ এখনো ফ্রয়েড ও কার্লমার্কস প্রমুখের মতবাদ দ্বারা বিকৃত হয়নি, সে তার অন্তরে লুকানো কোনো খারাপ ইচ্ছা সম্পর্কে অন্য কোনো মানুষ অবগত হোক, তা কখনো পছন্দ করবে না। মোমেন অনুভব করে যে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর প্রতিটি মুহূর্তে দৃষ্টি রাখছেন। তাই সে মনে করে যে, তার চিন্তা ও অনুভূতিকে পবিত্র রাখাই সমীচীন।

ঈমানের নৈতিক চেতনা হচ্ছে স্নেহময়, পরম ধৈর্যশীল মাবুদ রয়েছেন, যিনি অন্যায়কে ঘৃণা ও ন্যায়কে পছন্দ করেন এবং চোখের কুদৃষ্টি ও অন্তরে লুকানো ইচ্ছা পর্যন্ত জানেন। সে কথা বিশ্বাস করলেই মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা জন্মে।

স্বাধীন ইচ্ছা ও সামষ্টিক তদারকী থেকেও একটি গুণের জন্ম হয়। মোমেনের অনুভূতিতে আমরা এ গুণটি সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকি। এটি হচ্ছে সতর্কতা, স্পর্শকাতরতা, জাগৃতি, গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতা এবং প্রজ্ঞা ও কুশলতা। এটি শুধু ব্যক্তিগত গুণ নয়। এটি একটি সামষ্টিক গুণও বটে। এটি নিজের একটি কল্যাণময় গুণ, তদুপরি গোটা মানব জাতির জন্যেও এবং আল্লাহর কাছেও এর গুরুত্ব রয়েছে। যখনই মোমেন কোনো কাজের উদ্যোগ নেয়, তখনই এই গুণাবলী অনুভব করে। ফলে নিজের কাছেও সে বড় এবং পা বাড়ানোর আগেই তার কী ফল হবে আন্দাজ করতে পারে। সৃষ্টিজগতে এই গুণটির যথেষ্ট মূল্য রয়েছে এবং এ জগতে এর অনেক ফলাফলও আছে।

পার্থিব সম্পদ লিপ্সার উর্ধে ওঠাও ঈমানের একটি বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য অর্জিত হলে মানুষ আল্লাহর কাছে যে সম্পদ আছে, যা অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী, তাকেই অগ্রাধিকার দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'সে সব জিনিস নিয়েই প্রতিযোগিতা করা উচিত।' আল্লাহর কাছে যে নেয়ামত রয়েছে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করলে মানুষের চরিত্র উন্নত, মহৎ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়। মোমেন যে ময়দানে কাজ করে তার ব্যাপকতাও উক্ত চারিত্রিক গুণ সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে। তার এই ময়দানের সীমানা হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাত এবং পৃথিবী ও উচ্চ দায়িত্বশীল ফেরেশতাদের জগত জুড়ে বিস্তৃত। এ প্রতিযোগিতা চেষ্টা-সাধনার ফলাফল নিয়ে যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এবং ত্বরিত ফলাফল লাভের যে আকাংখা মানুষের মনে থাকে, তাকে প্রশমিত করে আখেরাতের নেয়ামত লাভের প্রতিযোগিতা। কেননা মোমেন সৎ কাজ শুধু এ জন্যে করে যে, তা সৎ কাজ এবং আল্লাহ তায়ালা তা চান। সৎ কাজের উপকারিতা ও কল্যাণকারিতা তার সীমিত ব্যক্তিগত জীবনে চাক্ষুষ সত্য হয়ে প্রকাশিত না হলেও তার কোনো ক্ষতি নেই। কেননা যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সে সৎ কাজ করে, যিনি মারা যান না, ভুলেন না এবং তার কোনো কাজ সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ থাকেন না। পৃথিবী প্রতিদানের জায়গা নয়। পার্থিব জীবন মানুষের জীবনের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ স্তর নয়। এই জ্ঞান ও ঈমানই সেই উৎস, যা থেকে সে সৎ কাজ অব্যাহত রাখার মনোবল ও প্রেরণা লাভ করে। এ উৎস কখনো শূন্য হয় না বা ফুরিয়ে যায় না। এ উৎসই সৎ ও কল্যাণকর কাজকে একটা অব্যাহত ও স্থিতিশীল রীতি হিসাবে বহাল রাখার নিশ্চয়তা দেয়। সৎকাজ নিছক সাময়িক ও মৌসুমী ব্যাপারে পরিণত হয় না কিংবা তা কোনো বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক ঘটনা হয় না। এ জন্যেই মোমেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়নোর প্রচন্ড শক্তি অর্জন করে, চাই সে অন্যায় কোনো খোদাদ্রোহী স্বৈর শক্তির পরিচালিত যুলুম ও সীমালংঘনের আকারে দেখা দিক, অথবা কোন জাহেলী দৃষ্টিভংগির চাপের আকারেই হোক, অথবা মোমেনের নিজের সৎ ইচ্ছার ওপর তার প্রবৃত্তির অন্যায় ঝোঁক ও কামনা-বাসনার চাপের আকারেই হোক বা সেই কামনা-বাসনার বিস্ফোরণ ঘটার আকারেই হোক। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার যে প্রবল চাপ মানুষের ভেতরে সর্বপ্রথম জন্ম নেয়, তা তার এই অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় যে, এই সীমিত আয়ুষ্কালে সে দুনিয়ার সকল আনন্দদায়ক ও মজাদার জিনিস উপভোগ করার এবং তার সকল আশা পূরণের সময় পাবে না। অনুরূপভাবে, এ অনুভূতি থেকেও তা জন্ম নেয় যে, তার সকল সৎ কাজের সুদূরপ্রসারী সুফল সে এই জীবনে দেখার সময় পাবে না এবং বাতিলের ওপর সত্যের বিজয় দেখার সুযোগ পাবে না। ঈমান এই অনুভূতির মৌলিক ও পরিপূর্ণ চিকিৎসা করে। (সূরা 'আল বুরুজের' তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

বস্তুত ঈমান হলো জীবনের প্রধান শেকড় ও উৎসমূল। সততা ও কল্যাণের সকল শাখা-প্রশাখার স্ফূরণ ঘটে এখান থেকেই। এর প্রত্যেক ফলমুল এরই সাথে সংযুক্ত। এর সাথে যে শাখার সংযোগ থাকে না, তা গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। সে শাখা অনিবার্যভাবে শুকিয়ে যাবে ও মরে যাবে। শেকড়ের সাথে যে ফলের সংযোগ নেই, তা শয়তানী ফল, তা কখনো স্থায়ী হয় না।

ঈমানই হলো সেই কেন্দ্রীয় অক্ষশক্তি, যার সাথে জীবনের সকল উর্ধগামী সূত্রসমূহ আবদ্ধ। ঈমান না থাকলে জীবনের সকল তৎপরতা, সকল সম্বন্ধসূত্র বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। কোনো কিছুই তা বাঁধতে বা আটকাতে পারবে না। প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর সাথে তা নিরুদ্দেশের পথে ভেসে যাবে।

ঈমানই হলো সেই মূলনীতি, যা সব কার্যকলাপকে এক সূত্রে গ্রথিত করে, একটা সুসমন্বিত ও সহায়ক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে এবং একটা একক পথে ও একক আন্দোলনে বিলীন করে দেয়। এর একটা সুপরিচিত পরিচালিকা ও প্রেরণাদায়ক শক্তি এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে।

এ জন্যে ঈমানী উৎসের সাথে সংস্রবহীন যে কোনো কাজকে কোরআন নিষ্ফল ও বৃথা গণ্য করে। ইসলামী আদর্শ এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে, তাদের সমস্ত সৎ কাজ সেই ছাইয়ের মত হবে, যা কোনো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনে বাতাসে প্রচন্ড গতিতে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কাফেরদের অর্জিত কোনো সৎ কাজই তাদের উপকারে আসবে না।' সূরা আল নূরে বলা হয়েছে 'যারা কুফরী করেছে, তাদের সৎকর্মসমূহ মরুভূমিতে বিরাজিত মরীচিকার মতো হবে, পিপাসিত ব্যক্তি তাকে পানি মনে করে। পরিশেষে যখন সে তার কাছে উপনীত হয়, তখন সেখানে কোনো বস্তুই পায় না।' কোরআনের এ সব ঘোষণা অকাট্য ভাষায় ঈমানবিহীন যাবতীয় সৎকর্মকে মূল্যহীন, বাতিল ও নিষ্ফল বলে রায় দিয়েছে। কেননা ঈমানই আমলের জন্যে বিশ্বস্রষ্টার সাথে সংযুক্তকারী সংযোগসূত্র এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয় বিধানকারী লক্ষ্য সংগ্রহ করে দেয়। যে আকীদা-বিশ্বাস সকল জিনিসকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে ও তাঁর ওপর নির্ভরশীল করে, তার ক্ষেত্রে কোরআনের উক্ত রায় সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সংস্রবহীন হয়, সে তার কাজের প্রকৃত তাৎপর্যই হারিয়ে ফেলে।(১)

এ কথা অকাট্য সত্য যে, ঈমান প্রাকৃতিক বিধি ব্যবস্থার বিশুদ্ধতার পক্ষে এবং মানুষের সৃষ্টির অর্থহীনতার পক্ষে একটি প্রমাণ স্বরূপ। ঈমান এ কথার সত্যতাও প্রমাণ করে যে, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এবং গোটা বিশ্বনিখিলের মাঝে পরিপূর্ণ সমন্বয় বিরাজ করছে এবং মানুষ ও তার পার্শ্ববর্তী সৃষ্টিজগতের মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ সংহতি, একাত্মতা ও ঐকতান। কেননা মানুষ এ বিশ্বেরই অধিবাসী। তার সত্ত্বা যদি সুস্থ ও নিখুঁত থাকে, তাহলে তার মধ্যেও এই বিশ্ব নিখিলের মধ্যে একাত্মতা ও ঐকতান বিরাজ না করে পারে না। আর এই ঐকতান ঈমানের রূপ না নিয়েও পারে না। কেননা খোদ্ এই বিশ্ব নিখিলের মধ্যেই এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে, যা এই সুশৃংখল

---

(১) সূরা 'যেলযালের' আয়াত যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও কোনো ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে, আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও খারাপ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, 'কোনো কোনো গ্রন্থকার লিখেছেন যে, এ ব্যাপারে সকল মুসলিম আলেমের এজমা (মতৈক্য) হয়েছে যে, কাফেরদের কোনো সৎ কাজই আখেরাতে ফলদায়ক হবেনা এবং তার কোনো অপকর্মের শাস্তিই লাঘব করা হবে না। কিন্তু এই এজমার কোনো প্রমাণ বা ভিত্তি নেই।' এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিষয়টি এজমা থেকে আসেনি, বরং .. এ ঘোষণা থেকে এসেছে যা স্বয়ং স্বপ্রামাণিত সত্য এবং এটা অন্য কোনো প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়।

বিশ্বকে কোনো নমুনা ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজ উদ্ভাবিত নকশা অনুসারে সৃষ্টিকারী এক সর্বশক্তিমান সত্ত্বার সন্ধান দেয়। মানুষ ও বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যখন এই সমন্বয় ও সমতা অনুপস্থিত বা বিকল হয়ে যাবে, তখন তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রমাণ করবে যে, এই গ্রাহকযন্ত্রটি অর্থাৎ মানবীয় সত্ত্বার ভেতরেই ত্রুটি ও বৈকল্য বিদ্যমান। এটা এমন এক বৈকল্যের উপস্থিতি নির্দেশ করে, যার পরিণাম ব্যর্থতা ও সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু নয়, আর সেই বৈকল্য ও ত্রুটি সহকারে কোনো কাজই শুদ্ধ হতে পারে না-তা বহিরাবরণে যতোই তার বিশুদ্ধতার প্রলেপ থাক না কেন।

আর মোমেনের ভুবন এতো প্রশস্ত, এতো ব্যাপক, এতো সুপরিসর, এতো উচ্চ, এতো সুন্দর ও এতো সুখ ও সৌভাগ্যমন্ডিত যে, তার পাশে কাফেরদের ভুবন অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বিদঘুটে, অশান্ত দুর্ভাগ্যজর্জরিত বৃথা ও ক্ষতিগ্রস্ত 'সালেহ' হচ্ছে ঈমানের স্বাভাবিক, সহজাত ও স্বয়ংক্রিয় ফল। সৎকর্ম হচ্ছে সেই স্বয়ংক্রিয় গতি বা তৎপরতা যা অন্তরে ঈমানের বীজ উপ্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে যায়। বস্তুত ঈমান হচ্ছে এমন একটি ইতিবাচক চলমান জিনিস, যা মানুষের মনমগযে স্থান লাভ করা মাত্রই তার বাস্তব জীবনে সৎকাজের আকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৎপর ও সচল হয়ে ওঠে। ইসলামের পরিভাষায় ঈমান এ জিনিসেরই নাম। ঈমান নিশ্চল ও নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকতে পারে না। শুধু মোমেনের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকবে এবং তার বাস্তব জীবনে জীবন্ত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে না-এটাও অসম্ভব। যে ঈমান এই স্বয়ংক্রিয় পন্থায় সঞ্চালিত হয় না, তা নষ্ট, বিকৃত অথবা মৃত। ঈমান ফুলের মতো। সে তার সৌরভকে আটকে রাখতে পারে না। আপনা থেকেই সুগন্ধ ছড়ায়। আর যদি সুগন্ধ না ছড়ায়, তবে বুঝতে হবে, ফুলের অস্তিত্ব নেই।

এখান থেকেই বুঝা যায় ঈমানের মূল্য কতখানি বা ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ কী? ঈমান আল্লাহমুখী গতিশীলতা, তৎপরতা, গঠন ও নির্মাণের সমষ্টি। শুধুমাত্র মন-মগযে ও বিবেকে লুকানো, সংকুচিত, নেতিবাচক জিনিসের নাম নয়। শুধুমাত্র এমন মহৎ উদ্দেশ্য, মনোবাসনা ও পবিত্র নিয়তকে ঈমান বলে না, যা কখনো কাজে পরিণত হয় না। এ হচ্ছে ইসলামের অন্যতম স্বভাব বা প্রকৃতি। ইসলামের এই স্বভাব-প্রকৃতি থেকেই উৎপত্তি হয় জীবনের সর্ব বৃহৎ নির্মাণ-ক্ষমতার।

ঈমান যতক্ষণ আল্লাহর নাযিল করা জীবন বিধানের সাথে সংযোগকে বুঝাবে, ততোক্ষণ উপরোক্ত তত্ত্ব বোধগম্য থাকবে। আর আল্লাহর এই বিধান হচ্ছে সৃষ্টিজগতের অভ্যন্তরে সক্রিয় একটা চিরস্থায়ী ও সুষমামন্ডিত আন্দোলন ও তৎপরতা। এ তৎপরতা একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালিত। এর একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। মানব জাতিকে ঈমানের পথে পরিচালিত করা মূলত বিশ্ব প্রকৃতির স্বভাবসুলভ গতি ও তৎপরতার নিয়মবিধিকেই বাস্তবায়িত করার পথ প্রদর্শনের নামান্তর। সৃষ্টিজগতের সেই স্বাভাবিক গতি ও তৎপরতা হচ্ছে কল্যাণমূলক, গঠনমূলক ও পরিচ্ছন্ন তৎপরতা। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া জীবন বিধানের সাথে তা সামঞ্জস্যশীল ও মানানসই।

মুসলিম জাতির লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি

এরপর সত্য ও ন্যায়ের উপদেশ দান এবং ধৈর্যের উপদেশ দান, এই দুটি বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এর ভেতর দিয়ে মুসলিম জাতির ভাবমূর্তি উদ্ভাসিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে এমন ইসলামী দল বা সংগঠনেরও ভাবমূর্তি স্পষ্ট হচ্ছে, যার বিশেষ ধরনের কাঠামো, বিশেষ ধরনের সংযোগ কর্মসূচী এবং একটা ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, এমন একটি দলের রূপ কাঠামো তুলে ধরা

হচ্ছে, যে দল নিজের স্বভাব, প্রকৃতিকে যেমন বোঝে, তেমনি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি সে সম্পর্কেও সচেতন। যে দল তার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় ঈমান ও সৎ কাজের প্রকৃত পরিচয় জানে এবং এও জানে যে, ঈমান ও সৎ কর্মের দিকে মানুষকে পরিচালিত করা ও নেতৃত্ব দান করাও তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এ সব বিষয়ে সচেতন বলেই এই সংগঠন নিজের অভ্যন্তরে এরূপ উপদেশের সার্বক্ষণিক আদান-প্রদান চালু রাখে, যাতে সে তার বৃহত্তম দায়িত্ব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ময়দানে নামতে পারে।

সুতরাং 'পরস্পরকে উপদেশ প্রদান' (তাওয়াসাও) বা উপদেশের আদান-প্রদান শব্দটি এই শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য এবং উপদেশ আদান-প্রদানের স্বাভাবিক রূপ ও বাস্তব রূপ এইসব কিছু মিলে মুসলিম উম্মাহ বা ইসলামী সংগঠন বা ইসলামী সমাজের যথার্থ স্বরূপ ও ভাবমূর্তি তুলে ধরে। সেই ভাবমূর্তি এরূপ যে, মুসলিম উম্মাহ, জাতি, সমাজ, দল বা সংগঠন, যাই হোক না কেন, তার সদস্যরা পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ, একাত্ম, কল্যাণকামী, সৎকর্মশীল, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং সেই সংগঠন পৃথিবীতে সত্য, ন্যায়নীতি ও সততার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মনোনীত উম্মাহ হওয়ার জন্যে একটি সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবমূর্তি। ইসলাম চায় মুসলিম জাতি এরকমই হোক। সে চায়, মুসলিম উম্মাহ এরকমই কল্যাণকামী, শক্তিমান, বুদ্ধিমান, সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের প্রহরী হোক। পরস্পরকে সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সৌভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়ে সত্য, সততা, ও ধৈর্যের সদুপদেশ দানকারী হোক, যেমনটি কোরআনের 'তাওয়াসাও' শব্দটি থেকে প্রতিবিম্বিত হয়।

বস্তুত সত্য ও সততার উপদেশের আদান প্রদান একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ। সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কঠিন এবং এর পথে বাধাগুলো হচ্ছে প্রকৃতির কামনা-বাসনা, স্বার্থপ্রণোদিত যুক্তি, পরিবেশগত ধ্যান-ধারণা, স্বৈরাচারী শক্তির আগ্রাসী ও বলপ্রয়োগের মনোবৃত্তি ও যালেমদের যুলুম। 'তাওয়াসাও' বা উপদেশের আদান-প্রদান বলতে বুঝায় স্মরণ করিয়ে দেয়া, উদ্বুদ্ধ করা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে ত্যাগ স্বীকারের চেতনা উজ্জীবন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা করা। এ জিনিসটি মূলত ব্যক্তিগত গুণাবলীর সামষ্টিক রূপ। যখন এগুলো একত্রে কর্মতৎপর হয়, তখন এর শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কারণ সত্য ও ন্যায়ের প্রত্যেক প্রহরীর মনে এই অনুভূতি থাকে যে, তার সাথে আরো অনেকে আছে, যারা তাকে সদুপদেশ দেয়, উৎসাহ যোগায়, সহযোগিতা দেয়, ভালোবাসে এবং অবজ্ঞা বা অসম্মান করে না। বস্তুত এই সত্য দ্বীন ঠিক এই ধরনের একটি দলের সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রহরা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যার কর্মীরা পরস্পরের সহযোগী, সমব্যথী, সমমনা, একাত্ম, সুসংগঠিত, পরস্পরকে উপদেশ দানকারী ও নিরাপত্তা দানকারী হয়।

একইভাবে ধৈর্যের জন্যে উপদেশ বিনিময়ও একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। ঈমান ও সৎকর্ম চালু রাখা এবং সত্য ও ন্যায়ের সংরক্ষণ ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ। আর এ জন্যে ধৈর্য অপরিহার্য। নিজের প্রবৃত্তির সাথে জেহাদ এবং অপরের সাথে জেহাদ, উভয় জেহাদের জন্যেই ধৈর্য প্রয়োজন। বাতিলের অগ্রগতি ও দুষ্ট লোকদের আংগুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখেও ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন। সত্যের পথের দীর্ঘতা ও বিভিন্ন স্তর পার হতে বিলম্ব ঘটার ক্ষেত্রেও ধৈর্যের প্রয়োজন। সত্যের ব্যাপারে বিশ্ববাসীর অসারতা ও দুঃসময়ের অবসানে বিলম্বেও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার উপদেশ আদান-প্রদানে কর্মক্ষমতা বাড়ে। কেননা এতে লক্ষ্যের ঐক্য, দৃষ্টিভংগির ঐক্য, সকল মোমেনের সমর্থন ও সহায়তা,তাদের দৃঢ় সংকল্প, ভালোবাসা ও ক্রমাগত চেষ্টা সাধনার যোগ্যতারূপী সম্পদ অর্জিত হয়, অনুরূপভাবে ইসলামী সমাজ বা সংগঠনের বহু প্রয়োজনীয় মহৎ গুণ ধৈর্যের উপদেশ দানের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। যে পরিবেশে সেইসব গুণের প্রসার ঘটে, ইসলামের সত্যিকার রূপ সেই পরিবেশেই বিকশিত ও প্রকাশিত হয়। তাই ধৈর্যের উপদেশের ব্যাপক আদান-প্রদান ছাড়া ব্যর্থতা অনিবার্য।

মুসলমানদের অধপতনে মানবজাতি যে ক্ষতির সম্মুখিন

পবিত্র কোরআন এই সূরায় ব্যর্থতা ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যে সংবিধান দিয়েছে, সেই সংবিধানের নিরিখে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, ব্যর্থতা আজ সারা পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতিকে গ্রাস করেছে। এই ব্যর্থতা থেকে পৃথিবীর কোনো অংশই নিস্তার পায়নি। এই দুনিয়াতে মানবজাতি যে যুলুমের শিকার, তা দেখলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। মানবজাতি যেভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে চলেছে, আর তার পাশাপাশি পৃথিবী থেকে সত্যপন্থী কল্যাণকামী ইসলামী সরকারের অনুপস্থিতি পরিস্থিতিকে যেভাবে অধিকতর বিপজ্জনক করে তুলেছে, তা যথার্থই ভীতিপ্রদ। এছাড়া আরো বিপজ্জনক ব্যাপার এই যে, মুসলমানরা বা সঠিকভাবে বলতে গেলে মুসলিম দাবীদাররাই আজ এই কল্যাণময় সত্য দ্বীন থেকে সবচেয়ে বেশী দূরত্বে অবস্থিত। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে জীবন বিধান মনোনীত করেছেন, তাকে তারাই সবচেয়ে বেশী অবজ্ঞা করে চলেছে। মুসলিম উম্মাহর জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে সংবিধান রচনা করে দিয়েছেন, ব্যর্থতা ও ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভের জন্যে যে একমাত্র পথটি দেখিয়েছেন, তাকে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশী উপেক্ষা করে চলেছে। আর পৃথিবীর যে স্থানগুলো থেকে এই কল্যাণময় ব্যবস্থা সর্বপ্রথম ফুটে বেরিয়েছিলো, সে সব স্থানের অধিবাসীরা তাদের পতাকা বেশী করে পরিত্যাগ করেছে। অথচ ওই ঈমানী পতাকা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্যে উড্ডীন করেছিলেন। অথচ সব অঞ্চলের জনগণ নিজেদেরকে এমন সব জাতিগত পতাকার সাথে সংযুক্ত করতে শুরু করেছে, যে পতাকার অধীনে ওইসব অঞ্চল তাদের ইতিহাসে কখনো কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি এমনকি সেসব অঞ্চল সে পতাকার অধীনে কখনো কোন সুনাম ও সুখ্যাতি লাভ করেনি। বরং একমাত্র ইসলাম এসেই তাদের জন্যে একক, লা-শরীক আল্লাহর মনোনীত পতাকা এবং একক লা-শরীক আল্লাহর নামাংকিত পতাকা উত্তোলন করেছে। সে পতাকা ছিলো আল্লাহর প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত। সেই পতাকার অধীনেই আরব জাতি বিজয় অর্জন করে, শুধু আরব ইতিহাসে নয় বরং সমগ্র মানবেতিহাসে এই পতাকাই সর্বপ্রথম মানবজাতিকে কল্যাণময়, শক্তিমান, বিচক্ষণ ও স্বাধীন নেতৃত্ব উপহার দেয়।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভী 'মুসলিম জাতির অধপতনে বিশ্বের কি ক্ষতি হয়েছে' নামক অনবদ্য গ্রন্থে সমগ্র ইতিহাসের এই নযীরবিহীন কল্যাণকামী নেতৃত্ব সম্পর্কে 'ইসলামী শাসনের যুগ, মুসলিম শাসকগণ ও তাদের বৈশিষ্ট' শিরোনামে বলেন,

'মুসলমানরা বিজয়ী হয়, বিশ্বের নেতৃত্ব হস্তগত করে এবং বিকারগ্রস্ত ও দুর্নীতিবাজ জাতিগুলোকে মানবজাতির নেতৃত্ব থেকে উৎখাত করে। এই নেতৃত্বকে তারা অন্যায়ভাবে কবযা করেছিলো এবং তার অপব্যবহার করেছিলো। মুসলমানরাই মানব জাতিকে ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফপূর্ণ শাসন উপহার দিয়েছিলো। বিশ্ব-নেতৃত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় গুণাবলী তাদেরই ছিলো। নিজেদের নেতৃত্বে ও তদারকীতে তারা বিশ্বের সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ নিশ্চিত করেছিলো। সেই গুণগুলো ছিলো নিম্নরূপ,

প্রথমত তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কেতাব ও শরীয়তের অধিকারী ছিলো। ফলে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো আইন রচনা করেনি। কেননা মানব রচিত আইন অজ্ঞতা, ভুলভ্রান্তি ও যুলুমের উৎস। মুসলিম শাসকরা নিজেদের ব্যবহারে, রাজনীতিতে ও মানুষের সাথে লেনদেনে উচ্ছৃংখল ও এলোমেলো আচরণ করতেন না। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মানুষের সাথে আচরণের জন্যে আলো এবং মানুষকে শাসন করার জন্যে শরীয়তী বিধান দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, মৃত ব্যক্তিকে আমি জীবিত করেছি এবং মানুষের ভেতরে চলাফেরার জন্যে আলো দিয়েছি, সে কি সেই ব্যক্তির মতো, যার উদাহরণ অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে এবং সেখান থেকে বের হবে না?' আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন, হে মোমেনরা! তোমরা ন্যায়বিচারের সাক্ষী হয়ে আল্লাহর জন্যে স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান হও। কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ ত্যাগ করতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার করো। আল্লাহভীতির সাথে এর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন।'

দ্বিতীয়ত নৈতিক প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা না করে তারা নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেনি, যেমনটি অধিকাংশ জাতি, ব্যক্তি ও শাসকরা অতীতেও করেছে বর্তমানেও করেছে ও ভবিষ্যতেও করে করবে। তারা দীর্ঘদিন মোহাম্মদ (স.)-এর হাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, তাঁর সূক্ষ্ম নিখুঁত তদারকী,পরিশুদ্ধি ও পরিমার্জনের সুযোগ পেয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে দুনিয়ার স্বার্থ বর্জন, পরহেযগারী, আমানতদারী, অন্যকে অগ্রাধিকার দান, আল্লাহর ভয় এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রার্থী ও প্রত্যাশী না হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো। রসূল (স.) বলেন, 'আল্লাহর কসম, এই কাজের দায়িত্ব আমরা যে চায় তাকেও দেই না, যে এর আকাংখা পোষণ করে তাকেও দেই না।' (বোখারী ও মুসলিম)।

আর এ কথা তো তাদের কানে দিন-রাত অনুরণিত হয়ে থাকে যে, 'আখেরাতের সেই ঘর (জান্নাত) আমি সেইসব লোকের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়াই যাহির করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও ইচ্ছুক নয়। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ শুধু পরহেযগার লোকদের জন্যেই।' আমীরত্বের পদের জন্যে প্রার্থী হওয়া, তদবীর সুপারিশ করা, প্রচারণা চালানো এবং তার জন্যে টাকা ব্যয় করা তো দূরের কথা, পদ ও চাকরীর জন্যে তারা ধরনাও দিতেন না। এতদসত্ত্বেও যখন জনগণের কোনো দায়িত্ব তাদের কাছে ন্যস্ত হতো, তখন সেটিকে তারা স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করতেন না কিংবা ইতিপূর্বে যে সম্পদ ও চেষ্টা-সাধনা তারা ইসলামের জন্যে ব্যয় করেছেন, তার মূল্য গ্রহণ করার জন্যেও তারা কোন চেষ্টা করেননি। তারা এই পদমর্যাদাকে আমানত হিসাবে এবং আল্লাহর পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তারা জানেন যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে (হিসাব না দিয়ে) এক পাও নড়তে দেবেন না এবং ছোট-বড় প্রতিটি কাজের জন্যে তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য। তারা সব সময় আল্লাহর এই বাণী স্মরণ রাখে যে, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন আমানতগুলোকে যারা তার উপযুক্ত, তাদের কাছে সমর্পণ করবে, আর মানুষের ভেতরে যখন বিচার শাসন করবে, তখন ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বিচার-শাসন করবে।' তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন এবং তোমাদের কিছু লোককে অপর কিছু লোকের ওপর মর্যাদা দান করেছেন, যাতে তোমাদেরকে দেয়া সম্পদের ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন।'

তৃতীয়ত, তারা কোনো গোষ্ঠীবিশেষ ও জাতি বিশেষের সেবক ও দূত ছিলেন না যে, শুধু সেই বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতির কল্যাণ ও সুবিধার জন্যেই তারা চেষ্টা করবেন। তারা নিজেদের জাতিকে দুনিয়ার সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না। তারা নিজেদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতেন না যে, তাদের সৃষ্টিই হয়েছে শাসক হবার জন্যে এবং অন্য জাতিগুলোর সৃষ্টিই হয়েছে মুসলমানদের পদানত হয়ে থাকার জন্যে। তারা কোনো আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেননি, যাতে তার মাধ্যমে নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধি ও ফুলে-ফেঁপে ওঠার ব্যবস্থা হয়, অহংকার ও গর্বে মেতে ওঠার সুযোগ হয় এবং জনগণ পারস্য ও রোমের পরিবর্তে আরব সাম্রাজ্যের গোলাম হয়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলাম বানানো। মুসলমানদের দূত রাবয়ী বিন আমের পারস্য সম্রাট ইয়াজদগারের দরবারে বলেছিলেন, 'আমরা এসেছি মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্বের আওতাভুক্ত করার জন্যে, পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে প্রশস্ততায় আনার জন্যে এবং বিভিন্ন ধর্মের যুলুম থেকে ইসলামের ন্যায়বিচারের অধীনে আনার জন্যে।' (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)।

বস্তুত মুসলমানদের চোখে সকল জাতি ও সকল মানুষ সমান ছিলো। সকল মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। কোনো অনারবের ওপর আরবের এবং কোনো আরবের ওপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ তায়ালা বলছেন হে মানুষেরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি রূপে বানিয়েছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের ভেতরে যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার, সেই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত।'

মিসরের গভর্ণর আমর ইবনুল আস-এর ছেলে যখন জনৈক মিসরীয় নাগরিককে প্রহার করে গর্বের সাথে বলেছিলো, 'এ প্রহার দুই সম্ভ্রান্ত নারী ও পুরুষের পুত্রের পক্ষ থেকে মেনে নাও,' তখন হযরত ওমর তার কাছ থেকে প্রতিশোধ আদায় করলেন এবং বললেন, 'জনগণ তো তাদের মায়ের গর্ভ থেকে স্বাধীন ভাবেই জন্মেছিলো, তোমরা আবার কখন তাদেরকে গোলামে পরিণত করলে?' বস্তুত মুসলিম শাসকরা তাদের জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতা এবং মর্যাদা দানে তারা কোনো বংশ, বর্ণ ও জন্মভূমির ভেদাভেদ করেননি। তারা ছিলেন মেঘমালার মতো। সকল দেশের ওপর সংগঠিত হয়ে এসেছেন, সকল মানুষকে সমভাবে অনুগ্রহ বিতরণ করেছেন, উপত্যকা ও মরুভূমির লোকেরা তাদের প্রশংসা করেছে, কিন্তু তা দ্বারা বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন দেশ উপকৃত হয়েছে নিজ নিজ যোগ্যতার ভিত্তিতে।

তাদেরই নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে বিভিন্ন জাতি, এমনকি ইতিপূর্বে যারা নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়েছে তারাও-ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও শাসন ক্ষমতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে এবং নতুন বিশ্ব গড়ার ব্যাপারে আরবদের সহযোগিতা করেছে। এমনকি বিভিন্ন শাসিত অনারব জাতির লোকেরা স্বয়ং শাসক আরব জাতির চেয়েও কোনো কোনো বিষয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করেছে। কেউ কেউ আরবদের মাথার মুকুটও হয়ে গেছে এবং মুসলিম জাতির সার্বজনীন নেতা, ইমাম, ফকীহ ও মোহাদ্দেস হয়েছে।

চতুর্থত মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি। তার মন আছে, জ্ঞান মস্তিষ্ক আছে, অংগপ্রত্যংগ আছে এবং রকমারি আবেগ-অনুভূতি আছে। তার এই সকল শক্তি সমানুপাতিক হারে ও সুসমন্বিতভাবে বিকাশ লাভ না করলে এবং উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টি না পেলে মানুষ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারে

না এবং সে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে উন্নতি করতে পারে না। একটি ন্যায়সংগত সভ্যতার প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব, যখন ধর্মীয়, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তির ও শারীরিক সর্বক্ষেত্রে মধ্যম ধরনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মানুষ তার অধীনে তার মানবীয় পূর্ণতা সহজেই অর্জন করতে পারবে। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ কাজটি তখনই সম্ভব, যখন সামাজিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব এমন লোকদের হাতে থাকবে, যারা আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা উভয়টিতেই বিশ্বাসী হবে, যারা ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে পরিপূর্ণ আদর্শ হবে, সুস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হবে এবং কার্যকর ও লাভজনক জ্ঞানের অধিকারী হবে। অতপর 'খেলাফতে রাশেদার যুগ ন্যায়নিষ্ঠ সভ্যতার আদর্শ' শিরোনামে তিনি বলেনঃ

'খেলাফতে রাশেদা এ রকমই ছিলো। সমগ্র ইতিহাসে আমরা খেলাফতে রাশেদার চেয়ে সর্বশক্তি দিয়ে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও পূর্ণাংগ কোনো যুগ খুঁজে পাই না। আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বস্তুগত উপায়-উপকরণ-এই সব কিছুই পূর্ণাংগ মানুষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ সত্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এই সরকার ছিলো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সরকার এবং তৎকালে সকল রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সেরা শক্তি। সে সময় উচ্চতম নৈতিক মানের প্রাধান্য সাধারণ মানুষের জীবনে ও শাসন ব্যবস্থায় সমভাবে বিদ্যমান ছিলো। নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শিল্পেরও উন্নয়ন সাধিত হচ্ছিলো। আর দেশ জয় ও সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে একই পর্যায়ের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির কাজ চলতো। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন ও লোকসংখ্যা অনুপাতে অপরাধের মাত্রা কমে গিয়েছিলো, যদিও অপরাধের উপকরণাদি নেহাৎ কম ছিলো না। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে সমাজের এবং সমাজের সাথে ব্যক্তির চমৎকার সুসম্পর্ক বিরাজ করতো। আর এটা এমন একটা পূর্ণাংগ স্তব, যার চেয়ে উন্নত স্তর, সুন্দর অবস্থা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

ইসলামী সংবিধানের অধীনে মানবজাতির যে সুখসময় যুগটা কেটেছে, এখানে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো। সূরা 'আল আসরে' এই সংবিধানের মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। মানবজাতি এ সুখময় যুগটা কাটাতে পেরেছিলো সেই ঈমানী পতাকার নিচে সমবেত হয়ে, যা বহন করেছিলো ঈমান, সৎসর্গ, সততা ও সত্যের জন্যে পারস্পরিক উপদেশের আদান-প্রদান এবং ধৈর্যের জন্যে পারস্পরিক উপদেশের আদান-প্রদানকারী একটি ইসলামী সংগঠন।

সেই সুখময় যুগ ও পরিবেশের সাথে আজকের সর্বব্যাপী ক্ষয়ক্ষতির কি তুলনা হতে পারে, যা দ্বারা মানবসমাজ পৃথিবীর সর্বত্র জর্জরিত, যা ন্যায় ও অন্যায় এবং সততা ও অসততার সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানব জাতিকে প্রতিনিয়ত সর্বস্বান্ত করছে। কি যুক্তি থাকতে পারে আজকের মানবসমাজ কর্তৃক তৎকালীন আরবজাতির সাধিত বিরাট জনকল্যাণমুখী কীর্তিকে অন্ধ বিদ্বেষের তাড়নায় অস্বীকার ও উপেক্ষা করার পেছনে? সেদিন আরব জাতি ইসলামের পতাকা উড়িয়ে এই অকল্পনীয় কীর্তি সমাধা করতে পেরেছিলো বলেই তার হাতে এসেছিলো মানবজাতির নেতৃত্বের চাবিকাঠি। তারপর যেই সে পতাকা নামালো, অমনি তার স্থান হলো কাফেলার একেবারে পেছনের কাতারে। তারপর গোটা কাফেলাই ধ্বংস ও পতনের শিকার হলো। আর সকল পতাকা হয়ে গেলো শয়তানের পতাকা। একটি পতাকাও আল্লাহর রইলো না। সকল ঝান্ডা উড়তে

লাগলো বাতিলের পক্ষে। একটি ঝান্ডাও সত্যের পক্ষে উড্ডীন থাকলো না। সকল পতাকা রইলো অন্ধত্ব ও গোমরাহীর পক্ষে। হেদায়াত ও আলোর পক্ষে কোনো পতাকা রইলো না। সকল পতাকা রইলো ক্ষতি ও ধ্বংসের। সফলতা ও কল্যাণের কোনো পতাকা রইলো না। অথচ আল্লাহর পতাকা এখনো বিদ্যমান। শুধু অপেক্ষায় আছে কোন হাত তা বহন করার জন্যে এগিয়ে আসে তা দেখার জন্যে। আর কোন জাতি তার অধীনে হেদায়াত, কল্যাণ, সততা ও মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের অভিযানে অভিযাত্রী হতে ইচ্ছুক।

পৃথিবীতে লাভ ও ক্ষতির এই হচ্ছে অবস্থা। তবে আখেরাতের লাভক্ষতির তুলনায় দুনিয়ার লাভক্ষতি নিতান্তই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ব্যাপার। আখেরাতের লাভ ও সাফল্য সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। সেখানে ক্ষতি হলে তাও ন্যায়ভিত্তিক। সেখানে লাভ বা ক্ষতি যেটাই হোক, দীর্ঘমেয়াদী, চিরস্থায়ী এবং বাস্তব। সেখানকার লাভ অর্থই বেহেশ্ত ও আল্লাহর সন্তোষ লাভ। আর ক্ষতি মানেই বেহেশ্ত ও আল্লাহ সন্তোষ খোয়ানো। সেখানে মানুষ হয় সর্বোচ্চ পর্যায়ের পূর্ণতা ও মর্যাদা লাভ করবে, নচেৎ সর্বনিম্ন পর্যায়ের অবমাননা ভোগ করবে, ফলে তার মনুষ্যত্বের এত অধোপতন ঘটবে যে, মানুষ মর্যাদার দিক দিয়ে পাথরের পর্যায়ে নেমে যাবে, কিন্তু শাস্তির দিক দিয়ে সে পাথরের চেয়েও নিচে নেমে যাবে। অর্থাৎ পাথর যতটুকু শাস্তি ভোগ করতে পারবে, সে তাও পারবে না। আল্লাহ বলেন, 'সেদিন মানুষ নিজের কৃতকর্মের দিকে তাকাবে। আর কাফের বলবে, আহা আমি যদি পাথর হয়ে যেতাম!'

এই সূরাটি মানুষের জীবন-পথ নির্ণয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সে বলেছে একমাত্র 'ঈমান, সৎ কাজ, সত্যের উপদেশ আদান-প্রদান ও ধৈর্যের উপদেশ আদান-প্রদানেই সফলতা। এছাড়া আর সব কিছুতেই ব্যর্থতা ও ক্ষতি। পথ মাত্র একটাই। একাধিক নয়। ঈমান, সততা ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা, যা সততা ও সত্যের উপদেশ প্রদান করবে এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সত্যকে সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেবে।

এ পথ একই পথ। এ কারণে রসূল (স.)-এর আমলে দু'ব্যক্তি একত্রে মিলিত হলে তারা বিচ্ছিন্ন হবার আগে একে অপরকে সূরা আল আসর পড়ে শুনাতে ভুল করতো না। এটা শুনানোর পরেই পরস্পরকে বিদায়ী সালাম করতো। তারা আল্লাহর এই সংবিধান মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলো। ঈমান ও সৎ কাজে অংগীকারাবদ্ধ ছিলো। সত্যের উপদেশ ও ধৈর্যের উপদেশ আদান-প্রদানে সংকল্পবদ্ধ ছিলো। এই সংবিধানকে রক্ষা করতে তারা বদ্ধপরিকর ছিলো। এই সংবিধান পালনকারী উম্মাহর সদস্য থাকতে চুক্তিবদ্ধ ছিলো।

সূরা আল হুমাযাহ

আয়াত ৯ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۣ ۝١ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে (সামনে পেছনে মানুষদের) নিন্দা করে, ২. যে (কাঁড়ি কাঁড়ি) অর্থ জমা করে এবং (যথাযথভাবে) তা গুনে গুনে রাখে, ৩. সে মনে করে, (তার এ) অর্থ তাকে (এ দুনিয়ায়) স্থায়ী করে রাখবে, ৪. বরং নির্ঘাত অল্পদিনের মধ্যেই সে চূর্ণবিচূর্ণকারী আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, ৫. তুমি কি জানো, বিচূর্ণকারী আগুন কেমন? ৬. (এ হচ্ছে সম্পদলোভীদের জন্যে) আল্লাহ তায়ালার প্রজ্বলিত এক আগুন, ৭. যা (এতো মারাত্মক যে,) মানুষের হৃদয়ের ওপর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে; ৮. (গর্ত বন্ধ করে) তাদের ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে, ৯. (যেন খুলে না যায় সে জন্যে) উঁচু উঁচু থাম দিয়ে (তা গেড়ে) রাখা হবে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক যুগের পরিস্থিতির একটি বাস্তব দিক এই সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। আসলে প্রত্যেক সমাজের পরিবেশেই এ ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। এক ধরনের সংকীর্ণমনা ছোট লোক অনেক সমাজেই দেখা যায়। তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে নিজের প্রতিপত্তি জমাতে চেষ্টা করে। এ জন্য সে যত নিচে নামা সম্ভব নামে। তারা ভাবে, সম্পদই হলো জীবনের সবচেয়ে মুল্যবান পুঁজি। এর চেয়ে আর কোনো মুল্যবান জিনিস নেই। মানবিক, নৈতিক কিংবা সামাজিক মুল্যবোধ সবই অর্থ-সম্পদের সামনে হেয় ও গৌণ। তারা মনে করে, অর্থের মালিক হতে পারলেই সকল মানুষের মান-মর্যাদা ও মূল্যবোধ বিনা হিসাবে তার করতলগত হবে।

তাফসীর

অর্থ-সম্পদকে এই শ্রেণীর মানুষ সর্বশক্তিমান খোদা বলে মনে করে। কোনো কিছুই তার অসাধ্য নয়। আর যদি তার দৃষ্টিতে কোনো হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলের অবকাশ থেকেও থাকে, তবু সে টাকাকড়ি দিয়ে তারও গতিরোধ করতে পারবে বলে মনে করে। এ জন্য অর্থ লোলুপতায়

তারা গতিসীমার বাধ মানে না। টাকাকে সে অনবরত গুণে আনন্দ পায়। এর পাশাপাশি তার ভেতরে এক ধরনের পাপাসক্ত ও অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তি বিকাশ লাভ করতে থাকে। এই মনোবৃত্তি তাকে মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে পদদলিত করা, পরনিন্দা করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করা, মুখে কুৎসা রটানো, অংগভংগি দ্বারা উপহাস করা, কথায় ও ইংগিতে ব্যাংগ করা অথবা তাদের উপাধি ও প্রতীকগুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, ইত্যকার অপতৎপরতায় প্ররোচিত করে।

এটা মানব চরিত্রের একটা ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট রূপ। মানবতা, ভদ্রতা, সৌজন্য ও ঈমান বিবর্জিত হলেই মানুষের ভেতরে এহেন নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য চালচলন দেখা দেয়। ইসলাম এ ধরনের নিচু মানের মানসিকতাকে ঘৃণা করে। কেননা উন্নত নৈতিকতা তার ভূষণ। সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কটাক্ষপাত, পরনিন্দা ও কুৎসা রটনাকে একাধিকবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে এ সূরায় যেভাবে অতিমাত্রায়, ঘৃণা ও ধিক্কারের সাথে হুমকি ও ধমক দিয়ে এ সবের উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মোশরেকদের পক্ষ থেকে রসুল (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে এ ধরনের একটি বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছিলো, যার জবাবে এখানে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিছু কিছু রেওয়ায়াতে কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেসব রেওয়ায়াত নির্ভরযোগ্য নয়। ওই সব রেওয়ায়াতের মধ্য থেকে যেটুকু আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করেছি, তার উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকছি।

পুঁজিপতিদের জন্যে সাবধান বাণী

এতে যে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, তা কেয়ামতের একটি দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে করা হয়েছে। এতে রয়েছে নির্যাতনের দৈহিক ও মানসিক রূপ এবং আগুনের বাস্তব ও রূপক দৃশ্য। এখানে অপরাধ এবং তার শক্তি দানের পদ্ধতির মধ্যে একটা তুলনা লক্ষণীয়। কথায় ও ইংগিতে নিন্দা ও কটাক্ষকারীর বর্ণনা এরূপ দেয়া হয়েছে যে, মানুষের সাথে ব্যাংগ বিদ্রূপ করা ও তাদের ইযযত-সম্ভ্রব নিয়ে কটূক্তি ও কু-ইংগিত করা তার সার্বক্ষণিক অভ্যাস ও রীতিতে পরিণত হয়। সে অর্থ-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে আর ভাবে যে, ওটা তার জীবন ও সুখ-সম্ভোগের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। একদিকে এই অর্থদর্পী উপহাসকারী প্রতাপশালী ব্যক্তির দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, অপরদিকে সেই হতভাগা ব্যক্তির দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যাকে শোচনীয় অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও তাচ্ছিল্যের 'হুতামায়' নিক্ষেপ করা হবে। আর 'হুতামা' এমন জায়গা, সেখানে যা-ই নিক্ষিপ্ত হয়, তাই ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানেই এই প্রতাপশালী পাপাচারী ব্যক্তিটিরও সকল দর্প, অহংকার চূর্ণ হয়ে যাবে। হুতামা হলো 'আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন।' আগুনকে এভাবে 'আল্লাহর আগুন' বলে সম্বন্ধযুক্ত করা থেকে বুঝা যায় যে, এটা একটা নযীরবিহীন, অসাধারণ ও অকল্পনীয় ভীতিপ্রদ আগুন হবে। যে হৃদয় থেকে মোমেনদের প্রতি ব্যাংগ-বিদ্রূপের ইচ্ছা জাগে, এই আগুন সেই হৃদয়ের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে। ঠাট্টা-তামাশা করার বাসনা ও অহংকারের জন্মস্থানরূপী অন্তকরণকেও তা দগ্ধ করবে। শুধু চরম অবমাননা ও তাচ্ছিল্যের সাথে নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত থাকা হবে না, বরং এই আগুনকে তার ওপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে, যাতে কেউ তাকে উদ্ধার করতে না পারে এবং সেও কাউকে কোনো অনুরোধ করতে না পারে। গরু, গাধা ইত্যাদিকে যেমন রশি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়, তাকেও তেমনি বেঁধে রাখা হবে। সূরাটিতে একধিক শব্দে 'তাসদীদ' প্রয়োগ দ্বারা আযাবের কঠোরতা ও নির্মমতাকে অধিকতর ব্যাগময় করা হয়েছে। আর একাধিক

'তাকীদ' সূচক পদ ব্যবহার করে এই আযাবের অবধারিত ও সুনির্দিষ্ট হওয়া বুঝানো হয়েছে। প্রথমে সংক্ষেপে ও অস্পষ্টভাবে বর্ণনা দান, তারপর ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ ও ভীতিপ্রদ করে তুলে ধরার জন্য প্রশ্ন করা, তারপর জবাব দিয়ে ব্যাখ্যা দান,-এ সব কিছু মিলে এই আযাবকে অতি মাত্রায় ভয়ংকর, আতংকজনক ও অবধারিত রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। 'ওয়ায়লুন (সর্বনাশ বা ধ্বংস) 'অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে' 'হুতামা', 'আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন' যা হৃদয় পর্যন্ত ঢুকে যাবে, তা তাদের ওপর আবদ্ধ থাকবে, খুঁটির সাথে বাঁধা থাকবে' এ সব উক্তির মধ্যে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর সার্বিকভাবে এ সূরায় এক ধরনের শৈল্পিক ও চেতনাগত সমন্বয় রয়েছে, যা 'ব্যংগ-বিদ্রূপ ও কটাক্ষকারী'দের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কোরআন নাযিল হওয়ার সময়ে একদিকে যেমন সে ইসলামের দাওয়াতের নেতৃত্ব দিতো, অপরদিকে তেমনি দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীকেও পর্যবেক্ষণ করতো। কোরআন ছিলো একাধারে ধারালো অস্ত্র এবং কুচক্রীদের চক্রান্ত নস্যাত করার বজ্রনিনাদিত হুংকার। এই হুংকারে সে শত্রুদের হৃদয়কে কাঁপিয়ে দিতো, আর মোমেনদের হৃদয়কে প্রশান্ত করতো ও প্রবোধ দিতো।

এ সূরায় যে ভংগিতে আল্লাহ তায়ালা প্রতিবাদ করেছেন ও জবাব দিয়েছেন তাতে আমরা দুটি তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি।

প্রথমত নৈতিক অধপতনের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার দান এবং এই নিচ মানসিকতার নিন্দা।

দ্বিতীয়ত মোমেনদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান এবং তাদের মনে যাতে অপমানবোধ প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আর সেই সাথে তাদেরকে এ কথা উপলব্ধি করানো যে, তাদের সাথে যা কিছু আচরণ সংঘটিত হচ্ছে, তা তিনি দেখেছেন, অপছন্দ করছেন এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এর মাধ্যমে এই মর্মেও ইংগিত দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের আত্মাকে এ সব হীনমনাসুলভ চক্রান্তের অনেক উর্ধে রাখবেন।

সূরা ফীলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সূরা ফীলে আখেরী নবী মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র আরব ভূখন্ডকে তাঁর সর্বশেষ সুমহান জ্যোতিকে উদ্ভাসিত করার জন্য পূর্বাহ্নেই নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। এ ঘটনা থেকে আরো ইংগিত পাওয়া যায় যে, আরব ভূখন্ড থেকেই বিশ্বব্যাপী হেদায়াতের আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং জাহেলিয়াতের মুলৎপাটন করে সত্য কল্যাণের প্রভায় স্নাত হবে গোটা বিশ্ব-নিখিল।

আসহাবে ফীলের ঘটনা

বিভিন্ন রেওয়ায়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, ইয়েমেনে পারস্য শাসনের অবসানের পর আবরাহা নামক একজন ইথিওপিয়ান (হাবশী) শাষন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

আবরাহা ইয়েমেনে ইথিওপিয়ান শাসকের নামে স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ এক সুবিশাল গীর্জা নির্মাণ করে। তার উদ্দেশ্য ছিলো যে, মক্কার পবিত্র বায়তুল্লাহর পরিবর্তে আরবসহ সকল দেশের অধিবাসীরা যেন এ গীর্জাকেই যেয়ারতের কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে এবং তীর্থস্থান হিসাবে সবাই যেন এখানেই আসে সে আরো আশা করেছিলো যে, এ গীর্জা সমগ্র আরবের কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের কারণে আরব উপদ্বীপের প্রধান তীর্থকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। আর উত্তর ও দক্ষিণের সকল অধিবাসীরাই দলে দলে এখানে ছুটে আসুক। রাজার কাছে তার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুমোদন কামনা করে সে একটি চিঠিও পাঠায়। কিন্তু আরবদের দৃষ্টি পবিত্র বায়তুল্লাহকে পরিত্যাগ করে তার নবনির্মিত গীর্জার প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হলো না।

আরবরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরসূরী হিসাবে দাবী করতো। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর নির্মিত বায়তুল্লাহকে পবিত্র ঘর হিসাবে এর মর্যাদা ও সম্মানের সংরক্ষণ এবং এর ঐতিহ্যকে ধরে রাখাকে নিজেদের জন্য অত্যন্ত গৌরবজনক বলে মনে করতো। তারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের তীর্থভূমির চেয়ে ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হওয়া ও তাদের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল্লাহর সুউচ্চ গৌরব ও মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখাকে তাদের পবিত্র দায়িত্ব মনে করতো। বায়তুল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়া বা এর পতন ও বিপর্যয় সাধনের চিন্তা তাদের কাছে ছিলো অকল্পনীয়। তারা সকল আহলে কেতাবের চেয়ে কাবার রক্ষক ও তার প্রতিবেশী হিসাবে নিজেদেরকে অধিক সম্মানের অধিকারী মনে করতো।

এমতাবস্থায় আবরাহা তার নির্মিত গীর্জার গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি না পেয়ে কাবাঘরের ধ্বংস সাধন, একে ধূলিস্মাৎ করা ও কাবা থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। আবরাহা তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ৬০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে কাবাঘর ধ্বংসের অভিযানে রওয়ানা হলো। আবরাহা রওয়ানা দেয়ার পরআরবরা এ সংবাদ শুনেও ফেললো। 'যুনফর' নামক এক অভিজাত ইয়েমেনী নেতা আবরাহার এ অভিযান প্রতিরোধ ও বায়তুল্লাহর ধ্বংস থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য তার নিজের গোত্র ও বিভিন্ন গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আবরাহার সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু যুদ্ধে যুনফর ও তার বাহিনী আবরাহার মোকাবেলায় পরাজয় বরণ করে ও যুনফর আবরাহার হাতে বন্দী হয়।

এরপর পথিমধ্যে আরবের দুটি প্রসিদ্ধ গোত্র ও বিপুল সংখ্যক আরবদেরকে সাথে নিয়ে নুফাইল ইবনে হাবীব আল খাসয়ামী আবরাহার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে এ বাহিনীও পরাজিত হয়

এবং নুফাইল বন্দী হয়। এমনিভাবে এ সকল খন্ডযুদ্ধে আবরাহার বিজয়ের কারণে আরবদের মনে আরো আতংক সৃষ্টি হয়।

অতপর আবরাহা বাহিনী তায়েফের নিকটবর্তী সাকীফ গোত্রের এলাকায় এলে বনু সাকীফ তাদের দেবতা 'লাত'-এর জন্য নির্মিত মন্দিরকে তাদের হাত থেকে হেফাযতের জন্যে আবরাহা বাহিনীকে সহযোগীতা করলো। বনু সাকীফের নেতা আবরাহা বাহিনীকে মক্কার পথ প্রদর্শনের জন্য তার গোত্র থেকে একজন রাহবারও তাদের সাথে দিয়ে দেয়।

একজন মোশরেকের ঈমানী দৃঢ়তা!

আবরাহা অগ্রসর হয়ে তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান মুগাম্মাসে অবস্থানকালীন 'তেহামা' ও 'কোরায়শ'সহ বিভিন্ন' গোত্রের কয়েকশত গৃহপালিত পশু চারণভূমি থেকে নিয়ে যায়। এই পশুসমূহের মধ্যে আবদুল মোত্তালেব ও বনু হাশেমের দু'শত উটও ছিলো। আবদুল মোত্তালেব ছিলেন কোরায়শদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও গোত্রপতি।

কোরায়শ, কেনানা ও হুযায়ল গোত্রের লোকেরা প্রথমত আবরাহা বাহিনীর মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এতো বড়ো বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে পরাস্ত হতে হবে মনে করে তারা তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে।(১)

মক্কায় প্রবেশ করে অবরাহা এ মর্মে দূত পাঠায় যে, সে শুধু কাবা ঘর ধ্বংসের জন্যই এসেছে, যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। সে মক্কাবাসীকে এটাও জানাতে চায় যে, কাবার প্রতিরক্ষার জন্যে যদি মক্কাবাসী মোকাবেলায় লিপ্ত না হয়; তাহলে রক্তপাতের কোনো ইচ্ছা তার নেই। আবদুল মোত্তালেব আবরাহার দূতের সাথে আলোচনার পর তাকে জানান যে, আল্লাহর কসম, আবরাহার সাথে যুদ্ধের কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই, তার সাথে যুদ্ধ করার শক্তিসামর্থও আমাদের নেই। এটি আল্লাহর পবিত্র ঘর ও ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মিত। আল্লাহই এর রক্ষাকর্তা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘরকে রক্ষা করতে চাইলে তিনিই তা রক্ষা করবেন। আর যদি তিনি তাঁর ঘরকে রক্ষা না করেন, তবে আল্লাহর কসম, অন্যথায় প্রতিরোধের কোনো শক্তিই আমাদের নেই। আবরাহার দূতের সাথে আলোচনার পর আবদুল মোত্তালেব নিজেও আবরাহার কাছে যান।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আবদুল মোত্তালেব তৎকালীন সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন ও সুঠাম দেহের অধিকারী। আবরাহা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এমনকি তাকে নিচে বসিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে থাকাও সমীচীন মনে করলো না। আবরাহা আবদুল মোত্তালেবের সম্মানে সিংহাসন থেকে নেমে বিছানায় বসে পড়লো এবং আবদুল মোত্তালেবকে তার পাশেই বসালো।

তারপর আবরাহা তার দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইলো, কোরায়শ সরদার আবদুল মোত্তালেবের আগমনের উদ্দেশ্য কী? আবদুল মোত্তালেব বললেন, আমার উট ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। আবদুল মোত্তালেবের কথা শুনে আবরাহা বললো, হে কোরায়শ নেতা। আমি আপনাকে দেখে প্রথম মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আপনাকে খুবই প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি বলেই ধারণা করেছিলাম, কিন্তু আপনার কথা আমার সমস্ত ধারণাকেই পাল্টে

(১) বিভিন্ন তাফসীর থেকে জানা যায় যে, আবরাহা বাহিনীতে ৬০ হাজার সৈন্য ও ১৩টি হস্তি ছিলো।-সম্পাদক

দলো। আপনি আপনার উটের প্রসংগটাই আমার কাছে উত্থাপন করলেন, অথচ আপনি ও আপনার পূর্ব পুরুষদের সম্মানিত ঘর ও আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র কাবাঘরের প্রসংগটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন! যে ঘর ধ্বংস করার জন্য আমি এসেছি, সে প্রসংগে কোনো কথাই আপনি উত্থাপন করলেন না? আবরাহার এ প্রশ্নের জবাবে আবদুল মোত্তালেব বললেন, হে রাজা! আমি উটের মালিক, তাই আমি উটের প্রসংগ উত্থাপন করেছি। কাবার মালিক তো আমি নই। তাই কাবা রক্ষার দায়িত্বও আমার নয়, কাবা ঘরের যিনি মালিক, তিনিই তার ঘর রক্ষা করবেন।

আবরাহা বললো, আমার হাত থেকে কাবা ঘর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মোত্তালেব বললেন, এ ব্যাপারে আপনার সাথে কাবার মালিকের সাথেই বুঝাপড়া হবে। এই আলাপ আলোচনার পর আবরাহা আবদুল মোত্তালেবের উটগুলো ফেরত দেয়।

আব্দুল মোত্তালেবের দোয়া

আবদুল মোত্তালেব ফিরে এসে সবার কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ তুলে ধরলেন। আবদুল মোত্তালেব মক্কাবাসীকে ঘরবাড়ী ছেড়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পর্বত চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন। মক্কা নগরী থেকে রেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে আবদুল মোত্তালেব আরও কিছু সংখ্যক কোরায়শসহ কাবার দরজায় কণ্ঠলগ্ন হয়ে অশ্রু বিগলিত নয়নে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কথিত আছে, আবদুল মোত্তালেব তখন আবেগ ভরা কণ্ঠে নিম্নোক্ত কবিতা গুচ্ছ আবৃত্তি করছিলেন,

'হে প্রভু! বান্দা তার নিজ ঘরকে রক্ষা করে
তুমি তোমার ঘরকে রক্ষা করো।
কাল যেন তোমার ঘরের ওপর ক্রুশ ও তাদের অভিযান বিজয়ী না হয়।
তুমি যদি আমাদেরকে ও তোমার ঘরকে এমনি ছেড়ে দিতে চাও
তাহলে সেটা হবে তোমার ব্যাপার, তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।'

শেষ পর্যন্ত আবরাহা যখন তার সমস্ত সৈন্য ও হস্তিবাহিনী নিয়ে কাবাঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো তখন তার হাতিগুলো আকস্মিকভাবে থমকে দাড়ালো, হাতিগুলোকে সামনে আগানোর জন্যে অনেক চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও এ হাতিগুলো এক পাও অগ্রসর হলো না।

হাতির এ আচরণ বোখারী শরীফে বর্ণীত রসূলুল্লাহ (স.)-এর একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে ওমরার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রসূল (স.) যখন ১৪০০ সাহাবীকে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হন, তখন হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর আল্লাহর রসূলের উট আর মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ উটগুলো অবাধ্য হয়ে গেছে, ওরা মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। রসূল (স.) বললেন, উট অবাধ্য হয়নি- অবাধ্য হওয়ার জন্য ওদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি বরং হস্তিবাহিনীর বন্ধনী তাদেরকে আটকে দিয়েছে।(২)

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণীত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (স.) মক্কা বিজয়ের দিন দশ হাজার সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা মক্কাকে হস্তিবাহিনী থেকে হেফাযত করেছিলেন, আর তাঁর রসূলকে ও মোমেনদেরকে বিজয়ীর বেশে প্রবেশের সম্মান দান করেছেন। মক্কা নগরীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা সেদিন যেমনি অপরিহার্য ছিলো, আজও তেমনি

---

(২) প্রকৃত পক্ষে ঐ বছর রসূল (স.) মক্কা গিয়ে ওমরাহ করতে পারেননি,হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পর পরের বছর গিয়ে ওমরাহ করেছেন।-সম্পাদক

অপরিহার্য। তোমরা যারা আমার যবান থেকে একথাগুলো শুনছো, তারা যারা এখানে অনুপস্থিত তাদের নিকট অবশ্যই এ কথাগুলো পৌঁছে দিও।'

উল্লেখিত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে হস্তিবাহিনীর ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

আবরাহা বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা

অতপর আল্লাহ তায়ালা শুধু হাতির পা'গুলোকেই স্তব্ধ করে দিলেন না, বরং আবরাহা সহ পুরো বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্যে পাথরসহ দলে দলে আবাবীল পাখী পাঠালেন। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী মুখে ও পায়ে পাথর নিয়ে আবরাহা বাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করতে লাগলো। পাথরের আঘাতে তাদের অবস্থা জন্তু জানোয়ারের চর্বিত ঘাষপাতার মতো হয়ে গেলো। তারা চর্বিতচর্বণে পরিণত হলো। যার বর্ণনা আল কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে।

আবরাহা নিজেও পাথরের আঘাত থেকে বাচতে পরলোনা। সে তার দলবল নিয়ে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ইয়েমেনের রাজধানী 'সানা'য় গিয়ে পৌঁছে, পরে সে তার হৃদয় বিদীর্ণ অবস্থায় মারা যায়।

এ ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা রয়েছে- পাখী ও পাথরের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কেও নানা ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

মোট কথা, বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এক অলৌকিক এবং অস্বাভাবিক অতি প্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা হস্তিবাহিনীর ধ্বংস সাধন করেন। কেউ কেউ বলেন, পাথরকুচি নিক্ষেপের ফলে এক ধরনের জটিল চর্ম রোগের সৃষ্টি হয়ে তাদের শরীরে পচন ধরে তারা মৃত্যুবরণ করে। ওই বছর মক্কায় ভীষণ চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। কেউ কেউ পাখী বলতে মশা মাছি, আর পাথর কুচি বলতে মশা-মাছির ছড়িয়ে দেয়া রোগ জীবাণুকে বুঝিয়েছেন। কেননা পাখি বলতে বুঝায় যা পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। মশা মাছিও পাখা ছড়িয়ে উড়ে বেড়ায়।

ইমাম মোহাম্মাদ আবদুহু তার লিখিত তাফসীরে লিখেছেন, আবদুল মোত্তালেবের দোয়ার পরদিন ব্যাপকভাবে চর্ম ও খুজলী-পাঁচড়া রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ইকরামা বলেন, হস্তিবাহিনীর এ ঘটনার মাধ্যমে আরব দেশে মহামারী আকারে চর্ম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ইয়াকুব ইবনে ওৎবা বর্ণনা করেছেন, এই ঘটনার বছরেই আরব দেশে চর্মরোগ, খুজলী-পাঁচড়া মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করে। সে এমন ধরনের জটিল ও কষ্টদায়ক চর্ম রোগ, যাতে প্রথম এক ধরনের খুজলীর মতো ওঠে, পরে তা পচে গলে চামড়া ঝরে পড়তে থাকে, তার পর খসে পড়া অংশ থেকে রক্ত পুঁজ নির্গত হতে থাকে এবং রুগ্ন ব্যক্তির দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও দুর্গন্ধময় হয়ে যায় আর তিলে তিলে যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এমনি ভাবে পাথরকুচি নিক্ষেপের ফলে আবরাহা ও তার সেনাবাহিনীর দেহে পচন ধরে। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার সময় অনেকেই পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করে। আবরাহা ক্ষতবিক্ষত দেহে 'সানায়' উপস্থিত হওয়ার পর মারা যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে অধিকাংশের মতে এটিই বিশুদ্ধ মত যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী দ্বারা নিক্ষিপ্ত পাথরকুচি দেহে পড়ার সাথে সাথে সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং বাতাসের মাধ্যমে বিষাক্ত জীবাণুর সংমিশ্রণে আহত ব্যক্তি বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে।

কারো কারো মতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে এ মর্মও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এ পাখীকুল মশা, মাছিও হতে পারে, যারা বিভিন্ন রোগ-জীবাণু বহন করে ঘুরে বেড়ায়। এ সকল

জীবাণু পাকা মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলো আর ছোট ছোট পাখীর দল মাটির ক্ষুদ্র কণা জীবাণুসহ হস্তিবাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করে। পাখিদের নিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরা থেকে বায়ুমন্ডলীয় প্রবাহের সাথে মানব দেহের লোমকূপে প্রবেশ করে এক মারাত্মক ধরনের ক্ষত ও চর্ম রোগের সৃষ্টি করে। তখন পচন ধরা সেই দেহগুলো ক্ষতবিক্ষত হয় এবং পুঁজ ও রক্ত নির্গত হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যায়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ ক্ষুদ্র প্রাণীকুল যুগে যুগে আল্লাহর শক্তিশালী সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করে আসছে। খোদাদ্রোহীদের বিনাশ সাধনে আজও এদের তৎপর হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহান কুদরতে ক্ষুদ্র পাখীদের দ্বারা শত্রুকে বিনাশ সাধন করতে পারেন, 'আসহাবে ফীল'-এর ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ ঘটনার তাৎপর্য এও হতে পারে, পর্বত চূড়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী এসে পাথরকুচি নিক্ষেপের ফলে তাদের ধ্বংস সাধিত হয়। আল্লাহর সৈনিক তো সবাই হতে পারে। সৃষ্টির প্রতিটি পরতে পরতে তাঁরই অস্তিত্বের নিদর্শন বিরাজমান। প্রকৃতির জগতের প্রতিটি অণু-পরামাণু সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ শুধু একজন। সমগ্র সৃষ্টিতে এমন কোনো শক্তিও নেই যা আল্লাহর শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। বিদ্রোহী আবরাহা তার সকল শক্তি নিয়ে আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতে এলে আল্লাহ তায়ালা পাথরকুচিসহ ক্ষুদ্র পাখি প্রেরণ করে আবরাহা ও তার দলবলকে মক্কা নগরীতে প্রবেশের আগেই ধ্বংস করে দিলেন।

এ ছিলো আল্লাহর এক বড়ো ধরনের অনুগ্রহ, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর শেষ নবী (স.) ও তাঁর ঘরের ও হেরেমের মর্যাদাকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যদি সে মুহূর্তে তাঁর ঘরের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ না করতেন, তাহলে আবরাহার হস্তিবাহিনী মক্কাবাসীসহ বায়তুল্লাহকে ধ্বংস করে দিতো। পুরো ঘটনার এ তাফসীরকেই আমরা নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ তাফসীর হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এছাড়া অপরাপর ব্যাখ্যাকে নানাবিধ সুনির্দিষ্ট দলীল-প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণ করা ও তার বিশুদ্ধতাকে মেনে নেয়া যায় না, যদিও বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে সর্বাধিক বিশাল বপুর অধিকারী হাতিকে আল্লাহর ক্ষুদ্র পক্ষীকুল ও পাথরকুচি দ্বারা ধ্বংস সাধনের ব্যাপারটিও সত্যিই বড় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর!

আমরা এর কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না যা মোহাম্মদ আবদুহু তার তাফসীরে পার্থীব চক্ষু, চোখ ও পায়ের মাটির সাথে জীবাণু ছড়িয়ে চর্ম রোগের প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমে হস্তিবাহিনীর ধ্বংস হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ ইকরামার রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ হাতি ও আরোহীদের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে এবং তাদের দেহ চর্বিত চর্বনের মতো ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেছে এবং সূরার শেষ আয়াতে যাকে 'কা-আসফিম মা'কূল' বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো চর্বিত চর্বণের মতো হয়ে যাওয়া। এ পন্থায়ও আল্লাহর কুদরতের উপলব্ধি আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা খুবই কঠিন।

আল্লাহ তায়ালা যে কোনো পদ্ধতিতে তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষের পরিচিত পন্থায় উন্মুক্তভাবেই যদি কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান, ধ্বংস করতে পারেন। অথবা মানুষের অপরিচিত অকল্পনীয় ও অদৃশ্যভাবে তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে পারেন। তিনি তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। তিনি কোনো নিয়মের অধীন নন, বরং তাঁর গৃহীত পন্থাই হলো আসল নিয়ম।

আল্লাহ তায়ালার নিয়ম তো তাই, যা তিনি করেন। আল্লাহর গৃহীত পন্থা, মানুষের চির পরিচিত হওয়া, মানুষের শক্তি-সামর্থ ও অনুভূত-ও বোধগম্য হওয়া মোটেই জরুরী নয়। আল্লাহ তায়ালা যদি চিরাচরিত পরিচিত পদ্ধতির বিপরীত অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক পন্থায়ও কোনো কিছু করেন, তবে তাকেই আল্লাহর গৃহীত পন্থা ও পদ্ধতি হিসাবে মেনে নিতে হবে। যারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে না, অথবা যারা বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে এ ঘটনার নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে চায় তাদের কারও মতামতকে আমরা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারি না।

কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ওহী দ্বারা ঘটনার বিস্ময়তা ও অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হয়। অথচ তা মানুষের সমাজে প্রচলিত পরিচিত সাধারণ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের সমাজে প্রচলিত, পরিচিত নিয়ম ও ধারণা বহির্ভূত হলেই যে তা আল্লাহর নিয়ম ও সামর্থের বাইরে হবে তা নয়। সূর্যের প্রতিনিয়ত উদয়াস্ত, মানবদেহের অভ্যন্তর থেকে জীবিত মানব শিশুর প্রসব, এ সকল ঘটনাও তো মানুষের নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতা বহির্ভূত, অথচ তা মানুষের দৃষ্টিতে চির পরিচিত ও সব সময় তা ঘটছে। তাই আল্লাহ তায়ালা যদি ক্ষুদ্র পাখী ও পাথরকণা দ্বারা কোনো শক্তিধর শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত ও পর্যদুস্ত করেন, তবে মহা শক্তিমান আল্লাহর জন্য তা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তিনি যদি ক্ষুদ্র পাখি ও পাথরকুচি দ্বারা কোনো বাহিনীকে মহামারীর মতো ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত করে ধ্বংস সাধন করেন, এটি তাঁর জন্য খুবই সহজতর। তিনি নির্দিষ্ট সময় বিস্ময়কর ঘটনার মাধ্যমে মানব সমাজে সাধারণ প্রচলিত নিয়মের বিপরীত পন্থায় তাঁর ঘরের সংরক্ষণ ও প্রতিরোধকল্পে অলৌকিক পদ্ধতিতে যদি পাখী ও পাথরকুচি দ্বারা শত্রু বাহিনীর দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে থাকেন, তবে তা আল্লাহর গৃহীত সফল পদক্ষেপ এবং তাঁ তার জন্য সহজ। এসবই তাঁর অসীম কুদরতের প্রমাণ বহন করে।

ঘটনার তাৎপর্য

এ ঘটনাকে আমরা যদি অলৌকিকত্বের কারণে গ্রহণ করতে ইতস্তত করি এবং পাখি ও পাথরকুচির আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে নানা ধরনের অভিমত পোষণ করি তবে এর পূর্বেও তো আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের শত্রুদেরকে ও বিভিন্ন নবীদের দাওয়াত অস্বীকার করার কারণে অনেক অম্প্রদায়কে অলৌকিক পন্থায় ধ্বংস সাধন করার ঘটনাবলির অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই কালামে পাকের মধ্যে। আমরা সে সকল ঘটনাকে কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করবো? প্রকৃত মানবীয় শক্তি ও সামর্থের দৃষ্টিতে যা সসীম মানুষের শক্তি ও সামর্থ বহির্ভূত বলে অনুভূত হয়, অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহর পক্ষে তা খুবই স্বাভাবিক ও সহজতর।

আমরা অত্যন্ত সহজভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ঘরের হেফাযতের লক্ষে মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল সংরক্ষণের জন্য তাঁর অসীম কুদরতের মাধ্যমে মানবীয় দৃষ্টিতে অলৌকিক পদ্ধতিতে অভিযানকারীদেরকে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত ও নবুওতের অস্বীকারকারী কোরায়শ সম্প্রদায়কে এ ঘটনা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের ইংগিত প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের বিরোধীদের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে অনায়াসে ব্যর্থ ও পর্যদুস্ত করে দিতে সক্ষম। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো বড়ো ধরনের প্রস্তুতি ও শক্তিশালী কোনো মাধ্যম ও উপায় উপকরণের প্রয়োজন নেই। সকল যুগের মানুষের সামনে তাঁর কালজয়ী অসীম কুদরতের দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করেছেন।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওতের দাওয়াতের সূচনালগ্নেই কোরায়শদের চোখে আংগুল দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন যে, কি বিস্ময়কর ও অকল্পনীয়ভাবে তিনি তাঁর দ্বীনের ও তাঁর ঘরের হেফাযতের জন্য বিরোধী ও চক্রান্তকারী শক্তিকে কতো সামান্য ও ক্ষুদ্র শক্তির মাধ্যমে চিরতরে পরাস্ত করে দিতে পারেন, পরাজিত, চূর্ণবিচূর্ণ, ক্ষতবিক্ষত, নিশ্চিহ্ন ও নাস্তানাবুদ করে দিতে পারেন। তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য কোনো পরিচিত পদ্ধতি ও পন্থা গ্রহণ করা তাঁর জন্য জরুরী নয়। তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি এক ও একক শক্তিমান।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা সূরা ফীলের সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে শায়খ আবদুহুর ব্যাখ্যাকে কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারি না। বিশেষ করে, মহামারী আকারে মাটির সাথে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার ফলে চর্মরোগ সৃষ্টি হয়েছে এ ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করা হয় তবে কোরআনে হাকীমে বর্ণীত পাখীদের বয়ে আনা পাথরকুচির আঘাতে সেনাবাহিনীর দেহ ক্ষতবিক্ষত, চুর্ণবিচুর্ণ, হৃদয় দীর্ণবিদীর্ণ ও চর্বিত চর্বনে পরিণত হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনাকে গ্রহণ করা যায় না। অথচ কোরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে- 'কা-আসফিম মা'কূল'। এ আয়াতে তাদের দেহ খন্ড-বিখন্ড চূর্ণ বিচূর্ণ ও চর্বিত চর্বণের পরিণত কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণীত হয়েছে।

ইকরামার বর্ণনায় সে বছর প্রথম বারের মতো মক্কায় চর্মরোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট নয়। সূরা 'ফীলে' বর্ণীত আয়াতে আবরাহা ও তার সেনাদলের মধ্যে চর্মরোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার কথাও পরিস্কারভাবে বলা হয়নি। এমন কি তৎকালীন সময়ে আরবে চর্মরোগে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটি ঐতিহাসিক বর্ণনায়ও সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। শায়খ আবদুহু বিষয়টি বৈষয়িক বিশ্লেষণ ও প্রচলিত নিয়মের বিপরীত হওয়ার কারণেই কিছুটা হীনমন্যতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন সে প্রতিষ্ঠানটি তথাকথিত আধুনিক প্রগতিবাদীদের বিকৃত চিন্তা থেকে মুক্ত ছিলো না। সে প্রতিষ্ঠানে তথাকথিত যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দেয়া হতো। তৎকালীন সময়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বিকৃত চিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিলো। কোরআনে কারীমের সব কিছুকে যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করার মানসিকতা ছিলো এই প্রতিষ্ঠানের সাথেজড়িত ব্যক্তিদের অন্যতম বৈশিষ্ট। বুদ্ধি ও যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য মনে না হলেই কোরআনের আয়াতসমূহকে ইহুদীদের বানোয়াট গল্প কাহিনীর প্রলেপ ছড়িয়ে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের বানোয়াট ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদানের প্রবণতা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো। তৎকালীন সময়ে হাদীস অস্বীকার করার প্রবণতাও কিছু লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আল কোরআনকে বৈষয়িক দর্শন ও তথাকথিত যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমকালীন বিজয়ী সমাজ দর্শন ও প্রকৃতি দর্শনের ভিত্তিতে তারা কোরআনের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। তাদের চিন্তা স্থুলদৃষ্টি ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ইসরাইলী ও খৃষ্টীয় চিন্তাধারা দ্বারা সংক্রামিত হয়।

প্রত্যেক ব্যাপারে জড়বাদী ব্যাখ্যার মননশীলতার কারণে, শায়খ আবদুহু ও তার দু'জন সেরা ছাত্র শায়খ রশীদ রেজা ও শায়খ আবদুল কাদের মাগরেবী অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক অতি প্রাকৃতিক স্থুলবুদ্ধি ও জড় দর্শনের ইন্দ্রিয়াতীত অদৃশ্যমান ঘটনাসমূহকে অস্বীকার অথবা বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আল কোরআনের ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাদের এ আত্মরক্ষামূলক মানসিকতা গড়ে ওঠে, আর এ কারণেই উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত চিন্তাবিদরা ইসলামের নবতর ব্যাখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এমনিভাবে তারা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা সংশ্লিষ্ট মূল বক্তব্যের ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে উপলব্ধি না করা গেলেও কোরআনের বর্ণীত বহু অলৌকিক ঘটনা আল্লাহর অসীম কুদরত ও সর্বশক্তিমান সত্ত্বারই প্রমাণ উপস্থাপন করে।

মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

এ সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে খুবই প্রজ্ঞা ও সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। বিশেষ করে তথাকথিত আধুনিক চিন্তাধারা থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারেও গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এখানে এটি অত্যন্ত নিখুত, নির্ভুল ও নিরাপদ পদ্ধতিতে আল কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের দৃষ্টিভংগিই প্রমাণিত হয়। এ বিস্ময়কর ও অভিনব পদ্ধতিতে আল্লাহর ঘরের হেফাযত ও অলৌকিকভাবে শত্রু নিপাতের ঘটনাকে উপস্থাপন ও প্রমাণ করাই হচ্ছে আলোচ্য সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই কোরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্যকে প্রচলিত বুদ্ধি-বিবেক ও স্থুলদৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে কোনো বিষয় বুঝে না আসলে তা অস্বীকার করা কিছুতেই আমাদের জন্য বৈধ ও সংগত হতে পারে না। আল্লাহর গৃহীত কার্যক্রম ও পদক্ষেপকে সবসময়ই সাধারণ নিয়মের নিরিখে বিচার ও বিশ্লেষণ করা যায় না। আর কোরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর পদ্ধতিও গ্রহণযোগ্য নয়, বরং আমাদের বুদ্ধি-বিবেক, যোগ্যতা, প্রতিভা ও সাধনাকে আল্লাহ প্রদত্ত ভাষ্যকে স্বপ্রমাণিত করার জন্যই নিয়োগ ও ব্যয় করা উচিত। এ পদ্ধতিতে আল্লাহর প্রতি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ও আমাদের ঈমানী শক্তি আরও মযবুত ও বৃদ্ধি পেতে পারে। আমাদের চিন্তা ও ভাষা, আমাদের অনুভূতি ও প্রজ্ঞাকে সামষ্টিকভাবে আল্লাহর ভাষ্যকে প্রমাণিত করার জন্য আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্থুলবুদ্ধি, যুক্তি, আবেগ ও উচ্ছাসকে আমাদের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে গ্রহণ না করে ঈমান ও একীনের বুনিয়াদেই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া অপরিহার্য। আল কোরআনের সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ভাষ্যের আলোকেই বিশ্ব প্রকৃতির ঘটনাসমূহ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত ঘটনা, মানবিক চিন্তা ও মূল্যবোধ, স্থুল বুদ্ধির পরিবর্তে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোরআন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান দ্বারা আল কোরআন তথা অসীম কুদরতময় আল্লাহ তায়ালার ভাষ্যকে বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করার মানসিকতা কখনও গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত হতে পারে না। কেননা মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি খুবই সীমাবদ্ধ ও মানুষের বিশ্লেষণ শক্তি ও অভিজ্ঞতা একান্ত সসীম।

মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক যদিও জ্ঞান-সাধনা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ও ভূমিকার অধিকারী এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধি-চিন্তা ও গবেষণা খুবই বিস্ময়কর অবদান রাখে, তথাপি প্রকৃত বিশ্লেষণ, তথ্যানুসন্ধান ও সত্য আবিস্কারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রেও মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান বারংবার ভুলের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে থাকে। মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক প্রসূত অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়েও ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হতে পারে। কেননা মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞান খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আল্লাহর অসীম জ্ঞানের সাথে মানবীয় জ্ঞানের কোনো প্রকার তুলনা বা উপমাই হতে পারে না।

আল কোরআনের প্রদত্ত জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত সে অসীম প্রজ্ঞাময় সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, তাই মানুষের জ্ঞান পিপাসা সে অসীম সত্ত্বার প্রস্রবণ থেকে নিসৃত স্বচ্ছ জ্ঞান সুধা দ্বারা মিটতে পারে। পিপাসা কাতর মানুষ একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত আল কোরআনের আবে হায়াতের পেয়ালা পান করেই অতৃপ্ত হৃদয়ের সকল ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালা নিবারণ করতে পারে। তাই কোরআনে উপস্থাপিত কোনো ঘটনা, তথ্য ও তত্ত্বকে মানুষের স্থুল-বুদ্ধি বিবেকের সাথে সংঘাত ও সংঘর্ষশীল মনে করে তাকে অস্বীকার করা বা তার অপব্যাখ্যা করা আল কোরআনের প্রতি বিশ্বাসের দাবীদার কোনো মানুষের পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব হতে পারে না। বস্তুত, কোনো মোমেনেরই এ অধিকার নেই। অথচ স্থুল বুদ্ধি বিবেকের পর্যালোচনায় আল কোরআনের উপস্থাপিত অনেক ঘটনা ও ভাষ্যকে সংঘাত ও সংঘর্ষশীল মনে করে উপরোল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা প্রদানের অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।

তাদের এ সকল ব্যাখ্যাকে আমি তাদের ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তি ও বিকৃত চিন্তার ফলশ্রুতি কিনা সে সম্পর্কে আমি মন্তব্য করবোনা, কিন্তু অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এসকল ক্ষেত্রে তারা মানুষের বুদ্ধি বিবেককে আল কোরআনের ওপর প্রাধান্য প্রদান করেছেন, যুক্তি ও বুদ্ধিকে কোরআনের নিয়ন্ত্রক শক্তির আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা কোনো মতেই আল কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও ভাষ্যের পরিপন্থী এ ধরনের বুদ্ধি ও যুক্তির আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে গ্রহণ করতে পারি না। আল কোরআনের সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন বক্তব্য ও ভাষ্যের পরিপন্থী ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা মোমেনের জন্যে অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয়। আমাদের প্রত্যয়দীপ্ত সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা কখনো এ ধরনের অপব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে না। এ ধরনের প্রবণতাকে প্রশ্রয় প্রদান করা মুসলিম জাতিসত্ত্বার অবলুপ্তি ও ইসলামী জীবনবোধ ও চেতনার অপমৃত্যুরই নামান্তর। এ ধরনের মন-মানসিকতা, চিন্তা ও কল্পনা প্রকৃতপক্ষে আল কোরআনের পেশকৃত সত্য তথ্য ও ঘটনারাজিকে অস্বীকার করার শামিল।

আসুন এখন আমরা এ দীর্ঘ আলোচনা পরিহার করে সূরা আল ফীলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং প্রকৃত ঘটনার প্রতি আলোকপাত করি।

সূরা আল ফীল

আয়াত ৫ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ
تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. তুমি কি দেখোনি তোমার মালিক (কা'বা ধ্বংসের জন্যে আগত) হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন? ২. তিনি কি (সে সময়) তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেননি? ৩. এবং তিনি তাদের ওপর (ঝাঁকে ঝাঁকে) আবাবীল পাখী পাঠিয়েছেন, ৪. এ পাখীগুলো (এ সুসজ্জিত) বাহিনীর ওপর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করছিলো। ৫. (অতপর) তিনি তাদের জন্তু জানোয়ারের চর্বিত (ঘাস পাতা)-এর মতো করে দিলেন।

তাফসীর

প্রথম আয়াতটিতে একটি প্রশ্নবোধক বাক্যের দ্বারা এক অভিনব, বিস্ময়কর ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সে অদ্ভুত ঘটনা তৎকালীন সমাজের প্রতিটি লোকের কাছেই প্রসিদ্ধ ও পরিজ্ঞাত ছিলো। এমনকি যে বছর এ ঘটনা ঘটে, তা ইতিহাসের উৎস হিসাবে গৃহীত হয়েছিলো। সে সমাজের লোকেরা কোনো ঘটনার সন তারিখ উল্লেখ করতে গিয়ে এমনিভাবে বলতো- 'অমুক ঘটনাটি 'আমুল ফীলে' (হস্তি বছরে) ঘটেছিলো।' অথবা বলতো 'আমুল ফীলের' দু'বছর পূর্বে অমুকের জন্ম হয়েছিলো, অমুকের বিয়ে হয়েছিলো, অমুক ঘটনা ঘটেছিলো।' অথবা 'আমুল ফীলের ১০ দশ বছর পর অমুক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো।'

এ কথাও সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ যে, মোহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহও (আল্লাহর রাসুল) 'আমুল ফীলে' জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত, এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা প্রচ্ছন্ন ইংগিত রেখেছিলেন যে, যেভাবে রসূলের জন্মের বছরে হস্তিবাহিনীর ধ্বংসের মাধ্যমে আল্লাহর ঘরকে তিনি হেফাযত করেছিলেন, তেমনি পরবর্তী পর্যায়ে রসূলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘরকে রক্ষা করবেন এবং গোটা বিশ্ব থেকে শেরেক, বেদয়াত ও পৌত্তলিকতার প্রাধান্যকে দূরীভূত করে তাওহীদের পতাকাকে সমুন্নত করবেন। আল্লাহর ঘর থেকে মূর্তি অপসারণ করে তাকে এক আল্লাহর এবাদাতের কেন্দ্র হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (স.) কে সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার প্রশ্নের মাধ্যমে তৎকালীন আরব সমাজের প্রত্যক্ষদর্শী লোকদের সামনে আল্লাহ তায়ালা এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, তোমরা কি হস্তিবাহিনীর ঘটনা প্রত্যক্ষ করোনি? এতো বড়ো একটি শিক্ষণীয় ও বিস্ময়কর ঘটনাকে এতো স্বল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা ভুলে গেলে? উল্লেখিত প্রশ্নবোধক বাক্যটির পরই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা হস্তিবাহিনীর সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে ব্যর্থ করার চিত্র তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন, 'তোমরা কি ভুলে গেছো যে, আমি হস্তিওয়ালাদেরকে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার সুযোগ দেইনি! আমি তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তজালকে ছিন্নভিন্ন, ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দিয়েছি? তারা যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে বায়তুল্লাহর ধ্বংস সাধনের জন্যে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করতে এসেছিলো আমি কি তাদের সে চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেইনি?

কোরায়শদের প্রতি আল্লাহর করুনা

আলোচ্য আয়াতে কোরায়শ সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর সীমাহীন নেয়ামতের দিকেও ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে কোরায়শ সম্প্রদায়, তোমরাই তো আল্লাহর এ পবিত্র কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারীর দায়িত্বে ছিলে। এ ঘরের বিনাশের জন্য হস্তিবাহিনী যখন অভিযান পরিচালনা করেছিলো, তোমাদের প্রতিরোধ করার মতো কোনো শক্তি ও সামর্থ ছিলো না, তখন একমাত্র তিনিই তাঁর ক্ষমতাবলে সে ঘরকে রক্ষা করলেন। তোমরা কি এ থকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর কতো বড়ো রহম করেছেন? তিনি নিজে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে হস্তিবাহিনীর সকল উদ্দ্যোগ ও অভিযানকে ব্যর্থ ও ধূলিস্যাৎ করে দেননি?

অসহায় দুর্বল শক্তিহীন কোরায়শ গোত্র বিশাল শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হস্তিবাহিনীর মোকাবেলা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো এবং আল্লাহর ঘরের হেফাযতের দায়িত্ব ওই সময়ে পরম নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে মহাশক্তিমান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করেছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার প্রতি অশেষ করুণা প্রদর্শন করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কাবা ঘরের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আনজাম দিয়েছিলেন। যাতে করে রসূলের দাওয়াতের সূচনায় (ঘটনার চারদশক পরে) কোরায়শরা হস্তিবাহিনীর ঘটনার স্মৃতি মন্থন করে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, আজকে যদি আমরা মোহাম্মাদ (স.)-এর উপস্থাপিত দাওয়াতে তথা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতকে অস্বীকার করি ও বিরোধিতা করি, তবে আজকে মোহাম্মাদ (স.) ও তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা স্বল্পতা সত্তেও আল্লাহ তায়ালা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাঁর দ্বীনের হেফাযতের এন্তেযাম করে আমাদেরকে হস্তিওয়ালাদের মতো ধ্বংস, বিপর্যস্ত ও পর্যদুস্ত করে দিতে পারেন। আজ থেকে চার দশক পূর্বে যে শক্তিমান সত্ত্বা তাঁর ঘরের হেফাযতের জন্য অলৌকিক ও বিস্ময়কর এবং এক অভিনব পন্থায় তাঁর ঘরের হেফাযত করেছেন আজও তাঁর হাবীব, তাঁর প্রতি বিশ্বাসী স্বল্পসংখ্যক মোমেন ও তাঁর প্রদত্ত দ্বীনের হেফাযতের জন্য তেমনি বিস্ময়কর পন্থায় তাঁর দ্বীনের বিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্র চক্রান্তকে অনায়াসে ব্যর্থ করে দিতে পারেন।

যেমনভাবে তিনি বায়তুল্লাহর শত্রুদের নিপাত করেছেন, তেমনিভাবে আল্লাহর রসূলের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও যারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও প্রচারে লিপ্ত রয়েছে

তাদের সকল প্রচেষ্টাকে আল্লাহ তায়ালা তেমনি ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দিতে পারেন। যারা আজ আল্লাহর রসূল ও তাঁর উপস্থাপিত দাওয়াতের বিরুদ্ধে হস্তিবাহিনীর মতো প্রতিরোধ গড়ে তুলছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের দাওয়াতের প্রতিরোধ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আজও তেমনি শক্তিমান।

'আবাবীল' একদল পাখী আর 'সিজ্জীল' মূলত দু'টি ফার্সি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হচ্ছে 'হিজারাতিন'- পাথর, অপরটি হচ্ছে 'সিজ্জীল'- মাটি অথবা এ শব্দের অর্থ হলো মাটি সংমিশ্রিত পাথরকুচি। আর 'আসফ' শব্দের অর্থ হচ্ছে ছিন্ন পাতা বা ঘাস বা ঘাষপাতার চর্বিতচর্বণ। কোনো পশু ঘাসপাতা প্রথমবার চিবানোর পর ঘাসের যে অবস্থা হয় তদ্রূপ অবস্থা। পশু ঘাসপাতা দাঁতে চিবিয়ে জাবর কাটলে যে রূপ ধারণ করে ঠিক তদ্রূপ। 'আসফ' শব্দ থেক পশুর ভক্ষণকৃত ঘাসপাতার রূপই বর্ণনা করা হয়েছে। জীব জন্তুর দাতে কাঁটা ও চিবিয়ে চর্বনে পরিণত করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা পাখীদের বয়ে আনা মাটি মিশ্রিত পাথরকুচি হাতি ও সোনাবাহিনীর দেহে বা মস্তিষ্কে পড়ার পর তাদের চর্ম ও অস্থি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও খন্ড-বিখন্ড হওয়ার অবস্থা ও রূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে যে শিক্ষা পাই

আর এ ঘটনার মধ্যে যে শিক্ষা, উপদেশ ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তা অত্যন্ত ব্যাপক। প্রথমত, এর দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর পবিত্র ঘরের হেফাযতের কাজকে মোশরেকদের সহযোগিতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। যদিও তারা বায়তুল্লাহর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা পোষণ করতো, এ ঘরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও খেদমত করতো।

প্রচন্ড শক্তিমান শত্রুর হাত থেকে কাবাকে রক্ষা করার ভার যখন মোশরেকরা একমাত্র আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করলো, তখন আল্লাহ তায়ালা শত্রুর হাত থেকে বায়তুল্লাহকে রক্ষা করার জন্য কোনো মোশরেকের হাতের পরশ লাগাতে দিলেন না। মূর্তিপূজারীদের দ্বারা তাঁর ঘরের হেফাযতে কোনো প্রকার সহযোগিতা নিলেন না, জাহেলীয়াতের তিমীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন কোরায়শদেরকে তাঁর ঘরের হেফাযতের সকল প্রকার উদ্যোগ ও সংশ্রব থেকে দূরে রাখলেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বয়ং অলৌকিক ও অভিনব পন্থায় তাঁর ঘরের দুশমনদের ধ্বংসাভিযানকে প্রতিহত করলেন। সর্বশেষ আয়াত দু'টির এই ব্যাখ্যাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত, রসূলের আগমনের বছরে আল্লাহর ঘরকে তাঁর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হেফাযতের কালক্ষণ মক্কাবাসী যেন আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন স্বচক্ষে দেখতে পায় এবং নির্দ্বিধায় ও নিসংকোচে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতকে কবুল করে, এমন এক পরিবেশ ও ক্ষেত্র এই ঘটনার মাধ্যমে আগে থেকেই প্রস্তুত করেছেন। এ থেকে মক্কার মোশরেকদের প্রতি এ ইংগীতও করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যেমন তাঁর নিজস্ব কুদরত ও ব্যবস্থাপনায় তাঁর ঘরের হেফাযতের এন্তেযাম করেছেন ঠিক তেমনভাবেই তাঁর দ্বীন, রসূল ও দ্বীনের অনুসারীদের হেফাযত করার কুদরত ও ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে। ঠিক একই পন্থায় তিনি তাঁর দ্বীনের বিরোধীশক্তি ও শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে পারেন।

এ ঘটনার মধ্যে এ শিক্ষা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ঘর বায়তুল্লাহ ও মক্কার পবিত্র ভূমির ওপর আহলে কেতাবদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদান করবেন না; যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইয়েমেনের খৃষ্টান রাজা আবরাহা ও তার সেনাবাহিনীকে কাবাঘর ও মক্কাভূমির পবিত্রতা, এর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার ওপর আধিপত্য

প্রতিষ্ঠা করতে দেননি, দুনিয়ার কোনো পৌত্তলিক, কোনো ত্রিত্ববাদী শক্তিকে আল্লাহ তায়ালা জয়ী করবেন না। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীদের সকল শক্তি ও প্রভাব বলয় থেকে তিনি তাঁর এ ঘর ও ভূমিকে পবিত্র ও মুক্ত রাখবেন। কোনো বাতেল শক্তি তাঁর দ্বীন, তাঁর ঘর, ও এ পবিত্র ভূমিতে তাদের কোনো পরিকল্পনা ও কৌশলকে বাস্তাবায়িত করতে পারবে না। এ ঘটনার বছরে যে নবী জন্ম গ্রহণ করেছেন সে নবীর উপস্থাপিত দ্বীনকেও নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করার যে কোনো চক্রান্তকে আল্লাহ তায়ালা তেমনিভাবে নস্যাত করে দেবেন যেমন করে খৃষ্টান রাজা আবরাহার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দিয়েছিলেন।

আজকের বিশ্বের মুসলিম উম্মাহও এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষা ও প্রত্যয় গ্রহণ করতে পারে যে, 'আমুল ফীল' তথা হস্তি বছরে জন্মগ্রহণকারী নবী মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের বিরুদ্ধে আজ খৃষ্টান, ইহুদী, পৌত্তলিক, নাস্তিক ও মোরতাদদের যে দুনিয়া জোড়া ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত পরিচালিত হচ্ছে এ সকল অভিশপ্ত সম্মিলিত শক্তির সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত অবশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাদের কোনো ষড়যন্ত্র, চক্রান্তকে তিনি সফল হতে দেবেন না। তাদের সকল অভিযানই বিফল হয়ে যাবে। যে আল্লাহ তায়ালা সেদিন ইহুদী, পৌত্তলিক ও খৃষ্টান শক্তির আক্রমণ থেকে তাঁর ঘর হেফাযত করেছেন। সে আল্লাহ তায়ালা আজও তাঁর ঘর, তাঁর দ্বীন, তার রসূলের নগরীকে সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

এ ঘটনার তৃতীয় শিক্ষা ও তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, নবী করীম (স.)-এর আবির্ভাব ও 'আমুল ফীলের' ঘটনার পূর্বে সারা দুনিয়ার আরবদের কোনো প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো না। কোনো শাসন বা কোনো সুগঠিত রাষ্ট্রক্ষমতাও তাদের ছিলো না। এমন কি হেজায ও ইয়েমেনও আরবদের শাসনাধীন ছিলো না। ইয়েমেন ছিলো পারস্যের অথবা ইথিওপিয়ার খৃষ্টান শাসনের অধীন। সিরিয়া সরাসরি ছিলো গ্রীকদের অধীন অথবা গ্রীক নিয়ন্ত্রিত শাসনের অধীনে। গোত্রীয় শাসনাধীন সংঘাতময় জীবন অথবা অস্থিতিশীল যাযাবর জীবন ব্যবস্থাই গোটা আরবে প্রচলিত ছিলো। আন্তর্জাতিক বিশ্বে আরবরা কোনো শক্তি হিসাবেই বিবেচিত হতো না। প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল যাবত তারা গোত্রীয় সংঘাত ও যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। সাধারণ ঘটনা নিয়ে এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে অব্যাহত চার দশক যাবত মরণপণ যুদ্ধে কাটিয়ে দিয়েছিলো। বিভিন্ন গোত্রের সমন্বয়ে একক ভাবে কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করে বসবাস করার কোনো ব্যবস্থা তারা কখনও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

হস্তিবাহিনীর এই বিপর্যয়ের খবর আরবরা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলো। দুর্দান্ত শক্তিশালী এক বাহিনীর এ নিদারুণ পতন ও চরম ধ্বংসের খবরশুনে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। 'আমুল ফীলে' জন্মলাভকারী নবী করীম (স.) আনীত ধর্ম ইসলামের ভিত্তিতে এক সময় গোত্র ও বর্ণবৈশম্য মুক্তি একটি আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করলে মুসলমান তথা আরবদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমগ্র দুনিয়া ছড়িয়ে পড়লো।

আরবদের উত্থান পতন

ইসলামী জীবনবোধ, ঐতিহ্য ও চেতনাকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রদর্শন ও স্থিতিশীল পদ্ধতি কায়েম হলো। কতো রাজ্য ও সিংহাসন আরবদের পদতলে লুটিয়ে পড়ে ইসলামের সমুন্নত পতাকাতলে সমবেত হলো।

ইসলামের প্রদীপ্ত জ্যোতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো। জাহেলী যুগের বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি লাভ করে বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলো। জাহেলী যুগের সকল তমসা, অন্যায়, অবিচার, যুলুম, নির্যাতন, সংকীর্ণতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, হানাহানি ও বিদ্বেষ দূরীভূত হলো। তারা সকল কুসংস্কার ও কূপমন্ডুকতাকে পরিহার করে নিজেদেরকে একমাত্র মুসলিম হিসাবে পরিচয় প্রদানের বৈশিষ্ট অর্জন করলো। তারা মানবপ্রেম, মানব কল্যাণ, শান্তি ও রহমতের মহান আদর্শের দীক্ষা গ্রহণ করলো। মানব রচিত সকল ধর্ম, দর্শন ও মতবাদের আবর্জনা ও জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে তারা ওহীভিত্তিক জীবনাদর্শ ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে বিশ্ব নেতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। বিশ্বের বৃহত্তম রাজশক্তি, গ্রীক সাম্রাজ্য ও পারস্য তাদের পদানত হলো। গ্রীক ও পারস্যের দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে বিভিন্ন রাজ্য ও ভূখণ্ড, জাতি ও সম্প্রদায় আরবদের আনুগত্য স্বীকার করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

আরবরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান পয়গাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করলো। এক আল্লাহর পথে জেহাদের পতাকা সমুন্নত করে তারা মানব জাতিকে মানুষের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহর গোলামে পরিণত করলো।

পার্থিব স্বার্থের সংকীর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন করে অনন্ত আখেরাতের কল্যাণ, মুক্তির উদারতার পথে মানবজাতিকে পরিচালিত করলো। মানব রচিত মতবাদের যুলুম নির্যাতন থেকে রেহাই পেয়ে মানুষ ইসলামের ইনসাফ, সুবিচার ও মুক্তির পথ খুঁজে পেলো। ইসলামের নিশানবরদার হওয়ার কারণে সমকালীন বিশ্বের সর্বত্র আরবদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আরবদের হস্তগত হলো। এ সব কিছু আরবদের গোত্রীয় প্রাধান্য বা আরব জাতীয়তাবাদের জন্য নয়; বরং একমাত্র আল্লাহর রেযামন্দি হাসিলের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে জেহাদের অবতীর্ণ হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছিলো। যতোদিন আরব জাতি এ মহান ঐতিহ্য, আদর্শ ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, ততোদিনই বিশ্ব নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে শক্তিমান জাতি হিসাবে তারা অধিষ্ঠিত ছিলো। আরবরা যতোদিন ইসলামী নীতিমালার অনুসারী ছিলো, আল্লাহ তায়ালাও ততোদিন তাদেরকে তাঁর সৃষ্টির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন।

যখন আরবরা তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামী ঐতিহ্য ও জীবনধারার অনুসরণকে পরিহার করলো, ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার পরিবর্তে আরব জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও জাহেলী বিদ্বেষ পুনপ্রবর্তন করলো তখনই তারা বিশ্বনেতৃত্ব থেকে অপসারিত হলো। মানব জাতিও তাদেরকে বর্জন করলো।

মুসলিম জাতি যখনই আল্লাহকে ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, আল্লাহ তায়ালাও তখন তাদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে সারিয়ে দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব নির্ভর করছে একমাত্র ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ওপর। ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মানব জাতির ওপর মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না। মানব জাতির ওপর আরবদের তথা মুসলিম উম্মাহর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ ছিলো ইসলামী চিন্তাদর্শন ও জীবনবোধের অধিকারী হওয়া। পরবর্তীকালে আদর্শিক পতন ও বিপর্যয়ের কারনেই বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় মুসলিম ও আরবদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ করেছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে আদর্শ ছাড়া যে সকল সম্প্রদায় বিভিন্ন সময় অস্ত্র বলে বলীয়ান হয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা খুব বেশী দিন তাদের ক্ষমতাকে আকড়ে ধরে রাখতে পারেনি। বারবার ও তাতারীরা ধ্বংসের তান্ডবলীলার মাধ্যমে গোটা বিশ্বব্যাপী তাদের দাপট ও ক্ষমতার আলোড়ন সৃষ্টি করে ছিলো বটে, কিন্তু এর মাধ্যমে খুব বেশী দিন তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। অপরদিকে পিরানিজ থেকে আল আলপ্স পর্বতমালা আর ভুমধ্যসাগর ও আটলান্টিকের উপকূল থেকে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত আরব তথা মুসলমানদের দীর্ঘস্থায়ী প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব একমাত্র ইসলামী জীবনদর্শনের ও চিন্তাধারার প্রভাবেই সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর যখন ইসলামী জীবন ধারাকে তারা বর্জন করলো তাদের চিন্তা-বিশ্বাস ক্রিয়াকান্ড থেকে ইসলামী ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও জীবন ধারার প্রভাব স্তিমিত হয়ে গেলো, যখন তারা সে আদর্শ, চিন্তাধারা ও জীনবোধকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা থেকে বিরত হলো, তখন পৃথিবীতে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তো দূরের কথা, মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত তারা খুজেঁ পেলো না। ইতিহাসে তাদের কোনো স্থানই হলো না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুন কোনো ইতিহাস তারা সৃষ্টি করতে পারলোনা। কোনো যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করার মর্যাদা থেকে তারা বঞ্চিত রয়ে গেলো।

আজ যদি আরব তথা মুসলিম উম্মাহ আবার পুনর্জাগরণের প্রত্যাশী হয়ে থাকে, তাদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্বকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় তবে অবশ্যই তাদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে স্মরণ করে ইসলামকে পুনরায় বাস্তবজীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ ছাড়া তাদের মর্যাদা ও অস্তিত্ব সংরক্ষণের বিকল্প কোনো পথ নেই। মনে রাখতে হবে, যাবতীয় গোমরাহী থেকে রক্ষা করে হেদায়াতের সমুজ্জল পথ কেবল আল্লাহ তায়ালাই দেখাতে পারেন।

সূরা কোরায়শ

আয়াত ৪ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ

هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (কা'বার পাহারাদার) কোরায়শ বংশের প্রতিরক্ষার জন্যে, ২. তাদের প্রতিরক্ষা শীত ও গরমকালের সফরের জন্যে, ৩. তাদের এ ঘরের মালিকেরই এবাদাত করা উচিত, ৪. যিনি ক্ষুধায় তাদের খাবার সরবরাহ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয় ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হযরত ইবরাহীম (আ.) পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ করে তা পরিস্কার -পরিছন্ন করার পর আল্লাহ তায়ালার দরবারে যে দোয়া করেছিলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ.)-এর সব দোয়াই কবুল করেছিলেন। তিনি আল্লাহর নিকট এ আরযি পেশ করেছিলেন, 'হে আমার প্রভু! তুমি এ নগরকে নিরাপদ নগরীতে পরিণত করো। আর এর অধিবাসীদেরকে ফলমূল, বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য এবং যাবতীয় জীবনধারণ সামগ্রীর প্রাচুর্য দ্বারা সমৃদ্ধ করো।'

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর প্রিয় খলীলের দোয়া কবুল করে পৃথিবীর সকল রাজা-বাদশাহ ও সকল শক্তিধর এবং অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে এ ঘরকে বরাবর পবিত্র ও মুক্ত রেখেছেন। যারা আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়-তাদের জন্য এ ঘরকে নিরাপত্তার কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। আর এ ঘরের আশেপাশের প্রতিটি ঘরকেও ভয় ভীতি ও ক্ষতি থেকে তিনি নিরাপদ রেখেছেন। এমন কি এ পবিত্র ঘরের ইযযতের কারণে এর প্রতিবেশীরা শেরেক, কুফর ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং এ ঘরের প্রভুর এবাদাতকে পরিহার করা সত্ত্বেও আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা তাঁর ঘরের মর্যাদার খাতিরে তাদেরকেও ক্ষতি ও ভীতি থেকে মুক্ত রেখেছেন।

এমনকি কোরায়শরা এ ঘরের মালিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এ ঘরে শত শত মূর্তি স্থাপন করা সত্ত্বেও এ ঘরের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হস্তিবাহিনীর হাত থেকে কোরায়শ ও বায়তুল্লাহকে নিরাপদ রেখেছেন। এর হেফাযত করে এ ঘরের মান-মর্যাদাকে রক্ষা করেছেন। সূরা ফীলের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে হাকীমের অপর আয়াতে এরশাদ করেছেন, 'তোমরা কি দেখোনি? আমি (আল্লাহ) এ হারামকে (বায়তুল্লাহকে) নিরাপদ করেছি, অথচ এর আশেপাশে মানুষের ওপর ছোবল মারা হয়।'

তাফসীর

'আমুল ফীলে' অনুষ্ঠিত হস্তিবাহিনীর ঘটনা কোরায়শ তথা আরববাসীর নিকট এ ঘরের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করলো। সমগ্র আরব উপদ্বীপে এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হলো। এ ঘর ও এ ঘরের কারণে এর প্রতিবেশীদের নিরাপত্তার এ ধারণা মানব মনে আরও সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল হয়ে গেলো। কাবার মর্যাদার কারণে কোরায়শদের মর্যাদাও ও আরব ভূখন্ডে বৃদ্ধি পেলো। কোরায়শদের প্রভাবও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। নিরাপদে চলাফেরা তাদের জন্য সহজতর হলো। সর্বত্র প্রতি ও সম্মান প্রদর্শন বেড়ে গেলো।

উত্তর ও দক্ষিণ তথা ইয়েমেন ও সিরিয়ায় তাদের জন্য বাণিজ্যের পথ আরো উন্মুক্ত হয়ে গেলো। শীতকালে দক্ষিণে (ইয়েমেনে) তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সফর করতো' আর গ্রীষ্মকালে উত্তরে (সিরিয়ায়) তাদের বাণিজ্যিক সফর পরিচালিত হতো। আবরাহার ধ্বংসাভিযান থেকে বায়তুল্লাহ এবং কোরায়শ সম্প্রদায় নিরাপদে মুক্তি লাভের পর সমস্ত আরব ভূখন্ডে তাদের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এমনকি তাদের প্রতি ঈর্ষা ও শত্রুভাবাপন্ন গোত্রসমূহের মধ্যেও অভাবনীয়ভাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাদের কষ্টকর বাণিজ্যিক সফরও তাদের জন্য নিরাপদ ও লাভজনক হয়ে গেলো। প্রকাশ্যভাবে কোরায়শ সম্প্রদায় এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হলো। তাদের সামনে জীবন ধারণের উপায়-উপাদানের প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত হলো। কাবার মর্যাদার কারণে তাদের রেযেকের প্রশস্ততাও বৃদ্ধি পেলো। তারা অকল্পনীয় নিরাপত্তা, শান্তি এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে একটি বিশেষ সম্মান করলো।

তারা উত্তর ও দক্ষিণ অর্থাৎ ইয়েমেন ও সিরিয়ার সর্বত্রই বাণিজ্যিক সফরে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এমনিভাবে লাভজনক বাণিজ্যিক সফর তাদের প্রিয় অভ্যাসে পরিণত হলো। তাই এ দু'সফরের প্রতি দুর্বলতার কথাই আল্লাহ তায়ালা সূরা কোরায়শের 'শীত ও গ্রীষ্মকালীন দু'সফরের প্রতি' আসক্তির কথা দ্বারা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া তাদের বাস্তব জীবনে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে প্রতিফলিত করেছেন তার বাস্তব নযীর স্থাপিত হলো।

আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী 'সূরা ফীলে' ও সূরা 'কোরায়শে' কোরায়শ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর এ অপার অনুগ্রহের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

কোরায়শদের বিশেষ মর্যাদা

শীত ও গ্রীষ্মের বাণিজ্যিক সফরে কোরায়শদেরকে বিশেষ সুযোগ দানের মাধ্যমে তাদের রেযেকের প্রশস্ততার ক্ষেত্রেও আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা তাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তিনি স্মরণ করিয়েছেন। বিভিন্ন নগর ও জনপদে তাদের নিরাপদ ভ্রমণ, তাদের জীবন ও জীবিকার সহজতর ব্যবস্থা, ভীতিমুক্ত নিরাপদ পরিবেশ, মরুভূমির পরিবেশেও তাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থায় জীবিকা অর্জনের উপায়, ঘরে ও বাইরে তাদের শান্তিপূর্ণ নিরাপদ অবস্থানের অনুগ্রহের কথা এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কাবা ঘরের ইযযত ও মর্যাদার কারণে তাদের ঘরে ও বাইরে কিভাবে অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করেছেন, তাদেরকে সকল শত্রুর ক্ষতি দুশমনী হ'তে হেফাযত করেছেন, সে সকল অনুগ্রহের প্রতি এ সূরায় ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কোরায়শদের মানসপটে তাঁর এ সকল অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে চাইছেন তারা যেন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে গায়রুল্লাহর পূজা-উপাসনা ও পরিহার করে একমাত্র লা শরীক আল্লাহর এবাদাতে মশগুল হয়ে যায়। তাদের অন্তরে যেন এ বিশ্বাস ও চেতনা জাগ্রত হয় যে, এ ঘরের তিনিই প্রভু-এ ঘরের প্রতিবেশী হওয়ার কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে আহার বিহার ও নিরাপদ জীবন যাপনের সুযোগ দান করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা কোরায়শদেরকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াতে বলেছেন, শীত ও গ্রীষ্মে তাদের হৃদয়ে তিনি সফরের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যাতে করে তারা এ ঘরের মালিকের এবাদাত ও বন্দেগীতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, যার ফলে তাদের হৃদয়ে শীত ও গ্রীষ্মে সফরের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আর তাদের জীবন যাপনের যে সকল বস্তু সামগ্রী ও রসদ প্রয়োজন এ বাণিজ্যিক সফরের মাধ্যমে তারা তা পেয়ে যাচ্ছে। তাই আল্লাহর এ সকল অনুগ্রহের কারণে তাদের অবশ্যই আল্লাহর বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা উচিত– যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে আহারের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। তাদেরকে ভয়ভীতি থেকে মুক্ত করে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। অথচ বৃক্ষ-তরুলতাহীন আরবের মরুভূমিতে স্বাভাবিকভাবে আহার বিহারের ব্যবস্থার অভাবে ক্ষুধার তাড়নায় তাদের অস্থির হওয়ার কথা। দুর্বল ও শক্তিহীন অবস্থায় এবং জীবনের নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকার কথা। আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে তাদের স্মৃতিতে এ দৃশ্যই জাগ্রত করতে চেয়েছেন।

আল্লাহর এ সকল অনুগ্রহকে স্মরণ করে তাদের অন্তর বিনয় ও লজ্জায় অবনত হয়ে আল্লাহর দিকে রুজু হোক। তারা যেন কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর ঘরের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে ভুলে না যায়। তারা যেন তাদের জীবনের কোনো পর্যায়েই সে কঠিন বিপদকালীন অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনার স্মৃতিকে ভুলে না যায় যে, এ পবিত্র ঘরের মর্যাদা, বরকত ও ইযযতের কারণেই আল্লাহ তায়ালা আবরাহার হস্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমন থেকে এ ঘরের হেফাযত করেছেন।

আবদুল মোত্তালেব সে চরম বিপদের সময় সম্পূর্ণ নিরূপায় অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছে, বিনয় ও নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর হাতে তাঁর ঘরকে সোপর্দ করেছে, একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করেছে। সে সময়ে আবদুল মোত্তালেব অপর কোনো শক্তির ওপর নির্ভর না করে একমাত্র আল্লাহর দিকেই 'রুজু' হয়েছে। এ ঘরের সংরক্ষণের জন্য এ ঘরের প্রভুর কাছেই দোয়া করেছে।

সে মুহূর্তে কোরায়শ গোত্রপতি আবদুল মোত্তালেব এমন কোনো কথা উচ্চারণ করেনি যার দ্বারা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তির ওপর নির্ভশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। আবদুল মোত্তালেব তখন কোনো দেবতা বা মূর্তির স্মরণাপন্ন হয়নি; এমন কথা বলেনি যে, আমাদের অমুক দেবতা, অমুক দেবী, অমুক মুর্তি ক্রোধান্বিত হয়ে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, অমুক দেব দেবী এ ঘরের হেফাযত করবে, বরং আবরাহার কাছে আবদুল মোত্তালেব অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় এ বাক্যই উচ্চারণ করেছে, 'উটের মালিক আমি, তাই তা ফেরত দানের দাবী নিয়েই আমি এসেছি। আর কাবার মালিক যিনি তিনিই তাঁর ঘরকে রক্ষা করবেন।'

কিন্তু এর পর দেখা যাচ্ছে যে, জাহেলী মন-মানসিকতা কোনো যুক্তির ধার ধারেনা। অজ্ঞতা ও গোঁড়ামি কখনও যুক্তিনির্ভর নয়। অজ্ঞতা কখনও মানব প্রবৃত্তিকে সত্যের পথে পরিচালিত করে না। অজ্ঞতা কখনও বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার প্রতি আকৃষ্ট করে না। বস্তুত, অজ্ঞতা পশুত্বেরই নামান্তর।

যদিও মাঝখানে তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ) সংযোজনের ফলে সূরা কোরায়শ সূরা 'ফীল' থেকে পৃথক ও একটি স্বতন্ত্র সূরা হিসাবেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। নয়তো উভয় সূরারই প্রতিপাদ্য ও আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন। তাই আলাদা আলাদা সময়ে অবতীর্ণ হওয়া সত্তেও বিষয়বস্তুর অভিন্নতার কারণে বিন্যাস ও সংযোজনের ক্ষেত্রে উভয় সূরাকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। সংকলনকালীন সময়ে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্পৃক্ততার কারণেই সূরা 'ফীলের' পরেই সূরা 'কোরায়শকে' সংযোজন ও সংকলন করা হয়েছে।

সূরা আল মাউন

আয়াত ৭ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا

يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ

صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۝٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. তুমি কি সে ব্যক্তির কথা (কখনো) ভেবে দেখেছো, যে শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করে, ২. এ তো হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে (নিরীহ) এতীমকে গলাধাক্কা দেয়, ৩. মেসকীনদের খাবার দিতে কখনো সে (অন্যদের) উৎসাহ দেয় না; ৪. (মর্মান্তিক) দুর্ভোগ রয়েছে সেসব (মোনাফেক) নামাযীর জন্যে, ৫. যারা নিজেদের নামায থেকে উদাসীন থাকে, ৬. তারা (যাবতীয়) কাজকর্ম শুধু প্রদর্শনীর জন্যেই করে, ৭. এবং ছোটোখাটো জিনিস পর্যন্ত (যারা অন্যদের) দিতে বারণ করে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি কারো কারো মতে রসূল (স.)এর মক্কী যেন্দেগীতে অবতীর্ণ হয়েছে আর কারো কারো মতে তাঁর মাদানী যেন্দেগীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কারো কারো বর্ণনা মতে প্রথম তিনটি আয়াত মক্কী জীবনে ও পরবর্তী চারটি আয়াত মদীনার জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে। 'ফী যিলালিল কোরআন-এর' মতে শেষোক্ত মতটিই গ্রহণযোগ্য। সূরাটি আগাগোড়া একই ধরনের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে এ ধারণাই প্রবলভাবে অনুভূত হয় যে, সূরার সমস্ত আলোচনাই মাদানী জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ সূরায় মাদানী জীবনে প্রকাশিত বিভিন্ন ব্যাধি ও দুর্বলতা সংশোধনের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

যেমন মুসলিম উম্মাহর সামষ্টিক জীবনধারায় 'মোনাফেকী' 'রিয়া' ইত্যাদি ব্যাধির উল্লেখ রয়েছে। আর স্বভাবতই এ ধরনের দুর্বলতা ও ব্যাধি মদীনার জীবনেই প্রকাশ পেয়েছে। মক্কী জীবনে এর প্রকাশ ঘটেনি। এমনকি এ ধরনের দূর্বলতা ও মানসিক ব্যাধি মক্কী জীবনে পরিচিতিও লাভ করেনি। অথচ প্রথম তিনটি আয়াতে যে বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে, তা থেকে তা মক্কী জীবনের সাথে বেশী সম্পৃক্ত বলেই অনুভূত হয়। কেননা, তাতে আখেরাতে বিচার দিবসের প্রতি

অবিশ্বাসীদের আচরন ও ক্রিয়াকান্ডের কথা উল্লেখ হয়েছে। আর পরবর্তী আয়াতে মদীনার জীবনের ক্রিয়াকান্ড, আচরণ ও দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে সামঞ্জস্য ও মিলের কারণেই পূর্ববর্তী তিনটি আয়াত ও পরবর্তী চারটি আয়াত একই সূরায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখন আমরা এ সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও মহান শিক্ষার আলোচনার দিকে অগ্রসর হতে পারি।

সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াত সম্বলিত এ ছোট্ট সূরাটিতে এক ব্যাপক ও বিশাল বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও চরিত্রে যে বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান আসে, এ সূরায় সুস্পষ্টভাবে তা নির্ণীত হয়েছে। ইসলামী জীবনদর্শন ও পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় মানব চরিত্র ও আচরণের যে সকল কল্যাণধর্মী গুণাবলী সৃষ্টি করে এবং যে সকল মহৎ গুণাবলী মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে সুষমামন্ডিত করে তোলে তার বিশদ বর্ণনা এসেছে। অপরদিকে দ্বীন ও আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের চরিত্র ও আচরণ কতো জঘন্য হতে পারে, তারা মানুষের প্রতি কতো নিষ্ঠুর ও নির্মম হতে পারে, আবার কপট বিশ্বাসী ও প্রদর্শনীমূলক মানসিকতা নিয়ে যারা ভন্ডধার্মিকতা, লোক দেখানো ও লেফাফাদুরস্তির ভান করে তারা মানুষের প্রতি কতোটা নির্দয় হয়, কতোটা অসহযোগিতামূলক আচরণ করে, এ সকল দিকই এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। সবশেষে রসূল প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে কল্যাণধর্মী সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক শান্তির সমাজ ও রহমতের সমাজ আল্লাহ রব্বুল আলামীন গড়ে তুলতে চান, তার এক বাস্তব চিত্র এ ছোট্ট সূরাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঈমানের বাস্তব রূপরেখা

এ সূরায় যে মহান শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে, দ্বীন ইসলাম কোনো সংকীর্ণ, অনুদার ও প্রদর্শনীমূলক লোক দেখানো মতাদর্শ নয়। আর এটি শুধু নিছক প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠান ও রীতি নীতি সর্বস্ব ধর্মও নয়। ইসলাম নিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্ততা বর্জিত কোনো জীবনদর্শন নয়'। বরং একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া, পরম নিষ্ঠা, একাগ্রচিত্ততা, আন্তরিকতা ও আত্মসমর্পনের আদর্শ ইসলাম। এ নিষ্ঠা, একাগ্রচিত্ততা, আন্তরিকতা ও একমাত্র আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পনের মানসিকতা এ জীবনবোধের অনুসারীদেরকে কতো সৎকর্মশীল করে তুলতে পারে, কতো দৃষ্টান্তমূলক উত্তম আচরণ ও চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে, কতো উন্নত ও মানব কল্যাণের মহৎ গুণাবলীতে ভূষিত করতে পারে, তার মনোজ্ঞ আলোচনা এখানে পেশ করা হয়েছে। সত্যি করে বলতে গেলে এই সকল গুণাবলীই একটি মার্জিত, সুসভ্য ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনের প্রেরণা যোগায়।

এমনিভাবে ইসলাম কোনো অপূর্ণাঙ্গ, বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত জীবন ব্যবস্থা নয়। জীবনের কোনো দিক ও বিভাগকে ইসলাম স্বতন্ত্র ও আলাদা করে দেখেনি। জীবনের কোনো একটি দিককে আংশিক ও বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা ইসলাম দেয়নি। ইসলামী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি ইসলামের কোনো দিক নিজ নিজ মরযী মতো মেনে চলবে, আর কোনো কোনো দিককে বর্জন করবে, এমন স্বেচ্ছাচারিতার স্থান ইসলামে নেই। ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ

জীবনপদ্ধতি। এর মৌলিক এবাদাত, ঐতিহ্য, সামাজিক বিধিবিধান, সাংস্কৃতিক জীবনধারা, ব্যক্তিগত অনুশাসন ও সামষ্টিক জীবনের ব্যবস্থা একটি অপরটির পরিপূরক ও সহায়ক। ইসলামের জীবনপদ্ধতির প্রতিটি দিক ও বিভাগের অনুসরণ ও অনুশীলন এর মূল জীবন লক্ষ্যেরই পরিবর্ধক, পরিপূরক ও মানবতার পরিপূর্ণতা বিধায়ক। ইসলামই আত্মার পরিশুদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন, মানব সমাজের প্রকৃত সংস্কার ও সংশোধন, মানব কল্যাণ ও শান্তি বিধান, সভ্যতার উত্থান ও মানব সমাজের উন্নতি ও প্রগতির নিশ্চয়তা দান করে।

ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তবায়নই আল্লাহর বান্দাদের জীবনে আল্লাহপ্রদত্ত রহমতভিত্তিক জীবন বিধানের বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন মানুষ মুখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, সে ইসলামের সত্যতা ও এর বিধানকে সত্য বলে গ্রহণ করারও দাবী করে এবং সে নামাযও আদায় করে। অথচ সাংস্কৃতিক জীবনধারা, আচরণ, সভ্যতা, আইন-আদালাত, সামাজিক রীতি নীতির ইসলাম থেকে অনেক দূরে, ইসলামও এমন ধরনের ব্যক্তি থেকে অনেক অনেক দূরে। কোনো ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক ও মৌলিক এবাদাতে অভ্যস্থ হওয়া, আর বাস্তব জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বিরোধী ক্রিয়াকান্ডে লিপ্ত হওয়া, স্বীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচার ঐতিহ্য বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া দ্বারা, স্বতসিদ্বভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী নয়। তার আচরণ দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তার ইসলামের প্রতি সত্যিকার ঈমান ও আস্থা নেই। সে মুখে যা বলে মূলত এটি তার অন্তরের বিশ্বাস নয়। মুখে সে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী করে, আনুষ্ঠানিকভাবে সে আল্লাহর বন্দেগী করে, আর বাস্তব জীবনে সে মানবরচিত ব্যবস্থার গোলামী করে। জীবনের এক অংশে সে আল্লাহর গোলামী করে এবং অপর দিকে তার গোটা জীবনধারায় সে মানুষের গোলামীতেই ব্যস্ত থাকে।

আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান যার হৃদয়ে বিদ্যমান, যে অন্তরে আল্লাহর প্রতি প্রত্যয় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তার গোটা জীবনেই তার প্রভাব, তার প্রতিফলনের প্রবাহ উৎসারিত হয়ে থাকে। মোমেনের সমগ্র জীবনধারাতে তার বিশ্বাসের নিদর্শন ফুটে ওঠে। তার ঈমান তার জীবন বৃক্ষকে আমলে সালেহের (সৎকর্মশীলতার) শাখা-প্রশাখা ও ফলে -ফুলে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করে তোলে। (যে প্রসংগটি আমরা সূরা আসরের তাফসীরে আরও ব্যাপকভাবে তুলে ধরেছি)।

যখন কোনো ব্যক্তির জীবন তার মুখে দাবীকৃত অন্তরের বিশ্বাসের বিপরীত খাতে প্রবাহিত হয়, তার কথার সাথে তার বাস্তব জীবনের আচরণের অমিল দেখতে পাওয়া যায়, তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার জীবনের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত না হয়, তার ঈমান বিরোধী আচরণই একথার সুস্পষ্ট দলীল যে, তার মুখের দাবী সত্য নয়। তার হৃদয়ে ইসলামী জীবনাদর্শের আদৌ কোনো অস্তিত্বই নেই। সূরা মাউনের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়েছে।

আয়াতের সূচনাতেই যারা উপলব্ধি চায়, যারা প্রত্যক্ষদর্শীর মতো এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদেরকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করা হয়েছে, কারা পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার দিবসকে মিথ্যা মনে করে? কোরআনুল কারীমের এ প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, যারা নিম্নে উল্লেখিত আচরণে অভ্যস্ত, তারাই প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাসী। তাই প্রথম আয়াতে তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে, দ্বীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, যারা এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়, যারা মেসকীনকে আহার প্রদানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে না।

ঈমানের দাবী

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রকৃত ঈমানের দাবী হচ্ছে, বাস্তব জীবনে ইসলামী জীবনধারাকে অনুসরণ করা। বস্তুত, আয়াতের মূল তাৎপর্য ও শিক্ষা হচ্ছে এই যে, যারা এতীমদের অধিকার হরণ করে, বল প্রয়োগ করে এতীমদের প্রাপ্য থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে, এতীমদের ওপর নির্যাতন চালায়, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ও তদের কষ্ট দেয়, তারাই তো দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাসী।

আর যারা মেসকীনদেরকে খাদ্য প্রদানে উৎসাহিত করে না, অসহায় সর্বহারা দুস্থের পুনর্বাসনে অনুপ্রেরণা যোগায় না, যারা তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাদের অভাব পূরণের জন্যে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দেয়া দ্বীনের প্রতি বিশ্বাসী ও আস্থাশীল নয়।

যদি তারা দ্বীনের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসী হতো, যদি তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে দ্বীনের প্রতি ঈমান থাকতো, তবে কক্ষনো তারা এতীমদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে পারতো না। এতীমদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়ার জঘন্য আচরণের দুঃসাহস করতো না, আর তারা কোনোমতেই মেসকীন ও সর্বহারাদেরকে খাদ্য প্রদানে নিরুৎসাহিত করার উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন করতো না। তারা মেসকীনদের বঞ্চিত করার প্রেরণা যোগাতো না।

প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ইসলামের সত্যতাকে শুধু মুখে স্বীকার করার নামই ঈমান নয়; বরং ঈমান তাই যা অন্তরে গভীর প্রত্যয় জন্মায়, যা মানব জীবনে ঈমানের দাবী পূরণের সকল পারিপার্শ্বিক ও আনুষাঙ্গিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে। সে বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস যে বিশ্বাসের সাথে মানব কল্যাণের সকল আনুসংগিক বৈশিষ্টাবলী বিকশিত হয়, যে বিশ্বাসের স্বীকৃতির সাথে জীবনের সকল কর্মের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

আল্লাহ তায়ালা শুধু মানুষের মৌখিক স্বীকৃতিই চাননা; বরং মৌখিক স্বীকৃতির সাথে হৃদয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও জীবনের সকল ক্রিয়াকান্ডে তার সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপনই আল্লাহ তায়ালা চান। যার মুখের কথার সাথে কর্মময় জীবনের কোনো মিল নেই, দাবী নিছক বুদবুদ, তা ধোঁয়ার মতো শূন্যে মিলিয়ে যায়। যে দাবী ও কথার সাথে কাজের মিল নেই, সে কথার আদৌ কোনো গুরুত্বই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কাছে নেই। আলোচ্য তিনটি আয়াতে দ্বীন ইসলামের মূল প্রাণ শক্তি, এর প্রকৃত শিক্ষা, তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে ইসলামের সৌন্দর্য ও তার মূর্তরূপ প্রতিভাত হয়েছে।

এখানে আমরা আকায়েদ ও ফেকাহ শাস্ত্রের বর্ণনায় ঈমান ও ইসলামের জটিল বির্তক জালে জড়িত ও লিপ্ত হতে চাচ্ছি না। আমরা এ সূরা থেকে এ শিক্ষাই উপলব্ধি করতে পারি যে, এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা জানাতে চেয়েছেন এ দ্বীনের প্রতি ঈমান ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের কারণে মানব চরিত্রে কোন ধরনের আচরণ ও গুণাবলী বিকশিত হয়, আল্লাহর কাছে দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের কোন ধরনের ঈমান পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ও মূল্যায়নের প্রকৃত মানদন্ড কী? দ্বীনের প্রকৃত শিক্ষা, স্বরূপ ও তাৎপর্য কী-এর সবই সূরার মূল প্রতপাদ্য ও আলোচ্য বিষয়।

ধ্বংস হোক মুসল্লীরা!

উপরোক্ত বিষয়াদি উপস্থাপনের পর এ সূরার পরবর্তী অংশে মূল বিষয়ের সম্পৃক্ততা অব্যাহত রেখেই পরবর্তী পর্যায়ে একান্ত প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতে নামাযের প্রতি অনীহা, অমনোযোগ ও আলস্য প্রদর্শকারী কারা? এর উত্তর প্রদান করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পরবর্তী ছয় ও সাত নম্বর আয়াতে বলেছেন; তাদের পরিচয় হচ্ছে 'মুসাল্লীন'। তারা সে সকল লোক যারা নামায আদায় করে, অথচ নামায কায়েম করেনা। যারা শুধু নামাযের আনুষ্ঠানিকতা আদায় করে- রুকু, সেজদা, সূরা, দোয়া, তাসবীহ যথাযথভাবে পালন করে; কিন্তু তাদের রূহ নামাযের প্রাণশক্তি থেকে বঞ্চিত, তাদের আত্মা নামাযের জীবনীশক্তি দ্বারা সঞ্জিবীত নয়। তাদের জীবনধারা নামাযের চরিত্র, শিক্ষা ও বৈশিষ্টমন্ডিত নয়। তাদের কেরাত দোয়া ও তাসবীহে উচ্চারিত বাক্যসমূহের সাথে তাদের বাস্তব জীবনের কোনো মিল পরিলক্ষিত হয় না। তারা বাহ্যত, লোক দেখানো নামায আদায় করে। তাদের নামাযের প্রতি গভীর মনোযোগ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নেই। এভাবে তারা তাদের নামায অমনোযোগিতা অনীহা, আলস্য ও প্রদর্শনীমূলক মনোভাব নিয়ে আদায় করে। অথচ নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্যকে জীবনে বাস্তবায়িত করে নামায কায়েম করে না। আর নামায কায়েমের প্রকৃত শিক্ষা, তাৎপর্য, নামাযের যেন্দেগীও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করা ছাড়া নামায কায়েমের লক্ষ্য অর্জিত হয়না। মূলত, পরিপূর্ণ জীবনে আল্লাহর রবুবিয়াত ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কায়েম করা যায়।

যারা শুধু নামাযের কতিপয় অনুষ্ঠান, দোয়া-তাসবীহ পালন করে রিয়া বা প্রদর্শনী, তথা লোকদেখানো মানসিকতা সহকারে অনীহা, অবজ্ঞা ও অমনোযোগিতা নিয়ে নামায আদায়ে অভ্যস্ত, তাদের নামায কায়েম হয় না। নামাযের কোনো গুণাবলী ও নিদর্শন তাদের চরিত্র ও জীবনধারায় পরিস্ফুট হয় না, তাদের অন্তরে এর কোন প্রভাব পড়েনা। এ ধরনের নামায আদায়কারীরাই তাদের ভাইদেরকে নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনো দ্রব্য গৃহ সামগ্রী, ও যে কোনো কল্যাণধর্মী সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রকাশ করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তারা আল্লাহর বান্দাদের উপকার সাধন, তাদের কল্যাণ কামনা ও সহযোগিতা প্রদান করে না। যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং নামায কায়েমের প্রকৃত তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেই তারা নামায কায়েম করতো; তবে কিছুতেই তারা আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ সাধন, সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকতো না। আল্লাহর দরবারে এবাদাত কবুল হওয়ার এবাদাতের সত্যিকার মর্ম শিক্ষা তাৎপর্য গ্রহণ ও নামায কায়েমের প্রকৃষ্ট পন্থাই হচ্ছে আল্লাহর এবাদাতের মাধ্যমে মানব কল্যাণের বৈশিষ্ট্য অর্জন তথা আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণধর্মী চরিত্র সৃষ্টি করা।

এ পথেই আমরা আমাদের মন মানসিকতায়, চরিত্রে ও প্রবৃত্তিতে দ্বীনের প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্যকে গ্রহণ করতে পারি। আর মানুষের কল্যাণধর্মী প্রবণতা, মননশীলতা ও মানব কল্যাণের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে যারা ব্যর্থ হয় সেই সব নামায আদায়কারীদের প্রতি অভিশাপ ও কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যারা স্ব স্ব চরিত্রে মানব কল্যাণের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতিফলন ঘটাতে পারে না তারা প্রকৃতপক্ষে নামায কায়েম করেনা। তারা শুধু প্রাণহীন কতিপয় অনুষ্ঠানই পালন করে। তারা একমাত্র আল্লাহর রেযামন্দীর উদ্দেশ্যে নামায

আদায় করে না, বরং আত্মিক শক্তি ও জ্যোতিহীন কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও দৈহিক নড়াচড়া, উঠাবসা ও শরীর চর্চায় লিপ্ত হয়ে থাকে। তারা লোক দেখাবার মতো কিছু নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণ করে মাত্র। তাদের নামায তাদের অন্তরে, কর্মে ও চরিত্রে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। তাদের সকল আনুষ্ঠানিকতা, কালো ধোঁয়ার মতো মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। বরং এ প্রাণশক্তিহীন আনুষ্ঠানিকতার কারণে তাদেরকে কঠোর শাস্তি ও অশুভ পরিণামের প্রতীক্ষায় থাকতে হয়।

এ সূরা থেকে আমরা এ শিক্ষা ও মর্ম উপলব্ধি করতে পারি যে, দ্বীন ইসলামকে গ্রহণ করার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কোনো স্বার্থ নিহিত নেই; বরং দ্বীনের প্রতি আস্থা স্থাপনের মধ্যে মানব কল্যাণের আদর্শই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য নবী, রসূল প্রেরণ করেছেন। মানব কল্যাণের জন্য ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন এবং মানব কল্যাণের জন্যই আল্লাহর এবাদাতের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কর্তৃক রসূল প্রেরণ, ওহী নাযিল, দ্বীন ও জীবন পদ্ধতি প্রদান, তার রবুবিয়াতের ওপর ঈমান আনয়ন ও তাঁর বন্দেগী করা এ সকল কিছুর বিনিময় বান্দার নিকট থেকে কোন কিছুই কামনা করে না। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি কারও মুখপেক্ষী নন। আল্লাহ তায়ালা তো চান এসব কিছুর বিনিময়ে বান্দা যেন নিজেদেরই কল্যাণ সাধন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালার এ সকল অফুরন্ত নেয়ামত ও হেদায়াত দ্বারা বান্দা যেন নিজ আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন, জীবনকে সবল, সুন্দর ও সৌভাগ্যবান করে গড়ে তুলতে পারে। আল্লাহ তো চান, বান্দা যেন উন্নত জীবন, পবিত্র ও বিশুদ্ধ অনুভূতি ও চেতনা, সুন্দর পরিবেশ, মার্জিত রুচি, সুবিচারমূলক সমাজ ও ভ্রাতৃপ্রেম, আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, সৌন্দর্য ও পারস্পরিক কল্যাণ কামনার ভিত্তিতে সুসভ্য সমাজ গড়ে তুলুক।

আজকের মানবসমাজ এমনি সুন্দর কল্যাণমুখী আদর্শ, এমনি শান্তিপূর্ণ রহমতের সমাজ, এমনি মার্জিত উন্নত প্রগতিশীল উচ্চতর মর্যাদাপূর্ণ জীবন দর্শনকে পরিহার করে কোন্ পথে যেতে চায়? আজকের মানব সমাজ কি এমন আলোকোজ্বল রাজপথকে বর্জন করে জাহেলিয়াতের তিমিরাচ্ছন্ন কলুষিত কন্টকাকীর্ণ পথকেই নিজেদের জন্যে বেছে নিতে চায়? আজকের বিশ্বমানব কি প্রগতির নামে অজ্ঞতা, বর্বরতা ও ধ্বংসের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গতির অতল গহবরেই পতিত হতে চায়?

সূরা আল কাওসার

আয়াত ৩ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (হে নবী,) আমি অবশ্যই তোমাকে (নেয়ামতে পরিপূর্ণ) কাওসার দান করেছি; ২. অতএব (আমার স্মরণের জন্যে) তুমি নামায কায়েম করো এবং (আমারই উদ্দেশে) তুমি কোরবানী করো; ৩. নিশ্চয়ই (পরিশেষে) তোমার নিন্দুকরাই হবে শেকড়-কাটা (অসহায়)।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি বিশেষভাবে সর্বশেষ রসূল মোহাম্মদ (স.)-কে সম্বোধন করেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরাটি 'যোহা' ও সূরা 'ইনশেরাহ' এর অনুরূপ। উল্লেখিত দুটি সূরায় রসূলুল্লাহ (স.)-এর উচ্চতর সম্মান ও মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে।

এ সূরায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব রসূলুল্লাহ (স.)-কে পর্যাপ্ত সম্মান, মর্যাদা, নেয়ামত ও কল্যাণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর শত্রুদেরকে শেকড়হীন ও নির্মূল করার হুশিয়ারী দিয়েছেন। প্রিয় নবীকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

মক্কী জীবনে 'দায়ী ইলাল্লাহ' হিসাবে ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক স্তরে অবতীর্ণ সূরা সমূহের মধ্যে এ ছোট্ট সূরাটি খুবই শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যবহ। এ সূরাটি ইসলাম বিরোধী শক্তির চক্রান্তকে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছে এবং শত্রুদের দেয়া সকল কষ্ট, নির্যাতন ও অত্যাচারে ধৈর্য্য ধারণ ও মোমেনদের সংখ্যা স্বল্পতা সত্তেও দুশমনের সকল নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভের আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর অপার অনুগ্রহ প্রাপ্তির ইংগিত এ সূরায় নিহিত রয়েছে। সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দার প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত আদর্শের কথা বলেছেন। শত্রুদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদের সকল বিরোধিতার সামনে দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য অবলম্বনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। শত্রুদেরকে ভীতিপ্রদ শাস্তি প্রদান, পর্যুদস্ত ও নির্মূল করার হুমকী প্রদর্শন করে ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর সুন্দরতম নেয়ামত ও সুউচ্চ সম্মান দান করার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে।

এতদসংগে সূরা কাওসারে হেদায়াত, ঈমান ও কল্যাণের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য, গোমরাহী অসৎপ্রবণতা, কুফরীর মর্ম ও চূড়ান্ত পরিণামের স্বরূপও উদঘাটিত করা হয়েছে। সাথে সাথে রসূলে আকরাম (স.)-এর প্রতি আল্লাহর অনন্ত অনুগ্রহ, চিরন্তন সম্মান মর্যাদা দানের কথার উল্লেখ রয়েছে। ইসলামের শত্রুদেরকে পর্যুদস্ত ও নির্মূল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে প্রিয় হাবীবকে শান্ত্ব ও

আশ্বস্ত করা হয়েছে। যদিও কাফেররা মনে করতো স্বল্প সংখ্যক মুসলিম ও আল্লাহর রসুল পর্যুদস্ত ও পরাজিত হবে এবং এ কারণেই রসূলকে তারা শেকড়হীন ও আটকূঁড়ে বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

বর্ণিত আছে যে, কোরায়শদের জঘন্য ব্যক্তিরা রসূলুল্লাহ (স.)এর চরম বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক যুগে তারা রসূলের বিরুদ্ধে মারাত্মক চক্রান্ত ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ দুষ্কৃতকারীরা মানুষকে ইসলামী দাওয়াত থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি নিকৃষ্ট ধরনের অপবাদ, দুর্নাম, অপপ্রচার চালায়। তাঁকে মানসিক অশান্তি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করার জন্যই সূরা কাওসার অবতীর্ণ হয়। এ সূরাতে রসূলুল্লাহ (স.)-কে মানসিক প্রশান্তি দান করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে অনন্ত নেয়ামত, প্রাচুর্য, সীমাহীন ও চিরন্তন অনুগ্রহ, সম্মান ও মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি ও সংবাদ প্রদান করেছেন। সুরাটিতে রসূলের শত্রুদেরকেই পর্যুদস্ত, নির্মূল ও সহায় সম্বলহীন করার হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়।

তাফসীর

সূরার প্রথম আয়াতেই রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে এরশাদ হচ্ছে, 'অবশ্যই আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি।'

'কাওসার' শব্দটি আরবী 'কাসরাত' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো, অধিকতর, পর্যাপ্ত, অনন্ত ও সীমাহীন। কোরায়শ সম্প্রদায়ের দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা প্রিয় রসূলকে 'আবতার' বলে বিদ্রূপ করেছে। আল্লাহ তায়ালা এর বিপরীত শব্দ 'কাওসার' ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা দুষ্কৃতকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন– আমার হাবীব 'আবতার' বা 'শেকড়হীন' আটকুঁড়ে নন, বরং আমি তাকে পর্যাপ্ত, অধিক, অসীম, অন্তহীন নেয়ামত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যে কোনো মানুষ মুক্ত ও উদার দৃষ্টি ও মন নিয়ে এই অন্তহীন নেয়ামতকে বুঝাতে চাইলে, সে তার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করলে সেই অন্তহীন প্রাচুর্যকে স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারে। সন্ধানী ব্যক্তি তার দৃষ্টি যেদিকেই নিবদ্ধ করুক না কেন, আল্লাহর এ প্রাচুর্য ও অন্তহীন অনুগ্রহ তার চোখে ধরা পড়বেই।

কাওসার এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীবকে রেসালাত ও নবুওতের আসনে অধিষ্ঠিত করে অন্তহীন নেয়ামত দান করেছেন। সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তারা রসূল (স.) সম্পর্কে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। আল্লাহ প্রদত্ত সত্য দ্বীন থেকে গণমানুষকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন রাখার হীন উদ্দেশ্যেই তারা এ সকল মিথ্যা প্রচারণায় লিপ্ত হতো। কোরায়শ সম্প্রদায়ের দূরাচারদের মধ্যে ইবনে ওয়ালিদ, উকবাহ বিন আবি মু'য়ীত, আবু লাহাব, আবু জাহল প্রমুখ ছিলো সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

প্রিয় নবী (স.)-এর পুত্র সন্তানরা শিশুকালেই মৃত্যু বরণের কারণে ওরা বলতো, ওকে নিয়ে ভাববার কারণ নেই, ওতো শেকড়হীন, আটকুঁড়ে। ওদের মধ্য থেকে একজন বললো, ওর প্রসংগই বাদ দাও, ওর সম্পর্ক বর্জন করো, ওতো শেষ হয়ে যাবে নির্বংশ হয়ে যাবে, ওর কোনো পুত্র সন্তান বেঁচে না থাকার কারণে ওর মৃত্যুর সাথে সাথেই ওর সব ব্যাপার চুকে যাবে।

তারা তাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তি অধিক সন্তানের পিতা হওয়ার কারণে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো এবং তাকে পরম সৌভাগ্যবান ও সম্মানিত মনে করতো। রসূলুল্লাহ (স.)-এর শত্রুরা রসূলের পুত্র সন্তান শিশু বয়সেই মৃত্যুবরণ করায় মনে করতো। রসূলুল্লাহ (স.)-এর শত্রুরা রসূলের পুত্র সন্তান শিশু বয়সেই মৃত্যুবরণ করায় তাঁর প্রতি বিভিন্ন ধরনের ঠাট্টাবিদ্রূপ করার কারণে স্বভাবতই তিনি মানসিকভাবে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর প্রিয় হাবীবকে আশ্বস্ত ও সান্ত্বনা প্রদানের মাধ্যমে নবুওত ও রেসালাতের মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। জানাচ্ছেন এর থেকে অধিকতর নেয়ামত আর কী হতে পারে? এর চেয়ে উচ্চতর সম্মান ও ইযযত আর কী হতে পারে? আল্লাহ প্রদত্ত এ মর্যাদাকে ও সম্মানের সমকক্ষ কি আর কিছু হতে পারে? এর চেয়ে অতুলনীয় ও অনুপম নেয়ামত আর কিছু কি হতে পারে? সে তো সব কিছুই পেয়ে যায় যে আল্লাহর এই মহান অতুলনীয় নেয়ামতের অধিকারী হয়।

রসূলকে 'কাওসার' প্রদানের আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো আল কোরআন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোরআন রসূলের প্রতি, আর রসূলের মাধ্যমে গোটা মানবতার প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত। অসীম জ্ঞানের উৎস আল কোরআন রসূল (স.)-কে প্রাচুর্য প্রদানের এক মহান নিদর্শন। আল কোরআনের ঝর্ণা ধারা শান্তি ও কল্যাণের অন্তহীন উৎস। গোটা কোরআন তো এক অনন্ত নেয়ামত, শুধু সূরা কাওসারইতো অন্তহীন নেয়ামতের মুর্ত প্রতীক। যার আধিক্য ও প্রাচূর্যের পরিসমাপ্তি নেই। এই সূরা কাওসার-এর মাধ্যমে রসূলের প্রতি, মানবতার প্রতি সীমাহীন রহমত ও অনুগ্রহের ঝর্ণাধারা উৎসারিত ও প্রবাহিত হওয়ার কথা চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ মাধুর্য ও এর প্রবাহের কোনো শেষ নেই।

রসূলকে প্রাচুর্য, অধিক্য, অন্তহীন নেয়ামত ও মর্যাদা প্রদানের আরেক সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে 'কালেমা' ও আযানের বাক্যে রসুলের প্রিয় নাম সংযুক্ত করা। এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি ভূখন্ডে মহান আল্লাহর নামের সাথে রসূল (স.)-এর নাম উচ্চারিত হয়। দেশে দেশে আল্লাহর নামের সাথে রসূলের নাম উচ্চারিত হয়। আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে, রসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। রসূলের প্রতি ফেরেশতাকুল স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহ নামায ও দুরূদ পাঠ করে।

দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশে বায়ু তরংগের তালে তালে যখন আযানের ধ্বনি ধ্বনিত হয় তখন প্রতিটি মুহূর্তে বিশ্বের প্রতিটি ভূখন্ডে উচ্চস্বরে উচ্চারিত ও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়– এ প্রিয় নাম। যুগে যুগে বিশ্বের সর্বত্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের পয়গাম কোটি কোটি মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়। তাদের অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে এ প্রাচুর্যের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। কোটি কোটি মানুষের মুখে এ প্রিয় নামের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়। অগণিত দার্শনিক, ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি ঘোষণায় পঞ্চমুখ। যুগযুগান্তরে তাঁর মহব্বতে অগণিত মানুষ জীবন দানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ নামের প্রশংসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্তের ঘোষণা ও স্বীকৃতি অব্যাহত থাকবে।

মানব সভ্যতার প্রতি তাঁর অবদান অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকা তাঁর প্রতি আধিক্য ও প্রাচুর্য প্রদানের আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁরই প্রদর্শিত পথে মানব জাতির চিরন্তন কল্যাণ ও শান্তি নিহিত রয়েছে। সকল যুগে সকল দেশের সকল যুগের মানুষ যারা তাঁর আদর্শকে একমাত্র নিখুঁত ও নির্ভুল আদর্শ হিসাবে উপলব্ধি করতে পারে, তাঁর এ আদর্শের প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ প্রদান করে। অনেক মানুষ অজ্ঞাতসারেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শের কল্যাণ ও উপকারিতা উপভোগ করে। বিভিন্ন রূপে বিভিন্নভাবে সংখ্যাগরিষ্ট ও সংখ্যালঘু সবাই তাঁর অন্তহীন কল্যাণের উৎসারিত ঝর্ণাধারা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করছে। রসূলুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালা যে

অন্তহীন কল্যাণ উপহার দিয়েছেন তা অফুরন্ত, তা কোনদিন নিঃশেষ হয়ে যাবেনা। যুগে যুগে এ কল্যাণের ধারা আরও বৃদ্ধি পাবে, আরও সম্প্রসারিত হবে। এ জন্য আল কোরআনে রসূলুল্লাহ (স.)-কে প্রাচুর্য ও অন্তহীন নেয়ামত প্রদানের সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এমন আধিক্য, এমন প্রাচুর্য, এত সম্মান ও মর্যাদা নবী করীম (স.)-কে দেয়া হয়েছে যার কোনো সীমা নেই। তাঁর পরিচিতিরও কোনো পরিসীমা নেই, যার কোনো পরিসংখ্যান করা যায়না। যার আদর্শ অনুসরণের মধ্যে মানুষের জীবনে কল্যাণের অফুরন্ত ফল্গুধারা প্রবাহিত ও বর্ধিত হয়।

এছাড়া 'কাওসার' প্রদানের সুসংবাদ প্রসংগে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসে এমন অনেক রেওয়ায়াত রয়েছে যেগুলোতে বলা হয়েছে, জান্নাতে একটি নহর রয়েছে যা রসূলুল্লাহ (স.) কে উপহার দেয়া হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ নহর ও ঝর্ণাধারা প্রভৃত কল্যাণের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ হাউযটি অনেক হাউযের মধ্যে একটি হাউয এবং হাউযটির কর্তৃত্ব রসূলে করীম (স.)-এর নিকট অর্পিত হবে। এ প্রসংগে এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক গ্রহণ যোগ্য। বলা হচ্ছে, নামায আদায় করুন ও কোরবানী দিন।

এবাদাত ও উৎসর্গ

রসূলুল্লাহ (স.)-কে অত্যধিক পরিমাণ নেয়ামত ও মর্যাদা দানের আশ্বাস ও নিশ্চয়তা প্রদানের পর পরবর্তী এ আয়াতে চক্রান্তকারীদের সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে রসূলের প্রতি অনুগ্রহ, মর্যাদা ও সম্মান প্রদানের কথা ঘোষণা হয়েছে। বিনিময়ে আল্লাহর শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তে আল্লাহর এবাদাত ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও কোরবানীর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্তে এবং নির্জনে আল্লাহর এবাদাতে মশগুল হতে বলা হয়েছে। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি, দীনতা, হীনতা ও বিনয় প্রকাশের জন্য একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করতে ও একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ত্যাগ ও কোরবানী করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর রেযামন্দির উদ্দেশ্যে মোশরেকদের সকল পদ্ধতি পরিহার করে, শেরেকমুক্ত ভাবে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে নামায আদায়, যবাই বা কোরবানীর সময় গায়রুল্লাহ নামে,

দেবদেবীর নামে বলিদানপ্রথাবর্জন করে জীবজন্তু একমাত্র আল্লাহরই নামে কোরবানী ও যবাই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আয়াতে দুটো নির্দেশের পুনরুল্লেখের মাধ্যমে একমাত্র সকল এবাদাত আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা, এবং একমাত্র আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই না করা, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অপর কারো নামে যবাই করা প্রাণী নিষিদ্ধ হওয়াই প্রমানিত হয়েছে। আয়াত থেকে এমর্মে ও এ শিক্ষাই আমরা খুজেঁ পাই যে, শেরেকের সংমিশ্রণ ও প্রভাবমুক্ত অকৃত্রিম নিরেট ও খালেস তাওহীদ একমাত্র ইসলামী জীবন দর্শনেই নিহিত রয়েছে।

তাদের শুধু কল্পনা ও অনুভূতি নয়, শব্দ ও তত্ত্বের মধ্যেই নয় বরং সমগ্র জীবনধারায় তাওহীদের মুর্ত প্রকাশ, জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে দিবালোকের মতো নির্ভেজাল ও অকৃত্রিম তাওহীদের অমলিন জ্যোতি একমাত্র দ্বীন ইসলামের মধ্যেই পাওয়া যায়। মানব জীবনের বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের প্রতিটি কর্মধারায়, শাখা প্রশাখা ছত্র ছায়ায় সর্বত্রই সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন, নির্ভেজাল, খাঁটি তাওহীদ বা একত্ববাদ একমাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ইসলাম ছাড়া বিশ্বের যতো মতাদর্শ রয়েছে তার কোনোটাই শেরেকমুক্ত নয়। ইসলাম ব্যতিত অপর সকল ধর্ম, দর্শন ও মতবাদের আগা গোড়া শেরেক বিজড়িত। অপর মতবাদের ভিতর বাইর, প্রকাশ্য গোপন, সকল

ক্ষেত্র শেরেক দ্বারা আচ্ছাদিত। অপর সকল মতাদর্শই নাস্তিকবাদ, জড়বাদ, পৌত্তলিকতাবাদ, নিরেশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও সন্দেহবাদে পরিপূর্ণ। একটি মুহূর্তের জন্যেও সে সকল মতাদর্শে খাঁটি তাওহীদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক কানাকড়ি নির্ভেজাল তাওহীদের সন্ধান ও সে সকল মতাদর্শে পাওয়া যাবে না। সে সকল ধর্ম ও মতাদর্শে, তার জীবনাচরণে, পূজা-অর্চনা ও উপাসনায় কোথাও খালেস তাওহীদের লেশমাত্র নেই। তাওহীদ যেমনি অবিচ্ছিন্ন অংশীদারিত্বহীন এক ও একক সত্ত্বা, তেমনি ইসলাম একমাত্র অবিচ্ছিন্ন এক পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি, জীবনের ছোটখাট খুটিনাটি ব্যাপারে খাঁটি নির্ভেজাল তাওহীদের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখে, যেমনি ভাবে আমি প্রাণী যবাই ও কোরবানীর ক্ষেত্রে, এবাদাত ও জীবন বোধে, আচরণে এবাদাতে সর্বত্র এই তাওহীদের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই।

দ্বীনের শত্রুরা সাবধান

'আর তোমার শত্রুরাই শেকড়কাটা'।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে আশ্বস্ত ও সান্ত্বনা দিয়ে অত্যধিক মর্যাদা সম্মান তথা কাওসার প্রদানের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, তুমি শেকড়-কাটা নও, বরং তোমার প্রতি যাদের অন্তরে ঈর্ষা, হিংসা ও বিদ্বেষের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে তোমার সে সকল শত্রুরাই প্রকৃতপক্ষে শেকড়টাকা ও আটকুঁড়ে।

আল্লাহ তায়ালার এ অভিশাপ ও সতর্কবাণী রসূলের শত্রুদের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিলো। আজ ইতিহাসে তাদের নাম-নিশানাও নেই। গোটা মক্কা ও মদীনায় একজন পৌত্তলিক ও শেরেকবাদীর নাম নিশানা আজ আর অবশিষ্ট নেই। আর আমরা আজও কোটি কোটি মানুষ প্রিয়নবী মোহাম্মাদ (স.)-এর আদর্শের অনুসরণ করে আল্লাহ তায়ালার ঘোষিত মর্যাদা ও সম্মানের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছি।

আমরা আজ রসূলের আদর্শের পতাকা বহন করে আল্লাহর ঘোষিত বাণীর সত্যতা প্রদান করছি। যুগে যুগে ইসলামের শত্রুরা পর্যুদস্ত, পরাস্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। রসূলের যুগে বদর, হোনায়ন, আহযাব এবং ফতহে মক্কায় তাদের পরাজয়ের মাধ্যমে কোরআন অস্বীকারকারী বাতিল পন্থী রসূলের সেই দুশমনদের 'আবতার'- শেকড়হীন, পরাজিত ও পরাস্ত হওয়ার চিরন্তন বাণীই ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সমুজ্জ্বল, ভাস্বর ও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহর লাঠি, আল্লাহর মার, আল্লাহর অস্ত্র- মানুষের লাঠি, মার ও অস্ত্র থেকে ভিন্নতর। কিন্তু ধোকাবাজ ও প্রতারণায় নিমজ্জিত ব্যক্তিরা তাদের উদ্যোগকে চূড়ান্ত মনে করে এবং তারা তাদের অস্ত্র শক্তিকেই প্রকৃত বলে মনে করে। অথচ আমাদের সামনে আল্লাহর এ চিরন্তন বাণীর সত্যতা সুস্পষ্টভাবে ধরা দিচ্ছে যে, মোহাম্মাদ (স.)-এর শত্রুরাই নিপাত, নিশ্চিহ্ন ও নির্বংশ হয়েছে। আল্লাহর চিরস্থায়ী বাণী ইতিহাসের পাতায় স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

আজ আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন, আজ কোথায় সে সব লোকেরা যারা রসূলে পাক (স.) সম্পর্কে কটূক্তি করেছিলো, যারা অপবাদ ও অপপ্রচারে লিপ্ত ছিলো? যারা আল্লাহর রসূল থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেয়েছিলো, যারা জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলো, তারা আজ কোথায়?

তারা আজ কোথায়? যারা মনে করতো আল্লাহর রসূলের ওপর তারা কাবু পেয়ে গেছে, তারা রসূল (স.)-কে গণবিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছে! ইতিহাস বলে দাও, আজ কোথায় তারা? কোথায় তাদের স্মৃতি? কোথায় তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রভাব?

আল্লাহপ্রদত্ত কাওসারের প্লাবন তাদেরকে কোন সুদূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে? কাওসারের মালিক মোহাম্মাদ (স.)-এর সে প্রতিবেশীরা আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে; যারা বলতো মুহাম্মাদ (স.) নির্মূল ও আটকুঁড়ে।

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত, সত্যের দাওয়াত, কল্যাণ ও মুক্তির দাওয়াতকে কোনো শক্তিই নির্মুল করতে পারেনা, পারে না তাকে নিশ্চিহ্ন করতে, পারে না কখনও ধ্বংস করতে। কোনো দিন কোনো শক্তি আল্লাহর দ্বীনের দায়ীকে, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তি ও সংগঠনকে নিশ্চিহ্নও নির্মূল করতে পারে না। এ সূরা ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনা ও প্রমাণের ভিত্তিতে এ মহাসত্যকেই তুলে ধরেছে।

কি করে পারবে? আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও দায়ী ইলাল্লাহকে নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করতে! যে আল্লাহর দেয়া এ দ্বীন তিনিতো চিরন্তন সত্য। তিনি চিরঞ্জীবী, চিরস্থায়ী, অনন্ত, অসীম, পরম পরাক্রমশালী ও মহাশক্তিমান। নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন, নির্মূল, পরাস্ত, পর্যুদস্ত, পরাভূত ও দূরীভূত হবে বাতিল। পরাজিত হবে মিথ্যাশ্রয়ী ও বাতিলপন্থীরা। ইতিহাসের কোনো স্তরে, কোনো পর্যায়ে, কোনো যুগে কি মিথ্যাশ্রয়ী ও বাতিলপন্থীরা জয়ী হয়েছে? না, সকল যুগেই আল্লাহর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার বাণীই তো চিরন্তন সত্য; আর মিথ্যাশ্রয়ী চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র চিরদিন মিথ্যাই প্রমাণিত হয়েছে।

সূরা আল কাফেরূন

আয়াত ৬ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ
اَعْبُدُ ۝ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ
دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (হে নবী,) তুমি বলে দাও, হে কাফেররা, ২. আমি (তাদের) এবাদাত করি না যাদের এবাদাত তোমরা করো, ৩. না তোমরা (তাঁর) এবাদাত করো যার এবাদাত আমি করি, ৪. এবং আমি (কখনোই তাদের) এবাদাত করবো না যাদের তোমরা এবাদাত করো, ৫. না তোমরা কখনো (তাঁর) এবাদাত করবে যাঁর এবাদাত আমি করি; ৬. (এ দ্বীনের মধ্যে কোনো মিশ্রণ সম্ভব নয়, অতএব) তোমাদের পথ তোমাদের জন্যে আর আমার পথ আমার জন্যে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আরববাসীরা খোদাদ্রোহী ছিলো না, অথচ তাদের কেউ আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় ও তাঁর সঠিক গুণাবলী সম্পর্কে জানতো না। তারা আল্লাহর পরমুখাপেক্ষী না হওয়া ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলো না। তারা শেরেক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিলো। তারা তাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও নেক লোকের নামে তৈরী করা মূর্তি ও দেবদেবীদের পূজা অর্চনা ও আরাধনা করতো, আর বিভিন্ন ফেরেশতাদের নামে তৈরী করা মূর্তিদের পূজা করতো।

তারা এ ধারণা করতো যে, ফেরেশতাকুল হচ্ছে আল্লাহর মেয়ে। তারা আরো মনে করতো যে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ও ওদের দেবীদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও সম্পর্ক রয়েছে। তারা এ সকল দেবদেবীকে উপ-খোদা মনে করতো। এ কারণে তারা এ সকল কল্পিত দেব-দেবী, মূর্তি ও ইলাহদের বন্দেগী করতো।

এমতাবস্থায় তারা ওই সকল দেব-দেবীর পূজা অর্চনা ও উপাসনা করাকে মহা শক্তিমান আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম পন্থা ও মাধ্যম মনে করতো। যেমন কোরআনে কারীমের অন্য এক আয়াতে তাদের উক্তি সম্পর্কে রয়েছে, 'আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার ঘনিষ্ঠ নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া, অপর কোনো উদ্দেশ্যে তাদের বন্দেগী করি না।'

কোরআনুল করীমে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, তারা আসমান ও যমীনের স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করতো। সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অনুগত বলে তারা স্বীকার করতো। তারা আরও স্বীকার করতো যে, আকাশের মেঘমালা থেকে বৃষ্টি নাযিল করে আল্লাহ তায়ালাই তৃষ্ণার্ত যমীনকে তৃপ্ত করেন, মৃত যমীনকে জীবিত, সতেজ ও সবুজ করেন। যেমন আল কোরআনে সূরা আনকাবুতের আয়াতে রয়েছে–

'তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো, কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে? সূর্য ও চন্দ্র কার অনুগত? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তারা বলবে আল্লাহ তায়ালার। তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো, আসমান থেকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মৃত যমীনকে সজীব করেন কে? নিশ্চয়ই তারা বলবে– আল্লাহ তায়ালা।' (সূরা আনকাবুত–৬২-৬৩)

কোনো কথা জোর দিয়ে বলার সময়ে, শপথ বা কসম করার সময়ে তারা বলতো, 'আল্লাহর কসম'। তারা তাদের দোয়ার সময় বলতো 'হে আল্লাহ'। (১)

অথচ, তারা কাজে-কর্মে, চিন্তা-ভাবনায়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে, তাদের চাষাবাদ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দেবদেবী ও মূর্তিদেরকে আল্লাহর শরীক ও অংশীদার মনে করতো। তাদের চতুষ্পদ জন্তু, সন্তান-সন্তুতির কমা বাড়ার ক্ষেত্রেও দেব-দেবী ও মূর্তিদেরকে অংশীদার মনে করতো। তারা তাদের নামে মানত করতো। তাদের কাছে সন্তান প্রাপ্তি রেযেক বৃদ্ধি ও গৃহপালিত প্রাণী বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতো। তাদের সন্তান-সন্তুতি, উৎপাদিত সকল গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে আল্লাহর জন্য ও দেবদেবীদের অংশ নির্ধারণ করতো। আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অংশ দেবদেবীদের নামে বন্টন করা হতো না। আবার দেবদেবীদের নামে নির্ধারিত অংশ আল্লাহর নামে বন্টন করা ও কোরবানী করা হতো না। এ প্রসংগে আল কোরআনে সূরা আনয়ামে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এই লোকেরা তাদের নিজেদের ক্ষেত খামারে উৎপাদিত ফসল থেকে ও গৃহপালিত প্রাণী থেকে আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্ধারিত করেছে। তারা বলে এ হচ্ছে আল্লাহর জন্য। এ সব কিছু তাদের (অমূলক) ধারণা ও কল্পনা মাত্র। (আর তারা বলতো এ অংশ হচ্ছে) আমাদের শরীকদের (দেবদেবীদের) জন্য। তারা মনে করতো তাদের মনগড়া শরীকদের অংশ থেকে আল্লাহর কাছে কিছুই পৌঁছায় না অথচ আল্লাহর নামে নির্ধারিত অংশ থেকে তাদের মনগড়া শরীকদের নিকট আবশ্যই কিছু পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। কতোই না জঘন্য এদের সিদ্ধান্ত!

এমনি ভাবে কল্পিত দেব-দেবীর অনুভূতি তাদের সন্তানদের বলি দেয়ার কাজকে কতোই না আকর্ষণীয় করে দিয়েছে। যেন তারা তাদের নিজেদেরকে ধ্বংসে নিমজ্জিত করে এবং তাদের দ্বীনকে তাদের জন্যে সন্দেহজনক বানিয়ে নেয়। আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তবে তারা এমনটি করতো না। কাজেই তাদেকে তুমি ছেড়ে দাও; তারা তাদের মনগড়া মিথ্যা রটনায় নিমজ্জিত থাকুক। (সূরা আনয়া'ম–১৩৬-১৩৭)।

তারা (মক্কার মোশরেকরা) মনে করতো, এ প্রাণীকূল এ ক্ষেতখামার (ফসল) তাদের জন্য সুসংরক্ষিত! তারা ভাবতো, এগুলো তারাই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে যাদেরকে তারা খাওয়াতে চায়, অথচ এসব বিধি নিষেধ ছিলো তাদের নিজেদের মনগড়া ও কল্পিত। এ ছাড়া এমন কিছু প্রাণী রয়েছে যেগুলোর পিঠে আরোহণ ও মাল বহন করাকে তারা নিজেদের জন্য হারাম করে

(১) তারা তাদের সন্তানদের নাম যেমন 'আবদুস শামস'–'সূর্যের গোলাম' রাখতো তেমনি 'আবদুল্লাহ' 'আল্লাহর গোলাম'ও রাখতো।–সম্পাদক।

নিয়েছে। আবার এমন কিছু প্রাণী রয়েছে, যাদের ওপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, এসব কিছুই তাদের আল্লাহর নামে বানানো কল্পিত মিথ্যা। আল্লাহ তায়ালা খুব শীঘ্রই তাদেরকে তাদের এ মনগড়া মিথ্যার বিনিময়ে উপযুক্ত! প্রতিফল দান করবেন।

আর তারা বলে, এ সকল প্রাণীর গর্ভে যা আছে, তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য। আর আমাদের নারীদের জন্য তা হারাম। আর যদি গর্ভে অবস্থিত প্রাণী মৃত হয় নারী ও পুরুষের জন্য তবে তা উভয়েরই জন্য হালাল। এ সব উদ্ভট! মিথ্যা, যা তারা রচনা করেছে। নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এর প্রতিফল দেবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

অবশ্যই তারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, যারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে, আর তাদের মনগড়া আইনের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া রেযেককে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে। আল্লাহর নামে মিথ্যা রটনা করে নিশ্চিতভাবে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। কষ্মিনকালেও তারা হেদায়াতপ্রাপ্তদের তালিকাভূক্ত ছিলো না।'(সূরা আনয়া'ম-১৩৮-১৪০)।

অথচ এমন সব বিভ্রান্তি, ভ্রষ্টতা ও শেরেকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে বলে বিশ্বাস করতো। তারা আরও মনে করতো যে,তারা ইহুদী নাসারা তথা আহলে কেতাবদের চেয়ে শ্রেয়। তাদের সাথে বসবাসকারী ইহুদীরা বলে, হযরত ওযায়ের (আ.) আল্লাহর পুত্র আর নাসারারা বলে ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। এমতাবস্থায় মক্কার মোশরেকরা ফেরেশতা এবং দেবদেবীর বা জিনের পূজা করতো। তারা মনে করতো যে, ঈসা (আ.) ও ওযায়ের (আ.)-এর তুলনায় ফেরেশতাকুল, জ্বিনেরাও দেবদেবীরা আল্লাহ তায়ালার বেশী ঘনিষ্ট ও নিকটতর। বস্তুত গায়রুল্লাহর এবাদাতে লিপ্ত হওয়াই শেরেক। মোশরেক ও আহলে কেতাব উভয় সম্প্রদায় প্রকাশ্য শেরেকে লিপ্ত ছিলো। শেরেক কোনোটাই উত্তম নয়, শেরেকের মধ্যে কোন কল্যাণই নিহিত নেই। অথচ মোশরেকরা দেবদেবীদের পূজা করে এ আত্মতৃপ্তি অনুভব করতো যে, তারাকোনো মানুষকে আল্লাহর সাথে শরীক না করে দেবদেবী ও ফেরেশতাদেরকে শরীক করার কারণে তারা অনেক বেশী হোদায়াতপ্রাপ্ত এবং দৃঢ়ভাবে সঠিক ও সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

আরবে যখন শেষ নবী মোহাম্মাদ (স.)-এর আবির্ভাব হলো, নবুওতের ঘোষণার পর তিনি এ দাবী উত্থাপন করলেন, তার উপস্থাপিত দ্বীন-ই হচ্ছে ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীন। তখন মক্কার মোশরেকরা বললো, যদি মোহাম্মদ (স.)-এর উপস্থাপিত দ্বীন, দ্বীনে ইবরাহীম-ই হয়ে থাকে তবে আমাদের দ্বীন পরিবর্তনের কোনো যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তাই নেই। কেননা আমরা তো দ্বীনে ইবরাহীমেরই অনুসারী। উপরন্তু তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এ দাবী ও শর্ত নিয়ে হাযির হলো যে, তুমি যদি দ্বীনে ইবরাহীমের দাওয়াত নিয়েই এসে থাকো তবে তুমি আমাদের দেব-দেবীদের পূজা করে এদের বন্দেগী ও উপাসনা করো, এদের দূর্ণাম রটনা, অপবাদ দেয়া ও মন্দ বলা বন্ধ করো। যদি তুমি আমাদের দেব-দেবীদের পূজা করো তবে আমরাও তোমার আল্লাহর এবাদাত করবো। তুমি যদি আমাদের ইলাহদের স্বীকৃতি দাও তবে আমরা তোমার আল্লাহকে মেনে চলবো। এমনিভাবে আমাদের মাবুদ ও তোমার মাবুদের এবাদাতের ভিত্তিতে আমরা একটা সমঝোতা, সমন্বয় ও সন্ধিতে উপনীত হতে পারবো। তারা প্রস্তাব উত্থাপন করলো, তুমি আমাদের রীতিনীতি, পদ্ধতি ও আমাদের মাবুদদের পূজা-অর্চনাকে মেনে নাও আমরা তোমার আল্লাহর এবাদাত করবো, তোমার কিছু নিয়মনীতিকে মেনে চলবো। এভাবে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে সমঝোতার একটা মাঝামাঝি পথ বা একটি নিরপেক্ষ পথ আমরা অবলম্বন করতে পারবো।

এভাবে আল্লাহ্ ও গায়রুল্লাহ্র তথা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের অভিনব সংমিশ্রণের মাধ্যমে এক উদ্ভট মিলনের প্রস্তাব তারা রসূলের কাছে উত্থাপন করলো। তাদের ধারণা মতে তারা মনে করতো, তারা নিজ নিজ মাবুদদের সাথে এক আল্লাহর স্বীকৃতি দিলে এতে উভয়ের মতই গুরুত্ব লাভ করবে। এভাবে তারা একটা সমঝোতা, সমন্বয় ও উভয় বন্ধ হবে। এবাদাতের ক্ষেত্রে জীবন পদ্ধতি, চিন্তা অনুভূতি, ক্রিয়াকান্ড, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মহামিলনের পথ উন্মোচিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা মক্কার মোশরেক পৌত্তলিকদের প্রস্তাবিত ইসলাম ও জাহেলিয়াত তথা তাওহীদ ও শেরেকের অভিনব মিলন, সমঝোতা ও সন্ধির এ উদ্ভট প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে এ সূরা নাযিল করেছেন। এ সূরা কোনো নিরপেক্ষ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়– ইসলাম ও জাহেলিয়াত, তাওহীদ ও শেরেকের মধ্যে মিশ্রনের ভিত্তিতে সমঝোতা ও সন্ধির সমর্থনে নাযিল করা হয়নি; বরং তাওহীদ, শেরেক, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে আল্লাহ গায়রুল্লাহর এবাদাতের মিশ্রণকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে। বাতিলের বিরুদ্ধে হকের সমঝোতার উদ্যোগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেই আল্লাহ তায়ালা সূরা 'কাফেরুন' নাযিল করেছেন। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে সমঝোতা ও সন্ধি অসম্ভব। আল্লাহ ও গায়রুল্লাহর এবাদাতের মধ্যে মিল সৃষ্টির কোনো উদ্যোগ কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য নয়। এ সূরায় বারংবার এ সিদ্ধান্তের পুনরুল্লেখ ঘোষিত হয়েছে।

কাফেরদের উত্থাপিত সকল প্রস্তাবনাকে এ সূরার প্রতিটি আয়াতেই দ্ব্যর্থহীনভাবে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। একক ও এককের অধিক সংখ্যার মধ্যে কোনো মিলন সংঘটিত হতে পারে না। তাওহীদ ও শেরেক দু প্রান্তের চিন্তার মধ্যে কোন সমতা, সমঝোতা, সন্ধি কোনোমতেই হতে পারে না, তা সূরায় স্পষ্টভাবে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরায় তাওহীদ ও শেরেকের সুস্পষ্ট রূপরেখা অংকিত ও চিত্রিত হয়েছে। সর্বশেষ এককের সাথে সংখ্যাধিক্যের সমতা কখনো সম্ভব নয় এ সত্যই এ সূরায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

তাফসীর

এরশাদ হচ্ছে, 'বলে দাও হে রসূল!' এ নির্দেশসূচক বাক্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এটি চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার ওহীভিত্তিক প্রত্যাদেশ। আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে মোহাম্মদ (স.)-এর নিজস্ব মতামত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করার কোনো অধিকার নেই। আল্লাহর তরফ থেকে তাদেরকে তুমি নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দাও, এ হচ্ছে সে মহান ও শক্তিমান এক আল্লাহর ঘোষণা ও নির্দেশ , যাঁর নির্দেশকে প্রতিরোধ করার মতো কোনো শক্তি কারো নেই, যার হুকুম অপ্রতিরোধ্য, যার হুকুমকে বাতিল করার ক্ষমতা কারো নেই।

এ আয়াতে কাফেরদেরকে তাদের যথার্থ উপাধিতে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে তাদের প্রকৃত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেই আহ্বান জানানো হয়েছে। কেননা তারা সত্য দ্বীনের অনুসারী নয় এবং তারা সত্য ও সঠিক আদর্শে বিশ্বাসীও নয় বরং সত্য গোপনকারী, সত্যের বিরোধী ও সত্য আদর্শে অবিশ্বাসী, তাই তাদেরকে 'কাফেরুন' বলে ডাকা হয়েছে। আর যেহেতু তারা সত্য গোপনকারী, মিথ্যাশ্রয়ী, তাই তোমার ও তাদের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ দুই পরস্পর বিরোধী মত ও পথের মধ্যে কোনোক্রমেই সমঝোতা ও মিল হতে পারে না। হক ও বাতিলের মধ্যে সন্ধি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

শেরেক ও তাওহীদের চূড়ান্ত ব্যবধান

তাওহীদ ও শেরেকের মধ্যে চূড়ান্ত ব্যবধান সৃষ্টির লক্ষে সূরার প্রথম সম্বোধনের সূচনাতেই এমন এক বাক্য সংযোজন করা হয়েছে যে, দুই পরস্পর বিরোধী বিচ্ছিন্ন মতাদর্শের মধ্যে কোনক্রমেই মিলের আশা করা যায়না।

এ দুই বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা আদৌ সম্ভবপর নয়। এরশাদ হচ্ছে যে, 'আমার এবাদাত ও তোমাদের এবাদাত এক ধরনের নয়, আমার মাবুদ ও তোমাদের মাবুদও এক ও অভিন্ন নয়।'

'আর তোমাদের এবাদাতের পদ্ধতি ও আমার এবাদাতের পদ্ধতি এক নয়, আর তোমাদের মাবুদ ও আমার মাবুদও এক এবং অভিন্ন নয়।'

এটি দ্বারা প্রথম বাক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং 'আমি' নামবাচক বিশেষ্যের উল্লেখ করে দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্বের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে, আমিও কোনো অবস্থায়ই দেব-দেবী ও মূর্তিদের এবাদাতে লিপ্ত হতে পারি না। তোমাদের মনগড়া ও কল্পিত মিথ্যা মাবুদদেরকে আমার পক্ষে মাবুদ হিসাবে মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

এ আয়াতটি পুনরুল্লেখের মাধ্যমে দ্বিতীয় বাক্যটির প্রতি আরো অধিক জোর ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় একই বাক্য একাধিকবার উল্লেখের মাধ্যমে এর প্রতি অধিক গুরুত্বাআরোপ করা হয়। এখানেও একই কথা বারবার উল্লেখ করে কথাটির গুরুত্ব পাঠকের মনে এতদূর বদ্ধমূল করতে চাওয়া হয়েছে যে, এ ব্যাপারে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ না থাকে। তাই বারংবার তাকিদ ও পুনরুল্লেখ করে হক ও বাতিলের সমঝোতা ও সন্ধির সকল সম্ভাবনার দ্বারকে কঠোরভাবে রুদ্ধ করা হয়েছে।

অতপর সামগ্রিকভাবে চূড়ান্ত ও প্রকৃত সত্য উদঘাটিত করে বলা হয়েছে, এ দুটোর মধ্যে এতো বেশী দূরত্ব বর্তমান যে কোনোক্রমেই এ'দুয়ের মধ্যে মিল, সমঝোতা ও সন্ধি হতে পারে না। সত্য ও মিথ্যা, ইসলাম ও কুফর, তাওহীদ ও শেরেকের মধ্যে এতো বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান যে, এদূ'য়ের মিলনের কোনো দৃষ্টান্তও নেই, আর এ দু'য়ের মধ্যে মিল ও সংমিশ্রণের কল্পনাও করা যায় না।

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, তোমাদের দ্বীন তোমাদের রীতি-নীতি পদ্ধতি ও আমার গৃহীত ও প্রচারিত দ্বীন, রীতি-নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে কোনোক্রমেই সমঝোতা, সন্ধি ও মিল করা সম্ভব নয়, তখন তোমরা তোমাদের অবস্থানে থাকো, আমি আমার অবস্থানে দৃঢ়ভাবে থাকবো, তোমরা ওপারে থাকো, আমি এপারে আছি। এ দু'য়ের মিলের জন্য মাঝখানে কোনো মিলন-পথ ও সেতুবন্ধ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

আর এ সূরায় উল্লেখিত পার্থক্য, ব্যবধান, স্বাতন্ত্র ও সুস্পষ্ট বিরোধ ও দূরত্বের ঘোষণা প্রদান, জীবন পথের নির্ভুল সন্ধান ও সঠিক দিশা প্রাপ্তির জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় ছিলো। কারণ এ বিরোধ ও পার্থক্য এমনি মৌলিক যার মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়, অকল্পনীয় ও অসম্ভব ব্যাপার। এ দুটো সংঘাতমুখর পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের মধ্যে কোনো মিল ও সেতুবন্ধনই সৃষ্টি করা যায় না। এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। এ পার্থক্য মৌলিক চিন্তা-বিশ্বাসের পার্থক্য, মৌলিক অনুভূতি, জীবন বোধ, চেতনা, পদ্ধতি, আচরণ, প্রবৃত্তি ও পন্থার পার্থক্য।

তাওহীদ এক স্বতন্ত্র চলার পথ ও শেরেক এক ভিন্নধর্মী চলার পথ। মানব প্রবৃত্তি ও জীবনধারার মধ্যে এ দুই বিপরীতমুখী মতাদর্শের অবস্থান কস্মিনকালেও সম্ভব নয়, এ দু'য়ের একীভূত করাও কল্পনাতীত।

তাওহীদ হচ্ছে শেরেকমুক্ত একত্ববাদের পথ। তাওহীদ হচ্ছে সমগ্র জীবনধারা আল্লাহমুখী হওয়ার পথ। তাওহীদ-বিশ্বাস এমন এক চিন্তা, চেতনা, প্রত্যয় ও জীবনপদ্ধতি যা মানুষকে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে তোলে। মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, জীবনাদর্শ, মানদন্ড,

মূল্যবোধ, অনুভূতি, চেতনা, শিষ্টাচার, আচরণ ও নৈতিকতা এবং চরিত্র সকল পর্যায়ে তাওহীদের প্রভাবে ও বিশ্বাসের বুনিয়াদেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তাওহীদ এমন কেন্দ্রবিন্দু, যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র জীবন আবর্তিত হয়। তাওহীদ বিশ্বাস এমন এক নিয়ন্ত্রণকক্ষ, যা গোটা জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করে। এ তাওহীদ বিশ্বাসই এর প্রতি প্রত্যয়শীল প্রতিটি মানুষকে আল্লাহপ্রাপ্তি ও আল্লাহর সাথে মিলনের তৃপ্তি ও স্বস্তি প্রদান করে। লা-শরীক আল্লাহ– একক অদ্বিতীয়। তাই তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষ এক আল্লাহর পথকে জীবনপদ্ধতি হিসাবে বেছে নেয় এবং সে তাওহীদ ভিত্তিক জীবনাদর্শের প্রতি দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। তার বিশ্বাস ও চেতনায়, কর্ম প্রেরণায়, ক্রিয়াকান্ডে তার ভেতর ও বাহির সবকিছুই তাওহীদের আলোকে ও তাওহীদের প্রভাবেই পরিচালিত হয়। প্রকাশ্য ও গোপন সকল পর্যায়েই তাওহীদের প্রভা ও জ্যোতি দ্বারা জীবন উদ্ভাসিত হয়। তার ভেতর বাইর, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তাওহীদের সাথে শেরেকের জাল ও সংমিশ্রণ দ্বারা দূষিত ও প্রভাবিত হয় না। সে সহজ সরল পথেই সর্বদা জীবন অতিবাহিত করে।

আর এ পার্থক্য আহবানকারী ও আহুতদের মধ্যে সুস্পষ্ট হওয়া জরুরী। এ পার্থক্য সুস্পষ্ট না হলে ইসলামী ও জাহেলী চিন্তা চেতনার মধ্যে মিশ্রণ ঘটে যেতে পারে। বিশেষ করে সে গোষ্ঠীর মাঝে এটি আরও পরিচ্ছন্ন হওয়া অপরিহার্য, যারা সঠিক আকীদার সাথে পরিচিত হওয়ার পর তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আর তারা ছিলো এমন জনগোষ্ঠী, যারা মোমেন জনগোষ্ঠীর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। নিছক অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে সত্যকে বর্জন করেছে। এরা এমন দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলো যারা সঠিক আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন ছিলো না। তথাপি তারা মনে করতো, তারা হেদায়াতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত আছে। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো ন্যায়, সত্য ও হেদায়াত বর্জনকারী। তাদের আকীদা-বিশ্বাস ছিলো সংমিশ্রিত। তাদের ক্রিয়াকান্ড ছিলো, ভাল-মন্দ মিশ্রিত। এতদসত্ত্বেও তারা অহমিকায় লিপ্ত ছিলো যে, তারাই সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথের অনুসারী। আর এ মিথ্যা অহমিকাই ছিলো তাদের বিভ্রান্তির বড় কারণ। এটিই ছিলো সবচেয়ে আশংকাজনক।

জাহেলিয়াত, সম্পূর্ণটাই জাহেলিয়াত। আর ইসলাম সবটাই ইসলাম। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর, দূরত্ব অনেক। ইসলামে প্রবেশ করতে হলে জাহেলিয়াত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে হবে, আর ইসলামকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে। ইসলামকে গ্রহণ করতে হলে জাহেলিয়াতের সকল রজ্জুকে ছিন্ন করে এবং সকল প্রতিবন্ধকতা চূর্ণ বিচূর্ণ করে পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করতে হবে।

ইসলামে দাখিল হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, জাহেলিয়াতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে জেনে শুনে এবং সচেতনতার সাথে এবং স্বতস্ফূর্ত ও পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে জীবনের পদ্ধতি ও কর্মনীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। জাহেলিয়াতের সাথে সহ অবস্থানের কোনো মাঝামাঝি পথ ইসলামে নেই। জাহেলিয়াতের সহযোগিতার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই।

বরং জাহেলিয়াতকে বর্জন করে যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করবে তাকে জাহেলিয়াতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখেল হতে হবে। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ও উভয়ের মধ্যে সমঝোতা ও সন্ধির মাধ্যমে মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বনের অনুমোদন ইসলামে নেই। ইসলামের সৌন্দর্যকে গ্রহণ করতে হলে জাহেলিয়াতকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের এ সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভই এ দাওয়াতের সঠিক চেতনা ও উপলব্ধির বুনিয়াদী স্তম্ভ। জাহেলিয়াত একটি ভ্রান্ত নীতি; আর ইসলাম এক স্বয়ংসম্পূর্ণ

ও পূর্ণাংগ জীবন দর্শন। তাই শেষোক্ত এ ঘোষণাই উচ্চারিত হয়েছে মোশরেকদের জন্য তাদের ধর্ম ও তাদের মতাদর্শ আর রসূলের জন্য রয়েছে তার নিজস্ব ধর্ম ও জীবন পদ্ধতি। মোশরেকরা তাদের পদ্ধতি অনুসরণ করবে, আর রসূল (স.) তাঁর নিজস্ব জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করবেন, তাদের জন্যে তাদের দ্বীন, আর রসূলের জন্য রসূলের দ্বীন। এ দুই জীবনধারা একই ধারায় প্রবাহিত হওয়া কখনও সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনধারা অনুযায়ী চলবে। মোশরেকদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী উভয় মতাদর্শের মধ্যে কোনো সন্ধি প্রস্তাব কোনোমতেই অনুমোদনযোগ্য নয়। এক মতাদর্শের মধ্যে অন্য মতাদর্শের বিন্দুমাত্র অনুপ্রবেশের কোনো অবকাশ নেই।

ইসলামকে গ্রহণ করতে হলে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে, আর বর্জন করতে হলেও পুরোপুরি বর্জন করতে হবে। এ সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত ঘোষণাই আয়াতে বলা হয়েছে।

এ দ্ব্যর্থহীন চ্যালেঞ্জ যেমন তদানীন্তন যুগে ছিলো, আজকের যুগের দায়ী ইলাল্লাহর নিকটও এ ঘোষণা এক চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ। আজকের দিনেও এ চিরন্তন ব্যবধান ও পার্থক্য সমভাবে প্রযোজ্য। আজকেও যারা ইসলামের অনুসারী হওয়ার দাবীদার তাদেরকে অবশ্যই জাহেলী পরিবারের সকল বন্ধন ও প্রভাবমুক্ত হয়ে জাহেলিয়াতের সকল রজ্জু ছিন্ন করে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। অনেকেই এ সত্য উপলব্ধি করে এবং এ আকীদাকে বুঝে সত্য গ্রহণের প্রবল আকাংখা তার হৃদয়ে জাগ্রত হয় কিন্তু এরপর পুনরায় তার অন্তর পাষাণে পরিণত হয় এবং আবার তারা সীমালংঘন করে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

'অতপর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেলো এবং তাদের অনেকেই সীমালংঘন করলো।'

আর এ দুটি পরস্পর বিরোধী পথের মধ্যে মিশ্রণ ও মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বনের কোনো সুযোগ নেই। নেই শেরেকের ক্রটি সংস্কারের কোনো সুযোগ। নেই এ দুয়ের মিলনের কোনো পন্থা।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান দাওয়াতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্তমান। ইসলাম তার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়েই টিকে আছে। জাহেলিয়াতের সাথে কোনোক্রমেই এবং কোনো স্তরেই তার কোনো মিল নেই।

বলা হয়েছে আমার দ্বীন হচ্ছে নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক দ্বীন। এর চেতনা, আকীদা, পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণা, আইন-বিধান, চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ আল্লাহর দেয়া। এতে শেরেকের বিন্দুমাত্র লেশ নেই। এর কোনো স্তরে এবং কোনো পর্যায়ে শেরেকের কোনো স্পর্শও নেই। কোনো দূর্বল ধ্যান ধারণা, কোনো নমনীয়তা, শেরেকের কোনো প্রকার মিশ্রণ, শেরেকের কোনো প্রভাব ইসলামী দাওয়াতের সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত হতে পারে না।

ইসলামী জীবনাদর্শ, এর অদম্য সাহসিকতা, বীরত্বব্যঞ্জক মানসিকতা এবং আপোষহীন দৃঢ়তা, প্রচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র বজায় রাখা ছাড়া প্রতিষ্ঠিতই হতে পারেনা।

তাই ইসলামী দাওয়াতের প্রথম স্তরেই এ চিরন্তনী ঘোষণা জানিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন। এ দু'য়ের সংমিশ্রণ বা সমঝোতা ও সন্ধির কোনো পথই খোলা নেই।

সূরা আন্ নাসর

আয়াত ৩ রুকু ১

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ
أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. যখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসবে, ২. তখন মানুষদের তুমি দেখবে, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে, ৩. অতপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা করো এবং তাঁর কাছেই (গুনাহ খাতার জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো; অবশ্যই তিনি তওবা কবুল করেন (পরম ক্ষমাশীল)।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সূরা কাওসারের অনুরূপ এটিও কোরআনুল কারীমের একটি ছোটো সূরা। মাত্র ৩টি আয়াতসম্পন্ন এ সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে, আল্লাহর সাহায্য, বিজয় ও দলে দলে লোকদের ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আগাম সুসংবাদ নাযিল করেছেন। মূলত এটি আল্লাহর মদদ, বিজয় ও ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুসংবাদবাহী সূরা। এ সূরায় সাহায্য ও বিজয়প্রাপ্তির লগ্নে রসূলল্লাহ (স.)-কে আল্লাহর শোক্রিয়া প্রকাশ আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর প্রবিত্রতা বর্ণনা ও মাগফেরাত কামনায় মনোনিবেশ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিজয়োল্লাসে আনন্দে মাতোয়ারা না হয়ে মহান আল্লাহর শোকরিয়া, হামদ, তাসবীহ ও মাগফেরাত কামনার মাধ্যমে বিনয়, নম্রতা, দীনতা, হীনতা প্রকাশের মহান মানবীয় গুণাবলীর প্রতি হুযুরে পাক (স.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এমনিভাবে এ ছোট্ট সূরাটিতে বিজয়লগ্নে ইসলামী জীবন-চেতনার অনুসারী আল্লাহর দ্বীনের প্রত্যয়শীল জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে হাবীবে পাক (স.) প্রদর্শিত এমন সব উজ্জ্বল গুণাবলী অর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানব সভ্যতার কোনো স্তরেই বিজয়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত ও বিজয়ের আনন্দে উল্লাসিত জনতার মধ্যে আশা করা যেতে পারে না। এ সূরায় এমন সব মহান উজ্জ্বল উন্নত মানবীয় গুনাবলী যথা সম্মান, মর্যাদা, বিনয়, নিষ্ঠা, একাগ্রচিত্ততা, আত্ম-সংযম, আত্ম-নিয়ন্ত্রন, উদারতা, বিজয় উল্লাসে মদমত্ত না হওয়া এবং হামদ তাসবীহ, মাগফেরাত ও তাওবায় লিপ্ত হওয়ার মতো এত উন্নত পর্যায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্টমন্ডিত হওয়ার

আদেশ প্রদান করা হয়েছে, যা একমাত্র ইসলামী জীবনদর্শনের স্বাভাবিক পদ্ধতি, প্রবৃত্তি, মননশীলতা ও দর্শনের সাথেই সামঞ্জস্যশীল। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কখনও মানুষ নৈতিক উৎকর্ষের এত শীর্ষ স্থানে আরোহণ করতে পারে না– পারে না মর্যাদা, সম্মান ও মহত্ত্বের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হতে।

এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে আমি এখানে ইমাম আহমদ সংকলিত হাদীস গ্রন্থের রেওয়ায়াতের উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি রেওয়ায়াত করেন যে, আমাদের কাছে মোহাম্মদ ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন, তিনি দাউদ থেকে, দাউদ শাবী থেকে, শাবী মাসরুক থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। মাসরুক বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর জীবনের শেষ সময়ে বেশী করে এ দোয়া পাঠ করতেন।

'সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহী আসতাগফিরুল্লাহে ওয়া আতুবু ইলাইহে' অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র, তাঁর জন্যে সব প্রশংসা, আমি আমার গুনাহর জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছেই আমি তাওবা করছি– তিনি এ কথাও বলেছেন, আমার প্রভু আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন, এ লক্ষণগুলো দেখলে আমি যেন আল্লাহর তাসবীহ, তাহমীদ, মাগফেরাত ও তাওবায় রত হই। অর্থাৎ উপরোল্লেখিত দোয়া বেশী বেশী করে পাঠ করি।

'আর যখন তুমি দেখতে পাবে যমীনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হয়েছে, তখনি তুমি এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, আল্লাহর সান্নিধ্যে তোমার ফিরে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আল্লাহর সাহায্য, বিজয় ও দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে দাখিল হওয়ার এ মর্মই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলাম তার পরিপূর্ণ আদর্শ নিয়ে বিজয়ী হওয়ার তাৎপর্যই হলো যে, সর্বশেষ রসূলের এ ধরার বুক থেকে অন্তর্ধানের সময় ও আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে বর্ণিত ফাত্হ্ (বিজয়) বলতে মক্কা বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। এটি একজনের একটি উক্তি। আরবের যেসব ক্বাবীলাসমূহ, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মক্কা-বিজয়ের অপেক্ষায় ছিলো, তারা বলতো, 'যদি সে তার জাতির ওপর বিজয়ী হয় তাহলে বুঝবো অবশ্যই সে নবী। তারপর যখন আল্লাহ তায়ালা মক্কা বিজয় দান করলেন তখন তারা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগলো। এরপর দু'বছর যেতে না যেতেই গোটা আরব উপদ্বীপ ঈমানের শরবত আকণ্ঠ পান করলো এবং সমগ্র আরবের কবীলাগুলো ইসলামের সমুজ্জ্বল বাতির বাইরে আর কেউ রইলো না এ বাতির প্রদীপ্ত আভায় সমুজ্জ্বল হয়ে গেলো তাদের জীবন। আলহামদু লিল্লাহ্ আল্লাহ তায়ালারই যাবতীয় প্রশংসাও কৃতিত্ব এবং তাঁর এহ্সানে আমরা ধন্য।

আমর্ ইবনে সালামার্ বরাত দিয়ে ইমাম বোখারী তাঁর কেতাব সহীহ বোখারীতে রেওয়ায়াত করেছেন, মক্কা বিজিত হলে প্রত্যেকটি ক্বাবীলা ও গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো। আর ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মক্কা-বিজয়ের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান ক্বাবীলাগুলোও বলতে লাগলো, 'এবারে তার জাতিকে বুঝতে দাও (অর্থাৎ, বুঝুক তার জাতি এবার) যে অবশ্যই তিনি নবী।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য রেওয়ায়াতটি সূরা নাসর-এর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এতে এরশাদ হয়েছে– 'যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এসে যাবে..... শেষ পর্যন্ত।' সুতরাং, সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়েই এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ইংগিত পাওয়া যায় যা অবশ্যই পরবর্তীতে সংঘটিত হবে। এ বিষয়ে নবী (স.) তখনই এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যখন তিনি এই সুসংবাদ ও এই ইংগিত পেয়ে গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আর একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, যাতে আমরা সহজেই দেখতে পাই দুটি রেওয়ায়াতের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান। ইমাম বোখারী বলেন, একটি হাদীস মূসা ইবনে ইসমাঈল আমাদেরকে শুনিয়েছেন, তাঁদের বলেছেন আবূ উয়ানাহ্, তিনি পেয়েছেন আবূ বাশার থেকে। এই আবূ বাশার সাঈদ ইবনে জোবায়ের থেকে পেয়েছেন। আর তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, ওমর (রা.) কিছু সংখ্যক বদ্‌রী বুযুর্গ (মুরুব্বী শ্রেণীর) ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে আমার কাছে আসতেন। এতে কারো কারো মনে একটু বেখাপ্পা (খারাপ) লাগলো। একজন বলেই ফেললেন, আমাদেরও তো এ বয়সী ছেলেরা আছে, এ ছেলেটা কেন আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে?' তখন ওমর (রা.) বললেন, হাঁ আছে, তবে এ বাচ্চাটা একটু ব্যতিক্রম। তোমাদেরকে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এই বাচ্চাটাকে সেই একই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা জানো এই বাচ্চাটাও তাই জানে। (সুতরাং এটা সাধারণ বাচ্চা নয়)। পরবর্তী আর এক দিন তিনি এ মুরব্বীদেরকে ডাকলেন এবং সেখানে আমাকেও রাখলেন। তখন আমি বুঝলাম, আসলে তিনি তাদেরকে সেদিন কিছু দেখাতে চাচ্ছিলেন। তাই বললেন, আল্লাহ পাকের বাণী 'ইযা জাআ নাসরুল্লাহে ওয়াল ফাত্‌হু' সম্পর্কে আপনারা কী বুঝেন বলুন দেখি। তাঁদের মধ্যে কেউ বললেন, যখন আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় আসবে তখন আমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রশংসা করতে এবং তাঁর কাছে এস্তেগফার করতে আদেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ কিছু না বলে চুপ থাকলেন। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে আব্বাসের বেটা, তুমিও কি ওদের মতো একই কথা বলতে চাও? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে বলো তুমি কী বলতে চাও। বললাম, এ সূরাটি রসূল (স.) এর মৃত্যুর কথা ভবিষ্যদ্বাণী করছে। (অর্থাৎ তিনি অবিলম্বে ইন্তেকাল করবেন এ ঘোষনা দিচ্ছে)। সূরাটি দ্বারা তাঁকে এ কথাটি জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন, 'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন বুঝবে সেটাই তোমার মৃত্যুর সংকেত। অতএব 'তোমার রবের প্রশংসা ও কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করে তাঁর তাসবীহ্ (পবিত্রতার ঘোষণা) জপতে থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হও, নিশ্চয়ই তিনি তাওবা গ্রহণকারী।' তখন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, 'তুমি যা বলেছো এর থেকে বেশী কিছু জানিনা।' (বোখারী একটি ব্যক্তি-সূত্র থেকে হাদীসটি পেয়েছেন)। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সংকেত পেয়ে গেলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, যে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো তা পূর্ণ হয়ে গেছে, আর তিনি শীঘ্র তাঁর রবের সাথে মিলিত হবেন। এটাই ছিলো ইবনে আব্বাসের বোধগম্য অর্থ। অর্থাৎ রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের ভবিষ্যদ্বাণী সূরাটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন।

অবশ্য হাফেয বায়হাকী তাঁর সংকলিত বায়হাকীতে সূরা 'নাসরের' শানে নযুল প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরা নাসর অবতীর্ণের পর রসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর নয়ন পুতুলী ফাতেমা (রা.)-কে তাঁর কাছে ডেকে এনে বললেন, শোনো মা ফাতেমা, আমি জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়েছি। এ কথা শুনে হযরত ফাতেমা (রা.) প্রথমে, কাঁদলেন এবং পরক্ষণেই হাসলেন। তার প্রথম কান্না এবং পরক্ষণেই হাসার কারণ ব্যাখ্যা করে হযরত ফাতেমা (রা.) বলেছেন, আব্বা যখন আমাকে এ সংবাদ দিলেন যে, তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তখন আমি কেঁদেছি, পরক্ষণেই তিনি বললেন, তুমি ধৈর্য্য ধারণ করো, (সংযত হও)। আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার মৃত্যুর পর আমার সাথে মিলিত হবে, তখনই আমি হেসেছি।

উক্ত হাদীস থেকে আমরা এ সূরার শানে নযুল ও অবতীর্ণকালীন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে স্থিরভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি যে, যখন সূরা নাসর নাযিল হলো তখন বুঝা গেলো যে, মক্কা

বিজয় আসন্ন, দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে। আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে কায়েম হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন নাযিল করেছেন, রসূল (স.) প্রেরণ করেছেন ও দ্বীনরূপী নেয়ামত উপহার দিয়েছেন, তা সফল হয়েছে। আল্লাহর সাহায্যে বিজয় সূচীত হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় হাবীব যখন বুঝতে পারলেন যে বিজয়ের নিদর্শন সুস্পষ্ট দেখা দিয়েছে তখন তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, তাঁর অন্তর্ধানের সময় নিকটতর হয়ে এসেছে। এ দুটো হাদীসের মূল বক্তব্য ও মর্ম প্রায় কাছাকাছি। তবু বিভিন্ন হাদীস ও আল কোরআনের ভাষ্য অনুসারে সূরা নাসর-এর শানে নুযুল প্রসংগে হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস অপর এক ঘটনা প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে এবং উম্মে সালমা (রা.) বর্ণিত হাদীসেও এ মতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং অপরাপর হাদীসে একই মতের উল্লেখ রয়েছে।

উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) মক্কা বিজয়ের পর হযরত ফাতেমা (রা.)-কে ডেকে কানে কানে কি কথা যেন বললেন, ফাতেমা (রা.) কাঁদলেন। আবার রসূলুল্লাহ (স.) ফাতেমার কানে কি কথা বললেন, এবার ফাতেমা (রা.) হাসলেন। রসূলুল্লাহ (স.) ইন্তেকালের পরে হযরত উম্মে সালমা (রা.) ফাতেমা (রা.)কে হাসা ও কান্নার কারণ জিজ্ঞাস করলে উত্তরে ফাতেমা (রা.) বললেন, তিনি প্রথম আমার কানে কানে বলেছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এ পৃথিবী থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাবেন। তখন আমি কেঁদেছি। এর পরেই তিনি আমার কানে কানে বললেন তুমি বেহেশতের সকল রমণীকুলের নেত্রী (একমাত্র ইমরান দুহিতা মরিয়ম ছাড়া)। (তিরমিযী)।

উল্লেখিত বর্ণনার সাথে কোরআনুল করীমের আয়াতের সাথে মিল রয়েছে। এবং সহীহ্ মুস-লিম শরীফে সংকলিত ইমাম আহমদ (র.) বর্ণিত হাদীসের সাথেও হুবহু মিল রয়েছে। কারণ যে নিদর্শন দেখার পর রসূলে পাক (স.) হামদ, তাসবীহ, এস্তেগফার ও তাওবায় লিপ্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং শেষ জীবনে যে আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স.) 'সুবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম' দোয়া বেশী করে অযীফা করতেন, সে আলামত বা নিদর্শন আর কিছুই নয়; তা হচ্ছে 'ইযা জাআ..... তাওয়াবা।' যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের নিদর্শন প্রকাশ হয়েছে তখন তিনি এও উপলব্ধি করলেন যে, আল্লাহর সান্নিধ্যে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি ফাতেমা (রা.)-এর কানে কানে একথা বললেন, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

এ ক্ষুদ্র সূরাটির মোদ্দা কথা হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর দৃষ্টি সাহায্য, বিজয় ও দলে দলে লোক ইসলামে দীক্ষিত হতে দেখলেই এ সত্য উপলব্ধি করা যে, যে মহান পয়গাম ও দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে প্রেরণ করেছেন তা সমাপ্তি পর্যায়ে এসে গেছে। তাঁকে দায়িত্ব সম্পাদনের পর বিরহের অনলে জ্বলে-পুড়ে অব্যক্ত ব্যথা বেদনায় জর্জরিত হওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। পরম প্রিয়জনের সান্নিধ্যে প্রত্যাবর্তনের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তাই এ সময় সে মহান প্রভুর হামদ, তাসবীহ মাগফেরাত ও তাওবার মাধ্যমে অতিবাহিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

তাফসীর

'ইযা জাআ.....তাওয়াবা' সূরা এক বিশেষ অনুভূতি ও চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বের ঘট-নারাজির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবাদের যুগে ইসলামী দাওয়াতের বিজয় ও প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে এক নবতর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ইসলামী দাওয়াতের চূড়ান্ত বিজয়ের এক অভিনব তাৎপর্য ও মর্ম উপলব্ধি করার পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

কৌশল বা অস্ত্রবল নয় বিজয় আল্লাহর হাতে

এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা, করা হয়েছে যে, বিজয় কখনো জনশক্তি বা অস্ত্রবলে হয় না, বরং বিজয়ের উৎস ঈমান বিল্লাহ। কাংখিত বিজয় ইসলামী কাফেলার প্রত্যাশা দিয়ে আসে না। এ জন্য দায়ী ইলাল্লাহদেরকে শ্রম, প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু বিজয় আসে একমাত্র আল্লাহর মরযী ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। আল্লাহর নুসরাত ও মদদই হচ্ছে বিজয়ের একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা করেন সিদ্ধান্ত নেন, তখন অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়করভাবেই ঘুম থেকে জেগে বিজয়ের উদিত সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা যে সময়ে যে পন্থায় যে প্রকৃতিতে বিজয় দিতে চান বিজয় সে পথেই সূচিত হয়। তিনি বিজয়ের যে নকশা বা চিত্র অংকন করেন, বিজয় সে নকশায় চিত্রিত হয়ে আগমন করে। তার কৌশল ও পরিকল্পনার বুনিয়াদে বিজয়ের লক্ষ্য অর্জিত হয়। বিজয় সূচিত হওয়ার ব্যাপারে নবী করীম (স.) ও তাঁর সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ও জনশক্তির ইচ্ছা, আকাংখা ও প্রত্যাশারও কোনো দখল নেই। বিজয় লাভের ক্ষেত্রে তাদের কোনো কিছুর ওপর নির্ভরতা নেই। দ্বীন বিজয়ের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের শ্রম সাধনা, জনশক্তি, সম্পদ ও অস্ত্রের ওপর ভর করে বিজয় আসেনা, সংগ্রামী কাফেলার এতে কোনো অংশ নেই।তাদের নিজস্ব শক্তি ও সামর্থের এতে কোনো হিস্যা নেই।

বিজয়ের সমস্ত কৃতিত্ব ও অবদান একমাত্র লা শারিক আল্লাহর। আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ ও নিবেদিত প্রাণ দায়ী ইলাল্লাহদেরকে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এ বিজয় দান করেন। আল্লাহ তায়ালাই তাঁর দ্বীনের কর্মীদেরকে বিজয়ের মাল্যে ভূষিত করেন। আল্লাহই তাদের হাতকে শক্তিশালী করেন। আল্লাহ তায়ালাই ফেরেশতাদেরকে খোদার পথে আহ্বানকারীদের পাহারাদার ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রেখে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বীয় ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন করেছেন। তিনিই দ্বীনবিরোধী, নাস্তিক ও মোরতাদদেরকে শায়েস্তা করেন। নাস্তিক মোরতাদ ও আল্লাহদ্রোহীদের সকল চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, প্রতারণাকে ব্যর্থ, প্রতিহত ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহর দ্বীনের মোজাহেদদের সকল বিজয় ও সাফল্য একমাত্র আল্লাহর মদদ, করুণা ও রহম-করমের ওপরই নির্ভরশীল। আর আল্লাহর মদদ ও সাহায্যের ফলে বিজয় সূচিত হওয়ার পরই লোকেরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বিজয়ের এ নবতর চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি, মর্ম ও তাৎপর্যের উপলব্ধির ফলেই রসূলুল্লাহ (স.)-এর সম্মান ও মর্যাদা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। মানব হৃদয়ে রসূলে করীম (স.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আরও দৃঢ়তর হতে থাকে এবং দ্বীনের পথে আহবানকারীদের প্রভাব ও সম্মান আল্লাহর সাহায্যে বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে তারা গৌরব সম্মান ও বিজয়ীর আসনে সমাসীন হয়। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সম্মান ও ইযযতের হকদার একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আর সম্মান তাদের জন্যে, যারা আল্লাহর সাথে নিজেদের সম্পর্ককে গভীর ও নিবিড় করেছে। তাই বিজয়লগ্নে ও বিজয়ান্তে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত কাফেলাদেরকে একমাত্র আল্লাহর হামদ-তাসবীহ, এস্তেগফার ও তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দরগায় বিনয় ও শোক্রিয়া প্রকাশ করাই তাদের অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে তাঁর দ্বীনের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে অংশ গ্রহণের তাওফীক দান করেছেন। তারই রহমতে ও মদদে তারা কুফর-শেরেক ও নাস্তিকতার অভিশপ্ত পথ থেকে বেচেঁ থাকতে পেরেছেন। আর এভাবেই দ্বীন বিরোধীদের কাতারে শামিল হওয়া থেকে আত্মরক্ষার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আল্লাহর যমীনে সমস্ত মানব গোষ্ঠীর ওপর সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠতম উম্মতের উপাধিতে ভূষিত হওয়া উম্মতের কাফেলায় শরীক হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের কাফেলাকে সমস্ত অজ্ঞতা, মূর্খতা, অন্ধত্ব, গোমরাহী, ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। তাই প্রতিনিয়ত তাদের তাঁর স্তবস্তুতি, প্রশংসা, গুণকীর্তন, এস্তেগফার ও তাওবায় লিপ্ত থাকা উচিত।

বান্দা আল্লাহর দরবারে এস্তেগফার করার মাধ্যমে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব, আত্মিক উৎকর্ষ, বিশুদ্ধতা পবিত্র মননশীলতা ও নম্রতা হৃদয়ে অনুভব করে। দীর্ঘ বিপর্যয় ও পরীক্ষার পর বিজয়লগ্নে মানব-হৃদয়ে এক অবর্ণনীয় খুশী, আনন্দানুভূতি ও তৃপ্তি জন্ম নেয়। আল্লাহর রহমতে বিজয় লাভের পর বিজয়ের পূর্বে বাতিলপন্থীদের দেয়া সীমাহীন নির্যাতন, ঈমানের কঠোর অগ্নি পরীক্ষা, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের ভীষণ কষ্ট, কঠোর বিরোধিতা, সংগীন ও মারাত্মক বিপদ-মুসীবত ও বিপর্যয় এবং জীবন ও জীবিকার পরিবেশ দুরূহ ও সংকীর্ণ হওয়ার নিষ্ঠুর নির্মমতা, আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয়ের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা– এসব দুঃখ যাতনা, বিষাদ, বেদনার অসংখ্য ক্ষত নিরাময়ের একমাত্র মহৌষধ ও আবে হায়াত হচ্ছে আল্লাহর হামদ, তাসবীহ, তাওবা ও এস্তেগফার। কোরআনে হাকীমে এরশাদ হচ্ছে, 'তোমরা কি মনে করেছো যে, (কোনো পরীক্ষা ছাড়াই) তোমরা এমনি এমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের কাছে (অতীতের) তোমাদের পূর্বে (যে সকল নবী রসূল) যারা অতিবাহিত হয়ে গেছেন, তাদের ইতিহাস রয়েছে। তাদের ওপর কঠিন বিপদ, মুসীবত এসেছে ও তারা ভীষণ কষ্টে পড়েছে। ফলে তাদের হৃদয় টলটলায়মান হয়ে গেছে, এমনকি রসূল ও তার সংগীরা বলে উঠেছে, আল্লাহর (প্রতিশ্রুত) সাহায্য কোথায়? জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (সূরা বাকারা ২১৪ আয়াত)।

এ কারণে আল্লাহর প্রতিশ্রুত ও বহু প্রতীক্ষিত সাহায্য প্রাপ্তির সময় তাঁর প্রতি বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এস্তেগফার করা আবশ্যক। এস্তেগফারের মাধ্যমে বান্দা স্বীয় দীনতা-হীনতা প্রকাশ করে আল্লাহর অসীমতা ও বিশালতার স্বীকৃতি প্রদান করে। সাথে সাথে আল্লাহর অনন্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মানবীয় চেষ্টা-সাধনা সকল অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বল ও সীমিত। আর আল্লাহর শক্তি সামর্থ্য প্রবাহ, অনুগ্রহ, অনন্ত, চিরন্তন ও অসীম। আল কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমার আল্লাহর অপার অনুগ্রহকে গুণে শেষ করতে পারবে না।' তাই আল্লাহর এ অনন্ত দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর সমীপে এস্তেগফার করা বান্দার দায়িত্ব।

আর আল্লাহর নিকট এস্তেগফার আদায়ের মধ্যে আরেকটি সূক্ষ্ম মর্ম ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে বান্দা তার সকল অহমিকা ও গর্বকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে স্বীয় অসহায়ত্ব, সংকীর্ণতা ও সকল দুর্বলতা মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে নিবেদন করে। আল্লাহর কাছে বিনয় প্রকাশ করে তার মাগফেরাত কামনা করে। আল্লাহর বিশালতা ও মহত্ত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে তাঁর মাগফেরাত কামনা করে। বিজয়ের আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে পরাজিত প্রতিপক্ষের সাথে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর মদদই যে সত্যাশ্রয়ী কাফেলাকে বিজয়ী করেছে একথা মনে হওয়ার সাথে সাথে নিজস্ব শক্তি সামর্থের গর্ব এবং নিজেদেরকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শক্তিমান মনে করার ভ্রান্ত চেতনা ও অনুভূতি লোপ পায়। ফলে বিজয়ী কাফেলার মনমগয পরিশুদ্ধ ও পবিত্র থাকে। এই এস্তেগফারের কারণে সত্যের সংগ্রামী কাফেলার হৃদয়রাজ্যে এ বিশ্বাস ও চেতনা দৃঢ়তর ও স্থায়ী হয় যে, আল্লাহ তায়ালাই বাতিল প্রতিপক্ষের ওপর তাদেরকে বিজয় দান ও আধিপত্য বিস্তারের মর্যাদা দান করেছেন। নতুবা তারা তো ছিলো একান্ত শক্তিহীন, দুর্বল ও অসহায়। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁরই ইচ্ছায় তাদের ওপর মোমেনদেরকে বিজয়ী করেছেন। সাহায্য তো একমাত্র তাঁরই, বিজয় দান তো একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহ। আর এ দ্বীন ও জীবনাদর্শ তো একমাত্র তাঁরই প্রদত্ত জীবনদর্শন। আর সবকিছুরই চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল একমাত্র তাঁরই সমীপে।

মানব সভ্যতার সুনীল আকাশে আল কোরআন প্রদীপ্ত সত্যের সুমহান আলোকবর্তিকা। মানব সভ্যতার এ ক্রমবিকাশ, প্রগতি ও উৎকর্ষের গগনচুম্বী চূড়া, লোহিত সাগর ও নীল নদীর উপকূলে সভ্যতার বিকাশ ও আলোর ছোয়া, সুনীল আকাশের বায়ুতরঙ্গের উত্থিত আযানের তাকবীর-ধ্বনি, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের গগনবিদারী আল্লাহু আকবারের ধ্বনি—এ সবই আল্লাহর অফুরন্ত দান। মহাশক্তির নিকট আত্মসমর্পণের অতৃপ্ত কামনায় পরম তৃপ্তি ও প্রশান্তি কেবল আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি আল্লাহর নামের যেকেরেরই ফলশ্রুতি। তাঁরই সাহায্যে এসেছে এ মহান বিজয় ও সাফল্য আর মোমেনরা লাভ করেছে পরম তৃপ্তির সন্ধান।

মানব জীবনের প্রগাঢ় অন্ধকারকে দূর করে প্রভাতের সোনালী আলোর রশ্মি, আর আত্মার বিকশিত জ্যোতি এ সবই তো মহান আল্লাহর অফুরন্ত দান। এতে মানুষের বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নেই, বরং এ সবই আল্লাহর ইচ্ছা। এতদসংগে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমাজ ও সভ্যতার বিনির্মাণ পুনর্গঠন, প্রগতি ও উত্থান, মানব সমাজের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব, সুসভ্য ও মার্জিত জীবনাচার মহান আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

আর আল্লাহর এ সকল সাহায্য যে চিরন্তন পন্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায় তাই নবুওত ও রেসালাত নামে আখ্যায়িত। আল্লাহ তায়ালা নবী ও রসূলদের প্রতিষ্ঠিত জীবনবোধ ও পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষকে এ চিরন্তন বিজয় ও কল্যাণের গগনচুম্বী চূড়ায় উত্তোলন করেন। আর নবুওত ও রেসালাতের নিখুত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত এ পন্থার অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে মানব সভ্যতা চিরস্থায়ীভাবে আকাশ ছোঁয়া উন্নতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এ পন্থায়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাণীকে পূর্ণতা দান করে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দান করেছেন।

ইউসুফ (আ.) দীর্ঘ পরীক্ষা ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বিরহ ও বিচ্ছেদ-অনলে দগ্ধীভূত হওয়ার পর মিলনের আনন্দঘন মুহূর্তে পিতাকে সম্মানের সাথে মিসরের সিংহাসনে বসাবার পর বিনয়াবনত হয়ে তিনি বললেন, হে আমার পিতা! এ হচ্ছে আমার দেখা সে স্বপ্নের বৃত্তান্ত যা আমি আগে দেখেছিলোম। আমার প্রভু সে স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন। আমার প্রভু আমাকে কারাগার থেকে বের করে এনে কতো উত্তম সম্মান দান করেছেন। আমাদের ভাইদের ওপর শয়তানের ছোঁয়া লাগার পরও আমাকে আপনাকে পল্লীর পরিবেশ থেকে বের করে এনে (এ নগরে) মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমার প্রভু যার প্রতি চান মেহেরবানী করেন, তিনিই তো সর্ব-জ্ঞাতা ও মহাবিজ্ঞানী। (সূরা ইউসুফ আয়াত-১০০)।

আর দীর্ঘ বিপদময় নির্যাতিত জীবনের অবসানান্তে হযরত ইউসুফ (আ.) আনন্দ উল্লাস, গর্ব-অহংকারের শয়তানী ছোঁয়া থেকে নিজকে মুক্ত ও পবিত্র রেখে, আল্লাহর সমস্ত অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর শোক্‌রিয়া আদায় করেন। তাঁর মেহেরবানী, জ্ঞান ও কৌশলের স্বীকৃতি প্রদান করে তাসবীহ ও হামদের মাধ্যমে তাঁরই মহান দরগাহে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি তার এ মর্যাদা প্রাপ্তি, তার ভাইদের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে তারই আশ্রয়ে আগমন, তার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের পুনর্মিলনের মহান সুযোগ সবই যে মহাশক্তিমান আল্লাহর পরম অনুগ্রহ, তাঁরই কৌশল ও মেহেরবানীর ফলশ্রুতি, তা নিসংকোচে হৃষ্টচিত্তে মুক্ত মন নিয়ে তিনি স্বীকার করেন।

তার সকল সম্মান মর্যাদা যে আল্লাহরই অফুরন্ত দান তার স্বীকৃতি প্রদান করে তিনি যা বলেছেন আল কোরআনের ভাষায় তা হচ্ছে, 'হে আমার প্রভু! তুমিই তো আমাকে রাজত্ব প্রদান

করেছো, স্বপ্নের বৃত্তান্ত শিখিয়েছো। তুমিই তো আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, (আর) তুমিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে তোমার সমীপে আত্মসমর্পণকারী হয়ে মৃত্যু দান করো আর তোমার নেক বান্দাদের সাথে মিলিত করো।' (সূরা ইউসুফ, আয়াত-১০১)।

এ আয়াতেও হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া যে আল্লাহরই মহান দান, তার স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। পরপারে ও ইহ-জীবনে আল্লাহর নেক বান্দাদের সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভ ও ভ্রাতৃত্ব কামনা জান্নাতে সালেহ বান্দাদের সাথে শামিল করা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এমন কি নশ্বর ধরার বুক হতে অবিনশ্বর জগতের সফর পর্যন্ত, আল্লাহর অনুগত আত্মসমর্পণকারী মুসলিম হিসাবে মৃত্যু কামনা এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর রহম, করম ও অনুগ্রহ কামনা করেছেন। আখেরাতের অনন্ত জীবনে সালেহ বান্দাদের সাথে জান্নাতে একত্রে বসবাস ও শামিল হওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার ফযল ভিক্ষা করেছেন।

ঠিক এই একই পদ্ধতিতে চোখের এক পলকে সারার রাণী বিলকিসের সিংহাসন বিস্ময়করভাবে নিজের সামনে উপস্থিত হতে দেখে হযরত সোলায়মান (আ.) নিজের বাহাদুরী বা কৃতিত্বের দাবী না করে বরং মহান আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর আদায় করে বলেছেন, আর তিনি যখন এক নিমিষে বিলকিসের সিংহাসনকে তার সামনে উপস্থিত দেখতে পেলেন, (তখনই) বললেন, এতো আমার প্রভুরই দান, তিনি (এমন বিস্ময়কর) ঘটনাতো আমাকে পরীক্ষা করার জন্যই ঘটিয়েছেন। তিনি দেখতে চান যে, আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশ করি? আর যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা নিজের স্বার্থেই তা করে, আর যারা অমান্য ও অবাধ্যতা প্রকাশ করে, (তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই বরং, তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে!) আমার প্রভু কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনিই পরম দাতা।

আর প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ (স.) ঠিক একই পন্থার অনুসরণ করেছেন। জীবনভর তিনি একই পদ্ধতিতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহর অপার অনুগ্রহ, সাহায্য ও বিজয়, যে বিজয়কে ইতিহাসের এক অমর স্মৃতি ও নিদর্শন হিসাবে উপহার দিয়েছেন।

কাতর কণ্ঠে সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তিনি আল্লাহর প্রশংসা, গুণ কীর্তন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে স্বীয় জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করেছেন। যে মক্কাবাসী তাঁকে রক্তে রঞ্জিত করেছে, তাঁকে বিতাড়িত করেছে, তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে, সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তাঁর সাথে প্রচন্ড শত্রুতা করেছে, নির্যাতন চালিয়েছে। আর যখন বিজয় তাঁর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে, তখন সব কিছু ভুলে বিজয়ের আনন্দ ও খুশীতে মেতে না উঠে তিনি পরম বিনয় ও কাতর কণ্ঠে আল্লাহর তাসবীহ, হামদ, এস্তেগফার ও তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেছেন, যা হযরত আয়শা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর তিরোধানের পর তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একই পদ্ধতির অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন।

এমনিভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মানব সমাজও একই পদ্ধতির অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বে উচ্চতর মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয়ে উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করেছে। এভাবে বিশ্ব-সভ্যতায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। তারা সম্মান, খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করে।

সূরা লাহাব

আয়াত ৫ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. (ইসলাম বিরোধিতার কারণে) আবু লাহাবের (দুনিয়া আখেরাতে) দুটো হাতই ধ্বংস হয়ে যাক– ধ্বংস হয়ে যাক সে নিজেও; ২. তার ধন সম্পদ ও আয় উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না; ৩. বরং (তা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে,) সে অচিরেই সেই আগুনের লেলিহান শিখায় প্রবেশ করবে, ৪. (সাথে থাকবে) জ্বালানি কাঠের বোঝা বহনকারী তার স্ত্রীও; ৫. (অবস্থা দেখে মনে হবে) তার গলায় যেন খেজুর পাতার পাকানো শক্ত কোনো রশি জড়িয়ে আছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আবু লাহাব, তার নাম ছিলো আবদুল ওযযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব। সে ছিলো প্রিয় নবী (স.)-এর চাচা। প্রভাতকালীন সূর্যের লালিমার মতো উজ্জল ও সুন্দর ছিলো তার মুখমন্ডল–এ কারণে তাকে 'আবু লাহাব' বলা হতো। তার স্ত্রীর নাম ছিলো 'আরদা'। অত্যধিক সুন্দরী হওয়ার কারণে তাকে 'উম্মে জামিল' নামেও ডাকা হতো। তারা ছিলো রসূলুল্লাহ (স.)-এর উপস্থাপিত দাওয়াতের পরম শত্রু ও বিরোধিতাকারী। আবূ লাহাব ও তার স্ত্রীই ছিলো রসূলের প্রতি সর্বাধিক অত্যাচারী ও যন্ত্রণাদানকারী।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রসিদ্ধ জীবনীকার ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেন, আমার কাছে হোসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি রাবিয়া ইবনে ইবাদুদ দায়েলীকে বলতে শুনেছি, আমি ও আমার পিতা একজন সুশ্রী যুবককে সাথে নিয়ে একদিন ভোর বেলা রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সংগী একদল লোকের সাথে পথ অতিক্রম করছিলাম; এমন সময় অপূর্ব সুন্দর চেহারার এক ব্যক্তিকে রসূলের পেছনে দেখতে পেলাম। রসূলুল্লাহ (স.) গোত্রের লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে অমুক গোত্রের জনমন্ডলী আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল। আল্লাহ তায়ালা হুকুম করেছেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করবে, আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার শেরেক করবে না, তোমরা আমার রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, আমার আনুগত্য করবে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত

থাকার নির্দেশ দান করবো, যাতে করে আমার ওপর আল্লাহর অর্পিত সে দায়িত্ব সম্পাদন করে যেতে পারি যে পায়গাম সহ আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহর রসুল যখন তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করলেন, তখন রসূলের পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলোঃ 'হে অমুক গোত্রের জনমন্ডলী! এ ব্যক্তি তোমাদেরকে তোমাদের মাবুদ লাত, ওযযা ও তোমাদের দেবদেবীদের থেকে আলাদা করতে চাচ্ছে। তোমাদের সাথে বনু আকমাস গোত্রের সাথে সংঘাত ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে, সে এক অদ্ভূত ও অভিনব কথাবার্তা ও ধর্ম নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও চেতনার বিলুপ্তি সাধন করবে। তোমাদেরকে সতর্ক করছি, তোমরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করো না, তাঁর অনুসরণ করোনা। আমি তখন আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে পিতা! (আল্লাহর রসূলের প্রকাশ্য বিরোধীতাকারী) 'এ সুন্দর যুবকটি কে? পিতা বললেন, 'এ হচ্ছে রসূলুল্লাহ (স.) এর চাচা আবু লাহাব।' (আহমাদ ও তিবরানী)।

রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর দাওয়াতের বিরোধীতা ও চক্রান্ত সম্পর্কে আবু লাহাবের এমনি অসংখ্য ঘটনার বিবরণ ও নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিল কর্তৃক রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর পাশবিক নির্যাতন, বিরোধিতা, শত্রুতা ও জঘন্য নির্মম আচরণের বর্ণনা আরওয়াহ বিনতে হারব ইবনে উমাইয়ার বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। এ আরওয়াহ ছিলো আবু সুফিয়ানের বোন। আবু লাহাব রসূলুল্লাহ (স.)–এর দাওয়াতের সূচনালগ্ন থেকেই প্রচন্ড শত্রুতা ও বিরোধীতার এ জঘন্য তৎপরতাকে অব্যাহত রাখে। ইমাম বোখারী (র.) বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে এ হাদীসটি সংকলিত করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম (স.) বাতহায় গমন করে পর্বত শৃংগে (আবু কোবায়েস পর্বতের ওপর) আরোহণ করেন। সেখানে দাঁড়িয়ে 'ইয়া সাববাহ' বলে উচ্চ স্বরে চীৎকার শুরু করলে কোরায়শরা পর্বতের পাদদেশে সমবেত হয়। আল্লাহর রসূল (স.) সমবেত জনমন্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি যদি তোমাদেরকে বলি (এ পর্বতের আড়ালে) একদল শত্রু তোমাদের ধ্বংস সাধনের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে, তবে কি তোমরা আমার কথাকে সত্য মনে করবে? তখন সকলেই সমস্বরে বললো, হাঁ, অবশ্যই আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করবো। (কেননা ইতিপূর্বে আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি)।

তাদের এ জবাবের পর আল্লাহর রসূল (স.) পুনরায় তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদের সতর্ককারী। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের জন্য কঠিন আযাব অপেক্ষা করছে। সাথে সাথে আবু লাহাব (রাগত স্বরে রূঢ় কণ্ঠে) বললো, তুমি ধ্বংস হও, এ জন্যই কি তুমি (চীৎকার করে) আমাদেরকে ডেকেছিলে? রসূলুল্লাহ (স.)–এর প্রতি আবু লাহাবের রূঢ় আচরণ ও অভিশাপের জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ পূর্ণ সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (স.)–এর উক্তির পর আবু লাহাব উত্তেজিত হয়ে হাত নাড়িয়ে রসূলকে লক্ষ্য করে বললো তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হও, (সর্বদা তুমি ধ্বংসে পতিত হও) তুমি কি এ উদ্দেশ্যেই আমাদেরকে একত্রিত করেছো? আবু লাহাবের এ উক্তি প্রসংগেই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সূরা লাহাব নাযিল করেছেন। বনু হাশেমের লোকেরা রসূলুল্লাহ (স.)–এর উপস্থাপিত ইসলামে দীক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর যে কোনো ধরনের কষ্ট ও নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য আবু তালেবের নেতৃত্বে অংগীকারাবদ্ধ হলো এবং তারা সম্মিলিত ভাবে রসূলের সাহায্য ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে একটি লিখিত চুক্তিনামায়ও স্বাক্ষর করে। রসূলুল্লাহ (স.)–এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম নবুওত যুগের পূর্বে আবু লাহাবের দুই পুত্র ওতবা ও ওতাইবার বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ ছিলো। ওহী অবতীর্ণের পর আল্লাহর রসূল (স.) ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা শুরু করলেই আবু লাহাব তার পুত্রদ্বয়কে রসূল (স.) দুহিতাদেরকে তালাক দানের কড়া নির্দেশ প্রদান করে এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর মতোই রসূলের কন্যাদেরকেও নিষ্ঠুর আচরণ ও যন্ত্রণা দিতে থাকে।

এ ভাবে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিল প্রিয়নবী (স.)-এর জাত শত্রুতে পরিণত হয়। বিভিন্নভাবে ইসলামী দাওয়াতের বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও রসূলের প্রতি নির্যাতনমূলক তৎপরতাকে আরো জোরদার করে।

রসূলের বাসগৃহটি ছিলো আবু লাহাবের ঘরের খুবই কাছে। আর এ কারণে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী আল্লাহর রসূলকে নানাভাবে কঠোর যন্ত্রণা ও কষ্ট দিতে থাকে।

কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, যে কূটনী উম্মে জামিল কাঁটার ডাল বহন করে এনে রসূলের ঘরের দরজায় বিছিয়ে রাখতো। রসূলের চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে যন্ত্রনা ও কষ্ট দেয়ার কারণেই এ সূরায় উম্মে জামিলকে কাঁটাযুক্ত কাঠের বোঝা বহনকারিণী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে অভিশপ্ত আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিলের এ নিষ্ঠুর পাশবিক আচরণ ও প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণার কারণেই আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রসূলের অভিভাবকত্বের দায়িত্বের ঘোষণা দিয়ে রসূলের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং আবু লাহাব দম্পতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী সহ সূরা 'লাহাব' অবতীর্ণ করেন।

তাফসীর

এরশাদ হচ্ছে, 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব'। প্রথম 'তাব্বাত' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রসূলের শানে দুর্বৃত্ত আবু লাহাবের চরম বেয়াদবী, রসূলের প্রতি আবু লাহাবের অভিশাপের প্রতিবাদে আবু লাহাবের প্রতি পাল্টা লা'নত ও বদদোয়া তথা অভিশাপের চূড়ান্ত ঘোষণা এবং আল্লাহর ঘোষিত লা'নত যে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হবে এবং নিশ্চিতভাবে আবু লাহাব দম্পতি আল্লাহর গযবে পতিত হবে, তারই নিশ্চয়তা ঘোষণা করা হয়েছে।

'তাব্বুন' শব্দের অর্থ হলো, ধ্বংস হওয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া ও ছিন্নভিন্ন হওয়া। আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত দৃঢ়তা ও গুরুত্ব সহকারে ইসলামী দাওয়াতের বিরোধীতাকারী ব্যক্তিটির ধ্বংসাত্মক কথা উল্লেখ করেছেন। সরওয়ারে কয়েনাত (স.)-এর ওপর নির্যাতন, শত্রুতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আবু লাহাব ও উম্মে জামিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রতিরোধের সুনিশ্চিত ঘোষণা দিয়েছেন। অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস কিভাবে এবং কিভাবে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে তার স্তর ও পর্যায়ক্রমিক বিবরণও প্রদান করেছেন। তাদের শক্তি সামর্থ, ধন সম্পদ, সৌন্দর্য, বীরত্ব, ও বাহাদুরী কোনো কিছুই তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। নিশ্চিতভাবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'অবশ্যই ধ্বংস হলো তাদের উভয় হাত এবং তারা উভয়েই ধ্বংস হলো।' অর্থাৎ তারা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েই যাবে। তাদের অগাধ ধন সম্পদ তাদের কোনো কাজেই লাগবে না। তাদের কোনো চেষ্টা সাধনা বা কোনো উদ্যোগই তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন হওয়া এবং অনিবার্য ধ্বংস ও বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করতে পারবে না।

এসব বিপর্যয় তো আসবে তাদের পার্থিব জীবনেই। অতপর পরকালের জীবনে তারা নিক্ষিপ্ত হবে (প্রজ্জলিত) লেলিহান অগ্নি শিখায়। এখানে 'না-রান যা-তা লাহাব' শব্দটি জ্বলন্ত অগ্নির

উত্থিত লেলিহান শিখাকে চিত্রিত করে তার ভয়াবহ অবস্থার দৃশ্য অংকন করা হয়েছে। জ্বলন্ত অগ্নির দাহিকা শক্তির বিভীষিকা, তীব্রতা ও প্রখরতা লেলিহান শিখা দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

'ওয়াম রাআতুহু হাম্মা লাতাল হাতাব' আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলামী দাওয়াতের বিরোধীতা ও সরওয়ারে কায়েনাত (স.)-এর ওপর পাশবিক ও নির্মম নির্যাতনের কারণে শুধু আবু লাহাবকেই জ্বলন্ত অনলের লেলিহান শিখায় নিক্ষেপ করা হবে না; বরং তার স্ত্রী উম্মে জামিলও নরককুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে কাঁটাযুক্ত কাঠের বোঝা বহন করা অবস্থায়। 'ফী জী-দেহা হাবলুম মিম মাসাদ' আয়াতে বলা হয়েছে উম্মে জামিলকে শুধু কাঁটাযুক্ত কাঠের বোঝা বহন করা অবস্থায় নয়, উপরন্তু তার গলদেশে খেজুর গাছের অগ্রভাগে অবস্থিত পদার্থের পাকানো রশি দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাকে লেলিহান অগ্নিশিখায় নিক্ষেপ করা হবে।

এ সূরায় উম্মে জামিলের প্রতি এ ধরনের শাস্তির সুক্ষ্ম তাৎপর্য, বিষয়বস্তু ও কারণ সহ কেয়ামত দিবসের দৃশ্যগুলো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, 'মাশাহাদুল ক্বিয়ামাহ ফিল কোরআন' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উম্মে জামিলের চরম উন্মাদনা ও পাগলামির যে সকল চিত্র এ গ্রন্থে অংকিত রয়েছে, তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপন করছি।

দ্বীনের শত্রুদের চরম পরিণতি

এই সূরাটিতে শব্দের মাধ্যমেই এ দৃশ্যের ও অবস্থার চিত্রাংকন করা হয়েছে। (অনেক ক্ষেত্রে রেখাচিত্রের চেয়ে কথাচিত্র হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে প্রকৃত অবস্থাকে বেশী স্পষ্ট ও দৃশ্যমান করে তোলে।) এখানে জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহতা, বীভৎসতা ও তীব্রতার প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের সে আগুন লেলিহান অগ্নিশিখাযুক্ত। সে ভীষণ উত্তপ্ত লেলিহান অগ্নিশিখায় (অগ্নির মতো লালবর্ণ সুন্দর ব্যক্তি) আবু লাহাবকে নিক্ষেপ করা হবে এবং তার সাথে তার স্ত্রী উম্মে জামিলকেও- যে কাঁটাযুক্ত কাঠের বোঝা বহন করে রসূলুল্লাহ (স.)-কে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে রসূলের চলার পথে (গৃহদ্বারে) বিছিয়ে দিতো। এখানে এটিকে প্রকৃত (হাকিকী) ও রূপক (মাজাযী) উভয় অর্থেই গ্রহণ করা যায়। আর কাঠ হচ্ছে তাই, যা আগুনের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, আবার কাঠের বোঝা রশি দ্বারা বাঁধা হয়।

দুনিয়ায় সে রসূলকে কষ্ট দিতো কাঁটাযুক্ত কাঠ দিয়ে, যে কাঠ সে বেঁধে আনতো খেজুর পাতার পাকানো রশি দিয়ে এবং সেই বোঝা বহন করে এনে রসূলের চলার পথে বিছিয়ে দিতো। তাকেও পরকালে রশি দ্বারা বাঁধা কাঠের বোঝার সাথে বেঁধে এনে জাহান্নামের ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হবে এবং সে কাঠ দ্বারা প্রজ্বলিত অনলের লেলিহান শিখায় তাকে নিক্ষেপ করা হবে। এখানে কাঠ, রশি, অগ্নি, লেলিহান শিখা সবকিছুর উল্লেখ করে তাতে আবু লাহাব ও তার স্ত্রীকে নিক্ষেপ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অপরদিকে এর রূপক অর্থ করা যেতে পারে, রশি দ্বারা বাঁধা কাঠের বোঝা বহনকরাকালীন তালে তালে যে মৃদু সংগীতের শব্দ শোনা যায় সে ধরনের শব্দ উত্থিত হবে, আর কণ্ঠ রশি দ্বারা চেপে ধরলে তাদের কণ্ঠ থেকে মৃদু শব্দ উত্থিত অবস্থায় তারা লেলিহান অগ্নি শিখায় নিক্ষিপ্ত হবে। কঠিন অবস্থায় রশি ও কাঠের কঠিন বেষ্টনীর ফলে যেমনি কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি কষ্টকর অবস্থায় তারা আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

এমনিভাবে মৃদু যন্ত্রসংগীতের মতোই শব্দ উত্থিত হবে। বিভিন্ন কর্মসম্পাদনকালীন নড়া চড়ার মাধ্যমে যে গুঞ্জন ও আওয়ায হয়, তাকে শব্দ তরঙ্গের ধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং উম্মে জামিলের এ সকল তৎপরতা ও আবু লাহাবের ইসলামী দাওয়াতের প্রতিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি

সম্পর্কে সতর্ক করে মাত্র ৫টি আয়াতসম্পন্ন এ ক্ষুদ্র সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। আর এটি কোরআনে করীমের ছোট্ট সূরাসমূহের মধ্যে একটি।

কোরআনে হাকীমের শক্তিশালী রূপক উপমা বিশিষ্ট এই সূরাটি ইসলামী দাওয়াত ও রেসালাতের মর্যাদার প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্রুপকারী আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিলের জঘন্য পরিণতির ইংগিত বহন করে অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মে জামিল মনে করেছিলো রসূলুল্লাহ (স.) তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও দুর্নাম রটনা করে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করেছেন।

এ ছোট্ট সূরাটির শব্দসমূহ, উম্মে জামিলের পরিণতি সম্পর্কিত সতর্কবাণী, বিশেষ করে আত্মগর্বিতা, আভিজাত্য, কৌলীন্য ও সৌন্দর্যের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত মহিলা উম্মে জামিল সম্পর্কিত নিন্দাসূচক ও শ্লেষাত্মক কথা চিত্রে তীর্যক সংগীত লহরী মক্কার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়লো এবং এ আয়াতের বিদ্রূপবান হচ্ছে 'কন্টকযুক্ত কাঠের বোঝা বহনকারিণী, যার গলদেশে পাকানো রশি জড়ানো থাকবে।' এ তীব্র আঘাত ও ভয়ংকর পরিণতির কথা যখন আরবের ঘরে ঘরে আলোচিত ও প্রচারিত হতে লাগলো তখন উম্মে জামিলের অন্তরে নিদারুণ জ্বালা, অস্থিরতা ও চরম মানসিক অস্বস্তি সৃষ্টি হলো। এ প্রসংগে প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থকার ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক উদ্‌ধৃত করেছেন–

আবু লাহাবের স্ত্রী কাঠের বোঝা বহনকারিণী উম্মে জামিল যখন তার ও তার স্বামী প্রসংগে কোরআনে কারীমে অবতীর্ণ বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক উক্তিসমূহ শুনতে পেলো, তখন ক্ষিপ্ত ও ক্রোধান্বিত অবস্থায় সোজা আল্লাহর রসূলের সামনে এসে উপস্থিত হলো। প্রিয় নবী (স.) তখন হযরত আবু বকর (রা.) সহ কাবাঘরের সামনে বসে ছিলেন। উম্মে জামিল এক মুঠি পাথর নিয়ে উভয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আল্লাহ তায়ালা মহান কুদরতের মাধ্যমে তাঁর হাবীবকে অলৌকিক ভাবে উম্মে জামিলের দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিলেন। উম্মে জামিলের চোখের সামনে বসে থাকা সত্ত্বেও উম্মে জামিল একমাত্র আবু বকর (রা.) ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলো না।

হযরত আবু বকর (রা.)-কে লক্ষ্য করে উম্মে জামিল বললো, 'হে আবু বকর! তোমার সংগী কোথায়? আমি জানতে পারলাম যে, সে নাকি আমার দূর্ণাম রচনা করে কবিতা রচনা করেছে। আল্লাহর কসম! আমি তাকে এখন সামনে পেলে এ মুষ্টিবদ্ধ পাথর তার মুখমন্ডলে ছুঁড়ে মারতাম। তার জেনে রাখা দরকার যে, আমিও একজন মহিলা কবি। আমরা তার দাওয়াতকে অস্বীকার করায় সে আমাদের নামে দুর্নাম রটাচ্ছে। এই বলে সে রাগে গড়গড় করতে করতে চলে গেলো। তার চলে যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স.)-কে লক্ষ্য করে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহ রসূল, আপনি কি লক্ষ্য করেছিলেন যে, সে আপনাকে দেখতে পেয়েছে? প্রিয়নবী (স.) বললেন, ' সে আমাকে দেখতে পায়নি, আল্লাহ তায়ালা আমাকে দেখা থেকে তার দৃষ্টি শক্তিকে বিরত রেখেছেন।'

প্রখ্যাত হাদীস শাস্ত্র বিশারদ হাফেয আবু বকর বাযযার বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই সূরা অবতীর্ণ হলো, তখন রসূলুল্লাহ (স.) হযরত আবু বকর (রা.)–এর সাথে এক জায়গায় বসেছিলেন। এসময় আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলকে রসূলের দিকে আসতে দেখে হযরত আবু বকর (রা.) রসূলুল্লাহ (স.)কে বললেন, আপনি যদি একদিকে সরে না যান, (আত্মগোপন না করেন) তাহলে অবশ্যই সে আপনাকে কোনো কিছু দ্বারা (কঠিন) আঘাত হানবে। রসূলুল্লাহ (স.) শান্তভাবে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তার দৃষ্টি থেকে আমাকে আড়াল করে রাখবেন।

উম্মে জামিল এগিয়ে এসে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আবু বকর! তোমার সংগী আমার দূর্ণামমূলক কবিতা রচনা করে তা গেয়ে বেড়াচ্ছে। তদুত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, না, কখনো না, এ গৃহের (কাবাগৃহের) মালিকের শপথ, আমার সংগী কখনও কবিতা রচনা করেন না, তাঁর মুখ থেকে কখনও কবিতা নিসৃত হয় না। তখন উম্মে জামিল বললো, তুমি অবশ্য সত্যবাদী। সে চলে চাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ওকি আপনাকে দেখতে পায়নি? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, যতক্ষণ সে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, আমার মালিক তার দৃষ্টিশক্তি ও আমার মধ্যে আবরণ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন।

এমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাহবুব রসূলে পাক (স.)-কে উম্মে জামিলের ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ক্ষতি থেকে হেফাযত করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার ফলে তার ক্রোধ ও হিংসা অবদমিত হলো। হযরত আবু বকর (রা.) যে বলেছেন, কাবার প্রভুর শপথ, তাঁর মুখ থেকে তোমার দুর্নামসূচক কবিতা নিসৃত হয়নি একথাও সম্পূর্ণ সত্য। কেননা আল কোরআন রসূলের রচিত কোনো কবিতা গ্রন্থ নয়, এটি স্বয়ং আল্লাহর বাণী। যদিও ছন্দের মত অনেকাংশে মিলের সন্ধান পাওয়া যায় তবুও আল কোরআন কোনো কবিতার গ্রন্থ নয়। আর সূরা লাহাব কোনো দূর্ণামসূচক ছড়া বা কবিতা নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনি নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো কথা বলেন না বরং তা হচ্ছে আল্লাহর প্রত্যাদেশ।'

সূরা লাহাব যেহেতু রসূলুল্লাহ (স.) রচিত কোনো দুর্ণামমূলক কবিতা বা ছড়া নয় সেহেতু হযরত আবুবকর (রা.) আল্লাহর নামে শপথ করে একথা বলেন যে, আমার সংগী তোমার দূর্নামমূলক কোনো কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেননি। এ উক্তি একান্ত বাস্তব ও সত্য এবং হযরত আবু বকর (রা.) একান্তভাবে ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যবাদী। অথচ এ সূরায় আল্লাহর দ্বীনের নিকৃষ্ট দুশমন আবু লাহাব ও উম্মে জামিলের চরিত্রের যে জঘন্য চিত্র অংকিত হয়েছে, তা বিশেষ করে উম্মে জামিলের ও তার স্বামীর চরম পরিণতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছে, যে বিদ্রূপ ও শ্লোষাত্মক বাক্য সন্নিবেশিত হয়েছে, উম্মে জামিলের গলদেশে রশি পরিবেষ্টনের যে চিরন্তন ঘোষণার উল্লেখ রয়েছে, তা অনন্তকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রচারিত হতে থাকবে। ইস-লামী দাওয়াতের বিরোধিতা ও সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও শ্রেষ্ঠ মানব মোহাম্মদ (স.)-এর শানে চরম বেয়াদবী ও ধৃষ্টতার জঘন্য আচরণের কারণে আল্লাহর গযব তাদের ওপর পতিত হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইতিহাসে চির স্মরণীয় ও শিক্ষণীয় নিদর্শন স্বরূপ ধ্বংস ও নির্মূল করেছেন এবং তাদেরকে আখেরাতের চিরস্থায়ী শাস্তির সুনিশ্চিত দুঃসংবাদ প্রদান করেছেন। তার গলায় রশি বেষ্টিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীও উচ্চারণ করেছেন। বর্তমান যুগের দ্বীনের দাওয়াতের প্রতিরোধ ও নির্মূলের প্রত্যাশা পোষণকারী ও কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের নিকৃষ্ট দুশমন ও জঘন্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীদের ধ্বংস ও নির্মূলের ব্যাপারে সূরাটি এক শিক্ষণীয় ঘটনা ও তাদের ধ্বংস, নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার তা এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে কাজ করছে।

সূরা আল এখলাস

আয়াত ৪ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক একক, ২. তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন, ৩. তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি, ৪. আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।

সূরার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সহীহ হাদীসসমূহের ভিত্তিতে এই সূরা কোরআন মজীদের এক-তৃতীয়াংশ। বোখারী শরীফে হযরত আবু সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি আরেক জন ব্যক্তিকে বারবার এ সূরার পুনরাবৃত্তি করতে শুনলেন। তিনি সকাল বেলায় রসূল (স.)-এর দরবারে হাযির হয়ে এই ঘটনা তাঁকে বললেন। তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, এত ছোট্ট একটি সূরা বারবার পড়ার কী প্রয়োজন আছে।

ঘটনা শোনার পর রসূল (স.) বললেন, কসম সেই মহান সত্ত্বার যার হাতে আমার জীবন, এই সূরা হচ্ছে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কেননা, যে একত্ববাদের ঘোষণা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর কাছে দিয়েছেন এই 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' হচ্ছে সেই একত্ববাদেরই মূলকথা। এটি আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা ও মানুষের জন্যে তার জীবন পদ্ধতিও বর্ণনা করে। ইসলামী তত্ত্বকথার বড়ো বড়ো কথাগুলোর মধ্যে এর স্থান অনেক শীর্ষে অবস্থিত।

তাফসীর

'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' বর্ণিত 'আহাদ' শব্দটি অনেক সূক্ষ্ম। এই শব্দটি প্রথমেই এর সাথে একথাটি যোগ করে দেয় যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো কিছু তাঁর সাথে নেই। এবং এটাও সত্য যে, তাঁর মতো অন্য কিছুই নেই।

আল্লাহ তায়ালার একত্বের অর্থ হচ্ছে অস্তিত্বে তিনি একা। তাঁর অস্তিত্বের একথা ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়, তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুরই কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা তাঁরই দান। তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য গ্রহণ করে এবং নিজেদের অস্তিত্বের ধারণাও তাঁর মূল অস্তিত্ব থেকে গ্রহণ করে।

এ কারণেই এই একত্ব হচ্ছে সবকিছুর কর্তা। অতএব তিনি ছাড়া আর কেউই করনেওয়ালা নেই। অন্য কারো কোনো প্রভাবও নেই। অর্থাৎ এ বিশ্ব জগতের সবকিছুর অস্তিত্ব সত্যিকার অর্থে

এবং স্থায়ী কোনো অস্তিত্ব থাকলে তা আল্লাহ তায়ালারই আছে, অন্য কারো নয়। এ থেকে এ কথা জানা যায় যে, এই সূরায় বর্ণিত আকীদায় মানুষের বিশ্বাসগত আকীদা ও তাঁর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা এ উভয়টাই প্রমাণ করে।

তাওহীদের রূপরেখা ও উপকারীতা

তাওহীদের ব্যাখ্যা ও ধারণা যখন একবার মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তার মন সব ধরনের সন্দেহ, সব ধরনের সন্দেহ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তার মন এমন সব কিছু থেকেই আলাদা হয়ে যায়, যা সে তার অস্তিত্বের ধারণা এবং তার ক্রিয়াকর্মে কর্তার ভূমিকায় একক ও অদ্বিতীয় সত্তার সাথে সাংঘর্ষিক দেখতে পায়।

যদি সব কয়টি জিনিসের অস্তিত্বের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হতে পারে তবে অন্তত অন্যকিছুর তুলনা থেকে তা তাকে মুক্ত করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্বই আসল নয়। আল্লাহর কর্তা-বাচকের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কিছুই সত্য নয়। মনে তখন একক সত্যের অনুভূতি ছাড়া অন্য কোনো ধারণাই অবশিষ্ট থাকে না এবং এই সত্যের বাইরে অন্য সব কিছুর সম্পর্ক থেকেই তার মন পরিষ্কার হয়ে যায়।

তখন সে সব ধরনের বিধি-বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়ে যায়। নিয়মনীতির বাধা থেকেও তার মুক্তি মেলে। সব আকর্ষন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, ভয়ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে যায়, যা অনেক কয়টি বিধি নিষেধের মূল। যখন সে আল্লাহ তায়ালাকেই পেয়ে যায় তখন তার সামনে আর দ্বিতীয় কোনো লক্ষ থাকে না।

এ অবস্থায় অন্য কিছুর আকর্ষণ তার কি কাজে লাগবে? যখন সে জেনে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারোই কিছু করার ক্ষমতা নেই। তখন সে কাকে ভয় করবে? অতএব অস্তিত্বের মূলগত ব্যাপারে যখন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সে অন্য কোনো সত্যকে দেখতে পায় না এমন ধরনের একটি ধারণা তার মনে সৃষ্টি হলো, তখন তার মনে এই ধারণাও সৃষ্টি হয় যে, সবকিছুর অস্তিত্বের মূলে সেই আসল ও খাঁটি অস্তিত্বই ক্রিয়াশীল। কেননা সব অস্তিত্বের ধারণা ও সৃষ্টি তো মূল সত্ত্বার অস্তিত্ব থেকেই এসেছে। আর এই হচ্ছে সে পর্যায়, যখন যা-ই দেখে তাতে সে আল্লাহর হাতকেই দেখতে পায়।

এরপর আরো এক স্তর ওপরে উঠে সে এই কায়েনাতের সর্বত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। কেননা দেখার মতো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো কিছুই তো নেই। তিনিই একমাত্র সত্য। এভাবেই আস্তে আস্তে তার অন্তর থেকে 'উপায় উপকরণ কোনো কিছু করতে পারে' এই বিশ্বাসই বিলীন হয়ে যায়।

এভাবেই মানুষ প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি ঘটনা দুর্ঘটনাকে তার মূল উৎসের দিকে ফিরিয়ে নেবে যেখান থেকে তা শুরু হয়েছে এবং যা দিয়ে তা প্রভাবান্বিত হয়েছে। এই মহাসত্যটাকেই কোরআন বহুভাবে ঈমানদারদের মনে বসাতে চেষ্টা করেছে। এ কারণে সে কোনো ব্যাপারের বাহ্যিক কারণ না খুঁজে তাকে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও এরাদার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়।

কোরআনের আরো অনেক আয়াতে এই সত্যের দিকে ইংগিত প্রদান করা হয়েছে। যখন সব কয়টি বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে সামনে থেকে সরিয়ে দেয়া যায় এবং সমগ্র বিষয়কেই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও এরাদার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়, তখন মনে দারুণ প্রশান্তি আসে। মানুষ যখন সে একক সত্ত্বার সন্ধান পেয়ে যায় তখন তার যা কিছুর প্রতি আকর্ষণ হয় তা শুধু তার কাছেই চায়। যতো কিছুকেই তার ভয় হয় তা থেকে বাঁচার জন্যে শুধু আল্লাহর কাছেই দোয়া করবে।

এ অবস্থায় সব বাহ্যিক উপায় উপকরণ, ক্রিয়াকলাপের ফলাফল ও প্রভাব কোনোটাই তার মানসিক প্রশান্তি নষ্ট করতে পারে না বরং এগুলো দেখে সে আরো বেশী পরিতৃপ্তি পায়। কারণ সে জানে এগুলোর কোনোই মূল্য নেই, এগুলো কোনোটাই কিছু করতে পারে না। সবকিছুর চূড়ান্ত ক্ষমতা এককভাবে আল্লাহ তায়ালার হাতেই।

এ হচ্ছে সে পর্যায়গুলো যা 'তাসাউফের' অনুসারীরা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তারা এ পর্যায়গুলোকে টেনে অনেক দূরে নিয়ে গেছেন। কেননা, ইসলাম মানুষের কাছে এই চায় যে, মানুষ এই মহাসত্যের দিকে চলার পথ যেন এভাবে দেখে নেয় যে তাদের এই দুনিয়ার বাস্তব মানুষের জীবনই তাকে কাটাতে হবে এবং এ যমীনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সব বিভাগগুলোকে সমভাবে গ্রহণ করে চলতে হবে।

তার সাথে সাথে এই সত্যকেও মনে রাখবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো সত্য নেই। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুর অস্তিত্বও নেই। তিনি ছাড়া আর কেউই কিছু করতে সক্ষম নয় এবং এই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ সে গ্রহণ করবে না।

এখান থেকেই জীবনের জন্যে পূর্ণাঙ্গ বিধানের প্রশ্নটি শুরু হয়ে যায়, যা এই ব্যাখ্যা ও এর আনুষঙ্গিক বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ এ থেকে যে ধ্যান-ধারণা, অনুভূতি ও সংকল্প তৈরী হয় জীবনের ব্যবস্থা তার ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। এই হচ্ছে একক আল্লাহর আনুগত্যের পথ, যিনি ছাড়া আর কারো অস্তিত্বের কোনোই সত্যতা নেই, তিনি ছাড়া এই বিশ্বজগতে অন্য কোনো নিয়ন্ত্রক নেই। তার সংকল্প ছাড়া আর কারো কোনো সংকল্পের কোনোই প্রভাব নেই।

এটা এমন এক পথ, যে পথে মানুষের ভালোবাসা, আকর্ষণ ও ভয়ভীতির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারো দিকেই আকৃষ্ট হয় না। আরাম ও কষ্টে, সুখ ও দুঃখে, নেয়ামত ও অভিশাপে শুধু বারবার তার দিকেই ফিরে যেতে হয়। কেননা, যার অস্তিত্ব মূলত কোনো অস্তিত্বই নয় তার দিকে চেয়ে কী লাভ? যিনি ছাড়া অন্য কেউই কিছু করতে পারে না তাকে বাদ দিয়ে অক্ষম কিছুর দিকে তাকিয়ে থেকে কী হবে?

এই পথ হচ্ছে সবকিছু এক আল্লাহর কাছ থেকে নেয়ার বিশ্বাস ও ধারণা, মর্যাদা ও মূল্যবোধ, মাপকাঠি ও পরিমাপযন্ত্র, শরীয়ত ও আইন-কানুন নিয়ম ও ব্যবস্থাপনা, শিষ্টাচার ও আনুষ্ঠানিকতা সবকিছুই একই সত্ত্বার কাছ থেকে নিতে হবে, যা সত্যিকার অর্থে একক সত্য- অন্য কিছুই এই মানের নয়। এ পথ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পথ যিনি একক ও মহান সত্ত্বা, তাঁর কাছ থেকে ক্রিয়াকর্মের উৎসাহ ও প্রেরণা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে যাতে করে মানুষ তার কাজকর্ম দিয়ে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হয়। বাধা থেকে মুক্তি লাভ করে পথভ্রষ্টকারী বিষয় থেকে নাজাত হাসিল করতে পারে- চাই তা ব্যক্তি মানুষের মনের গভীরের কিছু হোক, অথবা তা যদি হয় মানুষের নিজস্ব কোনো ব্যক্তি ও জিনিস যা তার আশেপাশে ছড়িয়ে আছে কিংবা তা যদি হয় মানুষের নিজস্ব কোনো ব্যক্তিসত্ত্বার বিষয় অথবা সমগ্র সৃষ্টিকুলের কোনো জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ও ভীতির আকারে হোক, সর্বাবস্থায় এই পথ একজন ব্যক্তি মানুষকে কর্মের প্রেরণা যোগাবে।

এ হচ্ছে এমন এক পথ-যার মাধ্যমে মানুষের অন্তরের সাথে এই পৃথিবীর অন্য সব কয়টি জিনিসের স্নেহ ও মমতা, আকর্ষণ ও সহমর্মিতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এসব কিছুর বিধি নিষেধ থেকে মুক্তি মানে এ নয় যে, এসব কিছুকে খারাপ মনে করতে হবে এবং ঘৃনায় মানুষ এসব কিছু থেকে দূরে সরে যাবে। এর সব কিছুই এসেছে আল্লাহর হাত দিয়ে, এগুলোর নিজেদের অস্তিত্বও সে অস্তিত্ব থেকেই পেয়েছে এবং এই সৃষ্টির সব কিছুতেই সে মৌলিক সত্যের অনুদান দৃষ্টিগোচর

হবে। অতএব গোটা সৃষ্টি জগতের সব কিছুই আমাদের কাছে প্রিয়, কারণ এর প্রতিটি জিনিসই হচ্ছে প্রিয়জনের উপহার।

এই পথ উন্মুক্ত ও অনেক উঁচু। এ পথে যমীন খুব ছোটো, বৈষয়িক জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। এই যেন্দেগীর সহায়-সম্পদ খুবই নগণ্য। এ পথের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে এই বিধিবন্ধন ও সীমাবদ্ধতা থেকে বাইরে চলে আসা। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে এ মুক্তির মানে দুনিয়ার জীবনকে ছেড়ে দেয়া কিংবা তাকে উদ্দেশ্যহীন মনে করা নয় এবং এটাকে ঘৃণা করে এ জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোও এর উদ্দেশ্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ সর্বদাই এ বৈষয়িক জীবনকে নিয়েই চলবে তবে মানবতার উৎকর্ষের খাতিরে তাকে সর্বদাই এসব কিছুর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

অপর কথায় এর অর্থ হচ্ছে মানুষদের তার সব কয়টি দায়দায়িত্ব সহই এ দুনিয়ার প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়েছে। নেতৃত্বের আসনও তাকে দেয়া হয়েছে এ সবকিছুরই সাথে। তবে সাথে সাথে প্রয়োজনে এ বৈষয়িক জীবনের বিধি–বন্ধন থেকে তার পূর্ণাঙ্গ আযাদীও সেখানে অবশিষ্ট থাকবে। আধুনিক গীর্জার পথ ধরে মানবতার যে মুক্তি আসে, তাকে বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় খুবই সহজ। কিন্তু ইসলাম তা মোটেই চায় না।

কেননা তার দৃষ্টিতে মুক্তির জন্যে খেলাফত তথা মানবতার পথ প্রদর্শন ইসলাম প্রদর্শিত এই পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পথ যদিও কিছুটা কঠিন কিন্তু মানুষের মনুষত্বকে এটিই প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের অস্তিত্বের মাঝে উন্নত মান ও উচ্চতা বিরাজমান। তাই মানুষের আত্মাকে তার স্রষ্টার উৎসের দিকে সর্বদাই স্বাধীন করে রাখতে হবে এবং এ জন্যে সে পথেই একে চালাতে হবে যা আল্লাহ তায়ালা শিখিয়েছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো তাকে ইসলামের প্রথম ও মৌলিক দাওয়াতের মূল ভিত্তি হিসেবে সামনে রাখুন। এই তাওহীদের ধারণা–বিশ্বাসকেই মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে রাখা হয়েছে। কেননা তাওহীদ কিংবা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তাই হচ্ছে এর বিশ্বাসগত আকীদা-অস্তিত্বের ব্যাখ্যা ও জীবনের পূর্ণ বিধি-বিধান। এটা শুধু মুখে আওড়ানোর একটি বাক্য কিংবা অন্তরে বসিয়ে রাখার একটি ছবিই নয়। মূলত সবকিছুই হচ্ছে এই তাওহীদ। এই হচ্ছে জীবন বিধান, এই হচ্ছে দ্বীন। এরপর যা কিছুই এর ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে এর ফলশ্রুতি মাত্র।

তাওহীদের এই মৌলিক বিশ্বাসকে এভাবেই অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে যেভাবে এর ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এর আগে যাদের ওপর কেতাব নাযিল করেছেন তাদের মধ্যে যেসব ভাঙ্গন–বিপর্যয় ও গোঁড়ামি সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে তাদের বিশ্বাস কর্মধারা ও সমগ্র জীবন যেভাবে বদলে গেছে, তার মূল কারণ ছিলো এই যে, তাওহীদের নির্ভেজাল ধারণা তাদের অন্তর থেকে মিটে গেছে। এই মৌলিক গলদের কারণে তাদের জীবনের সর্বাংশে এই পরিবর্তনসমূহ সূচিত হয়েছে। তাওহীদের ইসলামী আকীদার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি মানুষের সমগ্র জীবনে ব্যাপৃত থাকে। এখানে জীবনের ভিত্তিই রাখা হয় এই আকীদা বিশ্বাসের ওপর। কর্মজীবনের ভিত্তিও এখানে একই জায়গায়। বিশ্বাস ও আইনে সর্বত্রই এ বিশ্বাসের প্রভাব থাকবে সমান সমান। প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, এক আল্লাহর শরীয়তই হবে জীবনের আইন। যদি জীবনে ও জীবনের আইনে এসব প্রভাব বিদ্যমান না থাকে, তাহলে তাওহীদের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণই মূল্যহীন ব্যাপার। কেননা কোথাও যখন তা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার সব ক'টি প্রভাব নিয়েই সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীবনের সব কয়টি বিভাগ, সব কয়টি স্তর, সবখানেই সমভাবে তার প্রভাব পড়ে।

আল্লাহ তায়ালা এক, এর মানে হচ্ছে, তিনি 'সামাদ' কারো মুখাপেক্ষী নন কারো ওপর নির্ভরশীলও নন। তাঁর পিতা নেই, সন্তান নেই, না তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ আছে। অবশ্য কোরআন এ বিষয়টির আরো কিছু ব্যাখ্যা পেশ করার জন্যে বলেছে, 'আল্লাহুস সামাদ'।

'সামাদ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন এক সরদার, যার ইচ্ছা ও আদেশ ছাড়া কিছুই হয় না, কোনো সিদ্ধান্তও তাঁর মরযী ছাড়া করা যায় না। আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সেই সত্ত্বা যিনি ছাড়া অদ্বিতীয় কোনো সত্ত্বা নেই। কেননা তিনি তাঁর খোদায়ীতে একক, অন্য সবাই তাঁর বান্দা। কিছু চাওয়া, কিছু আশা করার ব্যাপারে তাঁর দিকেই ধাবিত হতে হয়। যারা তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের কথা শোনা ও তা যথাযথ পুরণ করার ব্যাপারে তিনি এক ও একক। তিনিই হচ্ছেন সেই একক আল্লাহ তায়ালা, যার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতিরেকে সমগ্র কায়েনাতে কিছুই সম্পাদিত হয় না। কোনো কিছুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর কোনো সাথী নেই। তিনি যেহেতু এক তাই নির্ভরশীলতা ও মুখাপেক্ষীতার যাবতীয় দোষক্রটি থেকে তিনি মুক্ত।

'লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ুলাদ' অর্থাৎ তিনিই প্রথম তিনিই শেষ। নিজের অস্তিত্বের জন্যে তাঁর কারো সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। তাঁকে নিজের স্থায়িত্বের জন্যে কারো ওপর ভরসা করতে হয় না। তাঁর অবস্থার কখনো পরিবর্তন হয় না। সর্বাবস্থায় তাঁর গুণাবলী হচ্ছে বিধি বন্ধনহীন।

জন্ম নেয়ার ভেতরে ক্রটি ও দোষ থাকে। একটি জিনিস আগে ছিলো না জন্মের পরই অস্তিত্বে এসেছে। এ বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে অসম্ভব ও অবান্তর। তাছাড়া জন্ম শব্দটির সাথে রয়েছে দু'জনের এক সমান হওয়ার সম্পর্ক। এই বিষয়টিও আল্লাহ তায়ালার জন্যে অসম্ভব। এ কারণেই 'আহাদ' এ শব্দটির মাঝে জন্মদাতা ও জন্ম উভয় ধারণারই অস্বীকৃতি প্রকাশ করা হয়েছে।

'ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ' অর্থাৎ তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। অস্তিত্বের মূল সত্যেও নেই, সবকিছুই তিনি একা করেন, এ ধারণাতেও কেউ তাঁর মতো নেই। তাঁর নিজস্ব গুণাবলী অথবা অন্য কোনো গুণের ক্ষেত্রেও তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই। একথাও তাঁর সে একা হওয়ার বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। সম্পূর্ণ একা হওয়ার এ হচ্ছে অপরিহার্য পরিণাম। অবশ্য আল-াদাভাবে একথাটা বলার মধ্যে এই গুণের আধিক্য ও এর অবশ্যম্ভাবিতাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে।

প্রকারান্তরে ভালোর খোদা একজন মন্দের খোদা আরেকজন এই বর্ণনা তাও অস্বীকার করে। সেখানে উভয় খোদার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী পরস্পর বিরোধী– একে অপরের উল্টো। এই দুই খোদার আকীদা ইরানী অগ্নিপূজকদের আকীদা থেকে এসেছে। তাঁরা সব সময় আলো আঁধারের জন্যে মনে করে আলাদা খোদা রয়েছে। আরব উপদ্বীপের উত্তর দিকের কিছু এলাকায়ও এই ধা-রণা প্রচলিত ছিলো, যে সব এলাকায় ইরানীদের রাজত্ব ছিলো।

এ সূরাটির তাওহীদের ইসলামী আকীদার স্বীকৃতি প্রদান করে। আর সূরায়ে 'কাফেরূন' তাওহীদ ও শেরেকের আকীদার মাঝে কোনো প্রকার সামঞ্জস্য ও মিলমিশকে প্রত্যাখান করে। এ উভয় সূরার মাঝেই তাওহীদ বিশ্বাসের ভিন্ন ভিন্ন দুটি দিক বর্ণিত ও পরিস্ফুটিত হয়ে আছে। সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রসূল (স.) ফজরের সুন্নাত দুই রাকয়াতে এই দুই সূরা পড়ে দিনের আরম্ভ করতেন। এভাবে শুরু করার একটা গভীর ও উঁচুমানের উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো।

সূরা আল ফালাক্ব

আয়াত ৫ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় চাই, ২. (আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিসের) অনিষ্ট থেকে, ৩. আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে সংঘটিত) অনিষ্ট থেকে, (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়, ৪. (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে, ৫. হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি তোমার আশ্রয় চাই), যখন সে হিংসা করে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরা এবং এর পরের সূরাটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক উদাত্ত আহ্বান। প্রথমত আল্লাহর নবীর জন্যে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণভাবে সব ঈমানদার মানুষের জন্যে। এই আহ্বান হচ্ছে আল্লাহর আশ্রয়ে পানাহ চাওয়ার, তাঁর সাহায্যের আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদ করার, সব ভীতিমূলক কাজ থেকে আশ্রয় চেয়ে সঠিকভাবে আল্লাহর কাছে এসে আশ্রয় নেয়া।

সেই ভীতিকর জিনিস গোপনীয় হোক কিংবা প্রকাশ্য হোক, জানা হোক কিংবা অজানা হোক, সব ধরনের ভীতি থেকে পানাহ চাইতে বলা হয়েছে। এই আহ্বানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, আবার বিস্তারিত ভাবেও বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, আশ্রয়ের স্থানটিকে প্রসারিত করে ধরেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও আদরের সাথে তাদের বলেন— এসো, এদিকে এসো, নিরাপদ জায়গায় এসো, শান্তির জায়গায় এসো। এসো আমার কাছে।

কারণ আমি জানি তোমরা দুর্বলতা, তার ওপর কিছু লোক রয়েছে যারা তোমাদের শত্রু। তোমাদের চারদিকে রয়েছে ভীতিপ্রদ কিছু কিছু স্থান, তাই তোমরা এদিকে চলে এসো, তোমরা এখানে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। এ কারণেই এ উভয় সূরা শুরু হচ্ছে এভাবে 'কুল আউ'যু বেরাব্বিল ফালাক্ব, কুল আউ'যু বেরাব্বিন্নাস। (হে নবী তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই সুবহে সাদিকের স্রষ্টার, হে নবী তুমি বলো আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের অর্থাৎ আশ্রয় চাওয়া দিয়েই এ সূরা দু'টি শুরু হয়েছে।)

এই সূরা দু'টোর শানে নযুলের ব্যাপারে যেসব হাদীস ও রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে তার সব কিছুর সাথে এর মৌলিক উদ্দেশ্যের একটা মিল রয়েছে, যা আমি ইতিপূর্বে এখানে আলোচনা করেছি। এসব বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, রসূল (স.) এ দুটো সূরা পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছেন ও মানসিক প্রশান্তি পেয়েছেন।

হযরত আকাবা বিন আমের থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, একদিন আল্লাহর নবী তাকে বলেছেন, তুমি কি জানো না আজ এমন কিছু আয়াত আমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে যার মতো কিছু আর আগে কখনো দেখিনি। 'কুল আউযু' বেরাব্বিল ফালাক্ব, কুল আউ'যু বেরাব্বিনাস' (মুয়াত্তা, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

নাসায়ীতে হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, একদিন রসূল (স.) আমাকে বললেন, 'জাবের পড়ো। আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার নামে উৎসর্গিত হোক, বলুন কী পড়বো? তিনি আমাকে বললেন, পড়ো 'কুল আউযু বেরাব্বিল ফালাক্ব, কুল আউ'যু বেরাব্বিনাস।' আমি পড়লাম। তিনি বললেন, এগুলো পড়তে থাকো, এরপর এরকম অন্য কোনো জিনিস কখনো আর পড়তে পারবে না।'

হযরত যর বিন হুবায়শ বললেন, আমি একদিন উবাই বিন কা'বকে এ সূরা দু'টোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবুল মানযার, আপনার ভাই ইবনে মাসউদ এমন কথা বলেন যে, এটা নাকি কোরআনের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি মনে করতেন এটা নাকি শুধু দোয়া ও ওযীফা, এ কারণেই তিনি একে কোরআনের অংশ মনে করেননি।

অতপর তিনি সাহাবাদের সম্মিলিত রায় মেনে নেন এবং একে কোরআনের শামিল বলে মনে করেন। এরপর উবাই বিন কা'ব বললেন, আমি রসূল (স.)-কে একথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বল-লেন, আমাকে বলা হয়েছে 'কুল' (বলো) আমি বললাম। অতএব আমরাও এভাবেই এগুলো বলি, যেভাবে রসূল (স.) আমাদের বলেছেন। (বোখারী)

অর্থাৎ এখানে কুল (বলো) অর্থ কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত কুল (বলো) শব্দের মতোই । অতএব এ দুটো কোরআনেরই সূরা এবং আলোচ্য হাদীস কয়টি এই সুন্দর কয়টি বিষয়ের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা আমি এখানে আলোচনা করেছি। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা নিজেকে নিজে তাঁর সেই বিশেষ গুণ দিয়ে পেশ করেছেন যার কাছ থেকে এখানে বর্ণিত জিনিসসমূহ থেকে আশ্রয় চাওয়া যায়।

সকল অনিষ্ট থেকে শান্তিময় আশ্রয়ে

যেমন বলা হয়েছে, 'কুল আউ'যু বেরাব্বিল ফালাক্ব'। 'ফালাক্ব' শব্দের এক অর্থ হচ্ছে 'সকাল বেলা' এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'সমগ্র সৃষ্টিকুল'। এই অর্থের আলোকে এর ইঙ্গিত এমন প্রতিটি জিনিসের দিকেই নিবদ্ধ যা থেকে জীবনের উৎপত্তি হয়। যেমন বলা হয়েছে সূরা 'আল আনয়ামে', 'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শস্যদানা ও তৃণরাজিকে জীবন দান করেন। জীবন্তকে জীবনহীন থেকে বের করেন আবার মৃতকে বের করে আনেন জীবিত কিছু থেকে।' আবার এও বলা হয়েছে, 'সকালকে তিনি বের করেন রাত থেকে আবার এই রাতকেই তিনি বানিয়েছেন আরামের উপকরণ হিসেবে এবং চাঁদ সূরুজকে বানিয়েছেন হিসাব নিকাশের ব্যবস্থা হিসেবে।'

এ সূরায় আশ্রয় চাওয়ার দিক থেকে উভয় উদ্দেশ্যেই সমান কথা, যদি 'ফালাক্ব' অর্থ সকাল বেলার মালিকের আশ্রয় নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে সেই মালিক যিনি দিনের আলোর আগ

পর্যন্ত সব রকমের গোপন বিষয়সমূহকে গোপন রাখেন, আবার যদি 'ফালাক্ব' অর্থ সৃষ্টিকূল হয় তাহলে এর অর্থ হবে, এমন কিছু থেকে আশ্রয় চাওয়া যা মাখলূকাতের অনিষ্ট থেকে তাকে নিরাপদ রাখবে। উভয় অর্থের দিক থেকেই পরবর্তী আলোচনার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

'মেন শাররি মা' খালাক্ব' বলতে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর মাখলুকাতকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। সৃষ্টিরাজি যখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়, তখন কিছু অনিষ্টও এর সাথে থাকে। কোনো কোনো অবস্থায় তাদের কাছ থেকে উপকার ও কল্যাণ হাসিল হতে পারে, এখানে তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে যেন তাদের কল্যাণটুকু অবশিষ্ট থাকে। যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের তৈরী করেছেন, তিনি এতটুকু ক্ষমতাও রাখেন যেন তাদের দিয়ে অপকার না হয়ে শুধু উপকারই সাধিত হবে। বলা হয়েছে, 'ওয়া মিন শাররে গা-সেকীন ইযা ওয়াক্বাব'।

'গা-সেক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন কোনো জিনিস যা ঝাঁপ দেয়। 'ওয়াক্বাব' বলা হয় পাহাড়ের সে উঁচু স্থানকে, যেখান থেকে পানি প্রাবাহিত হয়। সম্ভবত এখানে এর অর্থ রাত এবং তার অভ্যন্তরীণ জিনিসসমূহ বোঝানো হয়েছে। দিনের আলোর মাঝে যখন রাতের আঁধার ঝাঁপ দিয়ে এসে হাযির হয় তখন সে কায়েনাতকে ঢেকে ফেলে এবং রাত নিজের সবটুকু ভীতিপ্রদ বৈশিষ্ট নিয়ে হাযির হয়।

তাছাড়া তার মাধ্যমে অদেখা অজানা কিছুর আশংকাও বৃদ্ধি পায়। যেমন হিংস্র জন্তুর হামলা, কু-মতলবে লুকিয়ে থাকা চোর-ডাকাতের ভয়, ধোঁকাবাজ দুশমনের অতর্কিত আক্রমণ, বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের একত্রিত হওয়া, মনের ভেতরে নানা রকম দুশ্চিন্তা কুমন্ত্রণার আনাগোনা, যা অধিকাংশই রাতের বেলায় দেখা দেয় এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে দাবিয়ে রাখে, শয়তান যার অন্ধকারে স্বাধীনভাবে কুমন্ত্রণা দেয়ার সুযোগ পায়।

সর্বোপরি রাতের অন্ধকার ও নীরবতায় মানুষের মনে যে কামনা বাসনার সৃষ্টি হয় তার থেকেও পানাহ চাইতে হবে। এছাড়াও এতে রাতের সব ধরনের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ থেকেও আশ্রয় চাওয়ার চিত্র আঁকা হয়েছে।

এসব জাদুর মহিলা যারা মানুষের অনুভূতিকে ধোঁকা দিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে থাকে এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে প্রতারণার সাহায্যে প্রভাবিন্বত করে, নানা রকম মানসিক প্রবঞ্চনায় লিপ্ত করে– যা বিভিন্নভাবে জ্ঞান ও অনুভূতিতেও প্রভাব বিস্তার করে। তারপর বিভিন্ন রশি ও রুমালে গিরা দেয়, এসব হচ্ছে জাদু ও এর প্রভাবের এক দিক।

জাদু-টোনার ফলে কোনো বস্তুর মূল ও প্রকৃতিতে কোনোরকম পরিবর্তন সাধিত হয় না এবং বস্তুতে কোনো নতুন জিনিসের সৃষ্টিও করে না। কিছুক্ষণের জন্যে জাদুকরের জাদু মানুষের অনুভূতিতে কিছু ওলটপালট ঘটিয়ে দিয়ে যায়। মূসা (আ.)-এর ঘটনা বলতে গিয়ে কোরআনের জাদুর যে চিত্র আকা হয়েছে, তা সূরা 'তাহায়' দেখুন।

'জাদুকররা বললো, হে মূসা, তুমি (তোমার জাদুর চাল) আগে ফেলবে, না আমরা আগে ফেলবো? মূসা (আ.) বললো, বরং তোমরাই আগে ফেলো। তারপর তাদের নিক্ষেপ করা জাদুর রশি এবং লাঠির ওপর জাদুর প্রভাবে মূসা (আ.)–এর মনে এ ধারণা এসে যাচ্ছিলো যে, এগুলো বুঝি দ্রুতগতিতে চলছে। এ কারণে মূসা (আ.)–এর মনে কিছুটা ভয়ের উদ্রেক হলো।'

এরপর আমি বললাম, মূসা তুমি ভয় পেয়ো না, অবশ্যই তোমার মর্যাদা অনেক বড়ো। তুমি তোমার ডান হাতের জিনিসগুলো 'মাটিতে' ফেলে দাও, দেখবে তাদের বানানো সব কয়টি জিনিসকেই তোমার লাঠি খেয়ে ফেলবে। অবশ্যই তারা যা বানিয়েছে, তা ছিলো জাদুর একটা

গোপন ফন্দি মাত্র। জাদুকররা যেখানেই থাকুক, তারা কোনোদিনই সফলতা পাবে না।' এ থেকে এটা জানা গেলো যে, তাদের রশি ও লাঠি আসলে সাপে পরিণত হয়নি। কিন্তু তা মূসা (আ.) ও অন্যান্য লোকদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছিলো যে, এগুলো বুঝি দৌড়াচ্ছে। এমনকি মূসা (আ.) নিজে কিছুটা ভয়ও পেলেন। কারণ তিনি তো মূলত জাদুকর ছিলেন না। তার কাছে যা কিছু ছিলো তা আল্লাহর দেয়া মোজেযা ছিলো। আর তখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে অভয়বাণী তিনি পাননি।

অতপর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অভয়বাণী পেলেন, তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শক্তভাবে তার মোকাবেলা করলেন। এরপর এক পর্যায়ে যখন দেখলেন যে, সত্যিই মূসা (আ.)-এর লাঠি সাপে পরিণত হয়ে গেলো এবং জাদুর অন্যান্য ছোটখাটো রশি ও লাঠিকে খেয়ে ফেললো, তখন তার সামনে আল্লাহর সব কুদরত পরিষ্কার হয়ে গেলো।

এ হচ্ছে জাদুর মূলকথা। এভাবেই আমাদের এটা বুঝতে হবে। মেনে নিতে হবে যে, মানুষের ওপর এটা প্রভাব বিস্তার করে এবং সে অনুযায়ী মানুষকে এক ধরনের খেয়ালে ফেলে দেয়। এই অনুভূতি ও তার প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ মানুষের মনে এক ধরনের ভয় ও কষ্টের সৃষ্টি করে এবং এরই ফলে যাদুকর তার ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে মানুষদের ধাবিত করতে পারে।

আরো কিছু রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, যা মোতাওয়াতের নয় (মানে যা বর্ণনা বহুসংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত নয়) এ ধরনের একটি রেওয়ায়াত আছে, লুবায়দ বিন আসাম নামক এক ইহুদী ব্যক্তি মদীনা শরীফে রসূল (স.)-এর ওপর জাদু টোনা করে। কয়েক দিন কিংবা কয়েক মাস পর্যন্ত এই জাদুর প্রভাব তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট ছিলো।

এ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মনে হতো তিনি বুঝি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেছেন আসলে তিনি যাননি। অন্য রেওয়ায়াতে আছে তাঁর মনে হতো তিনি অমুক কাজটি বুঝি করেছেন, আসলে তিনি তা করেননি এবং আরেক রেওয়ায়াতের মতে এ সূরাগুলো ঝাঁড়ফুক থেকে বাঁচার জন্যে তাঁর কাছে নাযিল করা হয়েছে।

যখন তাকে জাদু করা হলো, যার কথা তাঁকে আগেই স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, তখন তিনি এই সূরা দুটো পড়লেন এবং এর ফলে ঝাড়ফুঁকের গিরাগুলো আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেলো তবে এই রেওয়ায়াতটি নবীর কর্ম ও তাঁর তাবলীগের ব্যাপার ও নবী চরিত্রের নিষ্পাপ হওয়ার সাথে খাপ খায় না এবং রসূল (স.)-এর সব কাজই যে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত এই বিশ্বাসের সাথেও এসব রেওয়ায়াতকে মিলানো যায় না।

তা ছাড়া রসূল (স.) সম্পর্কে কাফেররা যে বলতো তিনি জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত, এর প্রতিবাদ করে কোরআন যা বলেছে তাকেও এসব রেওয়ায়াত অস্বীকার করে। কোরআন কাফেরদের সেসব অভিযোগ এভাবে বর্ণনা করেছে, 'অর্থাৎ তোমরা কোনো জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্যক্তিরই আনুগত্য করে চলেছো।' কোরআন শরীফ বারবার এসব কাফের মোশরেকদের অভিযোগ ও অপবাদ খন্ডন করেছে। এসব কারণেই এসব রেওয়ায়াতকে আমরা শরীয়ত থেকে বেশ দূরবর্তী বলেই মনে করি। মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে হাদীস নয়-কোরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কোনো হাদীসকে আকীদার পর্যায়ে স্থান দিতে হলে তাকে হাদীসে মোতাওয়াতের হওয়াটা শর্ত। এই হাদীসগুলো কোনটাই মোতাওয়াতের নয়। তাছাড়া এ সূরা দুটোর মক্কায় নাযিল হওয়াটাই সঠিক, সেদিক থেকেও অন্য রেওয়ায়াতগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে।

'হাসাদ' হিংসা একটি মনস্তাত্ত্বিক রোগ। আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত দান ও অনুগ্রহের ব্যাপারে তাকে বিনষ্ট করে দেয়ার আগ্রহ থেকে কিছু মানুষের মনে এটি সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো এর প্রভাব শুধুমাত্র মানসিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। আবার কখনো মানুষ এর ফলে হিংসা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অন্যের ওপর দেয়া আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুদানকে বিনষ্ট করে দেয়ার চেষ্টাও করে থাকে। এর উভয় অবস্থাই অন্যায় ও অবৈধ। অবশ্য দ্বিতীয় অবস্থাটা প্রথম অবস্থার চেয়ে অনেক ক্ষতিকর। কেননা হিংসুক ব্যক্তি হিংসার আগুনে পুড়ে অনেক কিছুই করতে উদ্যত হয়।

মানুষের ভেতরের কিছু গোপন শক্তি-সামর্থ মজুদ থাকে, যার কুপ্রভাবে মানুষ অনেক কিছুই করে ফেলতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে অন্য মানুষকে হত্যা করতেও সে দ্বিধা করে না। মানুষের প্রাকৃতিক বিভিন্নতার কোনো সীমা নেই। তার সব কয়টির কারণ পেশ করা সম্ভব নয়। অনেক সময় বিভিন্ন জাদুটোনা, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির প্রভাব দিয়ে ব্যক্তিকে দিয়ে কিছু করানো যায়। এরকম অনেক কিছুই আমরা নিজেদের চোখে দেখতে পাই- যদিও এর কারণ সবসময় ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ যে অনেক অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে, তাতেও সন্দেহ নেই। এমন বহু ঘটনা দেখা যাবে যে, মানুষ শুধু হিংসার আগুনে ছারখার হয়ে অন্যকে খুন করে ফেলে, আহত করে ফেলে। তার সহায়-সম্পদ লুট করে অথবা তাকে মারাত্মক কোনো ক্ষতির হুমকি প্রদান করে। হিংসুক ব্যক্তির প্রভাব তো তার আচার আচরণ দেখেই বোঝা যায়। একজন ব্যক্তির এই হিংসাত্মক মন মানসিকতার প্রভাব অবশ্যই আরেকজনের ওপর পড়ে। স্নেহ মমতা ও ভালোবাসার দৃষ্টি হামেশাই রাগ ও আক্রোশের দৃষ্টি থেকে ভিন্নতর হয়। আর এ দু'টো পরস্পর বিরোধী অবস্থার দুটি ভিন্নমুখী প্রভাবও ঘটনার আলোকে বিচার করা যাবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে এটা বলা মুশকিল বরং একান্তই অসম্ভব যে এমনটি হয় কেন? এটাও সে ধরনের প্রশ্ন যেখানে জিজ্ঞেস করা হয় যে, যাদুর আছর হয় কেন? অথবা অসুখের ফলে মানুষ অসুস্থ হয় কেন? যদি এর সব কিছু কোনো বিষাক্ত জীবাণুর প্রভাব হয় তাহলে সেসব বানানোর উদ্দেশ্য কি এবং তা অন্যকেই বা কেন প্রভাবান্বিত করে?

এটা আল্লাহ পাকের দয়া যে, তিনি ক্ষতিকর মানুষ ও অন্যান্য অনিষ্টকর জিনিস থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় পাওয়ার নিয়ম আমাদের শিখিয়েছেন এবং এটাও পরীক্ষিত সত্য যে, এভাবে আশ্রয় চাইলে তা অবশ্যই কাজে লাগে। যে-ই আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং তাঁর আশ্রয়ে আসার জন্যে প্রার্থনা করে তিনি তাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নেন। যে-ই আল্লাহর কাছে দোয়া করে তিনি তা শুনেন এবং তা কবুল করেন। এটা মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা।

হযরত আয়শার বর্ণিত এই হাদীসটি ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসূল (স.) যখন প্রতি রাতে বিছানায় আসতেন, তখন উভয় হাতকে সামনে খুলে ধরতেন এবং তাতে ফুঁ দিতেন এবং উভয় হাতের মাঝে কোরআনের শেষ সূরা তিনটি পড়তেন। তারপর উভয় হাত দিয়ে শরীরের সম্ভাব্য অংশগুলো মোসেহ করতেন, মাথা ও মুখমন্ডল থেকে শুরু করতেন। আস্তেশরীরের অন্যান্য অংশের দিকে হাত বাড়াতেন। এভাবে তিনি তিনবার করতেন বলে হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায়।

সূরা আন্ নাস

আয়াত ৬ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের মালিকের কাছে, ২. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (আসল) বাদশাহের কাছে,৩. (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (একমাত্র) মাবুদের কাছে, ৪. (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণাদানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়েই) গা ঢাকা দেয়, ৫. যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, ৬. জ্বিনদের মধ্য থেকে (হোক বা) মানুষদের মধ্য থেকে হোক (তাদের অনিষ্ট থেকে আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাই)।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরায়ও আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে । যিনি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ। মানুষের মাবুদ। আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে শয়তানের অনিষ্ট থেকে যে শয়তান মানুষদের কুমন্ত্রণা যোগায়। কুমন্ত্রণা দিয়ে সে পেছনে ফিরে যায় মাঝখানে কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করে কেটে পড়ে। আবার এ শয়তান মানুষ এবং জ্বিন উভয় দলের মধ্য থেকেই হতে পারে।

এই পানাহ চাওয়ার ব্যাপারে যাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি প্রতিপালক, তিনি রাজাধিরাজ, বাদশাহ, তিনি মাবুদ। সাধারণভাবে তাঁর আশ্রয়ই যাবতীয় অনিষ্ট থেকে মানুষদের দূরে রাখে। আবার বিশেষ করে নানা ধরনের কুমন্ত্রণাদায়ী বস্তু যখন নানা ধরনের প্রলোভন দিয়ে মানুষদের খারাপ কাজে নিয়োগ করে তখন বিশেষভাবেও আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

'রব' হচ্ছেন সেই পবিত্র সত্ত্বা, যিনি সবকিছুকে লালন-পালন করেন, সবকিছু প্রদর্শন করেন, দেখাশোনা করেন, সাহায্য-সহযোগিতা করেন। 'মালেক' বাদশাহ, সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান শাসক। 'ইলাহ' মানে মাবুদ, উচু মর্যাদাসম্পন্ন সর্বোচ্চ বিজয়ী, সবকিছুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী মহান সত্ত্বা। এ গুণাবলী স্মরণ করে আল্লাহর মহান সত্ত্বার কাছ থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। কারণ

আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন এ গুণাবলীর একক আধার। অবশ্য এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ কিভাবে মানুষকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বাঁচায়, এটা আমাদের জানার উপায়ই বা কতোটুকু? আল্লাহ তায়ালাই তা ভালো জানেন।

আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, একক ক্ষমতাসম্পন্ন মালিক, সবকিছুর ওপর তাঁর ক্ষমতা কার্যকর। সবকিছু তাঁরই হাতে। ন্যায়-অন্যায়, উপকার অপকার, নিষ্ট অনিষ্ট সবকিছুর স্রষ্টাও তিনি। তাই তিনি তাঁর গুণাবলী দিয়ে মানুষকেও যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারেন।

আগের সূরাটিতে মানুষদের বৈষয়িক কিছু জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এই সূরায় বলা হয়েছে কিছু আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় থেকে আশ্রয় চাইতে।

তাফসীর

আল্লাহ তায়ালা সবার 'রব', সবার 'মালিক', সবার 'ইলাহ'। অবশ্য এখানে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার মাঝে পানাহ কিংবা আশ্রয় চাওয়ার ব্যাপারে তাদের অগ্রাধিকার পাওয়া ও এর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কুমন্ত্রনা থেকে বাচার উপায়

আল্লাহ তায়ালা নিজের দয়া ও অসীম অনুগ্রহ দিয়ে স্বীয় নবী (স.) ও তাঁর উম্মতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তারা যেন আল্লাহর কাছ থেকে আশ্রয় চায় এবং নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে তাঁর দিকেই ফিরে যায় এবং সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার এই অনুপম গুণাবলীকে স্মরণ রাখতে বলেছেন।

এসব গুণ স্মরণে রেখে বলা হয়েছে তাঁর কাছে পানাহ চাইতে সেই গোপনে কুমন্ত্রণা দাতা শয়তানের কাছ থেকে, যার মোকাবেলা এই ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কোনোদিনই সম্ভব নয়। শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণার আক্রমণ বহুমুখী। সে কোন্ দিক থেকে মানুষকে ধরবে, তা কেউই বলতে পারে না। কোন উপায় উপকরণ দিয়ে সে মানুষের মনকে বিপথগামী করে, তাও কেউ বলতে পারে না।

'ওয়াসওয়াসা' মানে 'ব্যক্তিগত আওয়ায'। 'আল খামুস' মানে 'লুকিয়ে যাওয়া এবং ফিরে আসা'। 'খান্নাস' বলে এমন কিছুকে যার প্রকৃতিই হচ্ছে এমন যে, সে অন্যায় করে লুকিয়ে যায় যাতে করে তার অন্যায়ের পাত্তাই পাওয়া না যায়।

কোরআন মাজীদ এই শয়তানের যে বর্ণনা দিয়েছে, সে মোতাবেক তাকে বলা হয়েছে 'ওয়াসওয়া'সুল খান্নাস'। তারপর তার কার্যাবলীর কথা বলেছে যে, সে মানুষের অন্তরে নানান ধরনের কুমন্ত্রণা যোগায়। তারপর তার মূল সূত্র বলা হয়েছে যে, সে জ্বিন থেকে যেমন হতে পারে— মানুষদের থেকেও আসতে পারে।

বর্ণনার এ ধারার ফলে মানুষের অনুভূতিতে একটা জাগরণ চিন্তা ও সাবধানতার সৃষ্টি হয় এবং এভাবেই সে 'ওয়াসওয়া'সুল খান্নাস' সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অভিহিত হতে পারে। বর্ণনার শুরুতে এর শুধু দোষটুকুই বলা হয়েছে যেন তার কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যের ধারণা পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে সে তার অনিষ্টসমূহ সম্পাদন করে, তাই মানুষের অন্তরে শয়তানকে মোকাবেলা করে তার থেকে দূরে থাকা এবং নিজেকে দেখা শোনা করার একটা যোগ্যতা সৃষ্টি হতে পারে।

অপরদিকে মানুষের প্রবৃত্তি এ জাগরণ ও হুশিয়ারীর ফলে যখন একথা জেনে যায় যে, 'ওয়াসওয়াসুল খান্নাস' মানুষের অন্তরে গোপনে কুমন্ত্রণা দেয়, তা লুকিয়ে থাকা জ্বিন হোক কিংবা প্রকাশ্য মানুষ হোক- যারা জ্বিনদের মতোই মানুষের অন্তরে নানান রকম খারাপ দিয়ে তাকে

খারাপ পথে নিতে চায় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে প্রতিরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়। কারণ কোন কোন পথ দিয়ে শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে পারে তা সবই ইতিমধ্যে সে চিনে নিয়েছে।

জ্বিনদের 'ওয়াসওয়াসা' কি ধরনের, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমাদের জানা নেই। অবশ্য তাদের ব্যাপারে মানব জীবনের কতিপয় বাস্তব ঘটনা দিয়ে এর কিছুটা ধারণা আমরা পেতে পারি। আমরা এও জানি যে, আদম-ইবলীসের ঘটনা বহু পুরানো এবং শয়তান একদিন মানুষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানব জাতির বিরুদ্ধে শয়তানের এ যুদ্ধ ঘোষণা তার অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট থেকেই শুরু হয়েছে তাও আমরা জানি।

এক পর্যায়ে সে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে অনুমতি চাইলো, কোন বিশেষ কারণে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন তাকে তিনি এই অনুমতি দিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা শয়তানের মোকাবেলার এ লড়াইয়ে মানুষকে নিরস্ত্র ও একা ফেলে রাখেননি, বরং যুদ্ধ মোকাবেলার জন্যে ঈমানের ঢাল ও আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে আশ্রয় চাওয়ার একটা হাতিয়ার তার হাতে তুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহর স্মরণ দিয়ে তাকে শয়তানের সাথে মোকাবেলা করতে বলেছেন। এর পরও যদি মানুষ খোদার দেয়া ঢাল ও হাতিয়ারের কথা ভুলে নিজের প্রস্তুতিতে অবহেলা করে, তাহলে সেজন্যে তাকে নিজেকেই দায়ী হতে হবে– অন্য কাউকে নয়।

বোখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, রসূল (স.) বলেছেন, 'শয়তান মানুষের অন্তর দখল করে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন সে সরে যায়, আবার যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে মানুষ দূরে সরে আসে, তখন শয়তান আবার সেখানে এসে কুমন্ত্রণা যোগাতে শুরু করে।'

মানুষের কুমন্ত্রণার কথা তো প্রচুর জানি এবং এসব জানার ফলে আমরা এও বুঝতে পারি যে, মানুষের এসব কুমন্ত্রণা শয়তানের প্ররোচনার চেয়ে অনেক মারাত্মক। যেমন একজন খারাপ বন্ধু তার বিভিন্ন কথাবার্তা ও কাজকর্মে বন্ধুর জ্ঞান বুদ্ধি ও মনের ওপর এমন সব বাজে প্রভাব বিস্তার করে, যা সে টের পর্যন্ত পায় না, অনুমানও করতে পারে না। কেননা, সে তাকে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুই মনে করে এসেছে।

আবার ক্ষমতাসীন ও দরবারী লোকদের আশেপাশের পরিষদবর্গ তাদের অন্তরে এমনসব কুমন্ত্রণা যোগায়, যার বশবর্তী হয়ে সে সব শাসক দুনিয়ায় মূল মালিকের বিদ্রোহে মেতে ওঠে এবং এভাবেই এরা এক সময় খোদার যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হিসেবে নিজের নানা অপকর্ম সৃষ্টি করে জনপদের মানুষ ও ফসলেরও বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধন করে।

আবার কিছু চোগলখোর আছে, যারা কথাবার্তাকে এমন রঙঢঙ দিয়ে পেশ করে যেন শুনে মনে হয় এটাই বুঝি সঠিক এবং এর মধ্যে কোনো সন্দেহ, শোবা নেই। আবার কিছু সংখ্যক আছে যারা কামনা-বাসনার বিষয়সমূহের বেচাকেনা করে, যা প্রাকৃতিক নিয়মনীতির বিপরীত জিনিসগুলোকেই উত্তেজিত করে।

এসব বহুমুখী মানবীয় কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা থেকে বাঁচতে হলে মানুষের অন্তরে খোদার স্মরণ জাগরূক থাকা ও তার প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রয়োজন। আবার এমন ধরনের বহু কুমন্ত্রণাদায়ী 'খান্নাস' আছে যারা প্ররোচনার জাল বিছিয়ে তাকে গোপন করে রাখে এবং এসব ষড়যন্ত্রের জাল নিয়ে মানব মনের গোপন পথ দিয়ে মানুষের মনে প্রবেশ করে। কারণ এসব পথ তাদের ভালোই জানা, ভালোই চেনা। এসব শয়তান কুমন্ত্রণা দানকারী জ্বিনের চেয়েও ভয়ংকর। কারণ, এরা লোকচক্ষুর

অন্তরালে লুকিয়ে থাকে এবং এক পর্যায়ে এসে মানুষ এসব অদেখা ও গোপনীয় চক্রান্ত ও প্ররোচনার কাছে অসহায় হয়ে পড়ে।

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর অক্ষমতা দূর করে তাকে মোকাবেলার সময়ে ঢাল তলোয়ার ও হাতিয়ার দিয়ে প্রস্তুতির কথা বলেন, তাকে এসব হাতিয়ার পাবার পথ বাতলে দেন, যাতে আল্লাহর বান্দা শয়তানের সাঙ্গপাঙ্গদের মোকাবেলা নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

'ওয়াসওয়াস' কুমন্ত্রণাদানকারীর প্রধান চরিত্র এটাই বলা হয়েছে যে, সে 'খান্নাস'। একথা বলে একদিকে এটা বুঝানো হয়েছে যে, সে গোপন-অদৃশ্য সব সময় সুযোগ ও সুবিধের সন্ধানে থাকে। যখনই সুযোগ পায় তখনি নিতান্ত চুপিসারে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে এবং তাকে কুমন্ত্রণা যোগায়। অপরদিকে এর মাধ্যমে তার এই গুণটিও বলা হয়েছে যে, খান্নাস সে ব্যক্তির সামনে অত্যন্ত দুর্বল, যে তার গোপন প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং তা থেকে সতর্ক হয়ে তার অন্তরের গোপন পথগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে। কেননা, শয়তান মানুষ হোক বা জ্বিন হোক, যখনই কেউ তার সামনাসামনি হবে, তখন সে ভেগে যাবে। এরপর অবশ্য সে আবারও আসে, তবে আসে নীরবে।

যেমন রসূল (স.) এ ব্যাপারে একটি সূক্ষ্ম উদাহরণ পেশ করে বলেছেন, যখন তার সামনে আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তখন শয়তান পালিয়ে যায়। আবার যখন সে গাফেল হয়ে যায় তখন শয়তান পুনরায় কুমন্ত্রণা দেয়। এ কথাটি প্ররোচনাকারীর সাথে মোকাবেলার সময় মোমেনের মনে শক্তির সঞ্চার করে। বিশেষ করে যখন মোমেন জানতে পারে যে, অভিশপ্ত শয়তান হচ্ছে 'খান্নাস' মানে গোপনে ও অতর্কিতে আক্রমণকারী, সে মোমেনের প্রস্তুতির সামনে সর্বদাই থাকে দুর্বল।

এ পর্যায়ে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার এবং তা হচ্ছে শয়তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার এ পথ অনেক লম্বা, অনেক দীর্ঘ। কেয়ামত পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতে থাকবে। শয়তান চিরদিন এভাবেই অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে থাকবে। একবার মোমেনের অন্তরকে জাগতে দেখলে কিছুক্ষণের জন্যে লুকিয়ে যাবে, আবার এসে হামলা করবে, কুমন্ত্রণা দেবে। সে সব সময়ই এই সুযোগের সন্ধানে থাকবে যে, কখন মোমেন-হৃদয় গাফেল হয়ে যাবে।

এ কারণে অন্তরকে জাগিয়ে নেয়াই যথেষ্ট নয়, এর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে ক্রমাগত জেগে থাকা। হৃদয় মনকে কখনো এ চেতনা থেকে গাফেল হতে দেয়া যাবে না, কারণ এ লড়াই কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কোরআন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে এ চিত্র এঁকেছে। তাকিয়ে দেখুন সূরায়ে ইসরার প্রতি, কি অপরূপ চিত্র আঁকা হয়েছে সেখানে!

'অতপর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম তোমরা সবাই আদমকে সেজদা করো, একমাত্র ইবলীস ছাড়া আর সবাই সেজদাবনত হলো। সে সেজদা তো করলোই না, বরং দম্ভভরে বললো, আমি কি তাকে সেজদা করবো যাকে তুমি মাটি দিয়ে বানিয়েছো? তা, তুমি দেখে নিয়ো, আজ যাকে তুমি আমার ওপর অধিক মর্যাদা দিলে, আমাকে যদি তুমি কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ দাও, তাহলে আমি এই ব্যক্তির সন্তানদের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দিয়ে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো।

অবশ্য কিছুসংখ্যক লোক এমন থাকবে, যাদের আমি গোমরাহ করতে পারবো না। আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ, যাও তোমাকে আমি সময়-সুযোগ দিলাম। মানুষের মাঝে যারাই তোমার প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে তোমার আনুগত্য করবে তোমার সাথে তাদের সবার জন্যেও এর পরিপূর্ণ বিনিময় হিসেবে জাহান্নাম আমি নির্ধারণ করে দেবো। যাও, ডাকো তাদের। তোমার ডাক দিয়ে

যদি পারো তাদের তুমি প্রলুব্ধ করো। তারপর তাদের ঘাড়ে উঠিয়ে নাও তোমার সঙ্গী-সাথী ও তাদের সামানপত্র।

অতপর তাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিতে তুমি তাদের অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের রকমারি ওয়াদা করতে থাকো। আর এটা তো জানা কথাই যে, শয়তানের ওয়াদা মিথ্যা ও প্রাতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সবাই জেনে রাখো যে, আমার যারা অনুগত বান্দা তাদের ওপর শয়তানের কোনো রকম মাতব্বরী কিংবা শাসন চলবে না। আমার বান্দাদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে আমি একাই যথেষ্ট।'

এ যে ক্রমাগত যুদ্ধ, যা একজন মানুষকে তার পারিপার্শিক অন্যায় ও অনিষ্টকর প্ররোচনার সাথে চালিয়ে যেতে হচ্ছে তা সরাসরি শয়তানের নিজের পক্ষ থেকে হোক কিংবা তার সাঙ্গোপাঙ্গ মানুষ কর্মী বাহিনীর পক্ষ থেকে হোক, মানুষ যেন কখনো নিজেকে এ চিরন্তন যুদ্ধে পরাজিত পরাভূত না ভাবে। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওপর ক্ষমতা ও প্রতিপ্রত্তি তো পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার একক। যিনি মানুষের মালিক, প্রতিপালক ও তার ওপর একচ্ছত্র বাদশাহ (তিনি রব্বুন্নাস, মালেকুন্নাস, ইলাহুন্নাস)।

তিনি যেখানে ইবলীসকে মানুষের কুমন্ত্রণা দেয়ার ও তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, সেখানে তিনি শয়তানকে তার টিকি ধরে টানতেও সক্ষম। আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে শুধু তাদের ওপরই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম করে বানিয়েছেন, যারা মূল মাবুদ রব ও মালিককে ভুলে যায়, কিন্তু যারা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে, তারা সবাই এ অনিষ্ট থেকে নাজাত পাবে। নাজাত পাবে শয়তানের যাবতীয় অদেখা অজানা ষড়যন্ত্র থেকে।

তাই বাঁচার একমাত্র পন্থা হচ্ছে মানুষ যেন সেই শক্তির আশ্রয় নেয়, যার ওপর দ্বিতীয় কোনো শক্তি নেই। সেই অমোঘ সত্যের ওপর ভরসা করবে যার বাইরে কোনো সত্য নেই। দুনিয়ার মালিক, দুনিয়ার মাবুদ, দুনিয়ার শাহানশাহর সাথেই তার সম্পর্ককে গভীর করতে হবে। অনিষ্ট ও অন্যায়ের সম্পর্ক হচ্ছে 'ওয়াসওয়াস ও খান্নাসের' (যারা গোপনে ও অতর্কিতে হামলা করে) সাথে। সম্মুখ সমরে তারা সর্বদাই পরাজিত ও পরাভূত থাকে। এরা হামেশাই প্রকাশ্য আক্রমণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে খোদার আশ্রয়ের সামনে। এদের পরাজয় অবধারিত।

ন্যায় ও অন্যায়ের এ হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত সত্য। এ হচ্ছে এমন এক উৎকৃষ্ট পন্থা, যা মানুষের অন্তরকে পরাজয় থেকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রয়োজনে তাকে শক্তি সাহস ও প্রশান্তি যোগায় এবং এভাবেই তার জীবন-শক্তিকে অক্ষুণ্ন রাখে। আল হামদু লিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজর
সূরা আন নাহল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

سيّد قطب

في ظلال القرآن

باللغة البنغالية

المجلد الثاني

ترجمة القرآن

حافظ منير الدين أحمد

AL-QURAN ACADEMY LONDON

إكاديمية القرآن لندن